হাজ্‌রাতুল কুদ্দুস

আল্লামা বদ্‌রুদ্দীন সেরহিন্দী রহ.

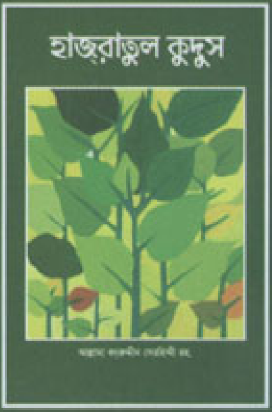

সেই সিঁড়ি শেষ হয়েছে। সমাপ্ত হয়েছে নবী-রসুল প্রেরণের প্রবহমানতা। এসেছেন তাঁদের শেষতম ও মহানতম জন, যিনি অপার মমতার পারাবার। রহমাতুল্লিল আ'লামীন। তারপর গত হয়েছে চৌদ্দশত বৎসর। তাঁর ধর্মাদর্শের পথেই এখন সমর্পিতপ্রাণ হতে হবে আমাদেরকে। খুঁজে নিতে হবে তাঁরই পথানুগামী কোনো নায়েবে রসুলকে, জামানার কুতুবকে, যথার্থ পীর-মোর্শেদকে। তাঁরাই মোহনা সমুদ্রমিলনপিয়াসী নদীসমূহের। হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ্ যেমন বলেছেন 'ফকিরদের দীল্ আল্লাহ্প্রাপ্তির দরওয়াজা।'

'হাজ্‌রাতুল কুদ্‌স' অর্থ 'পবিত্রাত্মাগণ' –তাঁদের জীবনচরিত।

প্রচ্ছদ ঃ সাবৃনা

হাজ্‌রাতুল কুদ্দুস

হাজ্‌রাতুল কুদুস

দ্বিতীয় খণ্ড

আল্লামা বদরুদ্দীন সেরহিন্দী র.

হাকিমাবাদ
খানকায়ে
মোজাদ্দেদিয়া

হাজ্‌রাতুল কুদুস
দ্বিতীয় খণ্ড
আল্লামা বদরুদ্দীন সেরহিন্দী র.
অনুবাদ
মাওলানা মোহাম্মদ অহিদুল্লাহ
সম্পাদনা
মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারী-২০১৩

প্রকাশক
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ
ফোনঃ ০১৭২৬২৮৮২৮০, ০১৬৭৭০৪২৮৯২

মুদ্রক
শওকত প্রিন্টার্স
১৯০/বি, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০।
মোবাইল ঃ ০১৭১১-২৬৪৮৮৭, ০১৭১৫-৩০২৭৩১

প্রচ্ছদ
সাবৃনা

বিনিময়
তিনশত টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান
মোজাদ্দেদিয়া কুতুবখানা
বায়তুল মোকাররম, ঢাকা-১০০০
মোবাইলঃ ০১১৯৯-৪৩৫৭৩৮, ০১৯২৯-৪৮৫২৯৯

HAZRATUL QUDUS (Lifesketches of Holy Souls) Volume-2: Lives of Shaykh Ahmed Faruki Serhindi R., his sons and representatives written by Allama Badruddin Serhindi R. translated in Bengali by Maolana Mohammad Wahidullah/Published by Hakimabad Khanka-e-Mozaddedia, Bhuigarh, Narayangonj, Bangladesh. Exchange Tk.300/- US $ 20

ISBN 984-70240-0066-8

بسم الله الرحمن الرحيم

স্মৃতি-বিস্মৃতির এই ভূবনে এসে প্রথমেই আমরা কাঁদি। তারপর মাতাপিতা ও স্বজনদের মায়া-মমতার বলয়ে প্রবেশ করে কান্না ভুলে যাই। মোহিত ও মত্ত হই পৃথিবীর প্রেমে। বয়ে যায় দিবস-বিভাবরীর রহস্যময় নিয়ম— আমাদের আত্মা ও সত্তার উপর দিয়ে। মহাবিশ্বের রূপ-রস-গন্ধ আগুন ধরিয়ে দেয় আমাদের সম্ভোগপ্রবৃত্তিতে। আমরা ভালোবাসতে থাকি পৃথিবীকে— পৃথিবীর প্রতিপত্তি-প্রভাবকে, নেতৃত্ব-কর্তৃত্বকে, বিত্ত-বৈভবকে। শুরু করি অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই। সংঘাতপ্রবণতাকে মনে করি জীবন। জীবনের সফলতা।

ভুলে যাই তাঁর কথা, যিনি জীবন দিলেন। ভালোবাসা দিলেন। সরবরাহ করে চললেন জীবনোপকরণসম্ভার। শুরু করি স্বার্থের দ্বন্দ্ব, সংঘাত, সংঘর্ষ। আপন-স্বজনদের মধ্যেই শুরু করি অ-সম্প্রীতি, অ-প্রেম। আমরা আর উপায় খুঁজে পাই না পরিত্রাণের।

শেষ পর্যন্ত তিনিই দেখিয়ে দেন আমাদেরকে পরিত্রাণের, উত্তরণের, শান্তির, মুক্তির ও সফলতার পথ, যিনি একমাত্র সৃজয়িতা, প্রভু-পালয়িতা, সকল প্রয়োজনপূরণকারী, সকল দুঃখ হরণকারী, জীবনদাতা, মৃত্যুপ্রদাতা। মাটির মানুষের প্রতি যাঁর পক্ষ থেকে সারাক্ষণ বর্ষিত হয়, হতে থাকে প্রীতি-মায়া-মমতার প্রেম-মহব্বত-ভালোবাসার বিরামহীন বৃষ্টি। তিনিই ক্রমাগত প্রেরণ করেন আমাদের আপনতম জনদেরকে, নবী ও রসুলগণকে, যুগে-যুগে শতাব্দীতে শতাব্দীতে।

তাঁরা এসে দাঁড়ান সকল সংঘর্ষের মাঝখানে। সকল দিশাহীনতার কেন্দ্রবিন্দুতে। আলোকাঘাত করেন সকল দিকে। সকল পক্ষ-প্রতিপক্ষকে। পক্ষ-প্রতিপক্ষের বিপক্ষদেরকেও। সেই প্রেমালোকের অভিঘাতে জেগে ওঠে বিশ্বাস, সুপ্তির সমুদ্র থেকে ফুটে ওঠে আলোর ফুল, প্রেমের মুকুল— হৃদয়ে হৃদয়ে, গৃহে-সংসারে-সমাজে।

সেই সিঁড়ি শেষ হয়েছে। সমাপ্ত হয়েছে নবী-রসুল প্রেরণের প্রবহমানতা। এসেছেন তাঁদের শেষতম ও মহানতম জন। যিনি অপার মমতার পারাবার। রহমাতুল্লিল আ'লামীন। তাঁর পরে গত হয়েছে চৌদ্দশত বছর। তাঁর ধর্মাদর্শের পথেই এখন সমর্পিতপ্রাণ হতে হবে আমাদেরকে। খুঁজে নিতে হবে তাঁরই পথানুগামী কোনো নায়েবে রসুলকে, জামানার কুতুবকে, যথার্থ পীর ও মোর্শেদকে। তাঁরাই মোহনা সমুদ্রমিলনপিয়াসী নদীসমূহের। হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ র. যেমন বলেছেন 'ফকিরদের দীল্ আল্লাহ্প্রাপ্তির দরওয়াজা'।

সময় বয়ে যায়। ঝরে পড়ে ফুল-ফল-ফসল, মরে মজে যায় স্রোতসংক্ষুব্ধ স্রোতস্বিনী, কক্ষচ্যুত হয় নক্ষত্রপুঞ্জ। চলে যাই আমরা, আমাদের প্রিয়জনেরা, ভ্রাতা-ভগ্নী, বন্ধু-স্বজনগণ। ভুলেও যাই। দিকচক্রবালকে ঘিরে ফ্যালে পুনঃবিস্মৃতি। সময়ের তমসাও হয় সুবিস্তৃত, সুকঠিন। সময়ের এই তামস্য ও বিস্তারকে প্রতিহত ও পরাভূত করে পথপ্রদর্শনের আলোককে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করাই ছিলো নবী ও রসূলগণের কাজ। কিন্তু তাঁরা তো আর আসবেন না।

আসবেন শেষতম নবীর প্রতিনিধিবৃন্দ, পূর্ণ ও পূর্ণতাপ্রদানকারী পীর-মোর্শেদগণ। এই নিয়মই চলতে থাকবে মহাপ্রলয় পর্যন্ত। তাঁদের প্রেমপক্ষপুটেই এখন আশ্রয় নিতে হবে আমাদেরকে। মান্য করে চলতে হবে তাঁদের যথানির্দেশনাকে। যখন, যেখানে, যাকেই পাইনা কেনো, তাঁদের কোনো একজনের করকমলকে স্পর্শ করে অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে হবে। বায়াত হতে হবে। যাঁরা এই বিধানটিকে মানবেন না, তাঁরা অবাধ্য হবেন আল্লাহ্তায়ালার এই অমূল্য ও অবশ্যমাননীয় নির্দেশখানির— 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো এবং সান্নিধ্যধন্য হও সত্যবাদীগণের'।

পীর-মোর্শেদগণের দায়িত্ব, কর্মবন্টন ও মর্যাদার তারতম্যও নিশ্চয় আছে। ফুল য্যামন হয় ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের ও গন্ধের। তেমনি হেদায়েতের বাগানের ফুল— কুতুবগণও হন ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্বসম্পন্ন— কামেল, কামেলে মোকাম্মেল এবং কামেলে মোকাল্লেদ। তাঁদের নেতা, বরং নেতাদের নেতা যাঁরা, তাঁদেরকে হাদিস শরীফে বলা হয়েছে 'মোজাদ্দেদ'। সময়ের তমসাকে অপসরণ করার ক্ষমতা তাঁদেরই অধিকারভূত। বলা বাহুল্য, আল্লাহ্পাকই তাঁদেরকে দান করেন বিজয়ের মহিমা। তাঁরা সময়ের পিতা (আবুল ওয়াক্ত), তাঁরা সময়কে জয় করেন, দ্বীন ইসলামকে করেন পুনঃজাগরিত, পুনঃমহিমান্বিত। নব বলে বলিয়ান।

শতাব্দীতে শতাব্দীতে মোজাদ্দেদ (সংস্কারক) এসেছেন। চলেও গিয়েছেন। তারপর এসেছেন সহস্রাব্দের মোজাদ্দেদ। হাজার বছর পর ৯৭১ হিজরী সনে ভারতভূমিতে, সেরহিন্দে। নাম তাঁর শায়েখ আহমদ। উপনাম আবুল বারাকাত। পিতার নাম শায়েখ আবদুল আহাদ— বংশধারা উৎসারিত হয়েছে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর ফারূক রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে। তিনিই দ্বিতীয় সহস্রাব্দের সংস্কারক— মোজাদ্দেদে আলফে সানি রহমাতুল্লাহি আলাইহি। তাঁর পরে তাঁর সমমর্যাদাসম্পন্নজন হবেন একজনই— হজরত ইমাম মেহদী আলাইহি রিদ্ওয়ান। এই তথ্যটিও তিনিই আমাদেরকে অনুগ্রহ করে জানিয়েছেন।

অতএব, আমরা যে জামেয়া থেকে ফারেগ হই না কেনো, যে দরবারেরই মুরিদ হই না কেনো, অথবা যে তিমিরেই অবস্থান করি না কেনো আমাদেরকে তাঁরই শিক্ষা-ধারা ও আত্মশুদ্ধির তরিকা মেনে চলতে হবে। তাঁর তরিকাতেই রয়েছে পূর্ববর্তী সকল তরিকার ফয়েজ-বরকতের স্রোত, সকল কামালতের সংশ্লেষ-নির্যাস, যাকে বলা যায় জামে কামালত। সাহাবায়ে কেরামের জামানার পরে তিনিই শ্রেষ্ঠতমজন। শ্রেষ্ঠতম সাহাবী হজরত আবু বকর সিদ্দীক রা. থেকে উৎসারিত হয়েছে বলে এই তরিকার এক নাম নেসবতে সিদ্দিকী। আর এক নাম নেস্বতে হুব্বী— মহব্বতের তরিকা। পূর্ব নাম নকশ্বন্দিয়া। এখনকার নাম মোজাদ্দেদিয়া— খাস মোজাদ্দেদিয়া।

ভালোবাসার পথই পরিত্রাণের পথ। ভালোবাসার আগুনে যাঁরা পোড়েন জাহান্নামের আগুন তাঁদেরকে পোড়াতে পারে না। সুতরাং আসুন আমরা ভালোবাসার পথ ধরি। আনুগত্য করি তাঁদের, যাঁরা আল্লাহ্পাকের অনুগ্রহধন্য প্রিয়তমজন। তাঁদের পথই দক্ষিণ ও বামবিমুক্ত পথ— সিরাত্বল মুস্তাক্বীম।

আলহামদুলিল্লাহ্। চারশত বছর পর প্রকাশিত হলো 'হাজ্রাতুল কুদুস' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। মূল রচয়িতার নাম আল্লামা বদরুদ্দীন সেরহিন্দী র.। এটি দ্বিতীয় খণ্ড। এই খণ্ডে রয়েছে ইমামে রব্বানী হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. এর জীবনালেখ্য এবং

তৎসম্পৃক্ত ঘটনাবলী। মকতুবাত শরীফের বিভিন্ন বিবরণের তত্ত্ব, তথ্য-উপাত্ত ও মারেফাতরাজি। পড়তে শুরু করলে প্রেমান্বেষী ও জ্ঞানান্বেষী পাঠকেরা বুঝতে পারবেন তাঁরা ক্রমান্বয়ে ডুবে যাচ্ছেন অথই নূরের সীমাহীন সাম্রাজ্যে। নির্মোহ ও নির্বিশ্বাসী পাঠকেরাও অভিভূত না হয়ে পারবেন না। বঞ্চিত হবে কেবল আউলিয়া-বিদ্বেষীরা, অবিশ্বাসী ও অপরিনামদর্শীরা। তাতে কীইবা ক্ষতি। কেউ চোখ বন্ধ করে রাখলে সূর্য কি তার কিরণ বিকীরণ স্থগিত করে দ্যায়?

আল্লামা বদরুদ্দীন সেরহিন্দী ছিলেন হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. এর বিশিষ্ট খলিফা। ছিলেন তাঁর সার্বক্ষণিক সাহচর্যধন্য। তাঁর অনুমতিক্রমেই রচিত হয়েছিলো এই জ্যোতির্ময় গ্রন্থখানি। রচনার কিছু অংশ তাঁকে শোনানোও হয়েছিলো পাঠ করে। তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। সফলতার প্রার্থনাও নিশ্চয় করেছিলেন।

এই খণ্ডে আরও রয়েছে তাঁর স্বনামধন্য সাহেবজাদা ও সাহেবজাদীগণের জীবন-বিবরণ। মকতুবাতে মাসুমিয়া ও মকতুবাতে সাঈদিয়া গ্রন্থের গুরুত্বপূর্ণ কিছু অংশের উল্লেখ। হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. এর খলিফাগণ ছিলেন সংখ্যায় পাঁচ হাজার। তাঁদের মধ্যে প্রধান বিশজনের জীবনকথাও সংযোজিত হয়েছে গ্রন্থখানিতে। এভাবে গ্রন্থখানি অর্জন করেছে ভিন্নমাত্রার সমৃদ্ধি ও সাফল্য।

উল্লেখ্য, মূল গ্রন্থখানি রচিত হয়েছিলো রাজকীয় ফারসী ভাষায়। আমরা এটি অনুবাদ করেছি সিন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ের মান্যবর অধ্যাপক ড. গোলাম মোস্তফা সাহেবের উর্দু তরজমা থেকে।

মারেফাতের অতি উচ্চ ভাবসমৃদ্ধ কিছুসংখ্যক কবিতা বাধ্য হয়ে বাদ দিতে হলো। আমাদের অক্ষমতাই এর জন্য দায়ী। ফারসী ভাষা ও সাহিত্যে সুগভীর জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব এদেশে এতোই বিরল যে, তার স্বীকৃতি দিতেও কুণ্ঠিত হতে হয়। চারশত বছর আগের পরিস্থিতি নিশ্চয় এরকম ছিলো না। তখন ফারসীই ছিলো সমগ্র ভারতের রাজভাষা, বিদ্বজ্জনের ভাববিনিময়ের মাধ্যম।

যিনি আমাদেরকে জীবন দান করেছেন, দান করেছেন সঠিক পথপ্রদর্শক— সেই পবিত্র সত্তার জন্যই আমাদের যাবতীয় উপাসনা, তাঁর প্রতিই উৎসর্গীকৃত আমাদের সকল শুভকর্ম, জীবন-মৃত্যু। আমরা তাঁরই প্রশংসা-প্রশস্তি স্তব-স্তুতি বর্ণনা করি। ঘোষণা করি তাঁরই আনুরূপ্যবিহীন জ্ঞান-গরিমা মহিমা-মহত্ত্বের কথা। তাঁর মনোনীত ধর্ম ইসলামের জয় হোক। জয় হোক পবিত্র ইসলামের প্রবর্তক মহানবী মোস্তফা সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের। তাঁর প্রতি, নবী-রসুল-ফেরেশতা, সাহাবা, তাঁর পরিবার-পরিজন, বংশধরগণ, আউলিয়া সম্প্রদায়, আমাদের পীর-মোর্শেদ— সকল পুণ্যবান ও পুণ্যবতীর উপরে অনন্তকাল ধরে বর্ষিত হোক সর্বোৎকৃষ্ট দরূদ, সালাম, রহমত, বরকত। আমীন।

আল্লাহ্পাক এ গ্রন্থের রচয়িতার সঙ্গে অনুবাদক, প্রকাশক, পৃষ্ঠপোষক, শুভানুধ্যায়ী, পাঠক-পাঠিকাগণকে এবং এই অধম সম্পাদককে রূহানীভাবে চিরসম্পৃক্ত করুন। আমিন।

ওয়াস্ সালাম।

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ

হাজার বছর পরে সে হিলাল উঠেছিল জেগে
হিন্দী বোত-খানা ফুঁড়ে’ নিখিল বিশ্বের কূলে কূলে,
অগণন মিথ্যাচারে নমরুদের সাজানো পুতুলে
বিপুল আঘাত হেনে লক্ষ সমুদ্রের প্রাণাবেগে
কোটি শুষ্ক গুলিস্তানে এনেছিল জোয়ার আবেগে
মুক্ত প্রাণ ধারা!— তারে পারেনি রুধিতে কারা-দ্বার;
সেলিমের শিরস্ত্রাণ ধূলায় হ’য়েছে একাকার
মুক্ত-প্রাণ সাধকের সত্যের দুর্জয় স্রোতাবেগে!

প্রজ্ঞার তরঙ্গ জাগে সে অগাধ সমুদ্রের বুকে
(সির্‌হিন্দ্‌ উপল পথে উঠিল যা একদা বিচ্ছুরি)
মোছেনি সে প্রাণ-ধারা আঘাতে, ব্যথায়; তিক্ত দুখে!
পারেনি থামাতে তারে অহঙ্কারী মোগলের ছুরি।
তৌহিদের সত্যে দীপ্ত পরিপূর্ণ সেই মুক্ত রবি
হাজার বছর পরে এনেছিল মদীনার ছবি।।

— ফররুখ আহ্‌মদ রহ.

সূচীপত্র

হাজ্‌রাতুল কুদুস/১১
দ্বিতীয় হাজ্‌রাত (মাহাত্ম্যের বর্ণনা)/১৪
বংশপরিচয়/১৭
জন্ম, শৈশব ও শিক্ষা/২১
রচনাবলী/২২
বাতেনী কামালত অর্জন/২৩
তৃতীয় হাজ্‌রাত/৩০
চতুর্থ হাজ্‌রাত/৫২
পঞ্চম হাজ্‌রাত
হজরত মোজাদ্দেদ র. এর আমল, ইবাদত ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা/৬৭
হজরত মোজাদ্দেদ র. এর আধ্যাত্মিকতা ও অলৌকিক ঘটনাবলী/৭৯
সপ্তম হাজ্‌রাত/১০০
অষ্টম হাজ্‌রাত
হজরত মোজাদ্দেদ র. এর বাণী/১২৯
নবম হাজ্‌রাত ঃ হজরত মোজাদ্দেদ র. এর হুলিয়া (দৈহিক গঠন), তাসার্‌রুফাত (আধ্যাত্মিক ক্ষমতা) এবং কারামত (অলৌকিক ঘটনা)/১৪২
কুদসিয়্যাহ্ (পবিত্র বাণী)/১৪৬, কারামত/১৪৯
দশম হাজ্‌রাত
হজরত মোজাদ্দেদ র. এর সন্তানগণ এবং তাঁর প্রখ্যাত খলিফাবৃন্দ
হজরত খাজা মোহাম্মদ সাদেক কুদ্দিসা সিররুহু/১৮৯
হজরত খাজা সাঈদ সাল্লামাল্লাহুল মাজীদ/২০০
খাজা মোহাম্মদ মাসুম সাল্লামাল্লাহুল কাইয়্যুম/২২৮
হজরত খাজা মোহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া সাল্লামাল্লাহু তায়ালা/২৫৮
মোহাম্মদ ফররুখ, মোহাম্মদ ঈসা এবং উম্মে কুলসুম সাল্লামাল্লাহু তায়ালা আজমাঈন/২৫৯
একাদশ হাজ্‌রাত
হজরত মোজাদ্দেদ র. এর খলিফাবৃন্দ/২৬২
মীর মোহাম্মদ নোমান র./২৬২
শায়েখ নূর মোহাম্মদ পাটনী কুদ্দিসা সিররুহু/২৭৪
শায়েখ আবদুল হামীদ বাঙ্গালী কুদ্দিসা সিররুহু/২৭৮
শায়েখ মোহাম্মদ তাহের লাহোরী কুদ্দিসা সিররুহু/২৮৩
খাজা মোহাম্মদ সিদ্দীক কাশমী আলাইহির রহমাহ্/২৯১
শায়েখ বদীউদ্দীন ছাহারানপুরী কুদ্দিসা সিররুহু/২৯৭
শায়েখ মোহাম্মদ তাহের বদখশী কুদ্দিসা সিররুহু/৩০৩
শায়েখ ইয়ার মোহাম্মদ (কাদীম) তলিকানি কুদ্দিসা সিররুহু/৩০৫
শায়েখ আবদুল হাদী বদায়ুনি কুদ্দিসা সিররুহু/৩০৭
খাজা মোহাম্মদ সাদেক কাবেলী কুদ্দিসা সিররুহু/৩০৮
হাজী খিযির খান আফগান কুদ্দিসা সিররুহু/৩০৯
শায়েখ আহমদ দীবানী (দেওবন্দী) কুদ্দিসা সিররুহু/৩১২
শায়েখ আহমদ বরকী কুদ্দিসা সিররুহ/৩১৪
শায়েখ ইউসুফ বরকী কুদ্দিসা সিররুহু/৩১৭
শায়েখ করীমুদ্দীন উরফে আবদুল করীম কুদ্দিসা সিররুহু/৩১৮
শায়েখ হাসান বরকী কুদ্দিসা সিররুহু/৩২৫
শায়েখ আবদুল হাই সাল্লামাহু রব্বুহু/৩২৯
খাজা মোহাম্মদ হাশেম কাশমী বোরহানপুরী কুদ্দিসা সিররুহু/৩৩২
শায়েখ আদম বিন্ নূরী কুদ্দিসা সিররুহু/৩৪৪
হাজ্‌রাতুল কুদুস গ্রন্থের লেখক আল্লামা বদরুদ্দীন র./৩৪৭

আমাদের প্রকাশিত বই

তাফ্‌সীরে মাযহারী (১–১২) মোট ১২ খণ্ড।
মাদারেজুন্‌ নবুওয়াত (১-৮) মোট ৮ খণ্ড
মাক্বামাতে মাযহারী (১-২) মোট ২ খণ্ড
মুকাশিফাতে আয়নিয়া
মাআরিফে লাদুন্নিয়া
মাব্‌দা ওয়া মা'আদ

মকতুবাতে মাসুমীয়া (১-৩) মোট ৩ খণ্ড
নকশায়ে নকশ্‌বন্দ ◆কালিয়ারের কুতুব ◆বায়ানুল বাকী
জীলান সূর্যের হাতছানি ◆নূরে সেরহিন্দ ◆আল্লাহ্‌র জিকির ◆প্রথম পরিবার
মহাপ্রেমিক মুসা ◆তুমিতো মোর্শেদ মহান ◆নবীনন্দিনী ◆ জননীদের জীবনকথা

আবার আসবেন তিনি ◆ অগ্নি ও উদ্যানের সংবাদ
সুন্দর ইতিবৃত্ত ◆ফোরাতের তীর ◆ মহাপ্লাবনের কাহিনী
দুজন বাদশাহ্‌ যাঁরা নবী ছিলেন ◆কী হয়েছিলো অবাধ্যদের

THE PATH
পথ পরিচিতি ◆নামাজের নিয়ম ◆রমজান মাস ◆ চেরাগে চিশ্‌তী
BASICS IN ISLAM ◆ ইসলামী বিশ্বাস ◆মালাবুদ্দা মিনহু

কাব্য সংকলন ◆ সোনার শিকল
বিশ্বাসের বৃষ্টিচিহ্ন ◆ সীমান্তপ্রহরী সব সরে যাও
তৃষিত তিথির অতিথি ◆ ভেঙে পড়ে বাতাসের সিঁড়ি
নীড়ে তার নীল ঢেউ ◆ ধীর সুর বিলম্বিত ব্যথা

হাজ্‌রাতুল কুদুস

সকল পবিত্র প্রশংসা এবং সৌন্দর্যমণ্ডিত ও সৌরভময় নিষ্কলুষ প্রেম ও মমতা ওই শাহানশাহ্ ওয়াজিবুল অজুদের প্রতি, যিনি এই বিচিত্র ধরনীকে অস্তিত্বহীনতার পর্দা থেকে বের করে অস্তিত্বে এনে দৃশ্যমান করেছেন এবং তাঁর অনন্ত এবং স্থায়ী গুণাবলী ও অবস্থাসমূহের (শুয়ুন) দর্পন বানিয়েছেন এবং সেই অস্তিত্বহীনকে অস্তিত্বে এনে আম্বিয়া আলাইহিমুস্‌সালাম এবং আউলিয়াকেরামের (রহমাতুল্লহি আলাইহিম) সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁদের মাধ্যমে পৃথিবীবাসীদেরকে সত্যপথ প্রদর্শন করেছেন এবং সৃষ্টিকুলকে কল্যাণ ও বরকতের সঙ্গে প্রতিপালন করছেন। অতঃপর তাঁদেরকে তাঁর নৈকট্য ও প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা দান করেছেন। তাঁদের হাতকে নিজের হাত বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং তাঁদের বায়াতকে নিজের বায়াত বলে উল্লেখ করেছেন। সেই বিস্ময়কর আলোচনা, যা মানুষের ক্ষমতার বাইরে ছিলো, তাঁর জ্যোতির্ময় হাতের দ্বারা তা প্রকাশ ও উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। বাস্তবিকপক্ষে এটি একটি বিস্ময়কর ব্যাপার যে, মাটি কেমন পবিত্রতা অর্জন করেছে এবং অস্তিত্বহীনতা কী পরিমাণ ওই স্থায়িত্বের দিকে উর্ধ্বারোহণ করেছে। এ সব কিছু হচ্ছে ভালোবাসার বিনিময়ে, যা সম্পূর্ণ ইশক (অকৃত্রিম প্রেমানুরাগ) এর উপর নির্ভরশীল। ‘আহ্‌বাবতু আন উ’রাফা’ (আমি আমার পরিচয় ঘটাতে চাই) হচ্ছে সকল সৃষ্টির মূল কারণ এবং ‘লাও লাকা লামা খলাকতুল আফলাক’ (যদি আমি আপনাকে সৃষ্টি না করতাম তাহলে মহাবিশ্ব সৃষ্টি করতাম না)— এই বাক্যটিই হচ্ছে জগৎসৃষ্টির মূল কারণ।

সকল প্রশংসাকারীদের প্রশংসা কেবল সেই একক সত্তার জন্য সুনির্দিষ্ট এবং মহান আল্লাহ্‌র সেই বিশেষ কামালত (পূর্ণতা) যা অন্য কারো মধ্যে নেই, সেই কামালত জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতবা সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দান করেছেন এবং রসুলে আনওয়ার স. সম্পর্কে সকল প্রশংসামূলক পরিচিতির বর্ণনা দিয়েছেন এবং বিশেষ পূর্ণতাও তাঁর প্রিয়জন হজরত মোহাম্মদ স. এর জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। ‘লিওয়াউল হামদ ইয়াওমা ইজিন বিইয়াদী’ (প্রশংসার পতাকা সেদিন আমার হাতে থাকবে) এ বিষয়েরই সুসংবাদ দিচ্ছে। তারপর আফলাক (মহাবিশ্ব)— সকল সৃষ্টিই রসুলেপাক স. এর প্রেমে উৎসর্গ করেছেন এবং তাঁর প্রিয়জনদেরকে (আম্বিয়া কেরাম) হজরত মোহাম্মদ স. এর আগমনীবার্তা শুনিয়ে দিয়েছেন, যেনো তাঁরা সকলে মোহাম্মদ স.কে আন্তরিকভাবে ভালোবাসতে পারে এবং তাঁদের ইমান ও আকীদা ঠিক করে রসুলেপাক স. এর

সাথে সমন্বয় ঘটাতে পারে এবং তাঁর নাম বারংবার উচ্চারণের মাধ্যমে ফয়েজ ও বরকত অর্জন করতে পারে। কেনোনা প্রেমিকের প্রেমই প্রেমিকের প্রেমের প্রেমিক হয়ে থাকে। আর এ কারণেই কোনো কোনো নবী আ.গণ শেষ নবী স. কে দর্শনের আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। বরং তাঁদের মধ্যে কোনো কোনো নবী শেষ নবী স. এর উম্মত হওয়ারও বাসনা করেছিলেন।

আল্লাহ্‌পাক হজরত মোহাম্মদ স. কে জাহেরী (প্রকাশ্য) ও বাতেনী (অপ্রকাশ্য) জ্ঞানভাণ্ডার দান করেছিলেন। প্রকাশ্য জ্ঞানকে সাধারণ করেছিলেন এবং অপ্রকাশ্য মারেফাতের জ্ঞানকে অসাধারণ করেছিলেন। আলেমগণের জন্য সাধারণ তরিকা দান করেছেন এবং আউলিয়া কেরামের বাতেনী কামালাত (মারেফাতের জ্ঞানে পূর্ণতা) দান করেছেন। বাতেনী নেসবত (মারেফাতের গোপন সম্পর্ক)কেও জাহেরী শরীয়তের সম্পর্কের মতো মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ স. এর পক্ষ থেকে আউলিয়া কেরাম পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন। কিয়ামত পর্যন্ত পৌঁছাতে থাকবেন। কেনোনা এই আয়াত 'ইন্না নাহনু নায্‌যালনাজ্‌ জিক্‌রা ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিজূন' (নিশ্চয়ই আমি পবিত্র কোরআনকে অবতীর্ণ করেছি এবং কিয়ামত পর্যন্ত এর সংরক্ষণের দায়িত্ব আমার)— এই অর্থই বহন করছে। মহান আল্লাহ্‌র রহমত ও মহাদান তাঁর প্রিয়জনদের প্রতি কিয়ামত পর্যন্ত বর্ষিত হতে থাকবে।

সকল নবীর প্রতি, তাঁর বংশধরদের প্রতি, তাঁর সাহাবীগণ ও তাবেঈগণ, আউলিয়া কেরাম, মুত্তাকীগণ ও তাঁদেরকে যাঁরা অসিলা (মধ্যস্থতা) বানিয়েছেন তাঁদের প্রতি পৃথিবীর প্রতিটি অণুপরমাণুর সংখ্যা পরিমাণ রহমত বর্ষিত হতে থাকবে।

উপরোক্ত আলোচনার পর এই নগণ্য ও অযোগ্য বান্দা (বদরুদ্দীন বিন শায়েখ ইব্রাহীম সেরহিন্দী) জানাচ্ছে যে, আমি হাজ্‌রাতুল কুদুস [১] প্রথম খণ্ডের কাজ সম্পন্ন করলাম (যার মধ্যে হজরত আবু বকর রা. থেকে নকশবন্দিয়া সিলসিলার সকল মাশায়েখ এমনকি হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ্‌ র. কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং হজরত খাজা র. এর বংশধর এবং সহচরবৃন্দের কথাও সংক্ষিপ্তভাবে বলা হয়েছে।

---

১. 'হাজ্‌রাতুল কুদুস' প্রণেতা এ গ্রন্থের অধ্যায়সমূহকে হাজ্‌রাতদের রূপক ভাষায় বিশ্লেষণ করেছেন এবং সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের বাণীসমূহকে 'কুদসিয়্যাহ্‌' এবং তাঁদের অবস্থাসমূহকে 'দারাজাত' বলেছেন। প্রথম হাজ্‌রাত— এর মধ্যে (যার ফারসি পাণ্ডুলিপি আজও প্রকাশিত হয়নি) নূরনবী স. এবং খোলাফায়ে রাশেদীন রা. সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত ও গুণাবলী উল্লেখ করেছেন। অতঃপর হজরত সালমান ফারসী রা. থেকে হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ্‌ কুদ্দিসা সিররুহু পর্যন্ত এবং তাঁর পরবর্তী খলিফাগণের অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় হাজ্‌রাতের মধ্যে হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি কুদ্দিসা সিররুহু এবং তাঁর পুত্রগণ ও তাঁর কতিপয় খলিফাবৃন্দের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এটি হাজ্‌রাত (২) এর উর্দু অনুবাদ। আল্লাহ্‌পাক কবুল করুন। আমিন। নোমানিয়া প্রকাশনী শিয়ালকোট থেকে এর উর্দু অনুবাদ মুদ্রিত হয়েছে।

এখন আমি দ্বিতীয় খণ্ডের কাজ শুরু করেছি। এর মধ্যে পীরে দস্তগীর হজরত শায়েখ আহমদ ফারুকী সেরহিন্দী কুদ্দিসা সিররুহুর অবস্থা, কারামাত, মর্যাদা, পূর্ণতা, অবস্থাসমূহ, মূল্যবান বক্তব্য এবং কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। এই গ্রন্থ রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য এটাও যে, তাঁর প্রশংসাসমূহ বর্ণনা করা হবে এবং তাঁর বংশধর, সহচরবৃন্দ, প্রসিদ্ধ খলিফাবৃন্দের আলোচনাও এর অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এ গ্রন্থখানি এগারো হাজ্‌রাত (অধ্যায়) বিশিষ্ট। প্রথম খণ্ডটি একটি অধ্যায়ে সমাপ্ত করা হয়েছে। অবশিষ্ট অধ্যায় দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচিত হবে এবং এই খণ্ডটি 'খুজুল ইলম মিন আফওয়াহির রিজাল' (জ্ঞান অন্বেষণ করো বিজ্ঞজনদের কাছ থেকে) এর সূত্র অনুযায়ী বিশুদ্ধ, নির্ভরযোগ্য ও সত্যনিষ্ঠদের বর্ণনার উপর এর ভিত্তি হবে। এ বিষয়ে সর্বোচ্চ সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়েছে। মহান আল্লাহ্‌ই যোগ্যতা দানকারী। আমি তাঁর সাহায্যপ্রার্থী এবং আমার পূর্ণ নির্ভরশীলতা তাঁরই উপরে।

দ্বিতীয় হাজ্‌রাত
(মাহাত্ম্যের বর্ণনা)

শায়েখেনা ইমামেনা ওয়া কিবলাতেনা (আমাদের মোর্শেদ, নেতা, পরম শ্রদ্ধেয়) কুতুবুল আকতাব (দরবেশকুলের শিরোমণি) গাওছুছ্ শায়েখে ওয়াশ্‌শাব (প্রবীণ ও নবীনদের সিদ্ধপুরুষ) হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি (দ্বিতীয় সহস্রাব্দের সংস্কারক) খাজিনুর রহমাতে রব্বানী (প্রভুর দয়ার ভাণ্ডার) বাহরুল আসরারুল ইলাহিয়্যাহ্ (আল্লাহ্‌র গুপ্ত রহস্যের সমুদ্র) মুযাইয়্যিনুল আত্‌ওয়ারুন নকশবন্দিয়া (নকশবন্দিয়া তরিকার শোভাবর্ধনকারী) হুজ্জাতুল উরাফাইল মোহাক্কেকীন (আল্লাহ্‌র পরিচয়প্রাপ্ত দার্শনিকদের নিদর্শন) খাতামুল উলামাউর রসিখীন (তত্ত্বউদঘাটনকারী আলেমগণের মোহরাংকন) শায়েখুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন (ইসলাম ও মুসলিম সমাজের অভিভাবক) শায়েখ আহমদ ফারুকী আল কাবেলী নকশবন্দি সেরহিন্দী র. এর অবস্থা ও উচ্চমর্যাদা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে।

তাঁর উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন নকশবন্দিয়া তরিকার সম্পর্ক হজরত খাজা মোহাম্মদ বাকী বিল্লাহ কুদ্দিসা সিররুহুর সঙ্গে। তিনি তাঁর খলিফাবৃন্দের মধ্যে সর্বাধিক উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ও কামেল ব্যক্তি ছিলেন। অসংখ্য লোক, যাঁরা উদাসীনতার গভীর সমুদ্রে নিমজ্জিত ছিলেন, তারাও তাঁর সুন্দর আধ্যাত্মিক পরিচর্যা বা লালন-পালনের ফলে সার্বক্ষণিক আল্লাহ্‌উপস্থিতির প্রেমসাগরের উপকুলে পৌঁছেছিলেন। অনেক লোক এমনও ছিলেন, যাঁরা বিভ্রান্তির গভীর অরণ্যে আবর্তিত হচ্ছিলেন— তারা তাঁরই মাধ্যমে হেদায়েতের শ্রেষ্ঠ স্তর পর্যন্ত উপনীত হয়েছিলেন। বিভিন্ন দেশ থেকে বহু বিদ্বান ও উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি এই মহামানবের খেদমতে ময়ূর ও পঙ্গপালের মতো ছুটে এসেছিলেন। বহু জ্ঞানী, গুণী ও দরবেশ ব্যক্তি তাঁদের গুরুগিরি পরিত্যাগ করে হজরতের কামালাত, কুতুবিয়াত ও গাওছিয়াতের সান্নিধ্য লাভে নিজেদেরকে ধন্য করেছিলেন। যুগশ্রেষ্ঠ আউলিয়াগণও তাঁর আনুগত্যকে আল্লাহ্‌র নৈকট্যলাভের মাধ্যম ও উচ্চমর্যাদা অর্জনের অসিলা বলে মনে করতেন। অনেক বাদশাহ্‌ও তাঁর প্রদীপ্ত হেদায়েতের প্রতি অনুরক্ত হয়ে নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছিলেন। কেনোনা সে যুগে একমাত্র তিনিই সঠিক পথপ্রদর্শনের কেবলা ও কাবা ছিলেন। পৃথিবী এবং পূর্ব থেকে পশ্চিম ও উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীবাসীর ফয়েজ, হেদায়েত, ফজল ও রহমতের মাধ্যম (অসিলা) ছিলেন তিনি। তাঁর আবির্ভাবকাল থেকে কিয়ামত পর্যন্ত তিনিই প্রধান অসিলা।

সুতরাং তাঁর তাওয়াজ্জোহ্ ও ইচ্ছা ব্যতীতই তাঁর ফয়েজ ও কল্যাণ মানুষের কাছে পৌঁছাতে থাকবে। এ বিষয়টি সূর্যের আলো ও চন্দ্রের কিরণসদৃশ। চন্দ্র-

সূর্যের আলো ও কিরণ সমগ্র পৃথিবীতে পতিত হয়, কিন্তু সূর্য ও চন্দ্রের সে বিষয়ে কোনো খবর থাকে না। অথবা এর উপমা পৃথিবীকে পরিবেষ্টিত সমুদ্রের মতো যে তার নিজের অবস্থানে অবস্থিত এবং তার স্রোত ওই দিকেই প্রবাহিত হয়, যে তার দিকে মুখ করে আছে এবং তার সাথে সম্পর্ক রাখতে চায়। এ ক্ষেত্রে আরো একটি বিষয় এই যে, নদী যদি নিজেই চায় কোনো ব্যক্তি বা কোনো দলকে উপকৃত করতে, তাহলে তার এই দান সম্পর্কে কী-ইবা বক্তব্য থাকতে পারে? সে তো যখন তখন একটি জগতকে পরিপূর্ণ করে দিতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে তাঁর এমতো কার্যকলাপ অনুধাবনে আমাদের জ্ঞান ও বোধশক্তি অক্ষম। আমাদের দুর্বল অনুধাবন শক্তি ওই পর্যন্ত পৌঁছাতেই পারে না। রসুলুল্লাহ স. এর মহাতিরোধানের এক হাজার বছর পর তাঁর পূর্ণ অনুসরণের বিনিময়ে সকল কামালাতের উত্তরাধিকারী একমাত্র তিনিই হয়েছেন। যেমন রসুলেপাক স. এরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের উপমা ওই বৃষ্টির মতো, যার শুরু ভালো না শেষ ভালো বোঝা যায় না। এই মহাবাণী তাঁর পুণ্যবান অস্তিত্ব (অজুদে মাসউদ) এর প্রতি ইঙ্গিত হতে পারে। কেনোনা এ উম্মতের শেষ এক হাজার বছর অতিবাহিত হওয়ার পর বলা যেতে পারে। তিনি স. এরশাদ করেছেন, প্রত্যেক শতাব্দীতে একজন মোজাদ্দেদ (সংস্কারক) আসবেন, যিনি এ সুদৃঢ় দ্বীনকে পূর্বরূপে উজ্জীবিত করবেন। সহস্রাব্দের মোজাদ্দেদ এবং শতাব্দীর মোজাদ্দেদের মধ্যে শত-সহস্র গুণ অথবা তার চেয়েও বেশী পার্থক্য রয়েছে। সুতরাং সহস্রাব্দের চাহিদাও এরকম যে, এ ধরনের রত্ন বাস্তবিক পক্ষেই আগমন করুক।

সহস্র বছরে প্রয়োজনে ধর্মের বাগানে
তোমাদের জন্য ফুটুক অনুপম ফুল
নেই কোনো সহস্রাব্দে নেই আর কেউ
যাকে বলা যেতে পারে তোমার সমতুল।

নূরে মোহাম্মদীর বিকাশ

রসুলুল্লাহ্ স. এর নূর প্রত্যেক শতাব্দীর পরে যথাসময়ে বিকশিত হয়ে নির্দেশনা ও পথপ্রদর্শন করে। কিন্তু কুতুবুল আকতাবের ক্ষেত্রে এই নূরের বহিঃপ্রকাশের জন্য এক হাজার বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। এর সময়কাল হচ্ছে ৯৯০ বছর এবং দশ বছর পর্যন্ত সময় এই নূরকে স্ববক্ষে রাখে এবং ফয়সালা (কাজা) ও তকদীরের পরিচর্যাকারী তাকে তিন লক্ষ ষাট হাজার দিন পর্যন্ত প্রশিক্ষণ দান করে এবং বারো হাজার মাস পর্যন্ত সার্বক্ষণিকভাবে তার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বক্ষদেশকে সুসজ্জিত ও অলংকৃত করা হয়। শোভামণ্ডিত করা হয় তাঁর অবয়ব ও আত্মাকে। এভাবে শেষকে প্রথমের সাথে মেলানো হয়।

সুতরাং এই সংস্কার যে সম্পূর্ণতই হকিকত ও রূহানীয়াতের বহিঃপ্রকাশ, সে কথা না মেনে আর উপায়ই থাকে না। এ কারণেই তিনি সবার জন্য এবং সকলেই তাঁর কামালাতের বৃত্তভূত।

যুগের জননীর বিনিময়ে তাঁর প্রতিপালনে এমনই দ্বীনের নূর দেয়া হয়েছে। রহমত, ফজল ও ইহসানের ধনভাণ্ডার তাঁর তত্ত্বধানের অন্তর্ভূত। ওই পবিত্র আয়াত 'ওয়ামা আরসালনাকা ইল্লা রহমাতাল্‌লিল আলামীন' (আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমতস্বরূপ করেছি) এর সম্বোধন মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁর রসুলের প্রতি করা হয়েছে। এক হাজার বছর পরে হজরত মোহাম্মদ স. এর প্রতিবিম্ব এই আহমদ (মোজাদ্দেদে আলফেসানি কুদ্দিসা সিররুহু) এর উপর প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

তুমি হলে রহমতের ধনভাণ্ডার
তুমি জাতির সৌন্দর্য ও অলংকার
শেষ হাজার বছর পর
তুমি হবে প্রথম ও শেষের জন্য রহমত বা করুণার আধার।

তাঁর প্রকৃত নাম আবদুর রহমান। তিনি ছিলেন তাঁর যুগের জন্য মহান আল্লাহ্‌র বিস্ময়কর ও মহাদানের এক উজ্জ্বল নিদর্শন। জগতে হাজারো মাখলুকের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু তিনি ছিলেন জগতের মাঝে এক বিস্ময়কর সৃষ্টি।

মোহাম্মদীর স. বহিঃপ্রকাশ

মোহাম্মদীর স. বহিঃপ্রকাশের ক্ষেত্রে এর চেয়ে আর কী প্রমাণ হতে পারে যে, পবিত্র কোরআনের হরুফে মোকাত্তাআতের (সূক্ষ্ম রহস্যসম্পন্ন আয়াত) যা ছিলো মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কেবল রসুলুল্লাহ স. এর জন্য নির্ধারিত গোপন তত্ত্ব— তাঁরই অন্তরাভ্যন্তরে (বাতেনে) ওই রহস্য প্রকাশ করা হয়েছিলো।

এমন মহান আল্লাহ্‌প্রেমিকের প্রশংসা বা পরিচিতি আমার মতো অহংকারী ব্যক্তির দ্বারা কতোটুকুই বা হতে পারে। যাঁর আপাদমস্তক আল্লাহ্‌প্রেমে পরিপূর্ণ, তাঁর গুণকীর্তণ করা আমার মতো দুনিয়া-আসক্ত ব্যক্তির পক্ষে কী করে সম্ভব। তাঁর স্বভাব, ব্যক্তিত্ব, গোপন ভেদ, তাঁর উচ্চমর্যাদা ও কারামতের সংখ্যা বৃষ্টির বিন্দু ও আকাশের নক্ষত্ররাজি থেকেও অধিক। পৃথিবীর কাগজসমূহ তাঁর সম্পর্কে লেখার জন্য যথেষ্ট নয়। সমুদ্রের পানিকে কালি এবং বৃক্ষরাজিকে যদি কলম বানানো হয়, তাহলেও তাঁর সম্পর্কে লিখে শেষ করা যাবে না। মানুষের চিন্তা, কল্পনা তাঁকে ধারণ করতে অক্ষম।

এ সুন্দর গ্রন্থের একটি কথা সাত আসমান তুল্য
সূর্য এর নুকতা সদৃশ, যা অকল্পনীয়
তাঁর মতো সুন্দর মানুষ সম্পর্কে একটি কথাও তো পূর্ণরূপে লেখা যাবে না
লিখতে লিখতে কলম যাবে শেষ হয়ে।

তার পরেও আমি আমার হাত-পা সঞ্চালন করি (আপ্রাণ চেষ্টা করি) সিন্ধু থেকে বিন্দু, শস্যাগার থেকে শস্য দানা, বাগান থেকে ফুল, রক্ষিত পানিপাত্রের পানির উপর নির্ভর করে কিছু কথা আলোকপাত করছি।

বংশপরিচয়

হজরত মোজাদ্দেদ র. এর ঊর্ধ্বতন সম্পর্ক আমিরুল মুমিনীন ইমামুল আদেলীন (ন্যায়পরায়ণদের সম্রাট) হজরত ওমর রা. পর্যন্ত পৌঁছেছে। তাঁর পিতা শায়েখ আবদুল আহাদ এবং পিতামহ জয়নুল আবেদীন, তিনি শায়েখ আবদুল হাইয়ের পুত্র, তিনি শায়েখ মোহাম্মদের পুত্র, তিনি শায়েখ হাবীবুল্লাহর পুত্র, তিনি ইমাম রফিউদ্দীনের [১] পুত্র, তিনি শায়েখ নাসিরুদ্দীনের পুত্র, তিনি শায়েখ সুলায়মানের পুত্র, তিনি শায়েখ ইউসুফের পুত্র, তিনি শায়েখ ইসহাকের পুত্র, তিনি শায়েখ আবদুল্লাহর পুত্র, তিনি শায়েখ আহমদের পুত্র, তিনি শায়েখ ইউসুফের পুত্র, তিনি শায়েখ শিহাবুদ্দীন, যিনি ফররুখ শাহ্ কাবেলী নামে পরিচিত— তাঁর পুত্র, তিনি শায়েখ নাসিরুদ্দীনের পুত্র, তিনি শায়েখ মাহমুদের পুত্র, তিনি শায়েখ সুলায়মানের পুত্র, তিনি শায়েখ মাসউদের পুত্র, তিনি শায়েখ আবদুল্লাহ ওয়ায়েজ (ছোট) এর পুত্র, তিনি শায়েখ আবদুল্লাহ (বড়) এর পুত্র, তিনি শায়েখ আবুল ফাতাহের পুত্র, তিনি শায়েখ ইসহাকের পুত্র, তিনি শায়েখ ইব্রাহীমের পুত্র, তিনি

---

১. মাওলানা মাহবুব ইলাহী সম্পাদিত হাজ্‌রাতুল কুদুস ২য় খণ্ডের যে পাণ্ডুলিপি লাহোর থেকে ১৯৭১ সালে মুদ্রিত হয়েছে, তার ২৮ নং পৃষ্ঠায় রয়েছে, ইমাম রফিউদ্দীন, তিনি খাজা নূরের পুত্র, তিনি খাজা নসরের পুত্র, তিনি খাজা সোলায়মানের পুত্র, তিনি খাজা ইউসুফ সুলতান শিহাবুদ্দীন যিনি ফররুখ শাহ নামে পরিচিত, তাঁর পুত্র। কিন্তু হাজ্‌রাতুল কুদুস নামক যে গ্রন্থটির উর্দু অনুবাদ ১৯২২ সালে লাহোরে মুদ্রিত হয়েছিলো, তার মধ্যে সেরকমই রয়েছে, যেমন আমি উপরে লিপিবদ্ধ করেছি— 'যুবদাতুল মাকামাত' (লক্ষ্ণৌ ১৮৯০ খ্রিঃ) এর ৮৯ পৃষ্ঠায় এরূপ বর্ণনা রয়েছে যে, ইমাম রফিউদ্দীন শায়েখ নাসিরুদ্দীনের পুত্র, তিনি শায়েখ সোলায়মানের পুত্র, তিনি শায়েখ ইউসুফের পুত্র, তিনি শায়েখ ইসহাকের পুত্র, তিনি আবদুল্লাহর পুত্র, তিনি শায়েখ শুআইবের পুত্র, তিনি আহমদের পুত্র, তিনি ইউসুফের পুত্র, তিনি শিহাবুদ্দীন ফররুখ শাহের পুত্র (অর্থাৎ এর মধ্যে শায়েখ শুআইবের নামও এসেছে)। এটাই সঠিক। কেনোনা হাজ্‌রাতুল কুদুসের লেখক যখন দেখেছেন যে, 'যুবদাতুল মাকামাত' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে— যার মধ্যে হজরত ইমামে রব্বানী কুদ্দিসা সিররুহুর বুজর্গ পিতা সহ অন্যান্য বুজর্গদের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে, তখন ওই গ্রন্থ থেকে অনুশীলন পূর্বক অবশ্যই উপকার লাভ করা হয়েছে। এটাও হতে পারে যে, অনুলিপি-প্রতিলিপি করতে গিয়ে শায়েখ শুআইবের নাম বাদ পড়েছে। এই শায়েখ শুআইবই হচ্ছেন হজরত ফরিদ গঞ্জেশাকর র. এর পরদাদা।

শায়েখ নাসিরের [১] পুত্র, তিন শায়েখ আবদুল্লাহর পুত্র, তিনি সাইয়্যেদেনা আমিরুল মুমিনীন হজরত ওমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর পুত্র।

এখানে আমি হজরত আবুল হাসান যায়েদ ফারুকী সাহেবের লিখিত গ্রন্থ 'মাকামাতে খায়ের' (দিল্লী) ১৩৯২ হিজরী) এর ৩৩ নং পৃষ্ঠায় তাঁর পর্যালোচনা অনুযায়ী হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি কুদ্দিসা সিররুহুর বংশপরিচয় সংকলন করছি।

১. মাখদুম আবদুল আহাদ	১৭. নাসিরুদ্দীন
২. জয়নুল আবেদীন	১৮. মাহমুদ
৩. আবদুল হাই	১৯. সুলায়মান
৪. মোহাম্মদ	২০. মাসউদ
৫. হাবীবুল্লাহ	২১. আব্দুল্লাহ আল ওয়ায়েজুল আসগার
৬. ইমাম রাফিউদ্দীন	২২. আব্দুল্লাহ আল ওয়ায়েজুল আকবার
৭. নাসিরুদ্দীন	২৩. আবুল ফাতাহ
৮. সোলায়মান	২৪. ইসহাক
৯. ইউসুফ	২৫. ইব্রাহীম
১০. ইসহাক	২৬. নাসির
১১. আবদুল্লাহ	২৭. আবদুল্লাহ
১২. শুআইব	২৮. ওমর
১৩. আহমাদ	২৯. হাফস
১৪. ইউসুফ	৩০. আসেম
১৫. শিহাবুদ্দীন আলী ফররুখ শাহ(১)	৩১. হজরত আবদুল্লাহ
১৬. নূরুদ্দীন	৩২. হজরত ওমর ফারুক রা. আজমাইন।

---

১. মাওলানা আফজালুল্লাহ মোজাদ্দেদী র. তাঁর 'উমদাতুল মাকামাত' নামক গ্রন্থে (লাহোর ১৩৫৫ হিজরী পৃষ্ঠা নং ৯৮) লিখেছেন, 'হাজ্‌রাতুল কুদুস' গ্রন্থে যেখানে নাসিরের পরিবর্তে সালেম নাম লেখা রয়েছে, আমাদের জানা নেই যে, তাঁদের কাছে হাজ্‌রাতুল কুদুস গ্রন্থের কোনো পাণ্ডুলিপি ছিলো কি না। মাওলানা মাহবুব ইলাহীর হাজ্‌রাতুল কুদুসের যে পাণ্ডুলিপিটি লাহোর থেকে ১৯৭১ সালে প্রকাশিত হয়েছিলো, সেটি বিন্যাসের জন্য তাঁরা তিনটি পাণ্ডুলিপি সামনে রেখেছিলেন। তাঁরা সেখানে নাসির নামই লিখেছিলেন, সালেম নামটি ছিলো না। যাই হোক সালেম পঠনই সঠিক। তাহলেই হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. এর পুত্র সালেমের বিষয়টি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়। 'ফতোয়ায়ে তাতারখানিয়া' (অধ্যায় ১৬) পুস্তকে রয়েছে, হজরত হাসান রা. যিনি হজরত আলী রা. এর পুত্র ছিলেন, তাঁর এক কন্যা হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. এর বৈবাহিক বন্ধনে ছিলেন এবং মাওলানা বাহারুদ্দীন মোজাদ্দেদীর (সরফরাজ কালুনী, হায়দারাবাদ) এক চমকপ্রদ লেখার মধ্যে রয়েছে যে, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. এর অপর সন্তান নাসির এই কন্যার গর্ভজাত ছিলো। সুতরাং এই দুটি সম্বন্ধের কারণে হজরত ওমর ফারুক রা. এর সন্তানদের স্বগীয় সর্দার (সাইয়্যেদে উলুবী) বলা হয়।

বাবা ফরিদ শাকরগঞ্জ র. [১] শায়েখ শুআইবের পরদাদা বা পূর্বপূরষ ছিলেন অর্থ— বাবা ফরিদ শায়েখ জামালুদ্দীনের পুত্র, তিনি সুলায়মানের পুত্র, তিনি কাজী শুআইবের পুত্র, তিনি মোহাম্মদ আহমদের পুত্র, তিনি ইউসুফের পুত্র, তিনি শায়েখ মোহাম্মদের পুত্র, তিনি ফররুখ শাহ কাবুলীর পুত্র ছিলেন।

চিশতীয়া সিলসিলার নেসবত

হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. এর সাথে চিশতীয়া সিলসিলার সম্পর্ক ছিলো তাঁর নিজের বুজর্গ পিতা শায়েখ আবদুল আহাদ র. এর সঙ্গে এবং তাঁর সম্পর্ক ছিলো তাঁর পিতা শায়েখ রুকনুদ্দীনের সঙ্গে। অতঃপর তাঁর সাথে সম্পর্ক ছিলো তাঁর পিতা শায়েখ আবদুল কুদ্দুস গাঙ্গুহীর সাথে (যিনি বংশ ও মাযহাব উভয় দিক দিয়েই হানাফী ছিলেন)। তাঁর সম্পর্ক শায়েখ মোহাম্মদ আরেফের সঙ্গে এবং তাঁর সম্পর্ক শায়েখ আহমদ আবদুল হকের সঙ্গে, যাঁদের বুজর্গণের সিলসিলা এরকম— শায়েখ জালালুদ্দীন পানিপথী, শায়েখ শামসুদ্দিন তুর্ক পানিপথী, শায়েখ আলাউদ্দীন আলী আহমদ সাবের কালিয়ারী, খাজা শায়েখ ফরিদুল হক যার পিতা মাসউদ আজুধানী, যিনি গঞ্জশাকর নামে প্রসিদ্ধ (ফারুকী), খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার আওশী, হজরত সুলতানুল হিন্দ খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী আজমীরী সানজারী, [২] শায়েখ ওসমান হারুনী, শায়েখ হাজী শরীফ জানদানী, হজরত শায়েখ মওদুদ চিশতী, হজরত আবু ইউসুফ চিশতী, শায়েখ আবু মোহম্মদ চিশতী, শায়েখ আবু ইসহাক শামী, শায়েখ মোমশাদ আলী দীনুরী, শায়েখ আবু হাবীরাহ বসরী, শায়েখ হুযাইফা মারআশী, শায়েখ সুলতান ইব্রাহীম আদহাম, হজরত ফুযাইল আইয়াজ, শায়েখ আবদুল ওয়াহেদ বিন যায়েদ, শায়েখ হাসান বসরী এবং আমিরুল মোমেনীন আলী মোর্তজা (রিদ্বওয়ানাল্লাহু তায়ালা আজমাঈন) যিনি সরাসরি রসুলে আকরম সরওয়ারে কায়েনাত সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর পরিবারর্বগ ও সহচরবৃন্দ থেকে ফয়েজপ্রাপ্ত ছিলেন।

নেসবতে কাদেরীয়া

কাদেরীয়া সিলসিলায় তাঁর নেসবত ছিলো তাঁর বুজর্গ পিতার সঙ্গে এবং তাঁর সম্পর্ক তাঁর বুজর্গ পিতা শায়েখ রুকনুদ্দীনের সঙ্গে। অতঃপর অন্য বুজর্গদের ধারাবাহিকতা নিম্নরূপঃ–

---

১. বাবা ফরিদউদ্দীন গঞ্জশাকর র. এর ঊর্ধ্বতন পিতৃপুরুষ (সপ্তম স্তরে) ছিলেন শায়েখ শিহাবুদ্দীন আলী ফর্রুখশাহ্ কাবুলী, যিনি হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি কুদ্দিসা সিররুহুরও (১৪ বা ১৫ স্তরে) ঊর্ধ্বতন পিতৃপুরুষ ছিলেন।

২. হজরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী র. সিস্তানে বসবাস করতেন। তাই তাঁকে বলা হয় সাজেযী। সাধারণ মানুষ বলে সানজেরী।

মীর সাইয়্যেদ ইব্রাহীম মঈনুল হাসানী ওয়াল হুসাইনী আল ইয়ারজী, শায়েখ বাহাউদ্দীন আল আনসারী আল হুসাইনী, শায়েখ আহমদ চালপী, তাঁর পিতা সাইয়্যেদ মূসা, তাঁর পিতা সাইয়্যেদ আবদুল কাদের, তাঁর পিতা সাইয়্যেদ হাসান, তাঁর পিতা সাইয়্যেদ মুহিউদ্দীন আবু নসর, তাঁর পিতা আবু সালেহ, তাঁর পিতা সাইয়্যেদ আবদুর রাজ্জাক, তাঁর পিতা গাওছুছ্ ছাকালাইন শায়েখ আবদুল কাদের জীলানী কুদ্দিসা সিররুহু। আমাদের হজরত (মোজাদ্দেদে আলফেসানি) হজরত শাহ কামাল কায়থলী র. থেকেও কবুলিয়াতের (গ্রহণযোগ্যতার) কারণে তাঁর পৌত্র শাহ সেকেন্দার র. থেকেও ফয়েজ লাভ করেছেন (যাঁকে তাঁর দাদা শাহ্ কামাল খিলাফত দান করেছিলেন অথচ তাঁর পিতা শায়েখ জীবিত ছিলেন)। শাহ্ কামালের সাথে শায়েখ ফুযাইলেরও সম্পর্ক ছিলো, যিনি সাইয়্যেদ গিদা রহমান সানি থেকে এবং তিনি সাইয়্যেদ শামসুদ্দীন আরেফ থেকে এবং তিনি সাইয়্যেদ গিদা রহমান আউয়াল থেকে ফয়েজপ্রাপ্ত ছিলেন। তাঁদের বুজর্গদের সিলসিলা এরকম—

সাইয়্যেদ আবুল হাসান, সাইয়্যেদ শামসুদ্দীন সাহরায়ী, সাইয়্যেদ আকীল, সাইয়্যেদ বাহাউদ্দীন, সাইয়্যেদ আবুল ওয়াহ্হাব, সাইয়্যেদ শরফুদ্দীন, সাইয়্যেদ আবদুর রাজ্জাক, অতঃপর তাঁর পিতা গাওছুছ্ ছাকালাইন শায়েখ আবদুল কাদের জিলানী, তিনি তাঁর পিতা সাইয়্যেদ আবু সালেহ থেকে, তিনি তাঁর পিতা সাইয়্যেদ মূসা ফালেহ থেকে, তিনি তাঁর পিতা সাইয়্যেদ ইয়াহ্ইয়া জাহেদ থেকে, তিনি তাঁর পিতা সাইয়্যেদ দাউদ থেকে, তিনি তাঁর পিতা সাইয়্যেদ মূসা থেকে, তিনি তাঁর পিতা সাইয়্যেদ আবদুল্লাহ থেকে, তিনি তাঁর পিতা সাইয়্যেদ মূসা থেকে, তিনি তাঁর পিতা সাইয়্যেদ মহসিন থেকে, তিনি তাঁর পিতা হাসান মাছনা থেকে, তিনি তাঁর পিতা হজরত ইমাম হাসান রহমাতুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন থেকে এবং তিনি তাঁর মহাসম্মানিত পিতা আমিরুল মোমেনীন আলীউল মুরতাজা কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু থেকে ফয়েজপ্রাপ্ত ছিলেন।

সনদে মোসাফিহা (করমর্দন বা সাক্ষাৎসূত্র)

হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. হাজী আবদুর রহমান বদখশী কাবুলী র. এর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন (যিনি রমজী নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন)। তিনি হাফেজ সুলতান আওবাহী র. এর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন, যাঁর বয়স ১১০ বছর হয়েছিলো। তিনি শায়েখ মাহমুদ আসফারাজী র. এর সাথে, তিনি হজরত সাঈদ মুআম্মার হাবশী র. এর সাথে এবং তিনি রসুলেপাক স. এর সাথে সাক্ষাৎ লাভ

করেছেন। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বর্ণনা আমার লিখিত গ্রন্থ ‘সানওয়াতুল আত্‌কিয়া’য় [১] উল্লেখ করা হয়েছে।

নকশবন্দিয়া নেসবত

হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. এর নকশবন্দিয়া তরিকার নেসবত (সম্পর্ক) বিষয়ে আমি এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের শুরুতে উল্লেখ করেছি। তাই এখানে শুধুমাত্র সংক্ষিপ্ত কবিতার মাধ্যমে তা উপস্থাপন করাকেই যথেষ্ট মনে করেছি।

ছন্দে সাজরা

পূর্ণ ফয়েজপ্রাপ্ত আহমদের নির্বাচিত আবু বকর রা.
আরো ধন্য হয়েছেন সালমান ফারসী, যিনি গুপ্ত ধন ভান্ডার,
আরো ধন্য কাসেম, জাফর ও আবু ইয়াজীদ
আবুল হাসান,[২] বু-আলী সকলে পুণ্যবানদের শির, এমনিভাবে ইউসুফ ও গাজদানী
আরেফ রেওগাড়ী, মাহমুদ ফাগনবী ও রামিতনি সকলে মুক্তা বরাবর
এমন করে হজরত বাবা অতঃপর আমীর কুলাল
বহাইলেন জাতির মাঝে নকশবন্দিয়ার আদর্শ, যারা বড়দের গৌরব,
অনুসরণ করলেন ইয়াকুব চরখী অন্যদের মতো
অতঃপর খাজা উবায়দুল্লাহ যিনি গুপ্ত ভাণ্ডারের কাণ্ডারী
আরো এলেন সুফী সাধক খাজা আমকাংগী
অতঃপর খাজা বাকী যিনি নূরের খনি
তিনি ছিলেন যুগের ইমাম, কুতুব, নাম শায়েখ আহমদ
শক্ত হাতে ধরলেন তিনি মারেফাতের উৎসসমূহের সকল পথ।

জন্ম, শৈশব ও শিক্ষা

হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. এর শুভ জন্ম ৯৭১ হিজরী শাওয়াল মাসে পাক পবিত্র আল্লাহ্‌র প্রহরা ও নিরাপত্তায় সেরহিন্দ শহরে হয়েছিলো। লেখাপড়া করার উপযুক্ত সময় হলে তাঁকে একটি মক্তবে ভর্তি করা হয়। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি পবিত্র কোরআন মুখস্থ [৩] করেন। অতঃপর তাঁর বুজর্গ বিজ্ঞ পিতা শায়েখ

১. হাজ্‌রাতুল কুদ্‌স গ্রন্থের লেখকের লিখিত অপর গ্রন্থের নাম ‘সানওয়াতুল আতকিয়া’।
২. সেজরার ছন্দে হাসান উল্লেখ করা হয়েছে। ইনিই হলেন আবুল হাসান খেরকানী।
৩. এখানে এবং হজরত হাশেম কাশেমী র. এর ‘যুবদাতুল মাকামাত’ গ্রন্থেও লেখা হয়েছে, তিনি শৈশবেই পবিত্র কোরআন স্মৃতিস্থ করেছিলেন। কিন্তু মকতুবাত শরীফের (২য় খণ্ডের ৪৩ নং মকতুবে) বর্ণনা থেকে জানা যায়, তিনি কয়েদী থাকা অবস্থায় পবিত্র কোরআন স্মৃতিস্থ করেছিলেন।

আবদুল আহাদ র. এর কাছে শিক্ষা শুরু করেন। অধিকাংশ বিদ্যা তিনি তাঁর কাছ থেকেই অর্জন করেছেন। অতঃপর তিনি শিয়ালকোটে গিয়ে মাওলানা কামাল কাশমীরীর কাছ থেকে বহুবিধ বিষয়ে যথাযথ জ্ঞানার্জন করেন। তিনি নানা বিষয়ে অভিজ্ঞ ও প্রসিদ্ধ ছিলেন। সে যুগে তিনিই ছিলেন দার্শনিক, সূক্ষ্ম অনুসন্ধানকারী, বিজ্ঞ পণ্ডিত, গবেষক ও সাধক।

শায়েখ খুয়ারযমী র. কাবরাবিয়া তরিকার খলিফা ছিলেন। তিনি হারামাইন শরীফের বড় বড় মুহাদ্দিসগণের কাছ থেকে লেখা পড়া করে সনদ লাভ করেছিলেন। হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. সিলসিলায়ে কাবরাবিয়ার ওই শায়েখের কাছে বায়াত গ্রহণ করেছিলেন।

শিক্ষাজীবনের সমাপ্তি

মোজাদ্দেদে আলফেসানি সতেরো বছর বয়সে শরীয়তের (জাহেরী) বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করে শিক্ষাজীবন শেষ করলেন। বহু বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করলেন। অধ্যয়ন ও অনুশীলনকালে যেখানে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আলোচনা আসতো, সেখানে তিনি ওই কিতাবের হাশিয়া লিপিবদ্ধ করতেন। তাফসীর, হাদিস (সিয়াহ্ সিত্তাহ্ ও অন্যান্য) এবং ধারাবাহিক হাদিস বর্ণনার অনুমতি লাভ করেন। বিশেষ করে বিশুদ্ধ হাদিস 'আর রহিমুনা ইয়ার হামুহুমুর রহমানু ইরহামূ মান ফিল আরদ্বি ইয়ারহামূকুম মান ফিস সামায়ি' (দয়া প্রদর্শনকারীদের প্রতি মহান আল্লাহ্ নিজেই দয়া প্রদর্শন করবেন। তোমরা পৃথিবীবাসীর প্রতি দয়া করো তাহলে আকাশবাসী তোমাদের উপর দয়া করবেন— তিরমিজী) এর অনুমতি (একটি মাধ্যম থেকে) বিশিষ্ট দার্শনিক, প্রখ্যাত হাদিসবিশারদ শায়েখ আবদুর রহমান থেকে লাভ করেছিলেন, তিনি একজন প্রখ্যাত হাদিসবিশারদ ছিলেন এবং ছিলেন যুগের শ্রেষ্ঠ আলেম ।

রচনাবলী

তিনি প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষাগ্রহণের সময়েই আরবী ও ফারসীতে প্রাঞ্জল ও পরিশুদ্ধ ভাষায় কয়েকখানা গ্রন্থ রচনা করেন। 'রেসালায়ে তাহ্‌লিলিয়াহ্' ও 'রেসালায়ে ইছ্‌বাতুন নবুওয়াত' আরবী ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন এবং 'রদ্দে শিয়া' ও অন্যান্য গ্রন্থ সেই সময়েই ফারসী ভাষায় রচনা করেন। তাঁর জ্ঞানের গভীরতা এ বিষয় থেকে অতি সহজে অনুমান করা যায় যে, যখন আবুল ফয়েজ (ফৈজী) ত্রুটিমুক্ত তাফসীর লিখছিলো। ওই কাজে সহযোগিতার জন্য হিন্দুস্তানের আলেমগণের মধ্যে মাওলানা জামালুদ্দীন লাহুরী তালুবী ও অন্যান্য প্রখ্যাত আলেম ওই মজলিসে ছিলেন। এক স্থানে গিয়ে তাঁরা আটকে গেলেন এবং লেখনীর কাজ চালিয়ে যেতে অক্ষম হলেন। তখন আবুল ফজল ও ফৈজী মোজাদ্দেদে

আলফেসানি র. এর কাছে জানালেন যে, এক স্থানে আলেমগণ অক্ষম হয়েছেন এবং আপনার সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়েছেন। যদি আপনি বিশেষ কোনো পরিভাষায় অর্থবহ শব্দচয়নের মাধ্যমে বিষয়টি লিপিবদ্ধ করে দেন, তাহলে বড়ই এহসান হবে। কেনোনা আমরা সবাই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। তিনি কলম ধরলেন এবং ত্রুটিমুক্ত পরিভাষায় এমন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, উদ্দেশ্য, শানে নুযুল ও অন্যান্য বিষয়ে লিখলেন, যা দেখে বিচক্ষণ ও পণ্ডিত ব্যক্তিগণ বিস্ময় প্রকাশ করলেন।

বাতেনী কামালত অর্জন

প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্তির পর হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. তাঁর বুজর্গ পিতার সাহচর্য অবলম্বন করলেন এবং তাঁর কাছ থেকে কাদেরিয়া ও চিশ্‌তিয়া সিলসিলার বাতেনী কামালাত অর্জন করলেন। তার পিতা যথাসময়ে সকল পুত্রগণের মধ্য হতে তাঁকে খেরকা ও খেলাফত দান করলেন এবং নিজের স্থলাভিষিক্ত করলেন। তিনি 'মাবদা ওয়া মাআদ' গ্রন্থের শুরুতে লিখেছেন, এ ফকিরের একচ্ছত্র দুর্লভ নেসবত স্বীয় পিতা থেকে লাভ হয়েছে এবং তিনি এমন এক বুজর্গ ব্যক্তি থেকে লাভ করেছিলেন, যিনি ছিলেন শক্তিধর জযবার অধিকারী। তিনি তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন (অর্থাৎ হজরত শাহ কায়থলী কাদেরী র.)

অন্যত্র তিনি আরও লিখেছেন "এ ফকিরের নফল ইবাদতের (বিশেষ করে নফল নামাজের) অভ্যাস তাঁর বুজর্গ পিতার মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে। আর তিনি চিশ্‌তিয়া তরিকার বুজর্গদের মাধ্যমে এই স্বভাবে অভ্যস্ত হয়েছিলেন (অর্থাৎ শায়েখ আবদুল কুদ্দুস হানাফী গজনবী গাংগুহী থেকে লাভ করেছিলেন)। সর্বদাই তাঁর অন্তরে জিয়ারতে বাইতুল্লাহ এবং রসুলেপাক স. এর রওজা মোবারক জিয়ারতের বাসনা প্রবল ছিলো। কিন্তু বুজর্গ পিতার খেদমত এবং বাতেনী কামালাত অর্জনে রত থাকার জন্য তাঁর ওই অভিলাষ পূর্ণ হয়নি।

তিনি অল্প সময়ের মধ্যে পূর্ণতার শীর্ষে পৌঁছে গেলেন এবং তাঁর সাথী ও সমগোত্রীয়দের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করলেন এবং আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় দ্রুত কুতুবিয়াত ও কামেলে মোকাম্মেলের স্তরে পৌঁছে সফলকাম হলেন। তিনি নিজে তাঁর প্রাথমিক অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণী এক মকতুবে (প্রথম খণ্ড ২৯০ নং) বর্ণনা করেছেন এভাবে—

এই ফকিরের অন্তরে যখন আল্লাহ্‌প্রাপ্তির পথে চলবার কামনা প্রবল হলো এবং আল্লাহ্‌পাকের অনুগ্রহ আমার সহায় হলো, তখন আল্লাহ্‌তায়ালা আমাকে প্রকৃত তত্ত্ববিদ, এনদেরাজুন্‌ নেহায়েত ফিল্‌ বেদায়েতের (শেষ বস্তু প্রারম্ভে প্রাপ্তির) ও আল্লাহ্‌র নৈকট্যের স্তরসমূহে উপনীতকারী তরিকার পথপ্রদর্শক এবং আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্মের সহায়ক আমাদের শায়েখ, মাওলানা ও ইমাম হজরত মোহাম্মদ আল বাকী— যিনি নকশবন্দিয়া খানদানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ খলিফা— তাঁর

খেদমতে উপস্থিত হলাম। তিনি আমাকে ইসমে জাত অর্থাৎ 'আল্লাহ্' 'আল্লাহ্' জিকির করতে বললেন। নকশবন্দিয়া নীতি অনুযায়ী আমার প্রতি তাওয়াজ্জোহ্ দিলেন। আমার অন্তরে পূর্ণ আস্বাদ উপস্থিত হলো। পূর্ণ আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে আমি কাঁদাকাটি করলাম। একদিন পর দেখা গেলো আত্মবিস্মৃতির ভাব— এই তরিকায় যাকে বলা হয় গায়বত। ওই আত্মবিস্মৃতির মধ্যে আমি দেখতে পেলাম এক বিশাল সমুদ্র। নিখিল বিশ্বের সকল কিছুর ছায়া ওই মহাসমুদ্রে পতিত হয়েছে। আমার আত্মবিস্মৃতি গভীরতর ও বিস্তৃততর হলো। কখনো এক প্রহর কখনো দুই প্রহর। আবার কখনো সমস্ত রাত ধরে এই অবস্থাই চললো। আমি আমার পীর কেবলাকে আমার হালের কথা জানালাম। তিনি বললেন, এক প্রকারের ফানা অর্জিত হয়েছে। তিনি জিকির বন্ধ করতে বললেন। আত্মবিস্মৃতি ভাবের মধ্যে গভীর মনোনিবেশ করতে নির্দেশ দিলেন। এর দুই দিন পর নকশবন্দিয়া তরিকার ফানা হাসিল হলো। পীর কেবলাকে সবকিছু জানালাম। তিনি বললেন, আপন কাজে রত থাকো। আমি তাঁর নির্দেশ পালন করলাম। এবার হাসিল হলো ফানার ফানা। একথাও তাঁকে জানালাম। তিনি বললেন, মহাবিশ্বকে একটি সম্মিলিত বস্তু হিসেবে দেখতে পাও কিনা? আমি জবাব দিলাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, ওই 'ফানা'র 'ফানা'ই গ্রহণীয়, যাতে উক্তরূপ দর্শন সত্ত্বেও অজ্ঞতার ভাব প্রবল থাকে। ওই রাতেই আমার 'ফানা'র ফানা হাসিল হলো। বিস্মৃতিভাবও হলো সুপ্রবল। আমি এসকল কথাও পীর কেবলা হজরতকে জানালাম। আরো নিবেদন করলাম, আমার 'এলেম' এখন 'এলমে হুজুরী'তে পর্যবসিত হয়েছে। আর যে সকল গুণ আগে আমার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত ছিলো, সে সকল গুণ এখন সম্পৃক্ত হয়েছে আল্লাহ্তায়ালার সঙ্গে। এরপর যে নূর সকল বস্তুকে পরিবেষ্টন করেছিলো, সে নূরও প্রকাশিত হলো। আমি ওই নূরকেই আল্লাহ্র নূর বলে জানলাম। ওই নূর ছিলো কালো। আমি এই অবস্থার কথাও তাঁকে জানালাম। পীর কেবলা বললেন, হক সুবহানাহু তায়ালা দৃষ্টিকে প্রভাবান্বিত করেছে। মাঝখানে রয়েছে নূরের আড়াল। আরো বললেন, জ্ঞানের (এলেমের) মধ্যে ওই নূরের প্রশস্ততা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এর কারণ ঊর্ধ্বজগত ও অধোজগতের সকলকিছুর সঙ্গে রয়েছে আল্লাহ্র জাত পাকের সাধারণ সম্পর্ক। এ অবস্থাকেও 'নফি' (নিবারণ) করতে হবে।

এবার দেখলাম, কৃষ্ণবর্ণের প্রশস্ত নূর ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে। এভাবে ওই বিশাল নূর ক্রমে ক্রমে হয়ে গেলো বিন্দুবত্। তিনি বললেন, এটিকেও নিবারণ করতে হবে। হয়রানী বা অস্থিরতায় উপনীত হতে হবে। আমি সেরকমই করলাম। পতিত হলাম কথিত অস্থিরতায়। তিনি বললেন, এটাই নূরের পর্দাবিহীন আল্লাহ্র দর্শনের মাকাম (আখেরাতের দীদারের মাকাম)। তিনি বললেন, এটাই নক্শবন্দিয়া বুজর্গগণের হুজুরী (চৈতন্য)। তাঁরা এই হুজুরীকেই হুজুরে বে-গায়বত

(অনুপস্থিতশূন্য উপস্থিতি) অথবা তিরোধানরহিত বিদ্যমানতা বলে থাকেন। প্রারম্ভে শেষবিন্দুপ্রাপ্তি এই স্থানেই লাভ হয়। এই তরিকার তালেবগণের এমতো নেসবতপ্রাপ্তি অন্য তরিকার পীরের কাছ থেকে জিকির-অজিফা গ্রহণ করার পর তার উপর আমল করে মনজিলে মকসুদে উপনীত হওয়ার মতো।

দেখিয়া ভাবিও তুমি বাগান আমার
বসন্তে প্রকাশিবে কীরূপ বাহার।

বায়াত হওয়ার দুই মাস কয়েকদিন পর এই দুষ্প্রাপ্য নেসবত আমার অধিকৃত হলো। এই নেসবত লাভ হওয়ার পর দ্বিতীয় স্তরের ফানা (প্রকৃত ফানা) লাভ হলো। তখন আমার অন্তঃকরণ এরকম প্রশস্ত হলো যে, নিখিল বিশ্ব অর্থাৎ আরশ থেকে ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত যেনো ওই প্রশস্ততার তুলনায় সরিষা দানা পরিমাণও নয়। এরপর নিজেকে এবং জগতের সকল ব্যক্তিকে, বরঞ্চ প্রত্যেক অণু-পরমাণুকে হক বা আল্লাহ্ বলে দেখতে পেলাম। শেষে দেখলাম, মহাবিশ্ব একটি পরমাণুর মধ্যে বিলীন হয়েছে। এরপর নিজেকে এবং নিজের প্রত্যেক অনু-পরমাণুকে এরকম প্রশস্ত ও প্রসারিত দেখলাম যে, নিখিল বিশ্ব বরং তার চেয়ে বহুগুণ প্রশস্ত বস্তুও তার মধ্যে প্রবিষ্ট হতে পারে। নিজেকে এবং প্রত্যেক অনু-পরমাণুকে একটি সুপ্রশস্ত নূর হিশেবে পেতে লাগলাম, যা প্রত্যেক অণু-পরমাণুর মধ্যে প্রবিষ্ট ও জগতের যাবতীয় আকার-আকৃতি তার মধ্যে বিলীন। এরপর নিজেকে এবং নিজের প্রত্যেক অণু-পরমাণুকে নিখিল বিশ্বের নির্ভরশীল বস্তুরূপে পেলাম। এসকল অবস্থা যখন পীর কেবলা হজরতের গোচরীভূত করলাম, তখন তিনি বললেন, তওহীদের (একবাদের) মধ্যে হক্কুল একিনের (দৃঢ় বিশ্বাস) মরতবা এবং 'জমউল জমা'র মাকাম এটাই। তৎপর জগতের আকৃতিসমূহকে আগে যেমন আল্লাহ্ বলে পেতাম, এখন সেগুলোকে মাওহুম বা ধারণানির্ভর বস্তুরূপে দেখতে লাগলাম। আমার মন চঞ্চল হয়ে উঠলো। সহসা আমার পিতার নিকট 'ফুসুসুল হিকাম' নামক পুস্তকের যে বিবরণ শুনেছিলাম, সেই বিবরণের কথা মনে পড়লো। ওই গ্রন্থটিতে লেখা ছিলো, যদি তুমি ইচ্ছা করো, তবে জগতকে এক হিশেবে 'হক' বা আল্লাহ্ বলতে পারো, আবার ইচ্ছা করলে অন্য হিশেবে বলতে পারো সৃষ্টি। আবার পার্থক্য করতে না পারলে 'কী বলি না বলি— এই ভাবনায় অস্থির আছি'— এরকমও বলতে পারো। 'ফসুসুল হিকামে'র এই বিবরণটি আমার হৃদয়ে কিছুটা সান্ত্বনা প্রদান করলো। শেষে পীর কেবলার খেদমতে উপস্থিত হয়ে সবকিছু খুলে বললাম। সবকিছু শুনে তিনি বললেন, এখনো প্রকৃত হুজুরী (সদাবিদ্যমানতা) তোমার লাভ হয়নি। নিজ কাজে গভীরভাবে অভিনিবিষ্ট হও— তবেই 'মওজুদ' বা অস্তিত্বসম্পন্ন বস্তু 'মওহুম' বা ধারণনির্ভর বস্তু থেকে পার্থক্য লাভ করবে। আমি 'ফুসুসুল হিকাম' পুস্তকের বিবরণটি শোনালাম। তিনি

বললেন, লেখক শায়েখ মুহিউদ্দিন ইবনে আরাবী কামেল ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করেননি। অবশ্য অনেকেই এরকম পার্থক্য করতে সক্ষম হয় না।

পীর কেবলা হজরতের নির্দেশ অনুসারে নিজ কাজে বিভোর হয়ে গেলাম। আল্লাহ্‌তায়ালা নিতান্ত অনুগ্রহপূর্বক দুইদিন অতিবাহিত হওয়ার পর 'মওজুদ' ও 'মওহুম' এর মধ্যে পার্থক্য প্রকাশ করে দিলেন। ফলে প্রকৃত অস্তিত্বসম্পন্ন বস্তুকে ধারণনির্ভর বস্তু থেকে পৃথক দেখতে লাগলাম এবং যে গুণাবলী ও কার্যাবলী ও তার ক্রিয়া ধারণনির্ভর বস্তুর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়, তা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে দেখতে লাগলাম। অবস্থা এরকম হলো যে, গুণাবলী ও কার্যকলাপগুলোকেও নিরেট ধারণা বলে পেতে লাগলাম। আর খারেজ বা বহির্জগতে এক জাত ভিন্ন আর কাউকে অস্তিত্ববান বলে দেখলাম না। পীর কেবলার কাছে যখন এসকল হাল খুলে বললাম, তখন তিনি বললেন, 'ফরক বা'দাল জমা'র (একত্রিতির পর পৃথকতার) মাকাম এটাই। সাধনার শেষ এখানেই। এরপর প্রত্যেক বক্তির স্বকীয় ভাব ও যোগ্যতা প্রকাশ পেতে থাকে। তরিকার মাশায়েখগণ এই মাকামকে তাকমীল বা অন্যকে পূর্ণকরণের মাকাম বলেছেন।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. নিজের এলাকা সেরহিন্দ থেকে তিন বার হজরত খাজা র. এর খেদমতে হাজির হয়েছিলেন। প্রথম বার হজরত খাজা র. কামাল ও তাকমীল (পূর্ণতা ও পূর্ণকরণ), মাদারেজে কুরব ও নেহায়েত (নৈকট্যলাভ ও সমাপ্তি) এর উন্নতি সাধনের সুসংবাদ দিয়েছিলেন, যেমন উপরে বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয়বার হজরত খাজা তাঁকে আল্লাহ্‌প্রেমিকদের উপদেশ ও তাঁদের পরিচর্যা করার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং খেলাফতের খেলাআত (খেলাফতের পোশাক বা উপহার) দান করেছিলেন এবং তাঁর মনোনীত সহচরদের একটি দলকে তাঁর সঙ্গী করে তাঁদের আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণের দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত করেছিলেন।

তৃতীয়বার তিনি যখন হজরত খাজা সাহেবের কাছে গেলেন, হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ তাঁকে স্বাগতম জানানোর জন্য পায়ে হেঁটে ফিরোজী দূর্গ থেকে (যেখানে হজরতের বাসস্থান ছিলো) কাবুলী গেট পর্যন্ত পৌঁছলেন এবং অত্যন্ত উচ্চমর্যাদা ও বিশেষ সম্মানের সাথে তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন। অতঃপর যখন আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হলো, তখন তাঁর কাছে হজরত একটি মাত্র প্রশ্ন করেছিলেন। তা হলো— সাইয়্যেদুত্ তায়েফাহ্ [১] কুদ্দিসা সিররুহু বলেছেন, যদি আমার কাছে হজরত আবু সাঈদ খাররাজের জীবনপ্রণালী সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়, তাহলে আমি ধ্বংস হয়ে যাবো। তাঁর জীবনযাপন ছিলো সার্বক্ষণিক জিকিরের

১. হজরত জুনায়েদ বোগদাদী র. হজরত সিররি সাকতী র. এর ভাতিজা ও খলিফা ছিলেন। তিনি ২৮৭ হিজরীতে বাগদাদে ইন্তেকাল করেন।

উপর। এমনকি তিনি চামড়া সেলাই করার সময় যখন দুই গিরার মাঝে রাখতেন সে সময়ও তিনি আল্লাহ্‌র জিকির থেকে বিরত হতেন না। হজরত খাররাজ র. এর অন্তিম সময়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনার বাসনা কী? তিনি বললেন, আমি আমার উদাসীনতার জন্য আফসোস করছি। (যিনি চামড়া সিলাইয়ের সময় দুই গিরার মাঝে যখন রাখতেন তখনও আল্লাহ্‌র জিকির করতে ভুলেননি। তা সত্ত্বেও অন্তিমসময়ে আল্লাহ্‌র জিকির থেকে উদাসীন থাকার জন্য তিনি খুবই আফসোস করেছিলেন)। এ দুটি [১] বিপরীতমুখী বক্তব্য কী করে সঠিক হবে? এর উত্তরে হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. বলেছিলেন, হজরত খাররাজের বাসনা ছিলো, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দু'দিকেই পরিপূর্ণভাবে হুজুরী থাকবে। এর অন্যথাকে তিনি গাফলাত (উদাসীনতা) মনে করতেন। দুই গিরার মাঝে চামড়া সেলাইয়ের সময়ও জিকির করা ভুলতেন না বিষয়ে যা বলা হয়েছে, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে হুজুরে বাতেনী (অভ্যন্তরীণ নৈকট্য)।

মোটকথা তৃতীয় বার হজরত খাজা র. সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শনের ব্যাপারে সীমা অতিক্রম করেছেন। সুতরাং যখন হজরত খাজা স্বীয় স্থান ত্যাগ করতেন, তখন উল্টো পায়ে চলতেন, যেনো তাঁর দিকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন না হয়ে যায়। রাস্তায় চলার সময়ও খাজা সাহেব র. এরূপ আচরণই করতেন। বরং সকল সালেক ও উপস্থিত ব্যক্তিগণের প্রতি নির্দেশ ছিলো, তাঁর উপস্থিতিতে কখনোই আমাকে সম্মান প্রদর্শন করবে না। তাঁর সকল মুরিদকে তাঁর উপরে ন্যস্ত করে দিলেন এবং শায়েখ নিজের যাবতীয় তরবিয়াতের দায়িত্বও তাঁর উপর ন্যস্ত করলেন। এমনকি নিজের শিশুসন্তানদেরকে ডেকে তাওয়াজ্জোহের জন্য তাঁর সামনে উপস্থিত করলেন। তাঁর দুই সন্তান সম্পর্কে প্রথম খণ্ডে উল্লেখ করা হয়েছে। হজরত খাজা র. এর কোনো কোনো সহচর সার্বক্ষণিক খেয়ালের (হুজুরের) মধ্যে ছিলো না। তিনি তাদেরকে অদৃশ্যভাবে তরবিয়াত দেওয়ার জন্য তাঁর কাছে ইচ্ছা পোষণ করলেন। তারপর বললেন, আমার পীর-মুরিদীর উদ্দেশ্যই ছিলো আপনার বিকাশ (জহুর) ঘটানো। সে উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। তাই আমি শায়েখের দায়িত্ব ত্যাগ করেছি।

হজরত খাজা র. এর নির্দেশ অনুযায়ী তিনি সেরহিন্দে আগমন করে সালেকগণের আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ ও প্রতিপালনের কাজে নিয়োজিত হলেন। এক মকতুবে (২৯০/১) তিনি বলেছেন, হজরত খাজা র. যখন আমাকে কামেলে মোকাম্মেল মনে করে দয়াপরবশ হয়ে তরিকার প্রশিক্ষণ দেওয়ার অনুমতি দিলেন এবং সালেকদের একটি দলকে যখন আমার উপর ন্যস্ত করলেন, তখন আমার

১. আবু সাঈদ আহমদ বিন ঈসা খাররাজ র. ২৭৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তাঁকে 'লিসানুত্ তাসাউফ' (মারেফাতের মুখপত্র) বলা হতো। তাওয়াক্কুলে (আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভরশীলতায়) বিশেষ মাকামের অধিকারী ছিলেন তিনি।

কামাল (পূর্ণতা) ও তাকমিল (পূর্ণকরণ) সম্পর্কে আমি দ্বিধান্বিত হলাম। হজরত খাজা বললেন, এ পথে সন্দেহকে প্রশ্রয় না দেওয়াই উচিত। কেনোনা এর দ্বারা মোর্শেদের কামালের (পূর্ণতার) মধ্যে আবশ্যিকভাবে সন্দেহ এসে যায়। সুতরাং আমার পক্ষে যথাসম্ভব আমি তরিকার তা'লীম শুরু করলাম এবং সালেকগণের কর্মকাণ্ডগুলো সময়মত সুসম্পন্ন হতে লাগলো। কিন্তু ওই সময় আমার নেসবতের মধ্যে কিছু ঘাটতি অনুভূত হলো। তখন আমার সান্নিধ্যে যারা ছিলো, তাদের কাছে আমার এই ঘাটতির কথা তুলে ধরলাম এবং তাদের থেকে বিদায়ের অনুমতি চাইলাম। তখন লোকেরা আমার কথাগুলোকে মনোযোগ ও বিনয়ের সাথে গ্রহণ করলো এবং তাদের যা কিছু অর্জন হয়েছিলো, তা থেকে পশ্চাদ্‌পসরণ করলো না। তারপর আল্লাহ্‌পাকের অনুগ্রহ হলো এবং অল্প সময়ের মধ্যে ওই হালসমূহ অর্জিত হলো, যার অপেক্ষায় আমি ছিলাম।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি তাঁর অবস্থাসমূহ, কামালাতসমূহ , স্বীয় সাথীবৃন্দ ও তাঁর অধীনস্থ পীর ভাইদের উন্নতি সম্পর্কে হজরত খাজাকে লিখে জানাতেন, যা তাঁর মকতুবাতে (প্রথম খণ্ডে) উল্লেখ করা হয়েছে। আগ্রহীগণ সেখানে দেখে নিতে পারেন। হজরত খাজা র. এর নিকট যে সকল সাথী অবস্থান করছিলো তাঁদের সম্পর্কেও হজরত খাজা র. থেকে খোঁজ খবর নিতেন এবং তিনি বিশুদ্ধ ও প্রকাশ্য কাশফের অবস্থা সেরহিন্দ থেকে খাজা সাহেবের কাছে লিখতেন এবং তাঁদের উন্নতির জন্য অদৃশ্যভাবে তাওয়াজ্জোহ্ দিতেন। সুবহানাল্লাহ! তাঁর তাওয়াজ্জোহ্ কতোই না শক্তিশালী ছিলো। তাঁর পরিচর্যা (তরবিয়াত) ছিলো কতোই না শক্তিমান।

যখন তাঁর খ্যাতি বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়লো এবং তাঁর হেদায়েতের অনুশীলন গোটা বিশ্বে প্রচারিত হলো এবং তাঁর কামালাতের ধ্বনি সপ্তমহাদেশে যখন নিনাদিত হতে থাকলো, তখন এই আয়াতে কারিমা 'ইযা জা-আ নাসরুল্লহি ওয়াল ফাতহু অরাআইতান্নাসা ইয়াদ্ খুলূনা ফী দ্বীনিল্লহি আফওয়া-জা' (যখন আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয় আসবে তখন দেখবে, লোকেরা আল্লাহ্‌র দ্বীনের মধ্যে দলে দলে প্রবেশ করছে), সূরা নসর ৩০ পারা— এই আয়াতের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হলো। বিভিন্ন স্থানের লোক তাঁর (হুলিয়া) দৈহিক সৌন্দর্য স্বপ্নের মাধ্যমে দেখতে পেলেন। আম্বিয়া আ. এবং আউলিয়া কেরাম থেকেও রূহানী ইঙ্গিত ও সুসংবাদ পেলেন এবং তাঁর দরবারে তাঁরা সন্তোষ প্রকাশার্থে উপস্থিত হতে লাগলেন। সুতরাং অসংখ্য লোক দলে দলে তাঁর খেদমতে উপস্থিত হলেন। তাঁরা স্বপ্নে তাঁকে যেভাবে দেখেছিলেন বাস্তবেও সেভাবে দেখলেন। তাঁর প্রতি হলেন আরো অধিক আস্থাবান। হলেন একান্ত অনুগত। তাঁর সুন্দর স্বভাব ও কারামত, অন্তর্দৃষ্টি এবং অদৃশ্যবার্তা একের পর এক এমনভাবে প্রকাশ হতে লাগলো, যেমন মুষলধারায় বৃষ্টি বর্ষিত হয়। এরপর জাহের ও বাতেনে তাঁর বিচরণ, হালের রূপান্তর এবং

তাওয়াজ্জোহ্ সীমাহীন বলে অনুভূত হতে লাগলো। তাঁর প্রকৃতি ও রূহানিয়াতের ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি আল্লাহ্প্রেমিকের দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন। লোকেরা তাঁর প্রতি প্রকাশ করতে লাগলো পরিপূর্ণ বিনয় ও আনুগত্য। তাদের আদব-শিষ্টাচার দেয়ালের উপর নকশাসদৃশ ছিলো। অতঃপর তাঁর মতো কুতুবুল আকতাবের সাথে কথা বলার সাহস ছিলো কার? তাঁর কারণে আল্লাহ্প্রেমিক ও সত্যান্বেষীদের এমন জমজমাট মেলা লেগে গেলো যে, গোটা বিশ্বে তার কোনো তুলনা মিললো না। এসকল সত্যানুসন্ধানকারী এবং খাঁটি সালেকদের মধ্যে যাঁরাই তাঁকে দেখেছিলেন, তাঁরাই স্বতঃস্ফূর্ত ও অকুণ্ঠ চিত্তে বলে উঠেছিলেন, নিঃসন্দেহে ইনি মহান কোনো ফেরেশতা।

তাঁর তরিকা হুবহু সাহাবা কেরাম রা.গণের তরিকা অনুযায়ী ছিলো। তাঁর পোশাক রসুলে আনওয়ার স. এর উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন সাহাবীদের মতো ছিলো। অর্থাৎ মাথায় পাগড়ী, মিসওয়াক, যা পাগড়ীর কোণা দ্বারা বাঁধা থাকতো, পাগড়ীর পার্শ্ব দুই কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে পড়ে থাকতো, জামার কলার দু' কাঁধের দিকে উন্মুক্ত থাকতো, পাজামা গিরার উপরে বরং নলার মাঝ বরাবর ছিলো। পায়ে জুতা এবং হাতে লাঠি থাকতো, কাঁধের উপর জায়নামাজ থাকতো এবং ললাটে সমুদ্ভাসিত ছিলো অধিক সেজদার চিহ্ন। ললাটদেশ এবং মুখমণ্ডল বাতেনী নূরের কারণে ছিলো জ্যোতির্ময়। সারা রাত তিনি নামাজ বা মোরাকাবার মাধ্যমে অতিবাহিত করতেন এবং দিনের বেলায় সকালে, জোহরে ও আসর নামাজের পর হালকা জিকির করাতেন, যার মধ্যে ইসতিগ্রাক (আল্লাহ্প্রেমের মধ্যে নিমজ্জিত) অবস্থা থাকতো। তিনি এশরাক ও চাশতের নামাজও আদায় করতেন এবং রাত দিন ওজু, নামাজ, মোরাকাবা ও তেলাওয়াতের মাধ্যমে ব্যয় করতেন। নামাজের সময়, স্থান ও পোশাকের পবিত্রতার প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখতেন। যেমন রসুল স. এর এই হাদিস 'লা ইউদর-আওয়ালুহুম খয়রুন আও আখিরুহুম' (বুঝা যায় না যে, আমার উম্মতের মধ্যে প্রথমাংশ শ্রেষ্ঠ না শেষাংশ)। তিনি রসুলুল্লাহ স. এর প্রিয়জন ও সাহাবীদের অনুরূপ হয়েছিলেন।

তিনি তাঁর সহোদর ভাই শায়েখ মোহাম্মদ মওদুদ র. এর কাছে লিখেছিলেন, হে ভ্রাতঃ! আহলুল্লাহ্ এবং আল্লাহ্প্রেমিকদের এমন সমাবেশ বর্তমানে যা সেরহিন্দে হচ্ছে, যদি তুমি সমগ্র পৃথিবীতে বিচরণ করো, তাহলে এর শতভাগের একভাগ— এমনকি এর অণুপরিমাণ গন্ধও কোথাও পাবে না। তুমি অনর্থক এমন মূল্যবান সম্পদকে হেলাভরে দূরে ঠেলে দিচ্ছো। তুমি অবুঝ শিশুদের মতো অমূল্য সম্পদ মণি-মুক্তার বিনিময়ে খেলনা সামগ্রী গ্রহণ করেছো।

লজ্জা এবং হাজার লজ্জার কথা (মকতুবাত প্রথম খণ্ড ২২৬ নং)।

তৃতীয় হাজ্‌রাত

এ অধ্যায়ে হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. এর আবির্ভাবের পূর্ব ও পরবর্তী ঘটনাবলী সম্পর্কে আলোচিত হবে। তাঁর সম্পর্কে মহান আল্লাহ্‌র প্রিয়জনেরা ও আউলিয়াগণ অনেক কিছু প্রকাশ করেছেন। যেমন—

১. আল্লামা সুয়্যুতী র. তাঁর 'জমাউলজমা' গ্রন্থে একটি হাদিস লিখেছেন এভাবে— রসুল স. বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে এক ব্যক্তি এমন হবে, যাকে সীলাহ্ (যোগসূত্র) বলা হবে। তার সুপারিশে অসংখ্য ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে। এই হাদিস দ্বারা হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেনোনা তিনিই ছিলেন সূফী-আলেমগণের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনকারী। তিনিই ওয়াহ্‌দাতুল অজুদ বিষয়টিকে কেন্দ্র করে আলেমগণের বিভিন্ন দলের মতপার্থক্য দূর করে দেন। এটি যে কেবল ভাষাবিভ্রাটজনিত বিষয়, তা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন। আরো বলেন, মহান আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা যে, তিনি আমাকে দুই দলের সেতুবন্ধন (সিলাহ) বানিয়েছেন। তাঁকে প্রিয় নবী সরওয়ারে কায়েনাত স. এই মর্মে সুসংবাদ দিয়েছেন যে, কিয়ামতের দিন অসংখ্য লোককে তাঁর সুপারিশে মাফ করে দেওয়া হবে। এই পবিত্র হাদিস এবং সুসংবাদের সত্য প্রমাণ তিনি নিজেই। দীর্ঘ এক হাজার বছর সময়ের মধ্যে তিনি ব্যতীত অন্য কেউ 'সিলাহ্' উপাধিতে ভূষিত হননি।

২. মাকামাতে শায়খুল ইসলাম আহমদ জামি কুদ্দিসা সিররুহুর গ্রন্থের এক স্থানে আমি দেখেছি, সেখানে বলা হয়েছে, আমার পরে সতেরো ব্যক্তি আমার মতো 'আহমদ' নামধারী হবে। সর্বশেষের জন আগমন করবেন এক হাজার বছর পর। তিনিই হবেন সকলের থেকে উৎকৃষ্ট।

৩. হজরত শায়েখ আহমদ জামি কুদ্দিসা সিররুহু'র সন্তান জহুরুদ্দীন তাঁর 'রুমূযুল আশেকীন' গ্রন্থে লিখেছেন, আমার পিতার শেষ বয়স পর্যন্ত তাঁর হাতে প্রায় ছয় হাজার ব্যক্তি তওবা করেছিলো (বায়াত হয়েছিলো)। তারা হজরতের কাছে জিজ্ঞেস করেছিলো, আমরা অনেক বুজর্গের অবস্থা শুনেছি, তাঁদের গ্রন্থাবলী পাঠ করেছি। কিন্তু হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. এর মাঝে যে সকল বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করা হয়েছে অন্য বুজর্গদের মধ্যে সে সকল বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়নি। এর কারণ কী? হজরত বললেন, রিয়াজত (নিরলস সাধনা) যা আউলিয়া কেরামদের সম্পর্কে শুনেছি, আমি নিজেও রিয়াজত করেছি বরং তাঁদের থেকে অনেক বেশি করেছি। এজন্য মহান আল্লাহ্ যা কিছু এককভাবে দান করেছেন, তা আমাকে নির্জনে দান করেছেন। চারশত বছর পর এক খ্যাতিমান (আহমদ) জন্মগ্রহণ করবেন এবং মহান আল্লাহ্‌র দানের নিদর্শন তাঁর থেকে এমনভাবে প্রকাশিত হবে যে, সকল সৃষ্টি তা অবাক হয়ে দেখবে। 'হাযা মিন ফাজলি রব্বি'।

আমার ধারণা, এটি হচ্ছে হজরত মোজাদ্দেদের শুভাগমন সম্পর্কে ইঙ্গিত। কেনোনা শায়েখ আহমদ জামি র. ইন্তেকাল করেছিলেন ৬০০হিজরীতে। আর আমাদের হজরত মোজাদ্দেদ র. এর জন্ম হয়েছিলো ৯৭১ হিজরীতে।

৪. একজন বিশ্বস্ত বুজর্গ লেখক বর্ণনা করেছেন, তিনি শায়েখ জলিলুল্লাহ বদখশানি র. কর্তৃক লিখিত গ্রন্থে দেখেছেন, হিন্দুস্তানে নকশবন্দিয়া তরিকার এক বুজর্গ জন্ম নিবেন, যিনি যুগশ্রেষ্ঠ হবেন। আফসোস! আমি সে সময় জীবিত থাকবো না।

কুতুবুল মোহাক্কেকীন খাজা মোহাম্মদ বাকী বিল্লাহ কুদ্দিসা সিররুহু বলেন, হজরত মাওলানা খাজা আমকাংগী [১] র. আমাকে হিন্দুস্তানে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। বললেন, সেখানে তোমার মাধ্যমে তরিকার প্রসার ঘটবে। আমি নিজের অযোগ্যতার কথা জানালাম। তিনি ইস্তেখারার নির্দেশ দিলেন। আমি ইস্তেখারা করলাম। দেখলাম, বৃক্ষশাখায় বসে আছে একটি তোতা পাখি। ভাবলাম, তোতা পাখিটি যদি উড়ে এসে আমার হাতে বসে, তাহলে আমার এ সফর সফল হবে। সঙ্গে সঙ্গে তোতা পাখিটি আমার হাতে এসে বসলো।

আমি তার ঠোঁট আমার মুখের মধ্যে নিয়ে নিলাম। আমার মুখের লালা তার মুখে প্রবেশ করিয়ে দিলাম। তার মুখে কথা ফুটলো। দ্বিতীয় বার তার ঠোঁট আমার মুখের মধ্যে নিতেই সে আমার মুখে চিনি ঢেলে দিলো। ঘটনাটির ব্যাখ্যা করলাম এভাবে— তোতা হিন্দুস্তানের পাখি। সুতরাং হিন্দুস্তানের এক বুজর্গ আমার সাথে সম্পর্ক রাখবেন, যিনি মারেফাত ও হাকিকত বর্ণনা করবেন। আমি তাঁর কাছ থেকে উপকৃত হবো। আমি ঘটনাটি ও তার ব্যাখ্যা হজরত আমকাংগী র. কে শোনালাম। তিনি বললেন, আপনার অন্তরে উদিত এই ব্যাখ্যাটি সঠিক। দ্রুত ওই বুজর্গকে অন্বেষণ করুন। বোঝা যাচ্ছে, ওই বুজর্গই আপনার সান্নিধ্যে আসবেন।

৫. হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ্ র. আমাদের মোজাদ্দেদ র. কে বলেছেন, হজরত খাজা আমকাংগী র. থেকে বিদায় নিয়ে সেরহিন্দ রওয়ানা দিলাম। অনেক পথ পাড়ি দিয়ে যখন সেরহিন্দ উপস্থিত হলাম, তখন আমাকে বলা হলো, তুমি এক কুতুবের নিকট অবস্থান করছো। ওই কুতুবের দৈহিক বর্ণনাও উল্লেখ করা হলো। প্রত্যুষে আমি শহরের মাশায়েখ ও সংসারত্যাগী সাধকদের সন্ধান করলাম। কিন্তু কারো মধ্যে কুতুবিয়াতের নিদর্শন দেখলাম না। ভাবলাম, হয়তো বা আরো পরে তাঁর আবির্ভাব ঘটবে। পরে যখন আপনার সাথে সাক্ষাৎ হলো, তখন ওই হুলিয়ার (দৈহিক বিবরণের) সাথে আপনার পরিপূর্ণ মিল পেলাম এবং কুতুবের নিদর্শনও আপনার মধ্যে দৃষ্টিগোচর হলো।

---

১. হজরত খাজা আমকাংগী র. এর জন্ম হয়েছিলো ৯১৮ হিজরীতে এবং ইন্তেকাল ঘটেছিলো ১০০৮ হিজরীতে। তাঁর বাসস্থান ছিলো বোখারা থেকে তিন মাইল দূরে।

৬. হজরত মোজাদ্দেদ র. হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ্ র. এর দরবারে হাজির হলেন। হজরত খাজা বললেন, যখন আমি আপনার শহরে অবস্থান করলাম, তখন দেখলাম একটি মশাল (প্রজ্জ্বলিত আলো) আসমান পর্যন্ত আলোকময় হয়ে রয়েছে। ওই আলোকে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত আলোকিত হয়েছে। এ অবস্থা রইলো ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে। দেখলাম লোকেরা সেই মশাল থেকে বহু প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করলো। আমি ওই ঘটনা থেকেও আপনার সম্পর্কে ইঙ্গিত ও সুসংবাদপ্রাপ্ত হই।

৭. হজরত মোজাদ্দেদ র. প্রাথমিক অবস্থায় যখন হজরত বাকী বিল্লাহ্ র. এর খেদমতে ছিলেন, তখন তিনি এক বুজর্গকে একটি চিঠি লিখেছিলেন এভাবে— শায়েখ আহমদ নামে এক বুজর্গ সেরহিন্দ থেকে আমার কাছে এসেছেন, যিনি অভিজ্ঞ ও শক্তিধর আমলবিশিষ্ট। আমি কিছু দিন তাঁর সাথে ছিলাম। তাঁর মধ্যে আমি বিস্ময়কর ও দুর্লভ ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করেছি। দেখেছি, তিনি সূর্যসদৃশ এবং তাঁর দ্বারা একটি বিশ্ব জ্যোতির্ময় হয়ে গিয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ্! তাঁর অবস্থাসমূহ সম্পর্কে আমার পূর্ণ প্রত্যয় অর্জিত হলো। ওই বুজর্গের কয়েক জন ভাই এবং আত্মীয়ও রয়েছেন, যাঁরা সকলে পুণ্যবান এবং জ্ঞানী। তাঁদের কয়েকজনের সাথে আমার সাক্ষাৎও হয়েছে, যাঁরা মহামূল্যবান মুক্তাসদৃশ ও বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী। বুজর্গের একটি কিশোর সন্তান রয়েছে। সেও আল্লাহ্র গুপ্ত রহস্যের আধার। মূলকথা, সবাই শাজারাতুন তইয়্যেবাহ্ (পবিত্র বৃক্ষ)। আল্লাহ্পাক তাঁকে উত্তম জ্ঞান দান করুন। (হজরত খাজা র. এর ৬৫ নং মকতুব)।

৮. হজরত খাজা র. আমাদের হজরত মোজাদ্দেদ র. সম্পর্কে বলেছেন, এখানে (দিল্লিতে) আমি তিন চার বছর ধরে পীর-মুরিদী করিনি। মনে হয় খেলাচ্ছলে সময় অতিবাহিত করেছি। কিন্তু মহান আল্লাহ্র কৃপা ও বড়ই এহসান এই যে, আমার খেলাচ্ছলের এই ব্যবসায় কোনো ক্ষতি হয়নি। কেনোনা হজরত মোজাদ্দেদ র. এর মতো বুজর্গকে আমি পেয়েছি।

৯. হজরত খাজা র. একথাও বলেছেন যে, আমি বোখারা এবং সমরখন্দ থেকে বীজ সংগ্রহ করেছি এবং হিন্দুস্তানের পুণ্যময় ভূমিতে তার চাষাবাদ করেছি। সত্য-অনুসন্ধানীদের (মুরিদগণের) তরবিয়াত (পরিচর্যা) ওই সময় পর্যন্ত করেছি যতক্ষণ পর্যন্ত না হজরত মোজাদ্দেদের আধ্যাত্মিক চর্চা চূড়ান্ত পর্যায়ে না পৌঁছেছে। যখন আমি এ কাজ থেকে মুক্ত হয়েছি তখন থেকে আমি পীরের দায়িত্ব পালন থেকেও নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছি। আর মুরিদদেরকে তাঁর দায়িত্বে ন্যস্ত করেছি।

১০. হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ র. তাঁর কাছে একটি চিঠি লিখেছিলেন। ওই চিঠি থেকেও মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. এর উচ্চ মর্যাদা ও মারেফাতের

উচ্চস্তরের বিবরণ পাওয়া যায়। তিনি লিখেছিলেন, আল্লাহ্ আপনাকে কামাল ও আকমালের স্তর পর্যন্ত পৌছিয়ে দিন। 'ওয়াল আরদু মিন কা'সিল কারামি নাসীবুন' (বুজর্গের পাত্র থেকে মাটিও কিছু অংশ পেয়ে থাকে) এটা এক বাস্তবতা। আমি লৌকিকতার জন্য লিখছি না। পীরে আনসারী হজরত আবদুল্লাহ [১] কুদ্দিসা সিররুহু বলেন, আমি হজরত আবুল হাসান খারকানীর [২] র. মুরিদ। যদি তিনি এ সময় জীবিত থাকতেন, তাহলে পীর হওয়া সত্ত্বেও তিনি আমার মুরিদ হতেন। যখন এমন গুণে গুণান্বিত বুজর্গের বৈশিষ্ট্যের অবস্থা এরকম, আর আমি যেখানে নিজেই তাঁর নিদর্শন ও গুণাবলীতে মুগ্ধ, তখন আমি কেমন করে তাঁর শিষ্যত্বে জীবন উৎসর্গ না করে পারি। যেখান থেকে জীবনের উৎসের সুঘ্রাণ আসছে, তার অনুসরণ করবো না কেনো? এমন অবস্থায় আমার কালক্ষেপণ ও নিরবতার কারণ কোনো প্রত্যাশা বা অন্তরায় নয়, বরং মহান আল্লাহ্র কৃপা ও ইহসানের প্রতীক্ষা।

দ্বীনের সম্রাট যার কৃপার প্রত্যাশী
এখন অল্পতে তুষ্টের উপর ক্ষান্ত কেনো হবো।

প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে এটাই, যা বর্ণনা করা হলো। মহান আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা দান করেন। সকল প্রকার অহংকার ও ঔদ্ধত্য থেকে রক্ষা প্রার্থনা করি। আমিন।

এখন অবস্থা এই যে, মীর সালেহ [৩] নিশাপুরী র. তাঁর সোহবত লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলেন। সময়ের দাবী এটাও ছিলো যে, এই সুবর্ণ সুযোগ হারানো হবে মুসলিম আদর্শের পরিপন্থী। তাই তাঁকে হজরতের খেদমতে প্রেরণ করা হলো। আল্লাহ্র ইচ্ছায় তাঁর যোগ্যতা অনুযায়ী তিনি জ্ঞানের গভীরতায় পৌছাতে পারবেন এবং পরিপূর্ণভাবে তায়াজ্জোহ্ ও অনুগ্রহ লাভ করতে সক্ষম হবেন। হজরত খাজা র. এর ৮৩ এবং ৮৪ নম্বর মকতুবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি তরিকতের সকল শিক্ষা ও পরিচর্যার কার্যক্রম হজরত মোজাদ্দেদ র. এর উপর ন্যস্ত করেছিলেন।

১১. হজরত খাজা র. হজরত মোজাদ্দেদ র. সম্পর্কে আরো লিখেছেন, মহান আল্লাহ্ ফকির মিসকীন ও হতভাগ্য ব্যক্তিদেরকে তাঁর প্রিয় বান্দাদের বরকতে উচ্চমর্যাদা পর্যন্ত পৌঁছে দেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর বেলায়েতের দরবারে নিজেকে প্রার্থী হিসেবে উপস্থিত করতে বিলম্ব ঘটেছে। কিন্তু একথাটি সত্য যে, একজন সঠিক দূত তিনিই পৌঁছে দিতে পারেন। আলহামদুলিল্লাহ্! যদি বিষয়টি এমন হয়ে

---

১. তিনি হেরাত নামক স্থানে ৩৯৬ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং ইন্তেকাল করেছিলেন ৪৮১ হিজরীতে।

২. আবুল হাসান খারকানী র. খারকানে (বাসতাম নগরীর গ্রামে) ৮২৫ হিজরীতে পরলোক গমন করেন।

৩. মীর সালেহ নিশাপুরীর নাম প্রথম খণ্ডে ১২৫ নং মকতুবে উল্লেখ করা হয়েছে।

যায়, তাহলে তা-ই যথেষ্ট। আমি আর কী লিখবো। দরবেশের বিষয়ে (আমার ব্যাপারে) তাঁর দরবারে কিছু লেখা বড়ই বেয়াদবী এবং প্রাত্যহিক অবস্থার বিবরণও অধিক অশোভনীয়। মোটকথা আমি নিজেও আমার সীমানার মধ্যে থাকতে চাই। দোয়ার প্রত্যাশী। (হজরত খাজা র. এর মকতুব নং ৮৫)

১২. একদিন হজরত খাজা র. এর এক বিশেষ মুরিদ, যিনি সাইয়্যেদ বংশের ছিলেন, তিনি নিতান্তই বিনীতভাবে হজরত খাজা র. এর তাওয়াজ্জোহ্‌প্রার্থী হলেন। তিনি বললেন, ইনশাআল্লাহ্ হজরত মোজাদ্দেদ যখন সেরহিন্দ থেকে আগমন করবেন, তখন আমি তাঁর কাছে তোমার বিষয়টি নিবেদন করবো— যেনো তিনি তোমার কাজ এক সপ্তাহের মধ্যে পূর্ণ করে দেন এবং তোমাকে বেলায়েতের স্তরে পৌঁছে দেন। কিন্তু এমন কথা বলার পর ঘটনা এই হলো যে, হজরত খাজা র. এর সাথে আমাদের হজরত মোজাদ্দেদ র. এর সাক্ষাৎ হচ্ছিলো না। অবশেষে হজরত খাজা সাহেবের ইন্তেকালের পর হজরত মোজাদ্দেদ র. দিল্লীতে আগমন করেন, তখন তিনি তাঁকে হজরত খাজা র. এর কথাগুলো শোনালেন। হজরত মোজাদ্দেদ র. বললেন, যদি খাঁটি মনে পূর্ণ বিশ্বাসসহ অগ্রসর হও, তবে ইনশাআল্লাহ্ হজরত খাজা র. এর ইচ্ছা অনুযায়ী তোমার কাজ এক সপ্তাহের মধ্যে পূর্ণ করে দিবো। কিন্তু দুঃখের বিষয় পরে ওই ব্যক্তি আর আসেনি।

১৩. হজরত মোজাদ্দেদ র. পূর্ববর্তী মাশায়েখগণের মর্যাদা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে লেখনীর মাধ্যমেও প্রকাশ করতেন। তিনি তাঁর এক পত্রে উল্লেখ করেন, তাঁর নির্দেশনাজগতের সিংহাসন ছিলো সুবিস্তৃত ও জ্যোতির্ময়। তরিকতের খাজেগানদের সম্পর্কে তিনি গ্রন্থখানা [১] লিখেছেন। অতি উৎসাহীদের কাছে এর গ্রহণযোগ্যতা চোখের সুরমাসদৃশ। মহান আল্লাহ্‌র প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতা ও ইহসান এ গ্রন্থের উচ্চমর্যাদা ও সূক্ষ্মতার জন্য। কিন্তু আমার অভিপ্রায়, হজরত খাজা আহরার কুদ্দিসা সিররুহুর অবস্থা সম্পর্কে অনেক অনুসন্ধান করবো। সম্ভবত আরো অনেক তথ্য জানা যেতে পারে। আর এই উদ্দেশ্যে 'লতীফা গায়বিয়াহ' নামক গ্রন্থ (হজরতের লেখা) যখন অধ্যয়ন করলাম, তখন বুঝতে পারলাম, আত্মার জগতের সম্পর্ক হজরত খাজা র. এর সাথে। কিন্তু যখন প্রকাশ ঘটলো, তখন তাঁর স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার কারণে এই মর্মে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পতিত হলেন যে, এ

১. এই পুস্তকটির কথা হজরত মোজাদ্দেদ র. মকতুবাত (১ম খণ্ড মকতুব নং ৫) এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন, যতদূর সম্ভব এই গ্রন্থখানি 'মুকাশিফাতে আইনিয়াহ'র প্রথম পাঁচ মুকাশিফাতের অন্তর্ভুক্ত এবং কুতুবুল মুহাক্কিকিন নাসিরুদ্দিন খাজা উবায়দুল্লাহ আহরার র. এর মাকামাত সম্পর্কিত আলোচনার শুরুতে দুই মুকাশিফাতের মধ্যে পাওয়া যায়। ৮০৬ হিজরীতে তাসখন্দের নিকটে বাগেস্তানে তাঁর জন্ম হয়েছিলো এবং ৮৯৫ হিজরীতে সম্পন্ন হয় তাঁর পরলোকযাত্রা। তিনি মাওলানা ইয়াকুব চরখী র. এর মুরিদ ও খলিফা ছিলেন। আর তাঁর প্রসিদ্ধ খলিফা হলেন মাওলানা আবদুর রহমান জামী র.। তিনি পরলোকগমন করেন ৮০৮ হিজরীতে।

গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিতটি কার প্রতি ছিলো। খুব সম্ভব এ ইঙ্গিতটি হজরত খাজা আহরার র. এর প্রতিই ছিলো। যদি ইমামগণের স্তর বা শ্রেণীবিন্যাসের প্রতি লক্ষ্য করা হয়, তাহলে কিছু নতুন তথ্য প্রকাশ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আরেকটি কথা হচ্ছে, তাঁর বাণী থেকে স্বচ্ছতা ও পবিত্রতার অর্থ প্রকাশ পাচ্ছে। আর এ ধরনের কথা খাজাগণের বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনা থেকে প্রকাশিত হয়েছে যে, খাজা আহরার র. তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে 'নেহায়েতুল বেদায়েত' (শেষ থেকে শুরু) মাকামে (স্তরে) অবস্থিত। এটি কোনো বিস্ময়ের ব্যাপার নয় যে, নুকতাহ্ (স্বরচিহ্ন) বিশিষ্ট জ্ঞানের উপরে এবং ওয়াহদাতে উলইয়া (সর্বোচ্চ একক) এর নিচে (যা সাধারণ কবুলিয়াতের স্তর) তা তাঁর অর্জিত হয়েছিলো। সম্মানসূচক পোশাক এ মাকামেই রয়েছে বলে তিনি ভেবেছিলেন। আবার হজরত ওমর ফারুক রা. এর মাকামও তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন। বর্ণিত আছে, তিনি এই মাকামে প্রবেশ করেই 'নুজুল' (অবতরণ) সম্পন্ন করেন। অথবা অন্য কোনো পন্থায় তিনি এর নিকটবর্তী হয়ে যান।

তাঁর এ মাকামে স্থায়ী না থাকা স্বভাবগতভাবে কেন্দ্রের ঊর্ধ্বে থাকার কারণে হতে পারে। তিনি আল্লাহ্র অনুগ্রহ কামনা করে অতি উত্তমভাবে অনুসন্ধান করলেন। আমি এ বিষয়ে অবগত হওয়ার জন্য দীর্ঘ প্রতীক্ষায় ছিলাম। আর একটি বিষয় হচ্ছে, এই ফানায়ে বাশারিয়াত (মানবসুলভ ফানা) এর বিষয়ে তাওয়াজ্জোহ্ (মনোযোগ) দান করবেন, অথবা এ বিষয়টি স্পষ্ট করবেন যে, এই মাকাম ফানাফিল্লাহ্ থেকে পৃথক কোনো মাকাম, না এই মাকামে (ফানাফিল্লাহ্) প্রবেশ করার পরেই এর সীমানা শুরু। ওই সকল দল, যাঁরা ফানাফিল্লাহ্র ঊর্ধ্বস্ত রের সাথে সম্পৃক্ত, তাঁদের দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, তাঁরা এভাবেই নিরাপদ রয়েছেন এবং তাঁদের মধ্যে ফানা বাশারিয়াতের বিকাশের কোনো প্রয়োজন নেই। আর যাঁরা ওয়াহদাতের মাকামে (একত্বের স্তরে) পূর্ণনিমজ্জিত, তাঁরা যদিও স্থায়ী জয্বার পথে অথবা ভিন্নভাবে সেখানে পৌঁছেছেন, তবুও তাঁরা অজুদের (অস্তি ত্বের) দিকে প্রত্যাবর্তন থেকে মুক্ত। এর পর তাঁর এক দৃষ্টি জাবারুতের (আল্লাহ্র অবস্থা বা গুণের) প্রতি নিক্ষেপ করলেন, যা নবীগণের মাকাম। ওখানেও কোনো মাকাম এমন হবে, যা অনুরূপ প্রত্যাবর্তন থেকে মুক্ত। এভাবে তিনি ফানাফিল্লাহ্র মাকামেও দৃষ্টিনিক্ষেপ করলেন। এরকমও হওয়া সম্ভব যে, প্রকাশ্য রাস্তা ব্যতীত অন্য কোনো রাস্তা থাকাও সম্ভব। আর অন্যান্য হজরত ওই স্বতন্ত্র রাস্তা দিয়েই প্রবেশ করেছেন। এই অসহায়ের অবশিষ্ট অবস্থা সম্পর্কে আপনার খুব ভালোই জানা আছে। এ জন্য আর কী-ই বা আবদার করতে পারি। এরূপ অনেক অপরিচিত নিদর্শন এবং মাকাম আমার নিজেরই জানা নেই। তাই তার বিবরণ দিতে অক্ষম। ইনশাআল্লাহ্ আপনার ইচ্ছানুযায়ী আমি আবেদন করবো। মোহাম্মদ সাদেক ও সকল ভ্রাতা ও সম্মানিতদের প্রতি সালাম।

হজরত খাজা র. হজরত মোজাদ্দেদ র. এর চিঠির উত্তর দিতেন। অতি উচ্চাংগ ভাষায় তাঁর ভূয়সী প্রশংসাও করতেন। তাঁর বাতেনী অবস্থা ও কাশফের পরিশুদ্ধির জন্য সাহায্যও করতেন। এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন, আপনি আপনার কাশফের বিষয়ে যা কিছু বর্ণনা করেছেন, তার পদ্ধতিসমূহ নিতান্তই উপযোগী— বিশুদ্ধ, সঠিক ও উত্তম। কেনোনা কাশফ্ তো বিনা বাক্যে ও ভাষায় হয়ে থাকে। সকল কারণ বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। ইনশাআল্লাহ সাক্ষাতে প্রয়োজনীয় যা কিছু বলার তা বলা যাবে।

১৫. একবার হজরত মোজাদ্দেদ র. দিল্লীর ফিরোজাবাদ মসজিদের নিজস্ব প্রকোষ্ঠে জিকিরে লিপ্ত ছিলেন। হজরত খাজা র. নির্জনে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য দরজার কাছে উপস্থিত হলেন। তাঁর আগমনের সংবাদ খাদেম সাহেব জানাতে চাইলেন। কিন্তু হজরত খাজা সাহেব কঠোরভাবে নিষেধ করলেন। প্রকোষ্ঠের বাইরে দাঁড়ালেন। ভিতর হতে আওয়াজ এলো, বাইরে কে? হজরত খাজা বললেন, ফকির মোহাম্মদ বাকী। তিনি অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হয়ে দরজা খুললেন। বাহিরে এসে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে হজরত খাজার খেদমতে উপস্থিত হলেন।

১৬. হজরত খাজা সর্বদাই এ বিষয়ে কৃতজ্ঞ ছিলেন যে, আল্লাহ্পাক তাঁকে উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন মুরিদের কাছে পাঠিয়েছেন এবং তাঁর সাহচর্যের কারণে কামাল ও তাকমীল (পূর্ণতায় পরিপূর্ণ) পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন। তিনি কৃতজ্ঞতায় পঞ্চমুখ থাকতেন। আর এই নেয়ামতের কারণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য আত্মতৃপ্তিও বোধ করতেন। অতঃপর তাঁর উপস্থিতিতে নিজের মুরিদদের মজলিসকে প্রধান মজলিস বানিয়ে নিজেও ওই মজলিসের একটি কোণে অবস্থান নিতেন।

১৭. বর্ণিত আছে, একদা হজরত শাহ কামাল কায়থলী র. সেরহিন্দে শায়েখ আবুল আহাদ র. এর বাড়িতে উপস্থিত হলেন। হজরত মোজাদ্দেদ [১] র. তখন ছিলেন দুগ্ধপোষ্য শিশু। প্লীহা রোগে আক্রান্ত ছিলেন তিনি। এই রোগ শিশুদের জন্য মরণব্যাধি। দীর্ঘশ্বাস নিচ্ছেলেন এবং ছিলেন অচেতন অবস্থায়। দীর্ঘ সময় মাতৃদুগ্ধও পান করেননি। বাড়ির সকলে ছিলেন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। জীবনের আশা ত্যাগ করেছিলেন তাঁরা। এমন সময় হজরত শাহ্ কামাল কায়থলীর আগমনকে তাঁরা অতি মূল্যবান মনে করলেন। সংগে সংগে তাঁকে শিশু মোজাদ্দেদের খেদমতে উপস্থিত করানো হলো। শাহ্ সাহেব তাঁকে কোলে নিলেন। নিজের জবান মোবারক

১. সম্ভবত এ সময়কাল ৯৭৩ হিজরী হবে। কেনোনা হজরত মোজাদ্দেদ র. ৯৭১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শাহ্ কামাল কায়থলী র. ৯৮১ হিজরীতে পৃথিবী ছেড়ে চলে যান।

তাঁর মুখের মধ্যে রাখলেন। শিশু মোজাদ্দেদ তাঁর জিহ্বা চুষতে শুরু করলো। শাহ্ সাহেব বললেন, আপনারা এই পবিত্র শিশুর প্রতি লক্ষ্য রাখবেন। তিনি দীর্ঘায়ু হবেন। মহান আল্লাহ্ তাঁকে দিয়ে অনেক কাজ করাবেন। তিনি আমার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন হবেন। আমি তাঁকে আমার সন্তান হিসেবে গ্রহণ করলাম। পবিত্র শিশু অতি অল্প সময়ের মধ্যে পূর্ণ সুস্থ হলে গেলো।

১৮. যৌবনকালে একবার তিনি কঠিন রোগে আক্রান্ত হলেন। দুর্বলতা তাঁকে এমনভাবে গ্রাস করলো যে, সকলে তাঁর জীবনের ব্যাপারে হতাশ হয়ে গেলেন। তাঁর পুণ্যবতী ও ইবাদতকারিনী স্ত্রী ওজু করে দু'রাকাত নামাজ আদায় করে তাঁর রোগমুক্তির জন্য মহান আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনা করলেন। ইতোমধ্যে তন্দ্রা এসে গেলো। তিনি স্বপ্নে দেখলেন, কে যেনো বলছেন, তাঁর প্রতি গভীর মহব্বত রাখো। আমি তাঁর দ্বারা অনেক বড় বড় কাজ করাতে চাই। তাঁর হাজারো কাজের মধ্যে আমি এখনো একটি কাজও তাঁর দ্বারা করাইনি। এরপর মহান আল্লাহ্ তাঁকে দ্রুত আরোগ্য দান করলেন ও তাঁকে নৈকট্যের স্তরে পৌঁছে দিলেন।

১৯. হজরত মোজাদ্দেদ র. এর স্ত্রী— যখন তাঁর বিবাহের জন্য বিভিন্ন স্থান থেকে নতুন নতুন প্রস্তাব আসতে লাগলো, তখন তিনি তাঁর বুজর্গ পিতা আলহাজ্ব শায়েখ সুলতান আহমদকে স্বপ্নে দেখলেন। পরলোকগত পিতা তাঁকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, আমি রসুলুল্লাহর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। তিনি স. একটি কাগজে বিশেষভাবে সীল লাগিয়ে লিখলেন, আমার খাস সাহাবা চারজন এবং পঞ্চম জন হচ্ছে শায়েখ আহমদ। স্বপ্নের মধ্যেই আমার চাচা শায়েখ জাকারিয়া এই ঘটনাকে অস্বীকার করলেন। আমার পিতা বললেন, এ রকম কোরো না। কেনোনা আমি এখনই রসুলুল্লাহর দরবারে উপস্থিত হয়ে ঘটনাটি নিজ চোখে দেখেছি। এতে দ্বিধা-সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই। জাগ্রত হওয়ার পর এই ঘটনার জন্য আমি চিন্তিত হলাম। অবশেষে আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে রসুলুল্লাহ স. এর শ্রেষ্ঠ সাহাবীদের পূর্ণ অনুসরণের বিনিময়ে এই মর্যাদায় পৌঁছে দিলেন। যে ব্যক্তি তাঁকে দেখতেন, তিনি বলতেন, আপনার তরিকা শ্রেষ্ঠ সাহাবীগণের তরিকা।

২০. হজরত শাহ কামাল কায়থলী কুদ্দিসা সিররুহ ৯৮১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। ইন্তেকালের পূর্বে এক বছর কাল ব্যবহৃত একটি জুব্বা তাঁর পুত্র শাহ আহমদ র. জীবিত থাকা সত্ত্বেও তাঁর পৌত্র শাহ্ সেকেন্দার বিন আহমদকে দিলেন। বললেন, এটি তোমার কাছে আমানত রাখলাম। আমি যে বুজর্গের কথা বলবো, তুমি সেই বুজর্গের কাছে এটি পৌঁছে দিয়ো। ইন্তেকালের পরে তিনি স্বপ্নে দেখা দিয়ে হজরত মোজাদ্দেদ র. এর নাম উল্লেখ করলেন। হজরত শাহ্ সেকেন্দার (ইন্তেকাল ১০২৩ হিজরী) কে বললেন, জুব্বাটি আমার মহান রূহানী সন্তান শায়েখ আহমদ সেরহিন্দীকে দিয়ে দাও। শাহ্ সেকেন্দার র. ভাবলেন, ঘরের নেয়ামত বাইরে কেনো দিবো? হজরত শাহ কামাল র. পুনরায় নির্দেশ

দিলেন, কিন্তু শাহ্ সেকেন্দার এবারও গুরুত্ব দিলেন না। হজরত শাহ্ কামাল র. তৃতীয়বার খুবই রাগান্বিত হলেন। অবশেষে তিনি বাধ্য হয়ে এই জুব্বা কায়থল থেকে সেরহিন্দে হজরত মোজাদ্দেদ র. এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ওই জুব্বা পরিধান করার পর হজরত মোজাদ্দেদ র. কী কী দৃশ্য দেখলেন, তার বিবরণ পরবর্তীতে উল্লেখ করা হবে ইনশাআল্লাহ্ তায়ালা।

২১. হজরত খাজা র. এর মহাতিরোধানের পর শোকাভিভূত হজরত মোজাদ্দেদ র. দিল্লী আগমন করলেন। তখন খাজা সাহেবের মুরিদগণ পূর্বের মতোই তাঁকে স্বাগতম জানালেন। তাঁর জিকিরের মজলিসে সকলে উপস্থিত হলেন। তিনিও মুরিদদের রূহানী খেদমত করলেন। অনেকে নতুন করে বায়াত হলেন। কিন্তু শয়তান ফেত্নার অবতারণা করলো। দুর্বল বিশ্বাসীরা ফেত্নায় পতিত হলো। তারা হজরত মোজাদ্দেদ র. এর প্রতি বিরূপ ধারণা পোষণ করতে লাগলো। তারা তাঁর পাশ থেকে দূরে সরে যেতে লাগলো। হজরত মোজাদ্দেদ র. মাতৃভূমি অভিমুখী হলেন। শায়েখ তাজ বিশেষভাবে তাঁর প্রতি মনোযোগী ছিলেন, কিন্তু তিনিও এক সময় ছিদ্র অন্বেষণকারী লোকদের প্ররোচনায় প্রভাবান্বিত হয়ে গেলেন। পরে অনুতপ্ত হন। তাঁর নিজের এলাকা সাম্বল থেকে একটি চিঠি হজরত খাজা র. এর শ্যালক মাওলানা মোহাম্মদ কলীজের [১] কাছে লিখলেন, আপনি জনাবের (হজরত মোজাদ্দেদের) খেদমতে চিঠি লিখেছেন। ওই চিঠিতে এই ফকিরের জন্য দোয়া কামনা করে লিখেছেন এভাবে—

আপনি যেমন আমাকে স্বপ্নের মধ্যে ক্ষমা করেছেন, অনুরূপভাবে আমাকে আপনি বাস্তবতার দিক থেকেও যথার্থ ক্ষমা করুন। এবার দিল্লীর বন্ধুদেরকে বলে দিন, যারা হজরত মোজাদ্দেদের প্রতি বিশ্বাস রাখতো এবং এখন যাদের বিশ্বাসে পরিবর্তন এসেছে, তারা তরিকা থেকে বিচ্যুত। কেনোনা কামেল ওলীদের অস্বীকার করাই সত্যপথবিচ্যুত হওয়া। এ দু'দিনের জীবন তো চলেই যাচ্ছে। কিন্তু যে ব্যক্তি অস্বীকৃতির উপরে থাকবে, মৃত্যুর পূর্বে তার ইমান নষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং আমরা সকলে পরস্পরে পীর ভাই। এ জন্য এ বিষয়ে আমি আপনাকে জানালাম।

এর কিছু দিন পর শায়েখ তাজ দিল্লীতে আগমন করলেন এবং হাজী সালেহের হুজরায় অবস্থান করলেন। ভ্রাতা মোল্লা হাসান, জাফর বেগ নেহানী এবং খাজা মোহাম্মদ সিদ্দীক তাঁর দরবারে উপস্থিত হলেন। জাফর বেগ [২] ও মোল্লা হাসান

১। মকতুবাত প্রথম খণ্ড ২৪, ৭৬, ১৪১। ১০২৩ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

২। মকতুবাত প্রথম খণ্ড ১৩৯। তিনি মির্জা বদীউজ্জামানের সন্তান ছিলেন। তিনি ৯৮৫ হিজরী ইরাক থেকে হিন্দুস্তানে এসেছিলেন। বাদশাহ্ আকবর তাঁকে দু' হাজার মুদ্রা সম্মানি দিলেন। তাঁকে আসিফ খান উপাধি দিলেন। জাহাঙ্গীর পাঁচ হাজার মুদ্রা সম্মানী দিলেন। ১০২১ হিজরীতে বালাকোটে তিনি ইন্তেকাল করেন। (মাআছারুল আমরাআ ১১৬/১)

বললেন, এ বিষয়ের উপর একটি চিঠি আমাদের কাছে এসেছে। হতে পারে এ চিঠিটি আপনার পক্ষ থেকে কেউ তৈরী করেছে অথবা প্রকৃতপক্ষে এটি আপনার চিঠি। শায়েখ তাজ বললেন চিঠিটি আমারই।

প্রকৃত সত্য এই ছিলো যে, হজরত মোজাদ্দেদ র. এর প্রতি বিশ্বাসে আমার যৎসামান্য পরিবর্তন এসেছিলো। কিন্তু যখন তাঁর হাতে আমি পরাজয় বরণ করে নিলাম, তখন তাঁর প্রতি আমার পূর্ণ বিশ্বাস এসে গেলো। কিন্তু যখন আমি দিল্লী থেকে হজরতের হালের প্রতি খেয়াল করলাম, তখন তাঁর মধ্যে হেদায়েতের নিদর্শন দেখতে পেলাম না। আমার উদ্দেশ্য পূর্ণ হলো না। এক রাতে মহান প্রভুপালকের দরবারে খুব বিনীতভাবে প্রার্থনা করলাম। স্বপ্নে দৃশ্যমান হলো, এক বড় মজলিস চলছে। সকল বড় বড় আউলিয়া সেখানে সমবেত হয়েছেন। আমি ওই মহফিলের এক কোণে অবস্থান নিলাম। আউলিয়াদের একজন আমাকে বললেন, তুমি বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ বুজর্গকে অস্বীকার করেছো। কিন্তু তুমি জানো না, এই কামেল বুজর্গের দরবারে বে-আদবী করা এবং তাঁকে উপেক্ষা করা ধ্বংসের কারণ। ইমান নষ্ট হয়ে যাওয়ারও কারণ। অনুতপ্ত হও। লজ্জিত হও। যখন ওই বুজর্গ চুপ করলেন, তখন আরেক বুজর্গ আমাকে উদ্দেশ্য করে তিরস্কার করলেন। মোটকথা ওই অনুষ্ঠানের সকল বুজর্গ এক এক করে আমাকে ভর্ৎসনা করলেন। আমি খুবই চিন্তান্বিত হলাম। মনে মনে বললাম, হে আল্লাহ্! শ্রেষ্ঠ আউলিয়াদের মধ্যে এমন কে ছিলেন, যাঁর প্রতি আমি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছি। ফলে তিরস্কারের পাত্রে পরিণত হয়েছি। এমন সময় আমি দেখলাম, ওই অনুষ্ঠানের মধ্যমণি হজরত শায়েখ আহমদ। তিনি চুপচাপ বসে আছেন। সকল বুজর্গের খেয়াল তাঁর দিকে। তিনিই এই মহামর্যাদাপূর্ণ সমাবেশের সর্দার। এবার আমি বুঝলাম, প্রকৃত অবস্থা কী। এরপর আমি আমার স্থান ত্যাগ করে দ্রুত তাঁর কাছে গেলাম। নিজেকে তাঁর কদমে সমর্পণ করলাম। হজরত মোজাদ্দেদ র. দাঁড়ালেন। পরম মমতায় আমাকে বুকে টেনে নিলেন। আমি বললাম, ভ্রান্ত-ধারণাকারীদের সঙ্গে ছিলাম। তাই আপনার সম্পর্কে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছিলো। আশা করি আমাকে ক্ষমা করবেন। তিনি বললেন, তুমি বন্ধুদের সাথে সম্পৃক্ত— এরূপ তিনবার বললেন। পুনরায় আমি বিনীতভাবে বললাম, মানবস্বভাবসুলভ ভুল হয়ে গিয়েছে। হজরত বললেন, ঠিক আছে । আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। যখন আমার স্বপ্নভঙ্গ হলো, তখন আমি তওবা করলাম এবং বহু অনুতাপ করলাম। কবুলিয়াতের (গ্রহণযোগ্যতার) নিদর্শন ফুটে উঠলো ও হেদায়েত নসীব হলো। আমি আমার বন্ধু ও পীর ভাইদের কাছে লিখলাম, দু'দিনের জীবন। সময় বয়ে চলেছে। তওবা করা প্রয়োজন। কিন্তু যে ব্যক্তি হজরত মোজাদ্দেদ র. এর প্রতি অবাধ্য হয়ে থাকলো, ফিরে এলো না, শেষ সময়ে তার ইমান ধ্বংস হয়ে যাবে। যখন হজরত মোজাদ্দেদ হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ্র উরস মোবারকে

উপস্থিত হলেন, তখন হজরত খাজা সাহেবের বিশিষ্ট খলিফা ও হিন্দুস্তানের প্রসিদ্ধ বুজর্গ শায়েখ তাজও দিল্লীতে আগমন করলেন। তিনি সবাইকে নিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন। ইতোপূর্বে তিনি হজরতের খেদমতে ফিরোজাবাদের বন্ধুদের অপরাধমার্জনার জন্য সুপারিশ করে চিঠি লিখেছিলেন। ওই চিঠির মধ্যে এই ঘটনাটির উল্লেখ ছিলো— এক বুজর্গ এক মসজিদে মোরাকাবারত অবস্থায় ছিলেন। এক সওদাগর নামাজের জন্য এলো। ইত্যবসরে তার কোমরে বাঁধা টাকার থলিটি সে আর খুঁজে পেলো না। থলিতে ছিলো পাঁচ হাজার মুদ্রা। তার ধারণা হলো, মসজিদের কোণে মোরাকাবারত বুজর্গটি তার থলিটি উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছে। সে তার লোকদেরকে একথা জানালো। তারা তাঁকে শাস্তিও দিলো। বাধ্য হয়ে তিনি ওই পরিমাণ মুদ্রা প্রদানের অঙ্গীকার করলেন। ওই বুজর্গ ব্যক্তির অনেক মুরিদ ছিলো। সকলে মিলে পাঁচ হাজার মুদ্রা একত্রিত করে সওদাগরকে দিয়ে দিলো। সওদাগর তার দলের লোকদেরকে নিয়ে অন্যত্র গমন করলো। আবারও তার থলিটি হারিয়ে গেলো। সে তখন ওই ধৈর্যশীল বুজর্গের প্রতি যে অত্যাচার করা হয়েছে, তার জন্য অনুতপ্ত হলো। তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে নিতান্ত বিনয়ের সাথে ক্ষমাপ্রার্থনা করলো। বুজর্গ বললেন, পেরেশান হওয়ার কোনো কারণ তো নেই। আমি তো ওই দিনই, যেদিন তুমি আমার প্রতি অহেতুক অত্যাচার করেছিলে—এই মর্মে অঙ্গীকার করে নিয়েছি যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমাকে জান্নাতে নিতে না পারবো, ততক্ষণ জান্নাতে যাবো না।

এ সকল ঘটনার মূল বক্তব্য হচ্ছে, হজরত মোজাদ্দেদ র. ওই বিদ্বেষী দলকে যেনো ক্ষমা করে দেন। তাদেরকে তিরস্কারমুক্ত করেন। হজরত মোজাদ্দে র. তাই করেন। প্রথমে শায়েখ তাজের সুপারিশসম্বলিত চিঠির কারণে এবং পরবর্তীতে প্রকাশ্যে তাঁর সকল পীর ভাইকে ক্ষমা করে দেন।

২২. এটা ওই সময়ের ঘটনা, যখন হজরত খাজা র. ইন্তেকাল করেছেন। হজরত মোজাদ্দেদ র. দিল্লী আগমন করলেন। হজরত খাজা সাহেব র. এর মুরিদগণ তাঁর কাছে নতুন করে বায়াত গ্রহণ করলেন। তখন খাজা হুসামুদ্দীন র. স্বপ্নে দেখলেন, স্বয়ং রসুলুল্লাহ স. মিম্বরে উপবেশন করলেন এবং হজরত মোজাদ্দেদের ভূয়সী প্রশংসা করে বক্তৃতা দিলেন। তাঁর বিশুদ্ধ সাধনা ও সাহসী বক্তব্যের কথা বললেন। তাঁর জন্য গর্ব-গৌরব প্রকাশ করলেন। আরো বললেন, আমি এ বিষয়ে গর্বিত যে, আমার উম্মতের মধ্যে শায়েখ আহমদের মতো ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটেছে। তাঁকে বানানো হয়েছে আমার এই সুদৃঢ় দ্বীনের সংস্কারক।

২৩. আর একবার খাজা হুসামুদ্দীন স্বপ্নে দেখলেন, তাঁকে লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে, ফিরোজাবাদবাসী মুরিদগণের উপর মুসিবত অবতীর্ণ হতে যাচ্ছে। কিন্তু যে

ব্যক্তি ওজুর পানি পান করবে, সে এই মুসিবত থেকে মুক্তি পাবে (প্রথম খণ্ড ২৯ নং মকতুবে এই ঘটনার উল্লেখ রয়েছে)।

খাজা হুসামুদ্দিন ঘটনাটি হজরত মোজাদ্দেদের কাছে বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন, ওজুর ব্যবহৃত পানি পান করা মাকরুহ। ফিকাহ শাস্ত্র অনুসন্ধান করে এতোটুকু ইতিবাচক দিক পাওয়া গেছে যে, চতুর্থ বার অঙ্গসমূহ নৈকট্যের নিয়ত ব্যতীত ধৌত করলে তা ব্যবহৃত পানির অন্তর্ভুক্ত হবে না এবং তা পান করাও মাকরুহ নয়। সুতরাং হজরত মোজাদ্দেদ র. এর চতুর্থ বারের অতিরিক্ত পানি খাজা হুসামুদ্দিন এবং তাঁর মুরিদগণ পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে পান করলেন। এর বরকতে সকলেই মুসিবত থেকে মুক্তি পেলেন।

২৪. হজরত মোজাদ্দেদ র. এর এক মুখলিছ মুরিদ, যিনি নেককার ছিলেন এবং কোরআনের হাফেজও ছিলেন, তিনি একদিন এই ফকিরকে বললেন, একবার রমজান মাসের শেষ দশকে তিনি অসুস্থ ছিলেন। ওই সময় তিনি স্বপ্নে দেখলেন, লোকেরা দলে দলে চতুর্দিক থেকে দৌড়ে আসছে। আমি এর কারণ জিজ্ঞেস করলাম। উত্তর পেলাম, যুগের কুতুবুল আকতাব অর্থাৎ শায়েখ আহমদ অসুস্থ। তাঁকে পাক্কে কিল্লার জামে মসজিদে আনা হয়েছে। সেখানে তাঁর চিকিৎসার জন্য আমীরুল মুমিনীন হজরত ওসমান রা. উপস্থিত হয়েছেন। লোকেরা তাঁকে দেখার জন্য দৌড়ে আসছে। আমিও দৌড় শুরু করলাম। হজরত আমিরুল মুমিনীনকে দর্শনের তীব্র বাসনা আমার মধ্যেও সৃষ্টি হলো। মহান আল্লাহ্ সত্য খলিফাকে তাঁর চিকিৎসার জন্য জীবিত করে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। তাঁর দর্শন নিঃসন্দেহে গনিমত। দেখলাম, ওই কিল্লা (দূর্গ) সম্পূর্ণ লাল রঙের পাথর দ্বারা নির্মিত এবং খুবই উঁচু ও মজবুত। মানুষ যেভাবে পাহাড়ে ওঠে, সেভাবে লোকেরা কিল্লায় আরোহণ করছিলো। যখন আমি ওই কিল্লার দরজার সামনে পৌঁছলাম, তখন লোকজনের শোরগোল, চিৎকার সকল দিক থেকে দৌড়ে আসা, চলে যাওয়া সবই কম হয়ে গেলো। লোকেরা দুই সারিতে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলো। কিছুক্ষণ পরে শহরে সংবাদটি ছড়িয়ে পড়লো যে, হজরত আমীরুল মুমিনীন ওসমান রা. জনাব শায়েখ আহমদের চিকিৎসা শেষে ফিরে যাচ্ছেন। ইত্যবসরে তিন অশ্বারোহীকে দেখা গেলো। আমীরুল মুমিনীন হজরত ওসমান একটু সামনে। আর দুই অশ্বারোহী তাঁর পিছনে। আমিও সারিবদ্ধ হয়ে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে গেলাম। যখন আমিরুল মুমিনীন আমার সামনে দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন তাঁর হাঁটুতে হাত রেখে চুম্বন করলাম। আমার মধ্যে বিশেষ মহব্বত ও আকর্ষণ সৃষ্টি হলো। হজরত আমিরুল মুমিনীন আমাকে বললেন, আমাকে স্মরণ করলে আমি তোমার কাছে উপস্থিত হবো। ইত্যবসরে আমার চক্ষু খুলে গেলো। আমি দেখলাম, আমার চক্ষু থেকে ঝর্ণাধারার মতো অশ্রু পতিত হচ্ছে।

২৫. হজরত খাজা র. এর ইন্তেকালের পর তাঁর কিছুসংখ্যক মুরিদ হজরত মোজাদ্দেদ র. এর প্রতি অনীহা প্রকাশ করেছিলো। তিনি তাদের সন্দেহ ও অনীহা দূর করার জন্য তাদেরকে হৃদয়গ্রাহী উপদেশ দিয়েছিলেন। সে উপদেশ বিফলে যায়। তাদের মধ্য থেকে কারো কারো বাতেনী সম্পর্ক ছিনিয়ে নেওয়া হলো। তার পরেও তারা ক্ষান্ত হলো না। বরং তারা হজরত খাজা সাহেবের মাজারে উপস্থিত হয়ে ফরিয়াদ করতে লাগলো। তাদের মধ্যে একজন কাশফধারী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি দেখলেন, প্রত্যেকে এক একটি বাতি জ্বালিয়েছে। ইতোমধ্যে হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকে উঠলো। বাতিগুলো নিভে গেলো। বাতিগুলোর প্রকৃত অবস্থা কী, তাও বুঝা গেলো। অর্থাৎ বাতিগুলো ছিলো ফিরোজাবাদবাসীদের তাওয়াজ্জোহ্ এবং চমকিত বিদ্যুৎ ছিলো হজরত মোজাদ্দেদ র. এর তাওয়াজ্জোহ্। লোকগুলো তাঁর উচ্চ মর্যাদা ও সম্মান অবগত হওয়ার পরেও হজরতের কাছে ফিরে এলো না। কিছুকাল পর হজরত মোজাদ্দেদ র. শায়েখ তাজের সুপারিশের কারণে তাদেরকে অভিসম্পাত করা থেকে বিরত থাকলেন এবং স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে মাফ করে দিলেন। তারপর তো তাদের মধ্যে খুবই এখলাছ (একনিষ্ঠতা) সৃষ্টি হলো। লোকেরা নিতান্তই বিনয়ের সাথে তাঁর খেদমতে উপস্থিত হতে থাকলো এবং তাঁর সাহচর্য লাভ করে তরিকতের মহফিলে পূর্ণ আদব ও সম্মান প্রদর্শনসহ অংশগ্রহণ করতে লাগলো। ফয়েজ ও বরকত লাভে ধন্য হলো এবং তাঁর অবস্থান ও অভ্যর্থনার ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ খাদেম হয়ে গেলো। তিনি আল্লাহ্র ইচ্ছায় প্রত্যেক বছর উরস মোবারকের সময় দিল্লী আগমন করতেন। (হজরত মোজাদ্দেদ র. এর প্রত্যেক বছর উরছ মোবারকের সময় উপস্থিত হওয়ার বিষয়টি ইতিহাস থেকে প্রমাণিত হয় না)।

২৬. এক পুণ্যবতী বোন, যিনি অধিক ইবাদাতকারিনী এবং সত্যের সাধক ছিলেন, যিনি অনেক বুজর্গের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং প্রত্যেকের থেকে নিজের প্রাপ্য অংশ বুঝে নিয়েছেন, তিনি বর্ণনা করেন, আমি একবার আকবারাবাদে ছিলাম। সেখানকার কিছুসংখ্যক মহিলা আমাকে বললেন, ফতেহপুর সিক্রীতে একজন কাশফ ও কারামতসম্পন্ন বুজর্গ এসেছেন। কখনো তিনি প্রকাশ্যে আসেন, আবার কখনো উধাও হয়ে যান। দীর্ঘ দিন পর তিনি এখন পুনরায় প্রকাশ্যে এসেছেন। আমি চিন্তা করলাম, ওই বুজর্গের কাছে গিয়ে আমার সত্যানুসন্ধানের তৃষ্ণা নিবৃত্ত করার আবেদন জানাবো। আমার বিশ্বাস, আমার অদৃষ্টে যা আছে তা আমি পাবো। কিছুসংখ্যক বিত্তবতীও আমার সাথী হলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিলো দোয়া প্রার্থনা। সন্ধ্যায় আমরা এক বাগানে উপস্থিত হলাম। বুজর্গ মহোদয় ওই বাগানেই অবস্থান করছিলেন। আমরা এক ব্যক্তির মাধ্যমে

সাক্ষাতের অনুমতি চাইলাম। তিনি অনুমতি দিলেন। আমি সাথীদের বললাম, তোমাদের বয়স কম। সাবধান! তোমাদের দ্বারা যেনো অশোভন কোনো আচরণ প্রকাশ না পায়। এমন যেনো না হয় যে, ওই বুজর্গের পোশাক দেখে তোমরা হেসে ফেললে। এরকম করলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবো। কাছে গিয়ে দেখলাম, তিনি কালো পোশাক পরিহিত। সাথে দুই তিন জন খাদেম রয়েছেন। আমরা সালাম দিয়ে একটু দূরে বসলাম। আমি আরো একটু দূরে সরে বসলাম। উদ্দেশ্য, কোনো কারণে তিনি যদি অতুষ্ট হন, তবে তার প্রভাব যেনো আমার উপরে না পড়ে। অল্পক্ষণ পরেই মহিলারা তাঁর কালো পোশাকের দিকে ইশারা-ইঙ্গিত করলো। নীরবে হাসাহাসি করলো। তিনি নাখোশ হয়ে বললেন, ফকিরের দরবারে তোমরা তামাশা করার জন্য এসেছো? সবাই আশ্চর্য হয়ে গেলো। ইঙ্গিত খুব আস্তেই করা হয়েছিলো। রাত্রি বেলা। আলো ছিলো অপ্রতুল। তথাপিও তিনি বুঝে ফেললেন। অবশ্যই তিনি কাশফের মাধ্যমে বিষয়টি অবগত হয়েছিলেন। কেনোনা প্রকাশ্য দৃষ্টিতে বোঝার কোনো উপায় ছিলো না। বুজর্গের কথা শুনে মহিলারা ভীতসন্ত্রস্ত হলো। বুজর্গ মহোদয় কিছুক্ষণ নিশ্চুপ রইলেন। আমি আল্লাহ্প্রাপ্তির বাসনা প্রকাশ করলাম। তিনি বললেন, প্রত্যেক যুগে একজন কুতুব থাকেন। এ যুগের কুতুব হজরত মিয়া শায়েখ আহমদ। যখন তোমরা তাঁর খেদমতে উপস্থিত হয়ে মহব্বতের সমুদ্র থেকে পরিতৃপ্ত হতে পারোনি, তখন আমার মতো ক্ষুদ্র ঝর্ণা থেকে কীভাবে পরিতৃপ্ত হতে পারবে? আমি আমার স্বল্প অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও বলছি, নিঃসন্দেহে তিনি একজন বুজর্গ ব্যক্তি। তাঁর প্রশংসা আমিও শুনেছি। যদি আল্লাহ্ সুযোগ দেন, তাহলে আমিও তাঁর দর্শন লাভে ধন্য হবো। কিন্তু আপনি তো তাঁর খেদমতে হাজির হয়েছিলেন। তবুও এখানে এসে প্রার্থী হয়েছেন কেনো? মহিলা বললেন, আপনি কীভাবে জানলেন? তিনি বললেন, তোমরা অমুক স্থানে একদিন দুপুরে তাঁর খেদমতে গিয়েছিলে। সেখানে এ ধরনের কথাবার্তা হয়েছিলো। তিনি হুবহু সকল ঘটনা বর্ণনা করলেন। অথচ সে সময় আমি হজরত মোজাদ্দেদ র. এর সাথে কিছু বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম এবং কিছু উত্তরও পেয়েছিলাম। তখন সেখানে অন্য কোনো ব্যক্তি উপস্থিত ছিলো না। বাধ্য হয়ে আমি অকপটে স্বীকার করে নিলাম যে, অবশ্যই আমি তাঁর দরবারে হাজির হয়েছিলাম। কিন্তু এখন আমি আপনার কাছ থেকে কিছু পেতে চাই। তিনি বললেন, আমি নিজেও তাঁর কাছ থেকে ফয়েজ পেতে চাই। আমি একবারই ওই অত্যুত্তম দরবারে হাজির হয়েছিলাম। পুনরায় তাঁর খেদমতে উপস্থিত হবো ইনশাআল্লাহ্। যে ব্যক্তি তাঁর দর্শন লাভ করেছে, তার জন্য দোজখের আগুন হারাম (অন্য পুণ্যবতীগণও হুবহু আমাকে এ ঘটনাটি সম্পর্কে বলেছেন)।

২৭. খাজা মোহাম্মদ আশরাফ কাবুলী [১] হজরত মোজাদ্দেদ র. এর বিশেষ অনুসারীর মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তাঁর যুগে তিনি একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বর্ণনা করেছেন, প্রথমে আমি হজরত মোজাদ্দেদ র. এর খেদমতে উপস্থিত হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলাম। ইস্তেখারা করলাম। দেখলাম, এক বিস্তির্ণ সমতল মরুভূমি। একদল লোক এক বুজর্গের দর্শনের জন্য দ্রুত ছুটে যাচ্ছে। আমি পূর্ণ আগ্রহ নিয়ে ওই দলের দিকে অগ্রসর হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কোন্ বুজর্গের দর্শনের জন্য যাচ্ছেন? একজন বললেন, হে অজ্ঞ ব্যক্তি! এখানে হজরত রসুলুল্লাহ্ স. আগমন করবেন। এ শুভ সংবাদ শুনে আমার আগ্রহ আরো বেড়ে গেলো। আমি নিজেকে ওই দলের অন্তর্ভুক্ত করলাম। দেখলাম, লোকেরা সবাই বৃত্তাকারে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে। একটি বৃত্ত পূর্ণ হয়ে গেলো। শুরু হলো দ্বিতীয় বৃত্ত। আমি খুব চেষ্টা করে দ্বিতীয় বৃত্তে পৌঁছলাম। ইতোমধ্যে লোকজনেরও ভীড় অনেক বেড়ে গেলো। এমন কি তৃতীয় বৃত্তও পূর্ণ হয়ে গেলো। এমন সময় আমার খেয়াল হলো, বিষয়টি আরো ভালো করে যাচাই করা দরকার। আমি লোকদের কাছে পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, যাঁর জন্য আপনারা এতো ছোটাছুটি করছেন, তিনি কে? তারা বললো, তুমি এখনো জানো না, তিনি রসুলুল্লাহ স.। আমার আকর্ষণ আরো বেড়ে গেলো। আমি খাটো হওয়ার কারণে খুব কষ্ট করে নিজের পায়ের অগ্রভাগের উপর ভর করে দাঁড়ালাম। দেখলাম, তিনি হজরত মোজাদ্দেদ র.। আমি বললাম, ইনি তো হজরত মোজাদ্দেদ অথচ আপনারা বলছেন, তিনি রসুলুল্লাহ্। তারা সমস্বরে বললো না, না। ইনি হজরত রসুলুল্লাহ্। এরপর আমার চক্ষু খুলে গেলো। আমার উপর এমন অবস্থা সৃষ্টি হলো যে, আমি অচেতন হয়ে গেলাম। চেতনা ফিরে এলে দেখলাম, আমার অন্তর্জগত রোরুদ্যমান। এই ঘটনার পর আমি হজরত মোজাদ্দেদ র. এর দরবারে পূর্ণ অনুসারী হওয়ার মানসে উপস্থিত হলাম।

২৮. বলখ নগরীর এক দরবেশ বর্ণনা করেছেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, এক বৃহৎ মর্যাদাপূর্ণ জানাযা আনা হলো। একটি বড় দল এবং লোকে লোকারণ্য পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল আউলিয়া কেরাম, বিশেষ করে মাওরাউন্নাহারের বিশিষ্ট বুজর্গবৃন্দ যেমন— কুতুবে রব্বানী আবদুল খালেক গজদাওয়ানী, গাওছুল আবরার খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দ এবং কুদ্ওয়াতুল আহরার খাজা উবায়দুল্লাহ আহরার এবং তাঁদের সমপর্যায়ভূত এবং সমকক্ষগণ জানাযায় অংশগ্রহণের জন্য উপস্থিত হলেন। জানাযা প্রস্তুত। সকলে যেনো কোনো বুজর্গের প্রতীক্ষায় রয়েছেন। সকলে রাস্তার দিকে তাকাচ্ছেন। তাঁদের একজনকে আমি জিজ্ঞেস

১। তাঁর নামে হজরত মোজাদ্দেদ র. দশটি চিঠি লিখেছেন। প্রথম খণ্ডে ১৩১, ১৪৭, ১৭৪, ১৮৭, ২০৫, ২২২, ২৩৫, ২৫১। দ্বিতীয় খণ্ডে ৩০ নং এবং তৃতীয় খণ্ডে ১০৭ নং মকতুব।

করলাম, কার জানাযা? আর আপনারা অপেক্ষা করছেন কার জন্য? একজন উত্তর দিলেন, জানাযা এ যুগের কুতুবের। সবাই কুতুবুল আকতাবের জন্য অপেক্ষমাণ। তিনি এই জানাযার নামাজের ইমাম হবেন। ইতোমধ্যে দীর্ঘদেহী ও গৌরবর্ণের, ডাগর চক্ষু, প্রশস্ত ললাট, উন্নত নাসিকা ও ঘন শ্মশ্রুবিশিষ্ট এক ব্যক্তি উপস্থিত হলেন। তাঁর মধ্যে ছিলো হজরত ইউসুফ আ. এর সৌন্দর্য (সাবাহাত) এবং হজরত মোহাম্মদ স. এর রূপলাবণ্য (মালাহাত)। ললাটে প্রজ্জ্বলিত ছিলো বেলায়েতের নূর। সৌন্দর্য, মাহাত্ম্য, মহিমা ছিলো তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদে। সকল আওলিয়া তাঁকে সম্মান জানালেন। তিনি সকলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। ইমামতি করলেন। যখন খাটিয়া ওঠানো হলো, তখন আমি এক ব্যক্তির কাছে জিজ্ঞেস করলাম, এই বুজর্গের নাম কী? তাঁর ঠিকানা কোথায়? তিনি জবাব দিলেন, তাঁর নাম মিয়া শায়েখ আহমদ। তিনি সেরহিন্দে বাস করেন। যখন আমার স্বপ্নভঙ্গ হলো, তখন ওই বুজর্গের সাক্ষাতের জন্য অস্থির হয়ে গেলাম। প্রত্যুষে বলখনগরী থেকে সেরহিন্দের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। সময় মতো কুতুবুল আকতাবের দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁর সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হলাম। স্বপ্নে দেখা চেহারার সঙ্গে বাস্তব চেহারা হুবহু মিলে গেলো। আমি তাঁর আরশতুল্য দরবারের অনুকম্পা শক্তভাবে আঁকড়ে ধরলাম। দীর্ঘকাল ধরে তাঁর ফেরেশতাতুল্য খানকায় অবস্থান করেছি। চতুর্দিক পরিভ্রমণ করেছি এবং যা দেখার ছিলো তা দেখেছি।

২৯. এক দরবেশের চেহারায় ছিলো অস্তিত্বহীনতা (নিস্তি) ও আত্মহারা (মাস্তি) ভাবের স্পষ্ট নিদর্শন। তিনি তাঁর (হজরত মোজাদ্দেদ র. এর) অনুসরণের কারণস্বরূপ বর্ণনা করেছেন, এক রাতে আমি তাহাজ্জুদ নামাজের পর হজরত সদরুদ্দীন র. এর রূহের উপর প্রভাব বিস্তার করার জন্য তাঁর দিকে তাওয়াজ্জোহ্ (খেয়াল) করলাম। তিনি ছিলেন হজরত জাহেদ বলখী র. এর খলিফা। দীর্ঘকাল তিনি সিলসিলায়ে কাবরাবিয়ার মুরিদগণের পথপ্রদর্শন করেছেন। আমার অল্প বয়সের সময় আমার পিতা আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমি তাঁর রূহের দিকে খেয়াল করে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি তো এই ধ্বংসশীল জগত থেকে চিরস্থায়ী জগতে প্রবেশ করেছেন। আমাকে এমন একজন বুজর্গের কথা বলে দিন, যার চেয়ে শ্রেষ্ঠ এ যুগে আর কেউ নেই। এর পর আমার নিদ্রা এসে গেলো। আমি সদরুদ্দীন র. কে স্বপ্নে দেখলাম। তিনি বললেন, তোমাকে আমি হজরত মিয়া শায়েখ আহমদ সেরহিন্দীর দরবারে প্রেরণ করছি। বর্তমান যুগে তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কামেল কেউ নেই। ঘুম ভেঙে গেলো। অতি প্রত্যুষে পূর্ণ আকর্ষণ ও ভালোবাসার সাথে শ্রেষ্ঠ কুতুবের দরবারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। তাঁর পবিত্র গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করলাম। বায়াত হলাম।

৩০. একজন সৎব্যবসায়ী, পাঞ্জাবের কোনো এক গ্রামে বসবাস করতেন। তিনি বলেন, আমার মধ্যে গাওছুল আযম আবদুল কাদের জীলানী র. এর প্রতি প্রবল আকর্ষণ ছিলো। প্রতিদিন পাঁচওয়াক্ত নামাজের পর তাঁর রূহের প্রতি দোয়া বখশিস করি। নির্জনে অত্যন্ত নম্রতা ও বিনয়ের সাথে আমার নিবেদন তাঁর কাছে তুলে ধরি। কাদেরিয়া সিলসিলা অনুযায়ী অজিফা ও জিকিরে নিয়োজিত থাকতাম। এক রাতে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় হজরত গাওছুল আযমকে দেখলাম। দৌড়ে গিয়ে তাঁর পদচুম্বন করলাম। তিনি বললেন, প্রকাশ্য পীরের সান্নিধ্য অর্জন এ পথের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমি বললাম, এ যুগের শ্রেষ্ঠ বুজর্গের সন্ধান বলে দিন। আমি তাঁর দরবারে উপস্থিত হবো। তিনি বললেন, সেরহিন্দে একজন বুজর্গ রয়েছেন। তিনি শরীয়তের এলেম, মারেফাতের এলেম ও আমলের প্রতীক এবং কামালিয়াতের সম্রাট। তাঁর নাম শায়েখ আহমদ। তুমি তাঁর কাছে যাও। কেনোনা বর্তমান যুগে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। প্রত্যুষে ওই কুতুবুল আকতাবের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। তাঁর অবস্থানে পৌঁছে গেলাম। আমার আবেদন পেশ করলাম। তাঁর অশেষ দান অনুগ্রহ দ্বারা উপকৃত হয়ে জযবা (আকর্ষণ), সুলুক (পরিক্রমণ) দ্বারা ধন্য হলাম। তিনি অল্প সময়ের মধ্যে আমাকে মোকাম্মেল (পরিপূর্ণ) করে দিলেন।

৩১. মীর সাইয়্যেদ আহমদ হজরত মোজাদ্দেদ র. এর নৈকট্যধারীদের অন্যতম ছিলেন। মকতুবাতে ইমামে রব্বানী প্রথম খণ্ড ৫৬ ও ২৩৮ নং মকতুবে এ বিষয়ে বর্ণনা রয়েছে। তিনি বর্ণনা করেন, যখন বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর তাঁকে বন্দী করেছিলেন, আমি আমার কাজে ব্যস্ত ছিলাম। তাই ঘটনাটি জানতে পারিনি। হঠাৎ শুনলাম সম্রাট তাঁকে শহীদ করে দিয়েছেন। এই সংবাদে আতংকিত হয়ে অস্থিরভাবে বাজারের দিকে বের হলাম এ জন্য যে, সম্ভবত কোনো দূতের মাধ্যমে সঠিক কোনো খবর পাবো। দেখলাম, বাজারের এক পাশে কয়েকজন ব্যবসায়ী দণ্ডায়মান। তাঁদের চেহারায় নূর চমকাচ্ছিলো। আমি তাঁদের কাছে গিয়ে সালাম দিয়ে বসে পড়লাম। তাঁদের একজন আমাকে চিন্তিত দেখে কারণ জিজ্ঞেস করলেন। আমি সব খুলে বললাম। তিনি আক্ষেপ প্রকাশ করলেন। নীরবে মস্তক অবনত করলেন। কিছুক্ষণ পর মাথা উঠিয়ে বললেন, তাঁর প্রতি অধিক মহব্বত রাখো। জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি হজরতকে দেখেছেন? তিনি বললেন, আমি তাঁর একজন নগণ্য মুরিদ। তারপর আমি মিনতি ও অনুরোধ করে তাঁকে আমার ঘরে নিয়ে এলাম। তাঁর সাহচর্য দান করে আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার আবেদন করলাম। বললাম, আপনি কতোদিন ধরে হজরতের সাহচর্যে আছেন। কী কী নেয়ামত পেয়েছেন তাঁর কাছ থেকে? তাঁকে বিশ্বাস ও অনুসরণের কারণ কী ছিলো? তিনি বুঝে ফেললেন, আমিও হজরতের একজন একনিষ্ঠ অনুসারী। তিনি তাঁর মুরিদ হওয়ার কারণ বর্ণনা করলেন। ওই বুজর্গ একজন ব্যবসায়ী হওয়া সত্ত্বেও ছিলেন কামেল (ইলমে মারেফাতে পরিপূর্ণ)।

৩২. শাহ্জাদা খুররম (শাহজাহান) তাঁর পিতার (জাহাঙ্গীরের) বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছিলেন। যুদ্ধ হলো। অনেক সৈন্য-সামন্ত থাকা সত্ত্বেও শাহ্জাদা বিজয়লাভ করতে পারলেন না। একদিন শাহ্জাদা এক বুজর্গের কাছে গেলেন। তিনি বাহ্যিকভাবে অলৌকিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। ছিলেন অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন। শাহ্জাদা জিজ্ঞেস করলেন, এতো অধিক সৈন্য-সামন্ত থাকা সত্ত্বেও কেনো জয়লাভ করতে পারছি না। আমার পিতার অধিকাংশ আমীরও আমার সমর্থক। বুজর্গ বললেন, এ যুগে চারজন মহান বুজর্গ রয়েছেন। তাঁদের মতামতের উপরেই সকল সিদ্ধান্ত প্রণীত হয়। আপনার জয়লাভের ব্যাপারে তিনজন একমত। কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠজন ভিন্নমত পোষণকারী। শাহ্জাদা বললেন, তিনি কে? বুজর্গ বললেন, হজরত মিয়া শায়েখ আহমদ সেরহিন্দী।

আর একটি ঘটনা— হিন্দুস্তানের এক প্রসিদ্ধ বুজর্গ হজরত মোজাদ্দেদ র. এর দরবারে লিখলেন, মান্যবর হজরত! শাহ্জাদার [১] বিজয় সময়ের দাবী। আপনার অভিমত কী? তিনি লিখলেন, শাহ্জাদার বিজয় আমি দেখতে পাচ্ছি না। তবে পরবর্তীতে অবশ্যই তিনি সমুন্নত হবেন। এরকমই হয়েছিলো। যুদ্ধ করে শাহ্জাদা বিজয়ী হতে পারেননি। তিনি সিংহাসন পেয়েছিলেন তাঁর পিতার ইন্তেকালের পর। তিনি দ্বীনকে যথারীতি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ফিরিয়ে এনেছিলেন ইসলামের জ্যোতির্ময়তা। প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন শরীয়তের বিধান।

৩৩. এক জ্ঞানী সাধু ব্যক্তি হজরত মোজাদ্দেদ র. এর দরবারে হাজির হয়েছিলেন। তিনি বর্ণনা করেছেন, আমি বোরহানপুর নগরীর শায়েখ ফজলুল্লাহর [২] দরবারে পৌঁছলাম। তাঁকে গোটা বিশ্বের কুতুব বলা যায়। তিনি আমাকে হজরত মোজাদ্দেদ র. এর চরিত্র ও আচার-আচরণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। বললেন, তুমি তাঁর দরবারে বেশ কিছু কাল থেকেছো। তাঁর সম্পর্কে কিছু বলো।

---

১. 'যুবদাতুল মাকামাত' ২৮১ পৃষ্ঠায় রয়েছে, শাহ্জাদা চার পাঁচ বছর ধরে চেষ্টা করেছিলেন, সফল হননি। সম্রাট হয়েছিলেন তাঁর পিতার মৃত্যুর পর। মোহাম্মদ হাশেম কাশেমী র. তাঁর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার তারিখ তাঁর 'জিনাতে শারা' গ্রন্থে ১০৩৭ হিজরী বলে উল্লেখ করেছেন।

২. শায়েখ ফজলুল্লাহ্র ইন্তেকালের সন-তারিখ জানা যায়নি। তিনি হজরত মোজাদ্দেদ র. এর বন্দীদশা (১০২৮ বা ১০২৯ হিজরী) থেকে মুক্তির জন্য দোয়া করতেন। সুতরাং বলা যেতে পারে, তিনি হজরত মোজাদ্দেদ র. এর কারামুক্তির পর ইন্তেকাল করেছিলেন। অবশ্য মোহাম্মদ হাশেম কাশেমীর ফার্সি গ্রন্থ 'দিওয়ান' এ রয়েছে, (হস্তলিপি ২৮৯৮, ইণ্ডিয়া অফিস, লণ্ডন) শায়েখ মোহাম্মদ বিন ফজলুল্লাহর ইন্তেকালের তারিখ ইবনে ফজলুল্লাহ্ এর সংখ্যা থেকে ১০২৯ হিজরী।

আমি বললাম, আমি তাঁর বাতেনী অবস্থা সম্পর্কে কি বর্ণনা দিতে পারবো? এতটুকু বলতে পারি, তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যেমন সুন্নতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুসরণ করেন, বর্তমান যুগের সকল বুজর্গ একত্রিত হয়েও তার শত ভাগের একভাগও আদায় করতে বা অনুসরণ করতে সক্ষম হবে না। শায়েখ ফজলুল্লাহ্ খুবই খুশি হলেন। বললেন, যা কিছু হকিকতের সূক্ষ্মতত্ত্ব এই কুতুবুল আকতাব মোজাদ্দেদ র. বর্ণনা করেন এবং লেখেন, তা সবই সত্য এবং বাস্তব। তিনি এ বিষয়ে পূর্ণমাত্রায় সত্য ও অধিক সত্যও বটে। কেনোনা তাঁর বক্তব্য ও হালের উন্নতি রসুলুল্লাহ স. এর পূর্ণ অনুসরণের কারণে হয়ে থাকে। আমি অদৃশ্যভাবে তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ ও বিশুদ্ধ মহব্বত রাখি।

বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর কিছুসংখ্যক ইসলামবিদ্বেষী লোকের প্ররোচনায় হজরত মোজাদ্দেদ র. কে রাজদরবারে ডেকে আনেন। তাঁকে সম্মানসূচক সেজদা করতে বলেন। বলাবাহুল্য, তিনি সে হুকুম মানেননি। তাই বাদশাহ্ তাঁকে গোয়ালিয়র দূর্গে [১] বন্দী করে রেখেছিলেন। তখন শায়েখ ফজলুল্লাহ র. প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পরে তাঁর মুক্তির জন্য দোয়া করতেন। কেউ তাঁর কাছে মুরিদ হওয়ার জন্য এলে তিনি যদি বুঝতেন, লোকটি সেরহিন্দের অধিবাসী, তখন খুবই বিস্ময় প্রকাশ করে বলতেন, তুমি হজরত মোজাদ্দেদ র. এর এলাকার বাসিন্দা হয়ে অন্যত্র মুরিদ হতে চাও! তুমি কী সূর্যকে ত্যাগ করে নক্ষত্রের দিকে ধাবিত হতে চাও?

৩৪. একজন আমীর হজরত মোজাদ্দেদ র. এর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতেন। তিনি একদিন হজরত মোজাদ্দেদ র. এর একান্ত অনুরক্ত তখনকার প্রধান বিচারককে বললেন, আপনি সুশিক্ষিত, সত্যবাদী, শায়েখ আহমদ সম্পর্কে কিছু বলুনতো। প্রধান বিচারক বললেন, ওই মহান ব্যক্তিত্বের বাতেনী অবস্থা আমার অনুভূতি বহির্ভূত। তবে আমি এতোটুকু জানি যে, তাঁর স্বভাবচরিত্র দেখে পূর্ববর্তী বুজর্গগণের স্বভাবচরিত্রের কথা মনে পড়ে যায়। কেনোনা পূর্ববর্তী বুজর্গদের কথা আমি বই পুস্তকে পড়েছি। তাতে করে আমার এই ধারণা হয়েছে যে, তাঁদের কঠোর রেয়াজত (সাধনা) এবং ইবাদতের কথা তাঁদের মুরিদগণ হয়তো বা অতিরঞ্জিত করে লিখেছেন। কিন্তু আমি এ সকল বিষয়ে হজরত মোজাদ্দেদ র. এর মধ্যে যা দেখেছি, তাতে আমার ওই অপধারণা দূরীভূত হয়েছে। এখন মনে হয় ওই বুজর্গগণ সম্পর্কে যাঁরা লিখেছেন, তাঁরা কমই লিখেছেন।

১. ডাঃ সিরাজ আহমদ খানের লিখিত গ্রন্থ ' মকতুবাতে ইমামে রব্বানী' ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনের গুরুত্ব ৪র্থ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে, হজরত মোজাদ্দেদ র. গোয়ালিয়র দূর্গে পহেলা রজব শুক্রবার ১০২৮ হিজরীতে (৪ঠা জুন ১৬১৯ খৃঃ) বন্দী হয়েছিলেন, এবং ১১ রজব ১০২৯ হিজরীতে শুক্রবার (২রা জুন ১৬২০ খৃঃ) মুক্তি পেয়েছিলেন।

৩৫. একজন আমলবিশিষ্ট আলেম যিনি অত্যন্ত খোদাভীরু ছিলেন, ছিলেন সে সময়ের একজন অনুসরণীয় ব্যক্তিত্বও, তিনি বলেছেন, হজরত মোজাদ্দেদ র. লেখনীর ধারাবাহিকতায় আলোচনা রাখতেন। আমাদের সমাজের গ্রন্থগুলো তাসনীফ অথবা তালীফ এর অন্তর্ভুক্ত। তালীফ হচ্ছে ওই ধরনের গ্রন্থ, যেখানে অন্যের বাণীসমূহ সুন্দর ভাষায় সাজিয়ে লেখা হয়। আর তাসনীফ হচ্ছে নিজের অর্জিত জ্ঞান, বাতেনীতত্ত্ব, সূক্ষ্ম বিষয়সমূহ ও ভূমিকার লিপিবদ্ধ রূপ। পৃথিবী থেকে তাসনীফ বিদায় হওয়ার পথে। কেবল তালীফই অবশিষ্ট রয়েছে। যদিও আমি হজরত মোজাদ্দেদ র. এর মুরিদ নই, কিন্তু বাস্তব সত্য হচ্ছে, বর্তমান যুগে হজরত মোজাদ্দেদ র. এর মকতুবাত এবং তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ তাসনীফাত (স্ব-অর্জিত ঘটনার বিবরণ), তালীফাত নয়। আমি অনেক বিষয়ে অধ্যয়ন করে দেখেছি, তাঁর গ্রন্থে বিশেষ কোনো প্রয়োজন ব্যতীত অন্যের কোনো কথা লিপিবদ্ধ করা হয়নি। তাঁর অধিকাংশ লেখায় রয়েছে তাঁর কাশফের অবস্থা এবং এলহাম বিষয়ে আলোচনা, যা অতি উচ্চ পর্যায়ের, সঠিক এবং শরীয়তসম্মত। মহান আল্লাহ্ তাঁকে উত্তম পারিতোষিক দান করুন।

৩৬. এক উচ্চ সম্মানিত ব্যক্তি, যিনি বহু আরেফ ও আলেম ব্যক্তির সাহচর্য লাভ করেছিলেন, তিনি কোনো কোনো ছিদ্রান্বেষণকারীদের অপবক্তব্য শুনে বলেছেন, এ কথা সত্য যে, হজরত মোজাদ্দেদ র. এর বক্তব্যের গূঢ়রহস্য ও বাস্তবতা উদঘাটন করার যোগ্যতা তাদের নেই। তাঁর আগমন পূর্বের যুগে হওয়া উচিত ছিল, যে যুগে ছিলো তাঁর বক্তব্য অনুধাবন করার মতো যোগ্য লোকজন। পরবর্তীগণ তাঁদের গ্রন্থে তাঁর থেকে সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করতে পারতেন। ওই যুগের লোকেরা তাঁর বাণী সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, তার উদাহরণ রয়েছে হেকমতপূর্ণ ওই ঘটনাটির মধ্যে। ঘটনাটি এরকম— এক বাদশাহ্ এক সভায় বললেন, আমি এমন একটি প্রাণী দেখেছি, যে আগুন জ্বালিয়ে তা ভক্ষণ করে। সভায় উপস্থিত কেউ এ ধরনের প্রাণী কখনো দেখেনি। তাই তারা বিশ্বাস করতে পারলো না। বাদশাহ্ তাদেরকে মূর্খ ও নির্বোধ আখ্যা দিলেন।

৩৭. মারেফাতসম্পন্ন কাশফধারী এক কামেল পণ্ডিত ব্যক্তি অসংখ্য বুজর্গের দর্শন লাভ করেছিলেন। তাঁর নাম হজরত শায়েখ মোহাম্মদ [১] গাউছ । তিনি গোয়ালিয়র দূর্গে মুরিদ হয়েছিলেন। তাঁর প্রকৃত নাম ছিলো হাসান [২] গাউছি। তিনি আল্লাহ্র ওলীদের সম্পর্কে একটি গ্রন্থও লিখেছেন। তিনি হিন্দুস্তানে সঠিক

১. শায়েখ মোহাম্মদ গাউছ ৯৭০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

২. হাসান গাউছি চোখের উপর পর্দা পড়ার কারণে অন্ধ ছিলেন। ১০২২ হিজরীতে তিনি 'গুলজারে আবরার' গ্রন্থ লিখেছিলেন। মোহাম্মদ হাশেম কাশেমীর গ্রন্থে শায়েখ হাসানের বিবরণীতে পাওয়া যায়, তিনি ১০২৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

ও সত্য পথপ্রদর্শনের কাজে লিপ্ত ছিলেন। হজরত মোজাদ্দেদ র. এর বৈশিষ্ট্যাবলীর উল্লেখ করেছেন তিনি এভাবে— আল্লাহ্‌প্রেমের অতুলনীয় দৃষ্টান্ত, একত্ববাদের বিশ্বাসে শীর্ষ স্থানীয়, প্রেমরাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি, কুতুবের মর্যাদায় আসীন।

৩৮. হেদায়েত ও মাহাত্ম্যের অধিকারী সাইয়্যেদ মীরাকশাহ্ [১] এবং শায়েখ আজাল কাবরাবী এবং মীর মোমেন [২] বলখী এবং মাওলানা রূবায়ী হাসান কুবাদানী এবং প্রধান বিচারপতি মাওলানা তাওলিক [৩] এক দরবেশের কাছে কিছু হাদিয়া বিনীত আবেদনসহ হজরত মোজাদ্দেদ র. এর দরবারে পাঠিয়েছিলেন। ওই দরবেশ প্রথমে প্রেরিত হাদিয়া ও বিনীত নিবেদন নিয়ে দরবারে উপস্থিত হলেন। অতঃপর স্বীয় পীর-মোর্শেদ মীর মোহাম্মদ বলখীর বার্তা পৌঁছে দিলেন। বার্তাটিতে লেখা ছিলো সালাম প্রদানপূর্বক দীর্ঘ পথ ও আমার বার্ধক্য যদি প্রতিবন্ধক না হতো, তবে আপনার দরবারে উপস্থিত হয়ে অবশিষ্ট জীবন আপনার খেদমতে অতিবাহিত করতাম এবং আপনার কাছে থেকে উচ্চ মাকাম, যা কোনো চক্ষু দেখেনি, কোনো কান শোনেনি— তা লাভের জন্য অনুসন্ধান করতাম। কিন্তু আমার মধ্যেও তো প্রতিবন্ধকতা। নিবেদন এই যে, আপনি আমাকে আপনার একনিষ্ঠ ভক্তদের অন্তর্ভুক্ত মনে করে অদৃশ্যভাবে আমার প্রতি তাওয়াজ্জোহ্ দিবেন। বাহ্যিকভাবে যদিও আমি দূরে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে আমি আপনার কাছেই আছি।

পত্রবাহক বললেন, তিনি আমাকে এরকমও বলেছেন যে, তুমি আমার পক্ষ থেকে বায়াত হয়ে যাও। তিনি গাত্রোত্থান করলেন এবং মীর মোহাম্মদ বলখীর পক্ষ থেকে বায়াত করলেন। বিদায়ের সময় এও নিবেদন করলেন যে, বলখবাসী আপনার উচ্চ প্রশংসা বা সুখ্যাতির কথা শুনেছেন। তাই অধিক আগ্রহের সঙ্গে তাঁরা অনুরোধ করেছেন যে, আপনি তাঁদের প্রকৃতি বা বাস্তবতা সম্পর্কে যদি একটি চিঠি লিখেন তবে বড়ই অনুগ্রহ করা হবে। হজরত মোজাদ্দেদ র. তাঁদেরকে অভিনন্দন জানিয়ে কিছু কথা লিখে দিলেন।

---

১. মকতুবাত ৯৯/৩ এর মধ্যে তার আলোচনা রয়েছে। মোহাম্মদ হাশেম কাশেমীর ফার্সী গ্রন্থ 'হুয়া সাইয়্যেদুশ্ শুয়ুখ' এর বিবরণ অনুযায়ী তিনি ১০৩২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেছেন বলে জানা যায়।

২. মকতুবাত- ১ম খণ্ড-১৫১, ৩য় খণ্ড ৯৯ মকতুবসমূহে তাঁর সম্পর্কে লেখা হয়েছে। তাঁকে শায়েখ কাদীমও বলা হয়। মোহাম্মদ হাশেম কাশেমী র. তাঁর ইন্তেকালের তারিখ লিখেছেন ১০৩১ হিজরী।

৩. হাফেজ কাযী তাওলিক সম্পর্কে ৯৯/৩ মকতুবাতে আলোচনা রয়েছে।

কিছু লোক বলখ এবং মাঅরাউন্নাহার থেকে হিন্দুস্তানে এসেছিলেন, তাঁরা বললেন, আমরা আরেফকুল শিরোমণি মীর মুমিন বলখীর দরবারে ছিলাম। তিনি হজরত মোজাদ্দেদ র. এর সম্পর্কে বিশেষভাবে অবগত। তিনি বলেন, যদি সুলতানুল আরেফীন সাইয়্যেদুত্ তায়েফাহ্ এ সময় জীবিত থাকতেন, তাহলে ওই বুজর্গও হজরত মোজাদ্দেদ র. এর দরবারে উপবেশন করতেন।

৩৯. সাইয়্যেদ সালেহ [১] ছিলেন আল্লাহ্প্রেমিক ও হজরত মোজাদ্দেদ র. এর একনিষ্ঠ অনুসরণকারী। তিনি একবার এই নগণ্যকে বললেন, একদিন হজরত মোজাদ্দেদকে অস্বীকারকারী দলের একজন বললো, হজরত মোজাদ্দেদ বলেছেন, যদি খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দ কুদ্দিসা সিররুহু বর্তমান যুগে জীবিত থাকতেন, তাহলে তিনি আমার খেদমত করতেন। একথা শুনে আমি বড়ই আশ্চর্যান্বিত হলাম। আমি বললাম, এমন উক্তি থেকে আল্লাহ্র কাছে পরিত্রাণ চাই। তিনি কখনোই এরূপ বলতে পারেন না। তাঁর স্বভাব এরূপ নয় যে, তিনি এধরনের কথা বলবেন। ঘটনাক্রমে আমি প্লেগ রোগে আক্রান্ত হলাম। এক রাতে রোগযন্ত্রণার মধ্যে দেখলাম, আমার জান কবজ করার জন্য আসমান থেকে এক ফেরেশতা নেমে এলো। সহসা হজরত বাহাউদ্দীন নকশবন্দ র. এর আবির্ভাব ঘটলো। তিনি ফেরেশতাদের উদ্দেশ্যে বললেন, এই সম্ভ্রান্ত সন্তানের হায়াত বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়েছে। তোমরা ফিরে যাও। জান কবজকারী ফেরেশতারা বললেন, কারণ কী? তিনি বললেন, এই ব্যক্তি এখনই দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেলে তিন ব্যক্তি কাফের হয়ে যেতো (একজনের প্রস্থানের কারণে এতোবড় ক্ষতি হয়ে যেতো)। এরপর খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দ আমাকে বললেন, হজরত মোজাদ্দেদ র. অবশ্যই ওই কথা বলেননি, যেমন বলেছে আমাকে অপছন্দকারী ব্যক্তিটি। তথাপিও তাঁর মর্যাদা এই ব্যক্তি থেকে অনেক ঊর্ধ্বে।

সাইয়্যেদ সালেহ বর্ণনা করেছেন, আমি এক রাতে খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতীকে স্বপ্নে দেখলাম। দেখলাম, তিনি একটি রাস্তা ধরে গমন করছেন। তাঁর সঙ্গে আছে বিশাল একটি দল, যাঁরা অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে পথ অতিক্রম করছিলেন। আমিও তাঁদের সঙ্গী হলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি বললেন, তোমার পূর্বপুরুষ তো চিশতীয়া তরিকার সিলসিলাভুক্ত ছিলেন। তুমি কেনো নকশবন্দিয়া তরিকা গ্রহণ করেছো ও মোজাদ্দেদ র. এর মুরিদ হয়েছো? আমি বললাম, কুকুর যেখানে এক টুকরা রুটি পায়, সেখানেই থেকে যায়। অন্য কোথাও যায় না। ওই ব্যক্তি বললেন, তুমি চিশতীয়া ও নকশবন্দিয়া তরিকার মধ্যে কী পার্থক্য দেখছো যে,

---

১. সম্ভবত ওই ব্যক্তি ছিলেন মাওলানা মোহাম্মদ সালেহ কাওলাবী। যার নাম ১৬১/১, ১৮২, ২৪১, ২৪৪, ২৪৫, ৩০৬ (৩৩/২) (২৮,৮৭,৯৫/৩) নং মকতুবে উল্লেখ রয়েছে। তাঁর লিখিত গ্রন্থ 'হেদায়েতুত্ ত্বলেবীন' এর মধ্যে হজরত মোজাদ্দেদ র. এর দৈনন্দিন জীবন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তিনি ১০৩৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেছেন।

পূর্বপুরুষদের তরিকা ত্যাগ করে মোজাদ্দেদ র. এর তরিকা গ্রহণ করেছো? আমি বললাম, হজরত মোজাদ্দেদ র. এবং আমার পূর্বপুরুষদের মধ্যে ওই রকমই পার্থক্য, যেমন পার্থক্য হাবীবুল্লাহ ও কালীমুল্লাহর মধ্যে।

একটি সিফাতের (গুণের) প্রতিবিম্বের কারণে মূসা হুঁশ হারিয়েছিলেন। আর তিনি স. সরাসরি পাক যাতের সাথে সাক্ষাৎ করেও হুঁশ হারাননি।

হজরত খাজা মঈনুদ্দীন রাগান্বিত হয়ে আবির্ভূত হলেন। বললেন, ওকে কিছু বলো না। তার মোর্শেদ নিতান্তই ধর্মভীরু, সীমাহীন দৃঢ়তাসম্পন্ন ও অটল বিশ্বাসী।

চতুর্থ হাজ্‌রাত

হজরত মোজাদ্দেদ র. এর বিশেষ অবস্থা ও উচ্চমর্যাদা এবং যে কারণে তিনি অন্যান্য আউলিয়া কেরাম থেকে স্বতন্ত্র ছিলেন— তার বর্ণনা।

১. মহান আল্লাহ্ বিশেষ উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন আলেমদের মধ্যে তাঁকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করেছেন। রসুল স. এর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। তিনি পবিত্র কোরআনের আয়াতে মুতাশাবিহাত (রহস্যাচ্ছন্ন আয়াতসমূহ) এবং হরূফে মোকাত্তাআত (বিচ্ছিন্ন বর্ণরাজি) এর গোপন ভেদ সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তিনি নিজেও একথা বলেছেন। যেমন— আমি এক সময় কোরআনের আয়াতে মুতাশাবিহাত শুধু মহান আল্লাহ্‌র জন্য সুনির্দিষ্ট মনে করতাম। উলামায়ে রসিখীন (জ্ঞানে সুগভীর আলেম সম্প্রদায়) এর মধ্যে মুতাশাবিহাতের উপর বিশ্বাস রাখা ব্যতীত অন্য কোনো বিকল্প আছে বলে মনে করতাম না। যে সকল বিশ্লেষণ সুফী আলেম সম্প্রদায় করেছেন, সে গুলোকে মুতাশাবিহাত অনুযায়ী হয়েছে বলে স্বীকৃতি দিতাম না এবং ওই ব্যাখ্যাবিশ্লেষণকে এমন গুপ্তরহস্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতাম না, যেগুলো গোপন রাখার উপযোগী। যেমন হজরত আইনুল কুজ্‌জাত র. 'আলিফ লাম মীম' এর অর্থ করেছেন— দুঃখ-বেদনা, যা ভালোবাসার জন্য একান্ত আবশ্যক ইত্যাদি। অবশেষে মহান আল্লাহ্ তাঁর অপার করুণায় মুতাশাবিহাতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মধ্য হতে এক বিন্দু এ ফকিরের প্রতি প্রকাশ করে দিলেন। এক বিশাল সমুদ্র থেকে একটি ঝর্ণা প্রবাহিত করে দিয়ে এ অধমের যোগ্যতার ক্ষেত্রকে প্রশস্ত করে দিলেন। আমি বুঝলাম, উলামায়ে রসিখীনের 'মুতাশাবিহাত' এবং 'মুকাত্তাআত' এর ব্যাখ্যাবিশ্লেষণে বিশেষ পারদর্শিতা রয়েছে। কোনো কোনো আলেম 'ওয়াজহুন' (চেহারা) শব্দ দ্বারা যাতে ইলাহী উদ্দেশ্য বলেছেন। 'ইয়াদুন' (হাত) শব্দ থেকে কুদরতে ইলাহী উদ্দেশ্য বলে উল্লেখ করেছেন। এমন ব্যাখ্যা সঠিক নয়। বরং ওগুলোর ব্যাখ্যা অবশ্যই রহস্যপূর্ণ, যা কেবল একান্ত নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গই অবগত। হরুফে মুকাত্তাআত সম্পর্কে কী-ই বা বলা সম্ভব। ওই অক্ষরসমূহের

মধ্যে প্রতিটি অক্ষর এক একটি আবেগের সমুদ্র এবং আশেক-মাশুকের মধ্যে অতিশয় গুপ্তরহস্যে পরিপূর্ণ। প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের মধ্যে অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম বিষয়ের ইঙ্গিত। আয়াতে মুহ্কামাত (স্পষ্ট অর্থপ্রকাশক আয়াত) যদিও পবিত্র কোরআনের মাতা সদৃশ বা মূল, কিন্তু তার নির্যাস হচ্ছে এই আয়াতে মুতাশাবিহাত। পবিত্র কোরআনের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে এই মুতাশাবিহাত। আর মাতা (আয়াতে মুহকামাত) মাধ্যম ছাড়া অতিরিক্ত কিছু নয়। আলেমে রসিখ ওই ব্যক্তি, যিনি মুতাশাবিহাতকে মুহাকামাতের সাথে সমন্বয় করেন এবং বাস্তবতা বা প্রকৃত সত্যকে উদঘাটন করে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটান। যে ব্যক্তি মুহকামাত বিষয়ে জ্ঞানার্জন ও তার আহবান অনুযায়ী আমল করা ব্যতীত মুতাশাবিহাতের ব্যাখ্যা অনুসন্ধান করে এবং প্রকাশ্য অবস্থা ত্যাগ করে অন্তর্নিহিত অবস্থা উদঘাটনের দিকে ধাবিত হয়, সে নিতান্তই মূর্খ এবং তার মূর্খতা বিষয়েও সে অজ্ঞ [১]।

হজরত মোজাদ্দেদ র. আরও বলেছেন—

মুতাশাবিহাত সম্পর্কে জ্ঞান শুধুমাত্র রসুলগণের জন্য নির্দিষ্ট। উম্মতের মধ্যে খুবই স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তি বিশেষ গুণ ও উত্তরাধিকার সূত্রে ওই এলেম লাভে ধন্য হয়েছেন। তাঁদের থেকে পৃথিবীতে মুতাশাবিহাতের সূক্ষ্ম অন্তরায় দূর করে দিয়েছেন এবং পরকালেও আশা করা যায় উম্মতের মধ্যে বহুসংখ্যক ব্যক্তি তাঁদের বিশেষ গুণের জন্য এই অমূল্য সম্পদের দ্বারা উপকৃত হবেন। অবশ্য এ বিষয়ে আরো অনুধাবিত হয় যে, পৃথিবীতে এই স্বল্পসংখ্যক লোক ব্যতীত অন্যান্য বিশেষ ব্যক্তিরও এ অমূল্য সম্পদ লাভে ধন্য হওয়া সম্ভব। তথাপিও প্রেক্ষাপটের বাস্তবতা সম্পর্কে তাদেরকে জ্ঞান দান করা হয় না এবং ব্যাখ্যাবিশ্লেষণও উন্মোচনের অনুমতি দেওয়া হয় না। এরকম হতে পারে যে, কারো কারো মুতাশাবিহাতের ব্যাখ্যা অর্জিত হয়েছে, কিন্তু সে সম্পর্কে তাঁর নিজেরই কোনো অবগতি নেই। মুতাশাবিহাত হচ্ছে যথার্থ বাস্তবতার ইঙ্গিত। হতে পারে প্রেক্ষাপটের বাস্তবতা তিনি লাভ করেছেন, কিন্তু সে সংবাদ তিনি জানেন না। এই আলোচনাটি মুতাশাবিহাত সম্পর্কে একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ। সামগ্রিক বিষয়টি তাহলে কেমন হতে পারে [২]— তা অনুমানসাধ্য নয়।

একদিন মখদুমজাদা নূরের প্রতিচ্ছবি কাইয়্যুম খাজা মোহাম্মদ মাসুম র. নির্জনে আমাকে বললেন, হজরত মোজাদ্দেদ র. এর প্রতি মুতাশাবিহাত ও মুকাত্তাআতের সূক্ষ্ম ইঙ্গিত প্রকাশিত হয়। কিন্তু তিনি তা প্রকাশ করেন না। তাঁর

১. মকতুবাত প্রথম খণ্ডের ২৭৬ নং মাকতুবের বাক্যবিন্যাসে কিছু পূর্বাপর ঘটেছে। দ্বিতীয় খণ্ডে ১৮ নং মকতুবের মধ্যে অনুরূপই বর্ণিত হয়েছে এবং 'মাবদা ওয়া মাআদ' গ্রন্থের মিনহা ৩৫ এর মধ্যেও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে।

২. মকতুবাত প্রথম খণ্ডের ৩১১নং মকতুব দেখুন।

কাছে যখন এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো তখন তিনি বললেন, শয়তান মারাত্মক শত্রু। সে সর্বদাই গোপন তত্ত্ব অনুসন্ধান ও প্রকাশের জন্য ব্যতিব্যস্ত। সে চায় এ বিষয়ের গূঢ়রহস্য প্রকাশিত হোক। সকল গোপন রহস্য ফাঁস হয়ে যাক। মহান আল্লাহ্ যাঁদেরকে এই মর্যাদায় আসীন করেছেন, তাঁদেরকে 'রসিখীন' বলা হয়। তাঁদের দৃঢ়তার কারণে তাঁরা এ বিষয়টি গোপন রাখতে সক্ষম হন। নিজের চিন্তাশক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে পারেন। আমি বললাম, আল্লাহ্র অপার অনুগ্রহে আপনি তো এ সকল ক্ষেত্র থেকে এবং এর চতুষ্পার্শ্ব থেকে শয়তানকে দূর করে দিতে সক্ষম, যাতে সে বিষয়টির অবগতি লাভ না করতে পারে। আমি এভাবে পীড়াপীড়ি করতে লাগলাম। তখন তিনি হরফ 'কৃফ' এর গুপ্তরহস্য প্রকাশ করলেন। আমার চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো।

২. মহান আল্লাহ্ হজরত মোজাদ্দেদকে আলফে সানির মোজাদ্দেদ বানিয়েছেন। তাই তিনি নিজেই সূক্ষ্ম বিষয়ের রহস্যাবলী তাঁর কাছে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। এক মকতুবাতে বিশেষ জ্ঞান ও মারেফাত সম্পর্কিত আলোচনা তিনি এভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন—

এ এলেম নবুওয়াতের জ্বলন্ত প্রদীপ থেকে সংগৃহীত, যা আলফে সানির সংস্কারের বিশেষ গুণ ও উত্তরাধিকার সূত্রে জীবন্ত হয়েছে এবং সজীবতার সঙ্গে তার বিকাশ ঘটেছে। এই এলেম ও মারেফাতের ধারক সহস্রাব্দের মোজাদ্দেদ। বিষয়টি তাদের কাছে খুবই স্পষ্ট। যারা তাঁর এলেম ও মারেফাতকে দর্শন করেছেন, যার সম্পর্ক মহান আল্লাহ্র যাত (মূলসত্তা) ও সিফাতের (গুণাবলীর) সঙ্গে এবং যার সম্পর্ক আহওয়াল (অবস্থাসমূহ), মাআজীদ (মওতী), তাজাল্লিয়াত (মাহাত্ম্য) এবং জহুরাত (বহিঃপ্রকাশ) এর সঙ্গে। সুতরাং তারা এ বিষয়ে অবগত যে, এই এলেম ও মারেফাত সকল আলেমের এলেম এবং সকল আউলিয়ার মারেফাত থেকে স্বতন্ত্র। বরং মোজাদ্দেদিয়াতের এলেমের তুলনায় অন্যান্যদের এলেম সামান্য। মোজাদ্দেদিয়াতের এলমই হলো মূল এলেম। মহান আল্লাহ্ই সঠিক পথ প্রদর্শনকারী।

উল্লেখ্য, প্রত্যেক শতাব্দীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মোজাদ্দেদ ছিলেন। কিন্তু শতাব্দীর মোজাদ্দেদ হচ্ছেন পৃথক। সহস্রাব্দের মোজাদ্দেদও আলাদা। সুতরাং শতাব্দী ও সহস্রাব্দের মধ্যে যেমন পার্থক্য রয়েছে, শতাব্দীর মোজাদ্দেদ ও সহস্রাব্দের মোজাদ্দেদের মধ্যেও তদ্রূপ পার্থক্য রয়েছে। মোজাদ্দেদ ওই ব্যক্তি, যাঁর মাধ্যমে ওই যুগের উম্মতেরা ফয়েজ ও বরকত লাভ করে, যদিও সে যুগে একাধিক কুতুব ও আওতাদ (আউলিয়া প্রধান), বুদালা (আবদাল) এবং নুজাবা (সাড়াদানকারী) বিদ্যমান থাকে (মকতুবাত ৪/২)।

হজরত মোজাদ্দেদ র. অন্য এক মকতুবে উল্লেখ করেছেন, হে বৎস! বর্তমান সময়টি এমনই যে, পূর্ববর্তী উম্মতগণের মধ্যে যদি এরকম পাপাচ্ছন্ন পরিবেশে

কোনো উলুল আজম (উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন) পয়গম্বর আবির্ভূত হতেন, তাহলে তিনি নতুন করে শরীয়তের ভিত্তি স্থাপন করতেন। কিন্তু বর্তমান উম্মত তো খয়রুল উম্মাত (শ্রেষ্ঠ উম্মত)— যে উম্মতের রসুল হলেন সর্বশেষ রসুল, যাঁর উম্মতের বিশিষ্ট আলেমগণের মর্যাদা বনী ইসরাইলের যুগের নবীদের তুল্য। নবীগণের স্থলে এ সকল আলেমগণকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। তাই এই উম্মতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ আলমগণের মধ্য থেকে একজনকে মোজাদ্দেদ নির্বাচন করে দেওয়া হয়, যিনি শরীয়তকে পুনর্জীবিত করেন। হাজার বছর পরে পূর্ববর্তী উম্মতগণের মধ্যে উলুল আজম পয়গম্বর প্রেরিত হতেন। সাধারণ পয়গম্বরদেরকে ওই সময় যথেষ্ট মনে করা হতো না। এভাবে বর্তমান যুগে উম্মতের জন্য এমনই এক আলেম ও আরেফ প্রয়োজন, যিনি পরিপূর্ণ মারেফাতের ধারক হবেন এবং উলুল আজম পয়গম্বরের স্থলাভিষিক্ত হবেন (মকতুবাত ৩২/১)।

এ বর্ণনার ধারাবাহিকতায় এক স্থানে হজরত মোজাদ্দেদ র. লিখেছেন, এ উম্মতের সমাপ্তির সূচনা হয়েছে রসুল স. এর ইন্তেকালের হাজার বছর পরে। হাজার বছর অতিবাহিত হওয়ার বিষয়টি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। হাজার বছরের কর্মধারা বহুধাবিবর্তিত হয়। বস্তুগত বিষয়েও ঘটে অনেক রকম পরিবর্তন। আবার এই উম্মতের মধ্যে কোনো রকম নুসখ (বিধান রহিতকরণ) বা পরিবর্তন হবে না। তাই পূর্ববর্তী ধারার সতেজকরণ ও সম্প্রসারণের দায়িত্ব নিয়ে পরবর্তীগণ অগ্রসরমান ছিলেন। দ্বিতীয় সহস্রাব্দে শরীয়তের উজ্জীবন ও জাতির সংস্কার হয়েছে। এই মহান সংস্কারের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন হজরত ঈসা আ. ও ইমাম মাহদী আ. রে.।

রুহুল কুদুসের ফয়েজ যদি এখনও সাহায্যকারী হয়ে যায়,
তাহলে অন্যেরাও তাই করবে যা মসীহ্ করেছেন।

হে ভ্রাতৃবৃন্দ! এ সকল কথা তো অধিকাংশ লোক অপছন্দ করে এবং তাদের কাছে এ সকল বিষয় দুর্বোধ্য। কিন্তু তারা যদি ন্যায়বিচারের দৃষ্টিতে সঠিকভাবে পরস্পরের এলেম ও মারেফাত পরিমাপ করে, সুস্থতা ও রোগগ্রস্তকে যদি শরীয়তের মাপকাঠিতে বিচার করে এবং এ কথাটিও ভেবে দেখে যে, শরীয়ত এবং নবুওয়াতের মহত্ব ও মহিমার স্বরূপ কী, তাহলে আশা করা যায় তাদের বিস্ময়ভাব দূরীভূত হবে। এই ফকির তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, তরিকত এবং হাকীকত দুটো বিষয়ই শরীয়তের খাদেম। আর বেলায়েত অপেক্ষা নবুওয়াত উত্তম, যদিও তা হয় নবীগণের বেলায়েত। এ কথাটিও তিনি উল্লেখ করেছেন যে, বেলায়েতের কামালাত, নবুওয়াতের কামালতের তুলনায় মূল্যহীন। যেমন বিশাল সমূদ্রের তুলনায় একটি বিন্দু। এরকম আরও অনেক কিছু তিনি লিখেছেন। বিশেষ করে লিখেছেন তরিকত সম্পর্কে। বিস্তারিত জানার জন্য মকতুবাত ২৬১/১ দেখুন। বিষয়টির অবতারণার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, হক নেয়ামত সম্পর্কে যথার্থ

আলোচনা, অন্য কিছু নয়। এ দ্বারা তরিকতপন্থীদের উৎসাহিত করা হয়েছে। এর দ্বারা অন্যের উপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করা উদ্দেশ্য নয়। মহান আল্লাহ্‌র মারেফাত তার জন্য হারাম, যে নিজেকে নিকৃষ্ট কাফের থেকে জঘন্য মনে না করে। অতঃপর দ্বীনের দৃষ্টিতে মহৎ ব্যক্তিদের সাথে কী করে সুসম্পর্ক হতে পারে।

ধূলি হতে প্রভু যবে তুলিল আমায়
আকাশে তুলিলে শির তা-ও শোভা পায়।
নগণ্য মৃত্তিকা আমি বর্ষা জল ধরে—
কতিপয় বারিবিন্দু দিলে মম শিরে।
ছুছুনের মতো হলে মম শতানন,
কৃতজ্ঞতা কভু তাঁর হবে না পালন।
— (মকতুবাত ২৬১/১)।

৩. হজরত মোজাদ্দেদ র. উল্লেখ করেছেন, ফানাফিল্লাহ্‌ ও বাকাবিল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়াবলী মহান আল্লাহ্‌ তাঁর অপার অনুগ্রহে আমার জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। এ কথাও জানিয়ে দিয়েছেন যে, প্রত্যেক কাজের একটি নির্দিষ্ট কারণ আছে এবং সায়ের ফিল্লাহ আসলে কী? বরকী তাজাল্লী কী? আর মোহাম্মাদীআল মাশরাব কে? এভাবে অন্যান্য বিষয়েও উল্লেখ করেছেন। প্রত্যেক মাকামে তাঁর আবশ্যকতা ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করা হয় এবং তাঁকে সায়ের করানো হয় এবং অনেক কম বিষয় এরূপ হবে, যার নিদর্শন ওই ওলীআল্লাহ্‌ই হবেন। তাকে রাস্তায় ছেড়ে দিয়েছেন এবং তাকে পথ দেখানো হয়নি। ওই ব্যক্তিই মকবুল ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত, যিনি চুলচেরা পরীক্ষা নিরীক্ষা ব্যতীত তাকে গ্রহণ করে নিয়েছেন।

৪. হজরত মোজাদ্দেদ র. উল্লেখ করেছেন, মহান আল্লাহ্‌ তাঁর অশেষ অনুগ্রহ থেকে বিস্তৃত কামালতের মধ্যে আমাকে যথার্থই উন্নতি দান করেছেন। বেলায়েতের মাকামের উপর বেলায়েতে শাহাদাত। শাহাদাতের মাকামের সাথে বেলায়েতের মাকামের সম্পর্ক ওই রকমই, যেমন তাজাল্লিয়ে যাত (মূল সত্তা) ও তাজাল্লিয়ে সুরী (প্রতিবিম্ব) এর মধ্যে তাজাল্লির সম্পর্ক। এই দুই মাকামের দূরত্ব, এই দুই তাজাল্লির মধ্যে দূরত্ব থেকেও অনেক বেশী। শাহাদাতের মাকামের ঊর্ধ্বের মাকাম হচ্ছে সিদ্দীকিয়াতের মাকাম। এ দুই মাকামের মধ্যে পার্থক্য— না ভাষার মাধ্যমে, না ইঙ্গিতের মাধ্যমে বুঝানো সম্ভব। সিদ্দীকিয়াত মাকামের ঊর্ধ্বে শুধুমাত্র নবুওয়াতেরই মাকাম। অন্য কোনো মাকাম নেই এবং সিদ্দীকিয়াত ও নবুওয়াতের মাকামের মধ্যবর্তী কোনো মাকাম হতে পারে না। হওয়া অসম্ভব। এরূপ অসম্ভব হওয়ার বিষয়টি আমি বিশুদ্ধ ও স্পষ্ট কাশফের মাধ্যমে জেনেছি। কোনো কোনো বুজর্গ এই দুই মাকামের মধ্যে একটি মধ্যবর্তী অবস্থার কথা

বলেছেন। তার নাম দিয়েছেন কোরবত্। এ বিষয়ে জ্ঞান দান করেও আমাকে ধন্য করা হয়েছে এবং এর বাস্তবতা সম্পর্কেও আমাকে অবগত করানো হয়েছে। অনেক তাওয়াজ্জোহ্ ও সীমাহীন বিনীত প্রার্থনার পর আমার প্রতি অনুরূপই প্রকাশিত হলো, যেমন উল্লেখ করেছেন সম্মানিত বুজর্গগণ। কিন্তু পরবর্তীতে এর হকিকত সম্পর্কে আমাকে সরাসরি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। নিঃসন্দেহে এই মাকাম অর্জন সিদ্দীকিয়াতের মাকাম লাভের পর উরূজ (ঊর্ধ্বগমন) এর সময় হয়ে থাকে। কিন্তু মধ্যবর্তী অবস্থা হওয়াকে তাঁরা অসম্ভব মনে করেছেন। কেনোনা এ মাকাম অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ। উরূজের ক্ষেত্রে এর উপরে আর কোনো মাকাম নেই। যাতে জাল্লা ওয়া আলার (সর্ব-ঊর্ধ্ব সত্তার) উপরে জায়েদিয়াতে অজুদ (অতিরিক্ত অস্তিত্ব) এই মাকামেই প্রকাশিত হয়। যেমন উলামায়ে হক থেকে এ বিষয়টি প্রমাণিত হয় যে, এই মাকামে অজুদও পথে পড়ে থাকে এবং এখান থেকে উরুজ বাস্তবায়িত হয়।

আবুল মাকারেম রুকনুদ্দীন শায়েখ আলাউদ্দৌলা সামনানী র.[১] তাঁর কোনো কোনো গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, আলমে অজুদের উপরে আলমে মুলকুল অদুদ (বন্ধুত্বের জগত) অবস্থিত এবং সিদ্দীকিয়াতের মাকাম বাকার মাকাম থেকে, যা আলমের (জগতের) মুখাপেক্ষী। আর এ মাকাম থেকে অনেক ঊর্ধ্বের মাকাম হচ্ছে নবুওয়াতের মাকাম, যা বাস্তবিক পক্ষেই মহামর্যাদাপূর্ণ। ছোহো (স্বাভাবিক হাল) ও বাকার পূর্ণতা এবং দুই মাকামের মধ্যবর্তী কোরবত্ মাকাম মধ্যবর্তী অবস্থানে নেই। কেনোনা তার অন্বেষা শুধু মাত্র তানাজ্জিয়াহ্ (পবিত্রসত্তার) দিকে।

মুকুরের বুকে আমি তোতা পাখি যথা
যা কহিতে বলে গুরু- কহি সেই কথা।

এলমে শরীয়তকে দৃশ্যমান প্রমাণাদি অনুযায়ী বদীহী (প্রকাশ্য) এবং কাশফী (অন্তর্দৃষ্টি) বানানো হয়েছে। আর দৃশ্যমান বিষয়গুলোকে আবশ্যিক হিশেবে গ্রহণ করা [২] হয়েছে।

৫. হজরত মোজাদ্দেদ র. আরও বর্ণনা করেছেন, 'ইস্তেতাআত মাআল ফে'ল' (কর্মদক্ষতা) এর বিষয়টিও উন্মোচিত হয়েছে। অর্থাৎ কর্ম থেকে শক্তি অধিক হয় না এবং শক্তি ততটুকুই দেওয়া হয়, যতটুকু দ্বারা কর্ম সম্পন্ন হতে

---

১. আবুল মাকারেম রুকনুদ্দীন আলাউদ্দৌলা সামনানী র. (আহমদ বিন মোহাম্মদ) ৬৫৯ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যুবরণ করেন ৭৩৬ হিজরীতে। ৬৭৭ হিজরীতে বাগদাদে শায়েখ নুরুদ্দীন আব্দুর রহমান কছরতী র. এর কাছে বায়াত গ্রহণ করেছিলেন। গবেষণায় ইমাম চতুষ্টয়ের মাসআলা বিষয়ে বিতর্কও করেছিলেন।

২. উপরের বিষয়টি 'মাআরিফে লাদুন্নিয়া' (মারেফাত-১৪) এর মধ্যেও উল্লেখ করা হয়েছে। এর উল্লেখ রয়েছে মকতুবাত ২/২ তেও।

পারে। উপকরণ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহনশীলতা অনুযায়ীই 'মুকাল্লাফ' (ধারক) করা হয়, যেমন আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আলেমগণ প্রমাণ করেছেন। এই মাকাম রাখা হয়েছে খাজা নকশবন্দ কুদ্দিসা সিররুহুর কদমের নিচে। তিনি এই মাকামে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আর হজরত আলাউদ্দীন আত্তার [১] কুদ্দিসা সিররুহুও এ মাকামের কিছু অংশ লাভ করেছিলেন।

নকশবন্দিয়া সিলসিলার খাজা আবদুল খালেক গাজদাওয়ান র.[২] এবং পূর্ববর্তী মাশায়েখগণের মধ্যে হজরত মারুফ কারখী র.[৩], ইমাম দাউদ তায়ী [৪] র., খাজা হাসান বসরী র.[৫] এবং খাজা হাবীব আজমী [৬] র.ও এই মাকাম হাসিল করেছিলেন।

৬. হজরত মোজাদ্দেদ র. বর্ণনা করেন, [৭] যখন এই দরবেশের অন্তরে সুলুকের রাস্তায় চলার ইচ্ছা প্রবল হলো, তখন হক তায়ালা তাকে নকশবন্দিয়া তরিকার এক বুজর্গের (খাজা বাকি বিল্লাহ র.) কাছে পৌঁছে দিলেন। সেখান থেকেই এই বুজর্গের তরিকা গ্রহণ করি এবং তাঁর সাহচর্য অবলম্বন করি। ওই বুজর্গের তাওয়াজ্জোহের বরকতে নকশবন্দিয়া তরিকার খাজেগানদের জয্‌বা যা ফানার মাকামে সিফাতসমূহের মূল তত্ত্বে মিলিত হয়েছে— তা হাসিল হয় এবং অন্য তরিকার শেষ বস্তু যা নকশবন্দিয়া তরিকার বুজর্গগণ প্রারম্ভেই প্রবিষ্ট করেন, তার দ্বারা পরিতৃপ্ত হই। যখন এই জয্‌বা সুদৃঢ় হয়, তখন সুলুকের মধ্যে স্থিরতা আসে এবং আমি এই রাস্তায় হজরত আলী কাররামাল্লাহু অজহাহুর রূহানী

---

১. খাজা আলাউদ্দীন আত্তার র.— নাম মোহাম্মদ বিন মোহাম্মদ। হজরত খাজা নকশবন্দ র. এর খলিফা ছিলেন। তিনি মাওয়ারাউন্নাহার নামক স্থানে ৮০২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

২. 'খাজা জাহান' তাঁর উপাধি ছিলো। তিনি ৫৭৬ হিজরীতে অথবা ৬১৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তাঁর নির্ধারিত আটটি বাক্য নকশবন্দিয়া তরিকার জ্ঞানভাণ্ডার।

(১) হুঁশদরদাম (প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে খেয়াল) (২) নজর বর কদম (প্রতিটি পদক্ষেপের উদ্দেশ্যের প্রতি খেয়াল) (৩) সফর দর ওয়াতন (স্বসত্তায় ভ্রমণ) (৪) খিলাওয়াত দর আঞ্জুমান (জনাকীর্ণতার মধ্যে নির্জনতা) (৫) ইয়াদ্ করদ (স্মরণ করা) (৬) বাজেগাশ্‌ত (প্রত্যাবর্তন) (৭) নেগাহ্‌দাশ্‌ত (রক্ষণাবেক্ষণ) (৮) ইয়াদ্‌দাশ্‌ত (স্মৃতিচারণ)

৩. খাজা মারুফ কারখী র. জ্যেষ্ঠদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি ২০০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৪. তিনিও শ্রেষ্ঠদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। ইন্তেকাল করেন ১৬৫ হিজরীতে।

৫. হাসান পুত্র আবিল হাসান বসরি র. ১২ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১১২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেলন। তাবেঈনদের মধ্যে অতি উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন।

৬. আবু মোহাম্মাদ হাবীব আজমী র. পারস্যবাসী ছিলেন। হজরত হাসান বসরী র. এর মুরিদ ছিলেন। বসরা নগরীতে (ইরাকে) ১৫৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। আত্তার র. এর তাযকিরাতুল আউলিয়া গ্রন্থে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। দেখুন হাসিয়া তবকাতুস সুফিয়া ২২৫ পৃষ্ঠা।

৭. এখান থেকে ৮ম সোপানের শেষ পর্যন্ত মাবদা মাআ'দ এর সূচনা পর্বের আলোচনা।

প্রতিপালনের মাধ্যমে সর্বশেষ স্থানে উপনীত হই। অর্থাৎ আমার উর্ধ্বারোহণ ওই এসেম পর্যন্ত হয়, যা আমার প্রতিপালনকারী।

অতঃপর খাজা নকশবন্দ কুদ্দিসা সিররুহুর রূহানী সহায়তায় এই এসেম থেকে কাবিলিয়াতে উলা (গ্রহণযোগ্যতার প্রাথমিক স্তর) এর স্তরে উন্নীত হই, যাকে হকিকতে মোহাম্মদী (আলা সাহিবিহাস্ সালাতি ওয়াস্ সালাম) হিশেবে বিবেচনা করা হয়। পরে এ স্থান থেকে হজরত ফারুক আজম রা. এর রূহানী সাহায্যে আরো উঁচু মাকামে উন্নীত হই। মনে রাখতে হবে, এই যোগ্যতা এই মাকামেরই বিশেষ বৈশিষ্ট্য এবং আগের স্তরটি সাধারণ স্তর। এ মাকামকে আফতাবে মোহাম্মদীও বলা হয়। খাতেমুর রসুল স. এর রূহানী প্রতিপালনের মাধ্যমে এই মাকামে উন্নীত হই। এই মাকামে উন্নীত হওয়ার সময় এই দরবেশ হজরত খাজা আলাউদ্দীন আত্তার র. যিনি হজরত খাজা নকশবন্দ র. এর খলিফা এবং কুতুবে ইরশাদ (কুতুবগণের পথপ্রদর্শক) ছিলেন, তাঁর রূহানী সাহায্যও লাভ করে। এই স্তর কুতুবগণের সর্বশেষ উন্নীত হওয়ার মাকাম এবং দায়রায়ে জিল্লিয়া (প্রতবিম্বজাত বৃত্ত) এই মাকামে পৌঁছানোর পর সমাপ্ত হয়। তারপর শুরু হয় নির্ভেজাল 'আসল' এর মাকাম। অথবা আসল ও ছায়ার সংমিশ্রণ। আফরাদগণের একটি দল এই সম্পদ লাভের যোগ্য। অবশ্য কোনো কোনো কুতুব আফরাদদের সোহবতের (সংসর্গের) কারণে এ বিশেষ মাকামে উন্নীত হয়ে থাকেন এবং আসলকে প্রতিবিম্বমিশ্রিতরূপে অবলোকন করেন। কিন্তু মূল আসলে পৌঁছানো অথবা মূল আসলকে তার স্তরের পার্থক্য অনুসারে অবলোকন করা কেবলমাত্র আফরাদদেরই বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এটা আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহ। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে দান করেন। আর আল্লাহ্ই অনুগ্রহের মালিক।

এই দরবেশ 'আকতাবের' মাকামে উন্নীত হলে সারোয়ারে দ্বীন ও দুনিয়া (আলাইহিস্ সালাত ওয়াস্ সালাম) তাঁকে 'কুতুবুল ইরশাদের' ভূষণে ভূষিত করেন এবং এই পদে অধিষ্ঠিত করেন।

তারপর আল্লাহ্তায়ালার বিশেষ অনুগ্রহে আরো উঁচু মাকামে উন্নীত হই এবং এক সময় মিশ্রিত প্রতিবিম্বের আসলে (মূল) উপনীত হই। এই মাকামেও বিগত মাকামগুলোর মতো ফানা ও বাকা (বিলীনতা ও স্থায়ীত্ব) হাসিল হয়। অতঃপর সেখান থেকে আসল মাকামে উন্নীত হয়ে 'আসলের আসল' বা মূলের মূলে উপনীত হই। এই শেষ উরূজ (উর্ধ্বারোহণ) এর সময়, যা দ্বারা আসল মাকামে উন্নীত হওয়া বোঝা যায়, আমি গাওছুল আযম মুহিউদ্দীন শায়েখ আবদুল কাদির কাদ্দাসাল্লাহু সিররুহুর রূহানী সাহায্যপ্রাপ্ত হই। তিনি তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা বলে এই মাকাম অতিক্রম করিয়ে আসলের আসল বা মূলের মূলে পৌঁছে দেন। অতঃপর সেখান থেকে আমাকে দুনিয়ার দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। ফলে, পূর্বেকার মাকামগুলো আবার ফিরে আসতে থাকে।

আর এই দরবেশের নেসবত 'নেসবতে ফরদিয়াত' যা শেষ মাকামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, সে তার পিতা (খাজা আবদুল আহাদ কুদ্দিসা সিররুহু) থেকে লাভ করেন। জয়বাধারী অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী এক বুজর্গের (হজরত শাহ্ কামাল কায়থলী কুদ্দিসা সিররুহু) কাছ থেকে তাঁর পিতা হাসিল করেন। কিন্তু নিজের দুর্বল অন্তর্দৃষ্টির কারণে এবং এই নেসবতের ক্ষীণ প্রকাশের ফলে সুলুকের রাস্তা অতিক্রম করার পূর্বে এই ফকির উক্ত নেসবত সম্পর্কে কিছুই জানতে পারেনি। এমনকি সে আদৌ জানতো না যে, সে ওই মর্যাদামণ্ডিত নেসবতের অধিকারী।

এ দরবেশ হজরত খিযির (আলাইহিস্ সালাত ওয়াস্ সালাম) এর রূহানী সাহায্যে ইলমে লাদুন্নী হাসিল করে। কিন্তু এ অবস্থা ততদিন বজায় থাকে, যতদিন না আমি কুতুবের মাকাম অতিক্রম করি। অতঃপর উক্ত মাকাম অতিক্রম করে উচ্চতর মাকামে উপনীত হওয়ার পর স্বীয় হকিকতের মাধ্যমে ইলম বা জ্ঞান লাভ হতে থাকে, এমতাবস্থায় অন্য কোনো কিছুই এই মাকামের অন্তরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় না।

৭. এরই পূর্বে তিনি বর্ণনা করেছিলেন— এ দরবেশ নুজুল (অবতরণ) এর সময় যা ছায়ের আনিল্লাহ বিল্লাহ বা আল্লাহ্র নিকট থেকে সায়ের বা আত্মিক ভ্রমণ হিসেবে পরিচিত, অন্যান্য তরিকার মাশায়েখদের মাকামসমূহও অতিক্রম করার সৌভাগ্য লাভ করে প্রত্যেক মাকাম থেকে সে প্রচুর ফায়দাপ্রাপ্ত হয়। প্রত্যেক মাকামের মাশায়েখগণ আমাকে সহযোগিতা করেন এবং স্ব স্ব নেসবতের সারবস্তু আমাকে প্রদান করেন। সর্বপ্রথম আমি চিশতিয়া তরিকার সম্মানিত বুজর্গদের মাকাম অতিক্রম করি এবং সেখান থেকে বহু কিছু হাসিল করি। এ সকল মাশায়েখদের মধ্য থেকে আমি সর্বাধিক সাহায্যপ্রাপ্ত হই হজরত খাজা কুতুবুদ্দীন র. এর রূহানী ফয়েজ দ্বারা। সত্য কথা এই যে, তিনি এই মাকামের একজন বিশেষ ব্যক্তিত্ব। বরং এই মাকামের তিনিই নেতা।

অতঃপর আমি কাবরাবিয়াহ (কাদ্দাসাল্লাহু আছরারাহুম) তরিকার বিশিষ্ট বুজর্গদের মাকাম অতিক্রম করি। চিশতিয়া ও কাবরাবিয়া মাকাম দু'টি উরুজের দিক দিয়ে সমমর্যাদাসম্পন্ন। কিন্তু নুজুলের সময় উক্ত মাকামটি তরিকতের রাজপথের ডানে এবং প্রথমটি বামে অবস্থিত; আর রাজপথ বা সিরাত্বল মুসতাক্বিম তাকেই বলে, যার মাধ্যমে কুতুবদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ফরদিয়াতের মাকাম পর্যন্ত উন্নীত হন। অবশেষে নিহায়াতুন নিহায়াহ্ বা চরম প্রান্তে উপনীত হন। আফরাদদের চলার পথ স্বতন্ত্র। কুতুব হওয়া ব্যতীত এ পথে চলা অসম্ভব। ওই মাকামটি মাকামে সিফাত ও উক্ত রাজপথের মধ্যে অবস্থিত। যেনো মাকামটি ওই দুই মাকামের মধ্যে মিলনক্ষেত্রস্বরূপ, যা দুই দিক থেকে ফয়েজ ও বরকত

লাভ করে থাকে। আর প্রথম মাকামটি এই রাজপথের অপর দিকে অবস্থিত, যার সঙ্গে মাকামে সিফাতের ক্ষীণ সম্পর্ক বিদ্যমান।

অতঃপর আমি সোহ্‌রাওয়ার্দীয়া তরিকার সম্মানিত বুজর্গদের মাকাম অতিক্রম করি, যার নেতা ছিলেন হজরত শায়েখ শিহাবউদ্দীন [১] (কাদাসাল্লাহু সিররুহু)। এ পথটি সুন্নতের অনুসরণের নূরে সমুজ্জ্বল এবং মুশাহিদা ফাওকুল ফাওকের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত।

ইবাদতের তওফীক লাভ করা এই মাকামের অনুকূল অবস্থা। কিছু সালেক, যারা এখনো এই মাকাম পর্যন্ত পৌঁছেননি, অথচ তারা নফল ইবাদতে ব্যস্ত এবং তাতেই সন্তুষ্ট, তারাও এই মাকামের সাথে সম্পর্ক রাখার ফলে এ মাকামের কিছু অংশ পেয়ে থাকেন। কেনোনা নফল ইবাদাতের দ্বারা কোনো মাধ্যম ছাড়াই এই মাকামের সাথে সম্পর্ক রয়েছে। এরূপ সম্পর্ক অন্যান্যদের সাথেও রয়েছে। চাই তিনি মুবতাদী (প্রারম্ভিক সাধক) হন, অথবা হন মুনতাহী (সুলুকসমাপ্তকারী) এই মাকামের সাথে সম্পর্ক রাখা হেতু উক্ত নেয়ামত পেয়ে থাকেন।

আর এই সোহরাওয়ার্দী মাকাম বিস্ময়কর নেয়ামতে পরিপূর্ণ। যে নূর এ মাকামে পরিদৃষ্ট হয়, অন্যান্য মাকামে তা খুব কমই দেখা যায়। এই মাকামের মাশায়েখগণ রসুলুল্লাহ্‌ স. এর পূর্ণ অনুসরণের ফলে অত্যন্ত উচ্চ মর্তবার অধিকারী এবং এই কারণে তাঁরা সমকালীন অন্যান্য তরিকাপন্থী মাশায়েখদের মধ্যে বিশেষ সম্মানিত। উক্ত বুজর্গগণ এই মাকামে যা লাভ করেছেন, তা অন্য কোথাও পাননি, যদিও উরুজের দৃষ্টিতে ওই মাকামগুলি, এই মাকাম থেকে অধিক উন্নত।

অতঃপর আমি জয্‌বার মাকামে অবতরণ করি। এই মাকামটি অসংখ্য প্রকার জয্‌বা দ্বারা পরিপূর্ণ। তৎপর সেখান থেকেও নিচে নুযুল (অবতরণ) হলো। নুযুলের (অবতরণের) সর্বশেষ স্তর— মাকামে কলব, যা হকিকতে জামেআ' বা সমস্ত মূলতত্ত্বের সমষ্টি। এরশাদ ও তাকমীলের সম্পর্ক এই মাকামে অবতরণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। শেষ পর্যন্ত আমার এই মাকামের নুযুল অর্জিত হলো। এই মাকামে স্থিতিশীল হওয়ার আগেই পুনরায় আমার উরুজ নসীব হয়। এই স্তরে আমি আসলকে ছায়ার মতো পিছনে ফেলে আসি। এই উরুজের মধ্যে যা কলবের মাকামে নসীব হয়েছিল তা আমার মাঝে স্থিতিশীল হলো ও পরিপক্কতা লাভ করলো।

৮. ইতোপূর্বে হজরত মোজাদ্দেদ র. এভাবে তাঁর নিজের সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছেন— ওই রূপ কুতুবে এরশাদ খুব কমই পাওয়া যায়, যিনি ফরদিয়াতের

---

১. শায়েখ উমার শিহাবউদ্দীন সোহরাওয়ার্দী র. তাঁর নিজের চাচা আবু নজীব সোহরাওয়ার্দী র. এর খলিফা ছিলেন। তিনি বাগদাদে ৫৩৯ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬৩২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তাঁর লিখিত গ্রন্থ আওয়ারিফুল মাআরিফ তাসাউফ জগতের শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ। শায়েখ সাদী র., হজরত বাহাউদ্দীন র. এবং জাকারিয়া মুলতানী র. তাঁর প্রসিদ্ধ খলিফাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

কামালাতেরও অধিকারী। বহুকাল ও বহু শতাব্দী অতিক্রান্ত হওয়ার পরেই কেবল এই ধরনের কোনো মুক্তাসদৃশ দুর্লভ ওলী জন্মগ্রহণ করেন। অন্ধকার পৃথিবী তাঁর বিকাশের নূরে আলোকিত হয় এবং তাঁর এরশাদ ও হেদায়েতের নূর পুরো পৃথিবীকে সমাচ্ছন্ন করে। আরশ থেকে ফরশ পর্যন্ত যে কেউ রুশদ্, হেদায়েত, ইমান এবং মারেফাত লাভ করুক না কেনো, তাঁর বদৌলতেই হাসিল করে থাকে এবং তাঁর দ্বারাই উপকৃত হয়। তাঁর মধ্যস্থতা ব্যতীত কেউই এ সম্পদ লাভে সক্ষম হয় না।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, তাঁর হেদায়েতের নূর পুরো পৃথিবীকে বিশাল সমুদ্রের মতো পরিবেষ্টন করে আছে। আর মনে হয়, সে মহাসমুদ্রটি জমাটবদ্ধ, নিশ্চল। যে কেউ সেই বুজর্গের প্রতি মনোযোগী হয় এবং তাঁর সঙ্গে আন্তরিকতা বজায় রাখে, অথবা তিনি যদি কোনো মুরিদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তখন এ তাওয়াজ্জোহের সময় উক্ত মুরিদের অন্তরের একটি বাতায়ন খুলে যায়। তখন সেই মুরিদ স্বীয় বিশুদ্ধ উদ্দেশ্য ও মনোযোগ অনুযায়ী উক্ত পথে মহাসমুদ্রতুল্য বুজর্গের কাছ থেকে ফয়েজ আহরণ করে পরিতৃপ্ত হয়।

একই রূপে যে ব্যক্তি সব সময় আল্লাহ্র জিকিরে মশগুল কিন্তু ওই বিশিষ্ট বুজর্গের প্রতি অমনোযোগী, অথচ তাঁর অমনোযোগিতা ওই বুজর্গকে অস্বীকার করার ফলে নয় বরং তাঁকে না জানার কারণে— এমতাবস্থায় সেই ব্যক্তিও ফয়েজপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। কিন্তু এ ফয়েজপ্রাপ্তি দ্বিতীয় অবস্থার চেয়ে প্রথম অবস্থায় অধিক হয়ে থাকে।

অবশ্য যে ব্যক্তি ওই বুজর্গকে অস্বীকার করবে কিংবা উক্ত বুজর্গ যার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন, এমতাবস্থায় সেই ব্যক্তি যতোই আল্লাহ্র জিকিরে মশগুল থাকুক না কেনো, সে অবশ্যই প্রকৃত পথ ও হেদায়েত থেকে বঞ্চিত হবে। উক্ত কুতুবে এরশাদকে অস্বীকার করার ফলেই তার ফয়েজপ্রাপ্তির রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়— চাই তিনি তাকে ফয়েজ পৌঁছানোর ইচ্ছা করুন অথবা কোনোরূপ ক্ষতি করার ইচ্ছা করুন— সে ব্যক্তি কখনো আসল হেদায়েত পাবে না। সে যা কিছু হাসিল করবে, তা হবে হেদায়েতের বাহ্যিক রূপ মাত্র। হকিকত ব্যতীত কেবল সুরত বা বাহ্যিক রূপ মানুষের খুব কমই উপকারে আসে।

আর যারা কুতুবে এরশাদের সঙ্গে এখলাছ ও মহব্বত রাখবে, তারা যদি আল্লাহ্তায়ালার জিকিরে সব সময় মশগুল নাও থাকে, তবুও তাঁদের প্রতি ভক্তি ও মহব্বত রাখার কারণে তারা রুঁশদ্ ও হেদায়েতের নূর প্রাপ্ত হবে।

৯. হজরত মোজাদ্দেদ র. কে রসুলেপাক স. এর অধিকৃত সাতটি স্তরের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এটি তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এই সাতটি স্তরের বিস্তারিত বর্ণনা মকতুবাত দ্বিতীয় খণ্ডে ৫০ নং মকতুবে উল্লেখ করা হয়েছে।

১০. হজরত মোজাদ্দেদ র. এর উপর নবীগণের যোগ্যতার নিদর্শন তাঁর মাবদায়ে তায়াইয়্যুন (নিরুপণের সূচনা)। সব কিছুর সম্পর্ক যে মহান আল্লাহ্র সঙ্গে অর্থাৎ মুহিব্বিয়াত (প্রেমিকত্ব), মাহবুবিয়াত (প্রেমাস্পদত্ব) এবং খুল্লাত (বন্ধুত্ব) এবং সালেকগণের যোগ্যতা যে কোনো নবীগণের সাথে সংশ্লিষ্ট— তা প্রকাশ করে দেওয়া হয়েছিলো। অতঃপর ওই অভিজ্ঞতার পারস্পরিক পার্থক্যের বিষয়টিও প্রকাশ করে দেওয়া হয়েছিলো। তিনি বলতেন, অমুক ব্যক্তি মুসাবী সম্পর্কযুক্ত, অমুক ব্যক্তি বেলায়েতে ঈসাবীর, অমুক ব্যক্তি মোহাম্মদীআল মাশরাব, অমুক ব্যক্তি অমুকের নিকটবর্তী, অমুকের অবস্থান বেলায়েতের কেন্দ্রবিন্দুতে এবং অমুক ওই দায়েরার নিকটবর্তী ইত্যাদি। এ সবই ছিলো তাঁর উচ্চ মাকাম ও মহান বৈশিষ্ট্য।

১১. তাআইয়্যুনে অজুদী— যে বিষয়ে আজ পর্যন্ত কোনো আরেফ মুখ খোলেননি, তাঁর প্রতি সেই বিষয়টিও প্রকাশ করে দেওয়া হয়েছিলো। এই উচ্চ মাকামের গুপ্ত রহস্য সম্পর্কে জ্ঞান দান করে তাঁকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। যেমন মকতুবাত শরীফের তৃতীয় খণ্ডে ৮৯ নং মকতুবে বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে। অন্যান্য মকতুবাতেও এ সকল কথা এসেছে।

১২. হজরত মোজাদ্দেদ র. কে ক্বলবের পাঁচটি স্তরের (এ বিষয়ে মাবদা ওয়া মাআদ গ্রন্থে ১২ নং মিনহাতে বর্ণনা করা হয়েছে) গুপ্তরহস্যের বিষয়ে জ্ঞান দান করা হয়েছে। বিশেষ করে উচ্চ মর্যাদার ক্ষেত্রে কলবের পাঁচটি স্তর বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত। এই মর্যাদা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের ক্ষেত্রে একটি সুমহান মর্যাদা এবং উদ্দেশ্য সাধনের শেষ প্রান্ত। এগুলোও রসুল স. এর মহান বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত। আর তাঁকে রসুল আনওয়ার স. এর প্রতিনিধিত্বের স্তর পর্যন্ত পৌঁছানো হয়েছিলো। তাঁকে এমন মাকামে উন্নীত করা হয়েছিলো, যার উপরে অন্য কোনো মাকাম ছিলো না এবং আকতাব, আওতাদ পর্যায়ভুক্তদেরকে তাঁর বেলায়েতের অধীনস্থ রাখা হয়েছিলো। যেমন মাবদা ওয়া মাআদ গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেছেন—

যখন এমন কোনো আরেফ, যিনি মারেফাতের পূর্ণ অধিকারী এবং যাঁর শুহুদ (দর্শন) নির্ভুল— এ মাকামে পৌঁছান, যার অস্তিত্ব দুর্লভ এবং মর্যাদায় তিনি সম্ভ্রান্ত, তখন ওই আরেফ সমগ্র জাহান এবং সমস্ত বিকাশমান বস্তুর কলব স্বরূপ হয়ে যান। এরূপ ব্যক্তিই মোহাম্মদী স. এর সত্যিকার প্রতিনিধি এবং দাওয়াতে মোস্তফার মর্যাদায় বিভূষিত হন। তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম।

বস্তুত সকল কুতুব, আওতাদ ও আবদাল তাঁর বেলায়েতের বৃত্তের মধ্যে প্রবিষ্ট হন এবং আফরাদ ও আউলিয়াদের সকলেই তাঁর হেদায়েতের আলোকে হন স্নাত। এরূপ ব্যক্তিই রসুলুল্লাহ স. এর স্থলাভিষিক্ত। তিনি আল্লাহ্র হাবীব সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হেদায়েত থেকে হেদায়েতপ্রাপ্ত হন।

এ মহান দুষ্প্রাপ্য নেসবত মুনতাহী বা শেষপ্রান্তে উপনীত ব্যক্তিদের জন্য নির্ধারিত। মুরিদদের পক্ষে এই কামালত অর্জন সম্ভব নয়। এটাই মারেফাতের সর্বোচ্চ পূর্ণতা এবং সর্বশেষ স্তর, যার উপর আর কোনো স্তর নেই এবং এর চেয়ে অধিক মর্যাদাশীল আল্লাহ্র দান আর কিছুই নেই। এই পর্যায়ের কোনো কামেল আরেফ যদি হাজার বছর পরেও পাওয়া যায়, তবু তাকে গনিমত মনে করতে হবে। তাঁর বরকতই দীর্ঘদিন (চলমান) থাকে। ইনিই সেই কামেল আরেফ— যার কথাবার্তা প্রতিষেধকতুল্য এবং দৃষ্টি রোগমুক্তির কারণ। হজরত ইমাম মাহ্দী আ. রে. এই উত্তম উম্মতের মধ্যে এই মহান নেসবতের সঙ্গে অতিসত্বর আগমন করবেন। এ যে আল্লাহ্র অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ প্রদান করেন। আর আল্লাহ্ তো মহান অনুগ্রহকারী।[১]

১৩. হজরত মোজাদ্দেদ র. এর প্রতি বেলায়েতের তিনটি স্তর উন্মোাচিত করা হয়েছে— বেলায়েতে সোগরা, বেলায়েতে কোবরা এবং বেলায়েতে উল্‌ইয়া। এ তিনটি স্তরের বিস্তারিত বিবরণ মকতুবাত শরীফে উল্লেখ[২] করা হয়েছে।

১৪. হজরত মোজাদ্দেদ র. এর প্রতি হকিকতে কোরআন, হকিকতে কাবা এবং হকিকতে বায়তুল মাকদিসের সূক্ষ্মতত্ত্ব উন্মোচিত করে দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়টিও প্রকাশ করা হয়েছে যে, এক হাজার বছর পরে হকিকতে আহমদীর সঙ্গে হকিকতে মোহাম্মদীকে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। এর বিস্তারিত বর্ণনা তিনি নিজেই উল্লেখ[৩] করেছেন।

১৫. হজরত মোজাদ্দেদ কুদ্দিসা সিররুহুর প্রতি প্রকাশ করা হয়েছে যে, এ পৃথিবীতে যদিও দর্শন (মহাপ্রভুর দর্শন) হয় না, তথাপিও তা অদর্শনও নয়। তিনি উল্লেখ করেছেন— মহাপ্রভুর দর্শন সেই মহাসম্পদ, যা সাহাবায়ে কেরামের জামানার পর খুব অল্পসংখ্যক লোকেরই নসীব হয়েছে। আজও অনেকে এ বিষয়টি অবাস্তব বলে ধারণা করে এবং অধিকাংশ লোকই একথা গ্রহণ করে না, তবুও এই ফকির একথা প্রকাশ করছে। চাই অপরিণামদর্শী লোকেরা একথা কবুল করুক আর না-ই করুক। এ পবিত্র নেসবতটি, এ বিশেষত্বের সাথে আগামীতে হজরত মাহদী আলাইহি রেদওয়ানের সময় প্রকাশিত হবে[৪]।

১৬. হজরত মোজাদ্দেদ র.কে মহান আল্লাহ্ 'হক্কুল ইয়াকীন' দ্বারা ধন্য করেছেন। সুফীগণের পরিভাষায় যা হক্কুল ইয়াকীন, সে বিষয়টি তাঁর কাছে আইনুল

---

১. মাবদা ওয়া মাআদ (মিনহা ১২)
২. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন মকতুবাত নং ২৬/১, ২৮৭, ৩০২, ৩/২।
৩. দেখুন মকতুবাত নং ৭৭/৩, ১২৪, ৭২/২।
৪. মাবদা ওয়া মাআদ মিনহা ৯ এবং মকতুবাত ৪/২ দেখুন।

ইয়াকীন। এ বিষয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন— আইনুল ইয়াকীন এবং হক্কুল ইয়াকীন বিষয়ে এই দরবেশ কী আর বলবে। যদি বলি, তাহলে তা অনুধাবন করার মতো কে আছে? আর সে কী-ই বা হাসিল করতে পারবে। মারেফাতের পরিসীমা বেলায়েতবহির্ভূত। বাহ্যিক আলেমগণের মতো বেলায়েতধারীগণও এই বিষয়টি অনুধাবনে অক্ষম। এই এলেম আনওয়ারে নবুওয়াত (সল্লা সাহিবিহাস্ সলাত্ ওয়াস্ সালাম) এর ভাণ্ডার থেকে সংগৃহীত, যা দ্বিতীয় সহস্রাব্দের সংস্কারক দ্বারা যথার্থ যোগ্যতা ও উত্তরাধিকারের কারণে সতেজ হয়েছে। [১]

১৭. হজরত মোজাদ্দেদ কুদ্দিসা সিররুহুর প্রতি জয্বা ও সুলুক ব্যতীত আর একটি তরিকা প্রকাশ করা হয়েছে, যা মিশকাতে নবুওয়াত থেকে সংগৃহীত বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য ৩০১/১ নং মকতুবে দেখুন।

১৮. সরওয়ারে কায়েনাত সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কামালে ইত্তেবার (পূর্ণ অনুসরণের) কারণে হজরত মোজাদ্দেদ র.কে এমন মাকামে উন্নীত করা হয়েছে, যা রেজা মাকামের সাথে সম্পৃক্ত। এই মাকামে তিনি শ্রেষ্ঠ বলেও উল্লেখ করেছেন। বিষয়টি তিনি মকতুবাত শরীফের দ্বিতীয় খণ্ডে ২নং মকতুবে বর্ণনা করেছেন।

১৯. হজরত মোজাদ্দেদ কুদ্দিসা সিররুহুকে 'খাজিনাতুর রহমাত' (রহমতের ভাণ্ডার) বানানো হয়েছে। যেমন তিনি মকতুবাত শরীফ প্রথম খণ্ডে ৩১১ নং মকতুবে 'হায়ে দু চশমী' এর হকিকত বর্ণনার ধারাবাহিকতায় পরোক্ষভাবে উল্লেখ করেছেন।

২০. হজরত মোজাদ্দেদ কুদ্দিসা সিররুহুকে মহান আল্লাহ্ 'মাকামে সাবেকীন' (পূর্ববর্তী মাকামধারী) যা আসহাবে ইয়ামীনের স্তর থেকে অধিক মর্যাদাপূর্ণ, তা-ও দান করা হয়েছে।

২১. হজরত মোজাদ্দেদ কুদ্দিসা সিররুহুকে মহান আল্লাহ্ 'মুকাল্লাম' ও 'মুহাদ্দাস' (কথোপকথনকারী) বানিয়েছেন। যেমন তিনি এক মকতুবে উল্লেখ করেছেন— উল্লেখ্য, মহান আল্লাহ্ কখনো কখনো মধ্যস্থতা ব্যতীত বান্দাদের সাথে কথা বলে থাকেন। যেমন কোনো কোনো নবীর সাথে বলেছেন এবং কখনো কখনো আম্বিয়া আলাইহিস্ সালামগণের পূর্ণ অনুসারীদের মধ্য হতে কারো কারো উত্তরাধিকার সূত্রে এ মাকাম হাসিল হয়ে যায়। যদি এ উপায়ে উম্মতের কোনো ব্যক্তির কালাম (কথোপকথন) অধিক হাসিল হয়, তখন তাঁকে মুহাদ্দাছ (কথোপকথনকারী) বলা হয়। যেমন হজরত ওমর রা.। কালামে এলহাম (অন্তরে উদয়পূর্ণ বাক্য) কলবী এত্ক্বা (অন্তরে তাক্বওয়া) থেকে ভিন্ন। ফেরেশতাদের সাথে

১. মকতুবাত ৪/২ দেখুন।

যে কথোপকথন হয়, তার স্বরূপ এমন নয়। এই কালামের সম্বোধনকারী ব্যক্তি শুধু ওই ইনসানে কামেল (পূর্ণতাপ্রাপ্ত মানব) যিনি আলমে আমর, আলমে রূহ ও নফস এবং ইলাহে আকল ও খিয়ালের সমষ্টি। মহান আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাঁর রহমত দ্বারা সুনির্দিষ্ট করেন এবং তিনি বড়ই মেহেরবান। [১]

২২. হজরত মোজাদ্দেদ কুদ্দিসা সিররুহু কে আম্বিয়া কেরামগণের বেলায়েত দান করে ধন্য করা হয়েছে এবং বেলায়েতে জিল্লী (প্রতিবিম্বধারী বেলায়েত)কে বেলায়েতে আসলী (মূল বেলায়েত) এর সাথে সংযোগ করে দেওয়া হয়েছে। [২]

২৩. হজরত মোজাদ্দেদ কুদ্দিসা সিররুহুর প্রতি সায়েরে আফাকী ও সায়েরে আনফুসী ব্যতীত অতিরিক্ত আরেকটি সায়ের উন্মোচন করা হয়েছে । [৩]

২৪. হজরত মোজাদ্দেদ কুদ্দিসা সিররুহুকে কাইয়্যুমিয়্যাতের নেসবত দান করা হয়েছে। মকতুবাতে এর উল্লেখ করা [৪] হয়েছে।

২৫. হজরত মোজাদ্দেদ র. কে কুতুবুল আকতাব বানানো হয়েছে। সমগ্র আকাশ এবং পৃথিবীর মধ্যে তাঁরই মাধ্যমে ফয়েজ পৌঁছায়। বিষয়টি অস্বীকার করার নয়। কিন্তু যারা অস্বীকার করে, তারা বঞ্চিত হয় [৫]।

২৬. মহান আল্লাহ্ হজরত মোজাদ্দেদ র. এর কোনো কোনো মুরিদকে তাঁর মধ্যস্থতায় কুতুবিয়াতের স্তরের ফয়েজ দান করেন।

২৭. হজরত মোজাদ্দেদ র. বলতেন, আমার প্রতি এই বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে যে, এই সিলসিলা আমার রূহানী সন্তানদের মাধ্যমে কেয়ামত পর্যন্ত জারি (বিদ্যমান) থাকবে ইনশাআল্লাহ।

প্রকাশ থাকে যে, হজরত মোজাদ্দেদ র. এর মর্যাদার বিবরণ কাগজকলমে লিপিবদ্ধ করে শেষ করা সম্ভব নয়, প্রয়োজনের তাগিদে এতোটুকু উল্লেখপূর্বক এখানেই ক্ষান্ত করা হলো। তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে কিছু বিবরণ ৬ষ্ঠ হাজ্‌রাত অধ্যায়ে তাঁর মুকাশিফাতের বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। হজরত মোজাদ্দেদ র. এর কয়েকজন সহচর ও খলিফা সম্পর্কেও পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

---

১. মকতুবাত ৫১/২

২. মকতুবাত ৩০১/১ দেখুন।

৩. মকতুবাত ২৬/২, মাবদা ওয়া মাআদ, মিনহা ৯ দেখুন।

৪ ও ৫. ২-১১/২য় খণ্ড, ৯৩/২য় খণ্ড মকতুব নং ৮০/৩য় খণ্ড মাবদা ওয়া মাআদ গ্রন্থে প্রথমাংশ এবং মকতুবাত নং ২৫৬/১ম খণ্ডও দেখুন।

পঞ্চম হাজ্‌রাত

হজরত মোজাদ্দেদ র. এর আমল, ইবাদত ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা

শীতে-গ্রীষ্মে গৃহে এবং ভ্রমণে হজরত মোজাদ্দেদ কুদ্দিসা সিররুহুর অভ্যাস এরূপ ছিলো— অর্ধেক রাতের পর তিনি জাগ্রত হয়ে সুন্নত দোয়া পড়তেন। এরপর ইস্তেনজা করার জন্য প্রথমে বাম পা রেখে শৌচাগারে প্রবেশ করতেন। অতঃপর ডান পা রেখে এ সময়ের সুন্নত দোয়া পাঠ করতেন। অতঃপর তিনি বাম পায়ের উপর অধিক ভর করে বসতেন। অতঃপর প্রয়োজন সম্পন্ন করতেন। এরপর কুলুখ ব্যবহার করে পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করতেন। তারপর কেবলামুখী হয়ে ওজু করার জন্য বসতেন। ওজুতে কারো সাহায্য নিতেন না। বাম হাতে পানির পাত্র নিয়ে ডান হাতে ঢালতেন, পরে বাম হাতে ঢালতেন। পরে দুই হাত মলে নিয়ে হাতের আঙ্গুলগুলো খেলাল করতেন এবং কুলি করার সময় মেসওয়াক ব্যবহার করতেন। তিনবার ডানে, তিনবার বামে, তিনবার জিহ্বার উপরে ঘুরাতেন। যদি এর থেকে বেশী করতেন, তাহলে যথাযথ নিয়মের অনুসরণ করতেন। প্রথমে ডান পাশের উপরের দাঁতে, তারপর নিচের দাঁতে মেসওয়াক ঘোরাতেন। তারপর বাম পাশের উপরের দাঁতে, তারপর নিচের দাঁতে ঘোরাতেন। প্রত্যেক ওজুতে তিনি অবশ্যই মেসওয়াক ব্যবহার করতেন। ব্যবহার শেষে লেখকের কলম রাখার মতো করে মেসওয়াক কখনো কানের উপরে রাখতেন। অধিকাংশ সময় খাদেমের কাছে দিতেন। তিনি তাঁর পাগড়ীর মধ্যে মেসওয়াক রেখে দিতেন। কুলির পানি তিনি সব সময় দূরে নিক্ষেপ করতেন। কুলি ও নাকে পানি ব্যবহারের সময় প্রতিবার নতুন পানি ব্যবহার করতেন। তারপর মুখমণ্ডলের উপর আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে কপালের উপর থেকে পানি সরিয়ে দিতেন। ডান হাত দিয়ে ডান পাশের মুখমণ্ডল এবং বাম হাত দিয়ে বাম পাশের মুখমণ্ডলে এমনভাবে ঘোরাতেন, যেনো শুরু ডান হাত দিয়ে হয়। মুখাবয়ব ধৌত করার সময় তাঁর হাত সামান্য বাঁকা রাখতেন, যেনো মাথার এক চতুর্থাংশ উন্মুক্ত হয় এবং তা ধৌত করা যায়। তিনি মুখমণ্ডলে পানি এমনভাবে ঢালতেন, যেনো কাপড় অথবা শরীরের কোথাও এক বিন্দু পানি না পড়ে। প্রত্যেক বার পানি পড়া বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত মুখমণ্ডলে হাত ঘোরাতেন যেনো কোনো পানির বিন্দু না থেকে যায়, যা কাপড়ে পড়তে পারে। এরপর ডান হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করতেন এবং প্রত্যেক বার হাত এমনভাবে ঘোরাতেন, যেনো কোনো পানির ফোঁটা না থেকে যায়। এভাবে বাম হাতও ধৌত করতেন এবং পানি আঙুলের দিকে ঢালতেন। মাসেহ করার জন্য পানি ডান হাতে নিয়ে বাম হাতে পৌঁছিয়ে দূরে ফেলে দিতেন যেনো মাটি থেকে ছিটকে কাপড়ে না লাগে। সমস্ত মাথা শুরু থেকে পিছন পর্যন্ত

মাসেহ করতেন। মাথার মধ্যস্থানে দুই হাতের আঙুলের পেট দিয়ে মাসেহ করতেন। মাথার পার্শ্বদেশে দু হাতের পাঞ্জা (হাতের তালু) দিয়ে মাসেহ করতেন এবং পিছন থেকে সামনের দিকে ফিরাতেন। এরপর এই পানি তর্জনী আঙ্গুল দিয়ে কানের মধ্যে এবং বৃদ্ধাঙুল দিয়ে কানের বাইরে এবং হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ঘাড় মাসেহ করতেন। অতঃপর ডান ও বাম পা তিন তিন বার করে পায়ের গীরাসহ নলার কিছু অংশ ধৌত করতেন এবং প্রত্যেক বার ওই স্থানে এতোবার হাত ঘোরাতেন যে, শুকিয়ে যাওয়ার মতো হতো। প্রতিটি অঙ্গ ধৌত করার সময় যে সকল সুন্নত দোয়া রয়েছে, তা পড়তেন। ওজু শেষেও তিনি সুন্নত দোয়া পড়তেন। ওজুর অঙ্গসমূহ কাপড় দ্বারা মুছতেন না। এরপর সুন্দর পরিপাটি কাপড় (জায়নামাজ) নিতেন এবং পূর্ণভাবে গাম্ভীর্যের সাথে নামাজের জন্য প্রস্তুত হতেন। প্রথমে সংক্ষেপে দুই রাকাত নামাজ আদায় করতেন। তারপর দীর্ঘ ক্বেরাত দিয়ে তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করতেন। কখনো এমন হতো যে, পবিত্র কোরআনের দুই বা তিন অংশ পড়ে ফেলতেন। কখনো মত্ততাবশত অর্ধেক রাত থেকে নিয়ে ভোর পর্যন্ত একই রাকাতে কাটিয়ে দিতেন। যখন খাদেম ভোর হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সংকেত দিতেন, তখন দ্রুত সংক্ষেপ করে সালাম ফিরাতেন। অধিকাংশ সময় দু'রাকাত করে নামাজ সময় অনুযায়ী কম বেশী করে আদায় করতেন। প্রত্যেক দু'রাকআত নামাজের পরে অত্যন্ত খুশুখুজু (নম্রতা ও বিনয়) এর সাথে একনিষ্ঠভাবে মোরাকাবায় লিপ্ত হতেন। মোরাকাবা শেষে একশত বার ইস্তেগফার, অন্যান্য দোয়া ও দরূদ শরীফ পড়তেন এবং ভোর হওয়া পর্যন্ত মোরাকাবা করতেন। অথবা কলেমা তাইয়্যেবা পাঠ করতেন। সুন্নত অনুযায়ী ভোর হওয়ার পূর্বে কিছু সময়ের জন্য স্বপ্নের ব্যাখ্যা বর্ণনা করতেন। যেনো দুই ঘুমের মধ্যবর্তী তাহাজ্জুদ আদায় করা যায়। ভোর হওয়ার পূর্বে জেগে উঠে নতুন ওজু করতেন। ঘরে সুন্নত নামাজ আদায় করতেন। তারপর কেবলা মুখ হয়ে শুয়ে ডান হাত ডান চিবুকের নিচে রাখতেন। সময় মতো উঠে অধিকসংখ্যক লোকের সাথে জামাতে সালাত আদায় করার জন্য মসজিদে যেতেন। অন্ধকারের শেষ ও আলোর প্রথম অংশে নামাজ আদায় করতেন। নিজেই ইমামতের দায়িত্ব পালন করতেন। লম্বা সূরা (তিওয়ালে মুফাস্সাল) পড়তেন। নামাজ শেষে সুন্নত দোয়া পড়তেন এবং জামাতের দিকে ডানে বামে ফিরে দোয়া করতেন। দোয়া শেষে উভয় হাত মুখের উপর ঘোরাতেন। তারপর তাঁর সহচরদের নিয়ে জিকিরের হালকা বানিয়ে বসতেন এবং বাতেনী ধ্যানে (মোরাকাবায়) নিমগ্ন হতেন। এতো দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ধ্যানে থাকতেন যে, সূর্য এক প্রহর পর্যন্ত উপরে উঠে যেতো। হালকার মাঝে কখনো কখনো তিনি হাফেজদের কাছ থেকে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত শুনতেন। ইশরাকের নামাজ দু'রাকাত লম্বা ক্বেরাতসহ এবং দুই রাকাত সংক্ষিপ্ত ক্বেরাতসহ

আদায় করতেন। নামাজ শেষে দোয়া ইস্তেগফার এবং প্রতি ওয়াক্তের দোয়া পড়তেন। অতঃপর তিনি ভিতরে গিয়ে নিজের ইচ্ছা মতো কোরআন তেলাওয়াত এবং কলেমা তাইয়্যেবা খতমে লিপ্ত হয়ে যেতেন। কখনো এমনও করতেন যে, প্রত্যেক মুরিদকে পৃথক পৃথক ভাবে ডেকে প্রত্যেকের বাতেনী অবস্থার খোঁজ খবর নিয়ে সে অনুযায়ী পরামর্শ দিতেন। অধিকাংশ সময় এরকমই হতো যে, তিনি নিজেই তাঁদের বর্তমান অবস্থা অগ্রিম ব্যাখ্যাসহ বলে দিতেন। প্রয়োজনীয় তরবিয়াত করতেন। অতঃপর মাকাম ও কাইফিয়াত (স্বরূপ) এবং অরিদাত (বিপত্তি) নামসহ জানিয়ে দিতেন এবং কখনো এমন হতো যে, অধিক প্রিয় মুরিদকে ডেকে নিয়ে বিশেষ বাতেনীতত্ত্ব এবং নিজের কাশফের মারেফাত সম্পর্কে বর্ণনা করতেন। এসকল গুপ্ত রহস্যকে উহ্য রাখার জন্য তিনি পূর্ণমাত্রায় সতর্ক থাকতেন। কিন্তু মারেফাতের বর্ণনার সময় এমন মনে হতো যে, তাঁর নিজের এলকা ও তাঁর হালের (অবস্থা) বর্ণনা করছেন। অনেক সময় এমনও হয়েছে যে, যখন তাঁর প্রিয়জনেরা তাঁর পবিত্র জবান থেকে অতি মূল্যবান মারেফাত শুনতেন, তখন তাঁর তাওয়াজ্জোহের বরকতে তিনি নিজেকে ওই মারেফাতের সাথে সম্পৃক্ত পেতেন। অধিকাংশ সময়ই তাঁর সোহবত নিরবতার সাথেই হতো। তাই তিনি তাঁর প্রিয়জনদের সঙ্গে অথবা অন্যদের সাথে থাকতেন। তাঁর ভক্তদের ভক্তি ও ভয়ের কারণে জোরে নিঃশ্বাস ফেলারও কেউ সাহস পেতো না। তাঁর মহিমা এমনই ছিলো যে, কোনো ঘটনার বিবৃতি এবং তার স্বরূপ বহুবিধ ভিন্নতা সত্ত্বেও তাঁর থেকে বিরক্তির চিহ্ন কখনো প্রকাশ পেতো না। সাধারণতঃ আবেগ, উত্তেজনা, চিৎকার, বিলাপ তাঁর মধ্যে কখনোই পরিলক্ষিত হতো না। কিন্তু ঘটনাক্রমে যা ঘটতো তা ছিলো আকস্মিক। কোনো কোনো সময় তাঁর মধ্যে ক্রন্দনরত অবস্থা দেখা যেতো। এ সময় চোখ হয়ে যেতো অশ্রুময় এবং কখনো গুরুত্বপূর্ণ কোনো ঘটনা বর্ণনার সময় তাঁর অবয়বের আকৃতিতে পরিবর্তন দেখা যেতো।

যখন দিবসের প্রথমভাগ শেষ হয়ে যেতো, তখন তিনি চাশতের আট রাকাত নামাজ আদায় করতেন। কখনো এমন অবস্থাও হতো যে, তিনি চার রাকাত নামাজ আদায় করতেন। তারপর খাবার খেতেন। খাবার গ্রহণের সময় দেখা যেতো অধিকাংশ সময় তাঁর দরবেশ, মুরিদ ও খাদেমগণের খাদ্যবণ্টনের তদারকিতেই চলে যেতো। এর মধ্যে তিনি তিন আঙ্গুল দিয়ে খাদ্য লোকমা গ্রহণ করতেন। কখনো পাত্র থেকে কিছু মুখে নিয়ে নিতেন। কেবল স্বাদই গ্রহণ করতেন। এ সময় এমনই মনে হতো যে, তাঁর খাদ্য গ্রহণের কোনো প্রয়োজন নেই। মনে হয় তিনি এজন্য খেতেন যে, খাবার গ্রহণ করা সুন্নত। আম্বিয়া আ. গণ কেউই খাদ্যগ্রহণ থেকে বিরত থাকেননি। খাদ্যগ্রহণের সময় তিনি সুন্নত

নিয়মে বসতেন। অর্থাৎ কখনো দুই হাঁটু খাড়া করে বসতেন। আবার কখনো ডান পা বাম পায়ের উপর, কখনো ডান রান বাম রানের উপর রাখতেন। খাদ্যগ্রহণ শেষে সুন্নত দোয়াসমূহ পড়তেন। সাধারণের নিয়ম অনুযায়ী খাবার পর হাত উঠিয়ে দোয়া করা তাঁর থেকে দেখা যায়নি। কেনোনা এটা সুন্নত নয়।

খাবার গ্রহণের পর কিছু সময়ের জন্য তিনি কায়লুলা (বিশ্রাম) করতেন। ইতোমধ্যে সূর্য হেলে যেতো, মুয়াজ্জিন আজান দিতো। মুয়াজ্জিনের 'আল্লাহুআকবার' বলার সাথে সাথে তাঁর ঘুম ভেঙে যেতো। তিনি স্বাভাবিক হয়ে ব্যস্ততার সাথে বাইরে আসতেন। বিলম্ব করতেন না। আজান শুনতেন আর সাথে সাথে আজানের বাক্যগুলো আবৃত্তি করতেন। কিন্তু হাইয়্যা আলাস্ সালাহ্ ও হাইয়্যা আলাল ফালাহ্ এর স্থলে লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ্ পড়তেন। আজান শেষে দোয়া পড়তেন। দোয়া পড়ার পর উঠতেন। ওজু করতেন। অতঃপর পাক-পবিত্র পোশাক পরিধান করে মসজিদে আসতেন। প্রথমে দু' রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামাজ আদায় করতেন। এর পর সুন্নতে জাওয়াল এর চার রাকাত নামাজ দীর্ঘ সূরা দিয়ে আদায় করতেন। তারপর জোহরের চার রাকাত সুন্নতে মোয়াক্কাদা নামাজ আদায় করতেন। তারপর যখন মুকাব্বির ইকামত বলতেন, তখন তিনি নিজেই ইমামতির দায়িত্ব পালন করতেন এবং দীর্ঘ সূরা দিয়ে ক্বেরাত (তিওয়ালে মুফাস্সাল) পড়তেন। ফরজ নামাজ আদায়ের পর অন্য দোয়া ব্যতীত শুধুমাত্র 'আল্লাহুম্মানতাস্ সালাম ওয়ামিন্কাস্ সালাম তাবারকতা ইয়া জাল্ জালালি ওয়াল ইক্রম' পড়েই দাঁড়িয়ে যেতেন। দু'রাকাত সুন্নতে মুয়াক্কাদা নামাজ আদায় করতেন। এরপর চার রাকাত অতিরিক্ত সুন্নত নামাজ আদায় করতেন। এরপর ফরজ নামাজের পরে যে সকল সুন্নত দোয়াসমূহ রয়েছে তা পড়তেন। তারপর সকলের দিকে মুখ করে বসতেন এবং মহফিলের পরিবেশ বানিয়ে নিতেন। পবিত্র কোরআনের হাফেজ থেকে তেলাওয়াত শ্রবণ করতেন। অতঃপর মুরিদানদের প্রতি তাওয়াজ্জোহ্ দিতেন এবং মোরাকাবা করতেন। এরপর তিনি দু'একটি বিষয়ের উপর আলোচনা রাখতেন। ইতোমধ্যে আসরের ওয়াক্ত হয়ে যেতো। তিনি নতুন ওজু করার জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন। ছায়া আসলি (মূল ছায়া) দ্বিগুণ হয়ে যাবার পর প্রথম ওয়াক্তেই তিনি আসরের নামাজ আদায়ের জন্য মসজিদে আগমন করতেন। অতঃপর দু'রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ ও পরে চার রাকাত সুন্নতে গায়রে মুয়াক্কাদা আদায় করতেন। তিনিই ইমামতের দায়িত্ব পালন করতেন এবং বড় জামাতের সঙ্গে আসরের নামাজ আদায় করতেন। এরপর ওই সুন্নত দোয়াসমূহ, যা ফরজ নামাজের পরে পড়া হয়, তা পড়তেন। তারপর কখনো জামাতের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসতেন। মুরিদগণ বৃত্তাকারে বসতেন, হাফেজ কোরআন পাক তেলাওয়াত করতেন। যখন তিনি ও মুরিদগণ ধ্যানমগ্ন হতেন, ইত্যবসরে তিনি বাতেনীভাবে হালের উপর

তাওয়াজ্জোহ্ দিতেন এবং তাদের আত্মিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করতেন। কখনো অন্যান্য নেকআমলেও লিপ্ত হতেন। প্রথম ওয়াক্তেই মাগরিবের নামাজ আদায় করতেন। ফরজ নামাজ আদায়ের পর কোনোরকম বিলম্ব না করে দু'রাকাত সুন্নতে মুয়াক্কাদা নামাজ আদায় করতেন। তারপর ছয় রাকাত নামাজ দুই দুই রাকাত করে দীর্ঘ সূরা দিয়ে আদায় করতেন। এই আওয়াবীন নামাজের মধ্যে সূরা ওয়াকিয়া ও সূরা এখলাস নির্ধারিত ছিল। অন্যান্য সূরাও পড়তেন। পশ্চিম আকাশের লাল ও শাদা আকৃতি দূর হওয়ার পর তিনি এশার নামাজের জন্য মসজিদে আগমন করতেন। ইমাম আজম আবু হানিফা র. এর মতে এটাই সাফাক। এশার ওয়াক্ত নির্ধারণের ক্ষেত্রে সকলে এতে একমত। প্রথমে দু'রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামাজ আদায় করতেন। তারপর চার রাকাত সুন্নতে জায়েদা নামাজ আদায় করতেন। তারপর চার রাকাত ফরজ নামাজ জামাতের সাথে আদায় করে পড়তেন 'আল্লাহুম্মানতাস সালাম ওয়ামিনকাস্ সালাম তাবারকতা ইয়া জাল্‌জালালি ওয়াল্ ইক্‌রাম'। পরক্ষণেই দাঁড়িয়ে যেতেন এবং দু'রাকাত সুন্নতে মুয়াক্কাদা নামাজ পড়তেন। তারপর চার রাকাত মোস্তাহাব নামাজ আদায় করতেন। অতঃপর সূরা আলিফ লাম মীম সিজদাহ্ তেলাওয়াত করতেন। কখনো চার রাকাতে সূরা সেজদা, সূরা তাবারাকাল্লাজী, সূরা কাফিরুন ও সূরা এখলাস পড়তেন। কখনো চার কুলও পড়তেন। বিতির নামাজে সূরা সাব্বিহিসমা, সূরা কাফিরুন এবং সূরা এখলাস পড়তেন এবং দোয়া কুনুত হানাফী ও শাফেয়ী মতে যা হানাফীগণ একত্রিত করেছেন— দুটিকেই তিনি উত্তম বলেছেন। তিনি তার সমন্বয় করতেন। বিতির নামাজ শেষে প্রথমে তিনি দুই রাকাত নামাজ বসে পড়তেন। এই দুই রাকাতে সূরা যিলযাল ও সূরা কাফিরুন পড়তেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি এই দু'রাকাত নামাজ পড়া বাদ দিয়েছিলেন। তিনি বলতেন, এ ক্ষেত্রে মতপার্থক্য রয়েছে এবং সিজদা, যা বিতিরের পরে বলে সর্বজনবিদিত, তিনি তা করতেন না। কেনোনা আলেমগণ এটাকে মাকরুহ বলেছেন। তিনি কখনো কখনো বিতির নামাজ রাতের প্রথম অংশে আবার কখনো শেষ অংশে পড়তেন। তাহাজ্জুদ নামাজের পরে তিনি বিতির নামাজ পুনরায় পড়তেন না। কেনোনা রসুল স. এর বাণী অনুযায়ী এক রাতে দু'বার বিতির নেই। এরপর ঘুমানোর সময় তিনি সূরা, আয়াত, তাসবিহ, দোয়া মাছুরা এবং অন্যান্য দোয়া পড়ে শয়ন স্থানে শুয়ে পড়তেন। তখন চেহারা মোবারক কেবলার দিকে এবং ডান হাত চোয়ালের নিচে রাখতেন। তাঁর নিদ্রাও পূর্ণ হুজুরী, মোরাকাবা এবং বিছাল (মিলন) মোশাহাদা জামালে ইলাহীর সাথেই হতো।

'আজব নিদ্রা যা জাগ্রত অবস্থা থেকেও উত্তম'

তিনি বলতেন— 'আন্ নাওমু আখুল মাউত' অর্থাৎ নিদ্রা মৃত্যুর ভাইসদৃশ। নিদ্রার মধ্যে যে অবস্থার অবতারণা হয়, তা জাগ্রত অবস্থা থেকে উত্তম, যদিও বিবেকবানদের বিবেক এই সূক্ষ্ম বিষয়টি বুঝতে পারেন না। এভাবে মৃত্যুর সময় যে অবস্থা সৃষ্টি হয়, তা নিদ্রাবস্থা থেকে অতি উত্তম। ওই অবস্থা যা কবরের মধ্যে উদ্ভাসিত হয়, তা মৃত্যুর অবস্থা থেকে উত্তম। বরযখ জীবনে যে অবস্থার বিকাশ ঘটে, তা উপরের সকল অবস্থা থেকে উত্তম এবং বেহেশতের মধ্যে যে অবস্থার অবতারণা হবে, তা ওই সব থেকে অতি উচ্চমর্যাদাপূর্ণ।

হজরত মোজাদ্দেদ র. রমজান মাসের শেষ দশদিন মসজিদে এতেকাফ করতেন এবং জিলহজ্ব মাসের শেষ দশদিন নির্জনতা অবলম্বন করতেন। এই দশদিনের ইবাদত জিকির ও রোজা পালনের মাধ্যমে পরিপূর্ণভাবে অতিবাহিত করতে উৎসাহবোধ করতেন। অধিক মাত্রায় দরূদ শরীফ পাঠ করতেন। জুমআর রাতে মুরিদগণের সাথে হাজার বার রসুল স. এর প্রতি দরূদ পাঠ করতেন। জুমআর নামাজ ও দুই ঈদের নামাজে উপস্থিত হতেন। জুমআর নামাজের পরে বা'দাল জুমআ চার রাকাত নামাজ আদায়ের পর দু'রাকাত আখেরি জোহর সুন্নত নামাজ সাবধানতাবশতঃ আদায় করতেন। কেনোনা ফেকাহ শাস্ত্রবিদগণের অভিমত অনুযায়ী এই দুই রাকাত জুমআর শর্তের মধ্যে পাওয়া যায় না। ঈদুল আজহার সময় রাস্তায় তাকবীর উচ্চস্বরে পড়তেন। জিলহজ্ব মাসের প্রথম দশ দিন নির্জনতা, বিনয়, পার্থিব কর্ম ত্যাগ, রোজা পালন ও রাত্রি জাগরণ করে ইবাদত করতেন। হাজীদের মতো ওই সময়ের মধ্যে চুল, নখ কাটতেন না। কিন্তু যে সকল লোক আরাফার দিন জঙ্গলে গিয়ে মাথার চুল ফেলে দিয়ে হাজীদের মতো দু'রাকাত নামাজ আদায় করতেন, তিনি সেরকম করতেন না। জিলহজ্ব মাসের দশম দিনে ইশার নামাজ এবং ফজর নামাজের দ্বিতীয় রাকাতে সূরা আল ফাজর তেলাওয়াত করতেন। এভাবে সারা মাস পড়ে যেতেন। তিনি সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের সময়ের নামাজও আদায় করতেন। সফরে ও গৃহে সর্বাবস্থায় তিনি বিশ রাকাত তারাবীর নামাজ যথাযথভাবে আদায় করতেন। রমজান মাসে কমপক্ষে তিনবার পবিত্র কোরআন খতম করতেন। প্রত্যেক চার রাকাত তারাবী নামাজের পরে তিনবার সুবহানাজিল মুলকি ওয়াল মালাকুতি....... এই দোয়া পড়তেন। তিনি যেহেতু কোরআনের হাফেজ ছিলেন তাই পরবর্তী দিনগুলোতে কোরআন তেলাওয়াতে মগ্ন থাকতেন। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত শ্রবণের মজলিসও যথানিয়মে প্রচলিত ছিলো। নামাজে ও অন্যান্য সময় তিনি পবিত্র কোরআন এমনভাবে তেলাওয়াত করতেন, মনে হতো পাক কালাম তেলাওয়াতের সঙ্গে সঙ্গে তিনি যেনো তার অনুবাদও বলে যাচ্ছেন। তাঁর কোরআন তেলাওয়াত শুনে শ্রোতাদের এমনই মনে হতো যেনো পবিত্র কোরআনের গুপ্ত রহস্য, ফয়েজ বরকত মহান ইলাহীর দরবার থেকে তাঁর উপর বর্ষিত হচ্ছে। অসংখ্য লোক যারা

তাঁর মুরিদ ছিলেন না, তারা তাঁর কোরআন তেলাওয়াত শ্রবণ করে বলতেন, তাঁর কোরআন তেলাওয়াতের বাক্যগুলো তাঁর অন্তর থেকেই বেরিয়ে আসছে। কোরআন তেলাওয়াতের সময় কখনো তিনি গানের সুরের অনুকরণ করতেন না। তারাবীর নামাজে খুব কমসংখ্যক লোককে তন্দ্রামুক্ত দেখা যেতো। কিন্তু সর্বদাই তিনি দাঁড়িয়ে কোরআন তেলাওয়াত শুনতেন। তাঁর মধ্যে বিন্দুমাত্রও তন্দ্রা অথবা অবসাদ দেখা যেতো না। একদিন এই নগণ্য লেখক বললেন, রসুলুল্লাহর কী আশ্চর্য মোজেজা ছিলো যে, তারাবীর নামাজে তাঁর কোনো তন্দ্রাও আসতো না। আপনি তো তেমনই। তিনি বললেন, আমিতো পবিত্র কোরআনের গুপ্ত রহস্য ও প্রশংসার সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে যাই। এতোটুকু সুযোগও পাই না যে, চক্ষু বন্ধ করি।

তিনি সফর শেষে গন্তব্যে পৌঁছানোর পরও কোরআন তেলাওয়াত করতেন। যখন সিজদার আয়াত তেলাওয়াত করতেন, তখন ঘোড়া থেকে মাটিতে নেমে সেজদা করতেন। একাকী যখন নামাজ পড়তেন, তখন রুকু সেজদার তসবিহ পাঁচ থেকে সাত, নয় অথবা এগারো বার পড়তেন। আর যখন ইমামতি করতেন, তখন তিনবার অথবা পাঁচবার পড়তেন, যেনো মুক্তাদীগণ শান্তির সাথে তিনবার তসবীহ পড়তে পারেন। কখনো কখনো তিনি ইমামতি করার সময় রুকু ও সেজদার তাসবিহ পাঁচ বারও পড়তেন। কিন্তু হজরত বারেগাহ থেকে এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা নেই। তারপর তিনি চারবার পড়াই যথেষ্ট মনে করতেন। সুন্নত পালনের ব্যাপারে তিনি এতোই সতর্ক থাকতেন যে, এ ব্যাপারে যেনো কোনো কম- বেশী না হয়। তারাবীর নামাজ ও সূর্য গ্রহণের নামাজ ব্যতীত কোনো নফল নামাজ জামাতে আদায় করতেন না। জামাতে নফল নামাজ আদায় করা মাকরূহ মনে করতেন। এমনিভাবে যে সকল লোক আশুরার দিন, শবে কদর, শবে বরাত এবং লায়লাতুল রাগায়েবের নফল নামাজ জামাতের সাথে পড়তো, তিনি তাদেরকে কঠোরভাবে নিষেধ করতেন। এটা সুন্নতের পরিপন্থী বলতেন। যারা জামাতের সঙ্গে তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করতেন, তাদেরকেও তিনি খারাপ বলতেন। যে কোনো কাজ শুরু করার পূর্বে ইস্তেখারা নামাজ আদায় করতেন এবং কখনো শুধুমাত্র ইস্তেখারার দোয়া পড়াই যথেষ্ট মনে করতেন। তাশাহুদের মধ্যে শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা তিনি ইশারা করতেন না। কেনোনা হানাফী মাযহাবে এটাকে মাকরুহ ও হারাম বলা হয়েছে। সুন্নত অনুযায়ী আলেমগণের এক দলের অভিমত— যদি সুন্নত ও মাকরুহের মধ্যবর্তী কোনো বিষয় উপস্থিত হয়, তাহলে তা পরিত্যাগ করাই উত্তম। তিনি কখনো কখনো বর্ণিত নফল বিষয়ক হাদিসের প্রতিও ইঙ্গিত করতেন, যেনো এ সকল কার্যাবলী সাধারণভাবেই পরিত্যাজ্য না হয়ে যায়। নামাজের পরে মৃত ব্যক্তিদের আত্মার মাগফেরাতের জন্য দোয়া করা, যা অন্যান্য বুজর্গদের অভ্যাস, তিনি তা করতেন না। কিন্তু তিনি ওই সময় ব্যতীত

অন্যান্য সময় মৃত ব্যক্তিদের আত্মার মাগফেরাতের জন্য দোয়া করতেন। রোগমুক্তির জন্য তিনি বাতেনী তাওয়াজ্জোহ্ দিতেন, যার চিহ্নও প্রকাশ পেতো। যেমন তাঁর কারামত বর্ণনার স্থলে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তিনি কবর জিয়ারত করতেন, ইস্তেগফার ও মাসনূন দোয়াসমূহ পড়তেন। দোয়ার মাধ্যমে তাঁদেরকে সাহায্য করতেন। তাঁদের প্রতি বাতেনী তাওয়াজ্জোহ্ দিতেন, যেনো তাঁরা আযাবমুক্ত হন এবং তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়— যেমন তাঁর কারামাত বর্ণনার ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। কবর চুম্বন করাকে তিনি উত্তম কাজ মনে করতেন না। অবশ্য কখনো কখনো তিনি তাঁর বুজর্গ পিতা ও পীর মোর্শেদের কবরে হাত বুলাতেন।

তিনি খাস (বিশেষ) দাওয়াত গ্রহণ করতেন কিন্তু সাধারণ দাওয়াতে তিনি যেতেন না। মেলা আনন্দোৎসব, সেমা, জন্মোৎসব অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতেন না। উচ্চস্বরের জিকির ত্যাগ করাকে তিনি উত্তম মনে করতেন। আম্বিয়া আ.গণকে বিশেষ ফেরেশতাদের উপর প্রাধান্য দিতেন। নবুওয়াতকে বেলায়েতের উপর প্রাধান্য দিতেন, যদিও সে বেলায়েত নবীর বেলায়েত হোক না কেনো। নবুওয়াতের স্তরের গালবাহ্ ছোহো (স্বাভাবিক প্রভাব) কে গালবাহ সোকর (প্রকৃত মত্ততা) এর উপর প্রাধান্য দিতেন (দেখুন মাবদা ওয়া মাআদ, মিনহা-১৩)। ছোহোয়ে খালেস (বিশুদ্ধ প্রভাব) কে সাধারণ জিকিরের অংশ বলতেন। যে সকল ওলী জনসমাজে বাস করেন, যাঁদের দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়, যাঁরা মানুষের সত্যপথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেন, তাঁরা নির্জনতা অবলম্বনকারী ওলী— যাঁরা মরুভূমিতে পাহাড়ে নির্জনে নিজের নিরাপত্তা কামনা করেন, তাঁদের থেকে উত্তম মনে করতেন। সকল সাহাবা কেরাম রা. কে সকল আউলিয়া কেরামের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ভাবতেন। যদিও তাঁরা আউলিয়া আকতাব, আওতাদ ও আবদাল পর্যায়ভুক্ত হন। সাহাবাগণের মতপার্থক্যকে ইজতেহাদ (গবেষণা) জনিত মনে করতেন। আর তাঁদের সকলকে প্রবৃত্তির তাড়না থেকে পরিপূর্ণভাবে মুক্ত বলে বিশ্বাস করতেন।

একদিন এক পুণ্যবান যুবক তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললো, আমি বোরহানপুর থেকে এসেছি। সেখানকার হজরত শায়েখ ফজলুল্লাহ বিনীতভাবে জানতে চেয়েছেন যে, জনসমাজে এ বিষয়টি অধিকশ্রুত হয়েছে যে, আপনি নাকি এক মকতুবে আপনার মর্যাদা হজরত সিদ্দীক আকবর রা. এর মর্যাদা থেকে অধিক বলে উল্লেখ করেছেন। প্রকৃত বিষয়টি কী?

হজরত মোজাদ্দেদ র. বললেন, হজরত আলী কাররামুল্লাহ অজহাহু সকল কামালাত ও ফাজায়েলে পরিপূর্ণ ছিলেন। তাঁকেও অন্যান্য খলিফা রাশেদীনের উপর প্রাধান্য দেই না। তাহলে আমি আমার নিজেকে কী করে হজরত আবু বকর থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করতে পারি? ওই ব্যক্তির জন্য মারেফাত হারাম, যে নিজেকে নিকৃষ্ট কাফের থেকে উত্তম মনে করে— সে দ্বীনের যতোবড় পদমর্যাদার ধারক হোক না কেনো।

তিনি তাঁর বিশেষ বিশেষ মুরিদ, যাঁদের দ্বারা মানুষের হেদায়েতের পথ খুলে যেতো, তাঁদের কামালিয়াতের স্তরে পৌঁছানোর পূর্বে তিনি তাঁদেরকে তরিকত বিষয়ক প্রশিক্ষণ দানের জন্য এক প্রকার অনুমতি দান করতেন। যেনো তাঁরা ভ্রান্ত ও ভ্রষ্টতা থেকে মানুষকে সত্যের পথ দেখাতে পারেন। কিন্তু আলোচনায় বিশেষভাবে তাঁদের অপূর্ণতার কথাও উল্লেখ করতেন, যেনো তাঁদের মধ্যে কামেল হওয়ার ধারণা বদ্ধমূল না হয় ও তাঁরা অহংকারী না হয় এবং তাঁদের বাতেনী উন্নতি বাধাগ্রস্ত না হয়।

তিনি সকল মাশায়েখদের তরিকা থেকে নকশবন্দিয়া তরিকাকে উত্তম মনে করতেন। নকশবন্দিয়া তরিকাকে হুবহু সাহাবায়ে কেরামগণের তরিকার উপর প্রতিষ্ঠিত মনে করতেন। এই তরিকার নেসবত সকল নেসবত থেকে উত্তম বা শ্রেষ্ঠ মনে করতেন। এ যুগে যে সকল বেদাতের উদ্ভব হয়েছে— যেমন জামাতে তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করা, সকালে উচ্চস্বরে ইস্তেগফার পড়া এ সকল আমল তিনি অপছন্দ করতেন। শায়েখ মহিউদ্দীন আ'রাবী র. কে তিনি বুজর্গ মনে করতেন। তবে তাঁর কিছু কিছু মকশুফ (কাশফ) কে তিনি ভুল মনে করতেন। কিন্তু তাঁর ওই কাশফজনিত ভুলকে গবেষণাজনিত ভুল বলে ভাবতেন এবং সেগুলোকে ধর্তব্য মনে করতেন না।

তিনি কোনো কোনো কিতাবের দরসও (প্রশিক্ষণ) দিতেন। যেমন বায়যাবী, বোখারী, মেশকাত, হেদায়া, শারহে মাআকেফ, হাশিয়া, আজদী, বজদুবি, আওয়ারেফ ইত্যাদি। এই দরবেশ লেখক হজরতের নিকট বায়যাবী, আজদী ও হাশিয়ামীর শিক্ষালাভ করেছেন এবং তাঁর স্বনামধন্য শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। তিনি সর্বদা শিক্ষার্থীদেরকে জ্ঞান অর্জনে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিতেন এবং দ্বীনবিষয়ক জ্ঞান অর্জনকে তাসাউফের জ্ঞান অর্জনের উপর প্রাধান্য দিতেন। এই দরবেশ লেখক তাঁর ছাত্রজীবনে হালের আধিক্যের কারণে পুঁথিগত বিদ্যার্জনে স্বাদ পেতেন না। তিনি পূর্ণ অনুগ্রহের সাথে বলতেন, ছবক গ্রহণ করো। অধ্যবসায়ে লিপ্ত হও। কেনোনা মূর্খ সূফী শয়তানের উপহাসের পাত্র।

তিনি সফরে রওয়ানা হলে সোমবার ও বৃহস্পতিবার রওয়ানা হতেন। কিন্তু প্রতিদিনই সফরের জন্য উপযোগী মনে করতেন। জ্যোতির্বিদদের ঘোষিত সময়ের উপর তিনি কোনো আমল করতেন না। বলতেন, রসুল স. এর মহাআবির্ভাবের বরকতে দিনের প্রতিবন্ধকতা বা বিপত্তি দূর হয়ে গিয়েছে। সফরসংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁর এই হাদিসের উপরই আমল ছিলো যে— সব দিনই আল্লাহ্র দিন এবং সকল মানুষই আল্লাহ্র বান্দা। অবশ্য সফরের সময় তিনি ইস্তেখারা করতেন। সফরের পূর্বে যে সুন্নত দোয়া রয়েছে, তাও পাঠ করতেন। কাপড় পরিধান করা,

পানিপান, খাদ্যগ্রহণ, চাঁদ এবং আয়না দেখার যে সকল দোয়া রয়েছে তা-ও পড়তেন। তাঁর প্রতিদিনের দোয়া ও অজিফা বিষয়ের আলোচনা পৃথক গ্রন্থে উল্লেখ [১] করা হয়েছে।

এখন আমি তাঁর নামাজের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করবো।

তকবিরে তাহরীমা বলার সময় তিনি তাঁর দু'হাতের আঙ্গুল কানের লতি বরাবর উঠাতেন, আঙ্গুল বন্ধ থাকতো এবং কেবলার দিকে ফিরিয়ে রেখে 'আল্লাহু আকবর' বলে নিচে নামাতেন এবং ঝুলিয়ে না দিয়ে ডান হাত বাম হাতের উপর নাভীর নিচে এমনভাবে রাখতেন যে, বৃদ্ধাঙ্গুল ও কণিষ্ঠাঙ্গুল দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকতো এবং অবশিষ্ট তিন আঙ্গুল বাম হাতের উপর প্রসারিত থাকতো। দাড়ানোর সময় দুই পায়ের মধ্যবর্তী চার আঙ্গুল পরিমাণ দূরত্ব থাকতো। দুই পা সুদৃঢ় রেখে দাঁড়াতেন। এক পায়ের উপর ভর করে দাঁড়াতেন না। দাঁড়ানো অবস্থায় সেজদার স্থানের দিকে দৃষ্টি রাখতেন এবং ক্বেরাতের মধ্যে তাজবীদ, অর্থ, গভীর মনোযোগ, গুপ্ত রহস্য অনুধাবন, বিনয়ীভাব এবং হুজুরী (যে বিষয়ে তিনি অধিক জ্ঞাত) এর প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখতেন। তকবির বলে রুকুতে যেতেন। তখন পায়ের দিকে নজর রাখতেন এবং মাথা পিঠ বরাবর রাখতেন। আঙ্গুল খুলে দিয়ে দুই হাঁটু শক্ত করে আঁকড়ে ধরতেন। হাঁটু সামনের দিকে বাড়ানো থাকতো না। রুকু থেকে উঠে এক তসবিহ পরিমাণ সময় দাঁড়াতেন। একাকী নামাজ পড়ার সময় 'সামি আল্লাহু লিমান হামিদাহ্' এবং 'রব্বানা লাকাল হামদ' দুটোই বলতেন। ইমামতি করার সময় 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ্' এবং মুক্তাদী অবস্থায় 'রব্বানা লাকাল হামদ' পড়তেন। দুই সেজদার মধ্যবর্তী সময়ে এক তসবীহ পরিমাণ বিলম্ব করতেন বা বসতেন। সেজদার অবস্থায় নাকের অগ্রভাগে দৃষ্টি রাখতেন এবং পেটকে হাঁটু থেকে এবং হাঁটুকে বাহু থেকে পৃথক রাখতেন। সেজদার সময় সকল অঙ্গের ভারসাম্য বজায় রাখতেন। অতঃপর রুকু ও সেজদার সময় যে হাল ও নৈকট্য লাভ হতো, তা তিনি নিজেই বুঝতেন। বৈঠকে ও তাশাহুদের সময় তাঁর দু'পায়ের আঙ্গুল কেবলার দিকে ফিরানো থাকতো এবং কোলের দিকে দৃষ্টি রাখতেন। বাতেনী প্রভাব থেকে তাঁর খুশু, খুজু (ভয় ও নম্রতা) এর চিহ্ন প্রকাশ পেতো এবং তিনি অধিক নামাজ আদায়কালে মহানবী স. এর অনুসরণ করতেন।

---

১. এ গ্রন্থখানির নাম 'হেদায়েতুত্ ত্বালেবীন' যা ফার্সি ভাষায় লিখিত। মোজাদ্দেদ র. এর সুযোগ্য খলিফা মোহাম্মদ সালেহ কাওলাকী র. ১০৩৮ হিজরীতে লিখেছেন, ফার্সি ভাষায় লিখিত এই পাণ্ডুলিপিটি মাওলানা মোহাম্মদ হাশেম মোজাদ্দেদী র. (সিন্ধী) এর কাছে ছিলো। এর উর্দু অনুবাদ এক আল্লাহ্ওয়ালা সম্প্রদায় লাহোরে মুদ্রিত করে প্রকাশ করেছেন।

আমি (নগণ্য লেখক) এই মহান বুজর্গের খাদেমদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পূর্বে কখনো কখনো তাঁর মসজিদে জুমআর নামাজ আদায়ের জন্য উপস্থিত হতাম, তাঁর নামাজ দেখে আমি বিস্মিত হতাম। আমার বিশ্বাস ছিলো যে, তিনি সর্বদাই রসুল আকরম স. এর দরবারে উপস্থিত থাকতেন এবং রসুল স. এর নামাজ দেখতেন এবং সেই নিয়মে নামাজ আদায় করতেন। এ অধম আরো অনেক মাশায়েখদের নামাজ দেখেছেন, কিন্তু কারো নামাজে এরূপ সৌন্দর্য দেখেননি। সর্বদাই প্রথম ওয়াক্তে নামাজ আদায়, একই পদ্ধতিতে আদায় করা— বড়ই বিস্ময়কর অর্জন বলে মনে হতো। আমি কখনোই দেখিনি যে, তিনি নিজের সময় মতো নামাজ আদায়ের ব্যাপারে এক মুহূর্ত বিলম্ব করেছেন এবং নামাজ আদায়ের নিয়মে, দাঁড়ানোতে, বসায় অথবা অন্য কোনো নিয়মের ক্ষেত্রে কোনোরকম ব্যতিক্রম করেছেন। তাঁর নামাজই ছিলো তাঁর বড় কারামাত, যার মধ্যে তাঁর উত্তম অভ্যাসের প্রতিফলন এবং উচ্চ পর্যায়ের আরেফের বহিঃপ্রকাশ ঘটতো। এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, সকল বিপত্তি ও প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করে সর্বদা একই পদ্ধতিতে পরিপূর্ণ সম্মান, ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ আদব, খুশু, খুজু ও বিনয়ের সাথে নামাজ আদায় করা শুধুমাত্র রসুলে পাক স. এর পূর্ণ অনুসরণের ও বাতেনী শক্তির কারণেই সম্ভব হয়েছিলো। এ নগণ্য লেখক নিজে এবং বেশ কিছু লোক তাঁর নামাজের কারণেই তাঁর প্রতি আস্থাবান হয়েছিলো।

রমজান মাসে জায়নামাজ বিছানো হতো। উজ্জ্বল বাতি জ্বালানো হতো। এ সময় দূরের ও নিকটের অসংখ্য আলেম, আল্লাহ্ওয়ালা ও মুরিদগণের মধ্যে এক বিশাল জামাত নিজেদেরকে নিষ্কলুষ করার জন্য তাঁর দরবারে হাজির হতেন। তারাবী নামাজ ও পবিত্র কোরআন খতমে অংশ নিতেন। তিনি যতদূর সম্ভব দ্রুত ইফতারী করতেন এবং বিলম্বে সেহেরী করতেন। একান্ত প্রয়োজন না হলে রমজান মাসে দিনের বেলায় তিনি ইস্তেনজায় যেতেন না। কেনোনা এতে করে গুহ্যদ্বার দিয়ে শরীরের মধ্যে পানি প্রবেশের সম্ভাবনা থেকে যায়। এরপরও যদি ইস্তেনজায় যেতেন (দিনের বেলায়) তাহলে অধিক সাবধানতার জন্য পরবর্তীতে তিনি কাজা আদায় করে নিতেন। রমজান মাসে দিন রাত কোরআন তেলাওয়াত ও শ্রবণের মধ্যে লিপ্ত থাকতেন।

তাঁর জাকাত আদায়ের নিয়ম ছিলো— যখন তাঁর কাছে কোনো উপঢৌকন বা সম্পদ আসতো, তিনি বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা না করে তাৎক্ষণিকভাবে হিসাব করে জাকাত আদায় করতেন। জাকাতের অর্থ নেককার ,অসহায়, নিকটবর্তী উপযুক্ত দয়ার্দ্রচিত্ত লোকদের দিয়ে দিতেন। পবিত্র হজ্ব পালনের জন্য দৃঢ় ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু সম্ভব হয়নি। তিনি সর্বক্ষণই হজ্বের বাসনা প্রকাশ করতেন। এমনি আকাঙ্ক্ষা নিয়েই তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। তিনি

বলতেন, হজ্ব পালনের তো তীব্র বাসনা রয়েছে, কিন্তু ইস্তেখারায় সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। হজ্ব পালনে আল্লাহ্‌র মঞ্জুরী আছে বলে মনে হচ্ছে না। এটি ছিলো তাঁর জীবনের একটি বড় আক্ষেপ। কিন্তু মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর এ আশা পূর্ণ হয়নি।

তাঁর চরিত্রের মধ্যে বিনয়, মহানুভবতা, শান্তিপ্রিয়তা, সন্তুষ্টিবোধ পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিলো। তিনি তাঁর প্রিয়জনদের থেকে নানাভাবে অত্যাচারিত হয়েছিলেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বহুমুখী কষ্টের সম্মুখীন হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সীমাহীন সহিষ্ণুতা ও সন্তুটির কারণে তাঁর কোমল অন্তরে কখনো আপত্তির উদয় হয়নি। কেউ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য এলে তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যেতেন। বিশেষ স্থানে তাঁকে আসন দিতেন। উপস্থিত জনসমক্ষে তাঁর মর্যাদা অনুযায়ী পরিচিত করিয়ে দিতেন। কিন্তু কাফেরদেরকে তিনি কখনো সম্মান করতেন না, যদিও তিনি প্রশাসনের পদস্থ কর্মকর্তা হতেন। প্রত্যেক ব্যক্তিকে সর্বপ্রথম তিনিই সালাম দিতেন। এমন তথ্য আমার জানা নেই যে, কেউ তাঁর আগে সালাম দিতে পেরেছেন। অসহায়দের হক আদায়ে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। কারো মৃত্যুর খবর শুনলে তিনি তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করতেন এবং ‘ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিঊন’ বলতেন। তার জানাযার নামাজে অংশ নিতেন এবং দোয়া করতেন।

তাঁর পোশাক ছিলো এরকম— জামা কলারবিশিষ্ট ছিলো। তার উপর কটি পরিধান করতেন। কিন্তু গ্রীষ্মকালে শুধুমাত্র পিরহান (লম্বা কোর্তা) পরিধান করতেন। মাথায় পেঁচিয়ে পাগড়ি পরিধান করতেন সুন্নত অনুযায়ী। পাগড়ির প্রান্ত দু'কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে পিঠের উপর ঝুলিয়ে দিতেন। কিন্তু ইস্তেনজা ও পেশাবের সময় এরূপ করতেন না। তিনি কোমরে কোমরবন্ধ বাঁধতেন। গিরার উপরে পায়জামা পরতেন। জুমআর নামাজ ও দুই ঈদের নামাজে অধিক উত্তম পোশাক পরিধান করতেন। যখন নতুন পোশাক পরিধান করতেন, তখন পূর্বের পোশাক গরীব, প্রিয় খাদেম অথবা কোনো মুসাফিরকে দান করে দিতেন। তাঁর দরবারে ৫০/৬০ বরং শতাধিক লোক (আলেম, আরেফ, মাশায়েখ, হাফেজে কোরআন, বহু পুণ্যবান ও উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি) উপস্থিত থাকতেন। তাঁর লঙ্গরখানা থেকে সকলের জন্য খাদ্য পরিবেশন করা হতো।

হজরত মোজাদ্দেদ র. এর আধ্যাত্মিকতা ও অলৌকিক ঘটনাবলী

মুকাশাফা ১

এক রাতে তিনি তাঁর উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন সাথী-মুরিদদেরকে সঙ্গে নিয়ে হজরত ইমাম রফিউদ্দীন র. এর মাজার জিয়ারতের জন্য গমন করলেন। ইমাম রফিউদ্দীন র. ছিলেন তাঁর ঊর্ধ্বতন পিতৃপুরুষ। ছিলেন হজরত সাইয়্যেদ মাখদুম জাহান র. এর খলিফা। তিনি দীর্ঘক্ষণ ইমাম রফিউদ্দীনের কবরের কাছে বসে মোরাকাবা করলেন। জিয়ারত থেকে প্রত্যাবর্তনের পর গুপ্ততত্ত্বজ্ঞানী সাথীদের বললেন, যখন আমি ইমাম সাহেবের মাজারের কাছে দাঁড়ালাম, তখন মহান ইলাহীর আজমত ও জাল্লাতের প্রতি খেয়াল করলাম। বললাম, হে আল্লাহ্ দয়াময়! তুমি এই মাজারবাসীর প্রতি দয়া করো। তাঁর আশেপাশের কবরবাসীদের আযাব মাফ করে দাও। নির্দেশ হলো, আমি তোমার নিবেদনের প্রেক্ষিতে তোমার সম্মানে কবরবাসীদের এক সপ্তাহের আযাব মাফ করে দিলাম। আমি নিবেদন করলাম, হে প্রভুপালক! তোমার রহমত অনন্ত অসীম, তুমি তাদের ক্ষমার মেয়াদকে দীর্ঘতর করে দাও। নির্দেশ হলো, তোমার সম্মানের খাতিরে আমি তাদের এক মাসের কবরের আযাব মাফ করে দিলাম। অতঃপর আমি আরো অধিক অনুনয়-বিনয় করলাম। তখন উত্তরে বলা হলো, তুমি এখানকার কবরবাসীদের মাগফিরাতের জন্য আমার সকাশে বারংবার মিনতি করে চলেছো। ঠিক আছে, তোমার সম্মানের জন্য আমি তাদের সকলকে ক্ষমা করে দিলাম।

মুকাশাফা ২

একদিন তিনি তাঁর বুজর্গ পিতা হজরত খাজা শায়েখ আবদুল আহাদ র. এর কবর জিয়ারতের জন্য গেলেন। সেখানে পৌঁছানো মাত্র মহানবী স. এর এই হাদিসখানি স্মরণে এলো— কোনো আলেম কোনো কবরের পাশ দিয়ে চলে গেলে চল্লিশ দিন পর্যন্ত ওই কবরবাসীর আযাব বন্ধ করে দেওয়া হয়। ইতোমধ্যে এলহাম হলো— তোমার আগমনের জন্য আমি কিয়ামত পর্যন্ত এই কবরস্থানের অধিবাসীদের আযাব বন্ধ করে দিলাম।

মুকাশাফা ৩

একদা তিনি ইমাম রফিউদ্দীন র. এর মাজার জিয়ারতের জন্য আগমন করলেন। সেখানে একজন মহিলার কবর ছিলো। হজরত ইমাম রফিউদ্দিন র. এর মাজার জিয়ারত শেষে তিনি ওই মহিলার কবরের পাশে গেলেন। দীর্ঘক্ষণ তাঁর কবরের সামনে দাঁড়ালেন। তাঁর চেহারা মোবারকে খুশু-খুজু (অত্যন্ত বিনয়াবনতার) নিদর্শন প্রকাশ পাচ্ছিলো। কিছুক্ষণ পর তাঁর চেহারার মধ্যে প্রকাশিত হলো আনন্দ ও সজীবতা। সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর সাথীগণ

জিজ্ঞেস করলেন, ওই মহিলার কবরে বিলম্বের হেতু কী ছিলো? আমরা আপনার চেহারায় প্রথমে দেখলাম বিনয় ও বিষণ্ণতা। পরে দেখলাম, আনন্দ ও সজীবতার ছাপ। তিনি উত্তরে বললেন, যখন আমি ওই মহিলার কবরের সামনে দাঁড়ালাম তখন দেখতে পেলাম, তাঁর আযাব হচ্ছে। তখন আমি বিশেষভাবে অনুভব করলাম, আযাব থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার কোনো উপায় তাঁর নেই। তখন আমি আমার পূর্বপুরুষদের পবিত্র আত্মাসমূহের প্রতি খেয়াল করলাম। তাঁরাও উপস্থিত হলেন। কিন্তু আযাব বন্ধ হলো না। তখন আমি তরিকতের সিলসিলার উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন বুজর্গ (কাদ্দাসাল্লাহু আসরারাহুম)গণের পবিত্র আত্মার প্রতি খেয়াল করলাম। তখন দেখলাম, রসুলুল্লাহ স. স্বয়ং নবুওয়াতের আসনে আসীন হয়ে আগমন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে কবরের আযাব বন্ধ হয়ে গেলো। ওই মহিলা আমার জন্য দোয়া করলেন। বললেন, তুমি আমার প্রতি যেমন শান্তি পৌঁছিয়েছো, মহান আল্লাহ্ও তেমনি তোমার প্রতি শান্তি বর্ষণ করুন।

মুকাশাফা ৪

একদা এক অনুষ্ঠানে তিনি বললেন, যদি কাশফধারী ব্যক্তি অনুসন্ধান করি তবে গাওছুছ্ ছাকালায়েন আবদুল কাদের জিলানী কুদ্দিসা সিররুহুর পরে কাদেরিয়া সিলসিলায় হজরত শাহ কামাল কায়থলী র. এর মতো ব্যক্তিত্ব খুব কমই দেখা যায়।

মুকাশাফা ৫

একদা প্রত্যুষে তিনি মজলিসের মধ্যে গভীরভাবে খেয়ালে ও একাগ্র মোরাকাবায় মগ্ন ছিলেন। হঠাৎ শাহ্ সেকান্দার র. আগমন করলেন এবং হজরত শাহ কামাল কায়থলী র. প্রদত্ত খেরকা তাঁর কাঁধের উপর রাখলেন। তিনি চক্ষু খুলে শাহ সেকান্দার র. কে দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং অত্যন্ত বিনয় ও মহব্বতের সাথে কোলাকুলি করলেন। শাহ্ সেকান্দার র. বললেন, আমার দাদা শাহ্ কামাল কায়থলী ইন্তেকালের পূর্বে এ জুব্বাটি আমার কাছে আমানত রেখেছিলেন। বলেছিলেন, আমি যখন যাকে এটি দিতে বলবো, তখন তুমি তার কাছে পৌঁছে দিয়ো। তিনি স্বপ্নযোগে কয়েকবার আমাকে এ জুব্বাটি আপনার কাছে পৌঁছানোর নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু আমার কাছে এটা খুবই কষ্টদায়ক মনে হয়েছে। কেনোনা আমার দাদার প্রদত্ত পবিত্র এই খেরকা আমার ঘরেরই নেয়ামত। এটাকে আমি বাইরের কাউকে প্রদান করবো কেনো? কিন্তু বারংবার তাগিদ দেওয়ার কারণে আমি নিরুপায় হয়ে আপনার কাছে এসেছি।

তিনি পবিত্র জুব্বা পরিধান করলেন। নির্জন পরিবেশে গেলেন। তিনি বলেছেন, ওই সময় আমার এটাই খেয়াল হলো যে, মাশায়েখদের এমনই নিয়ম প্রচলিত আছে যে, কাউকে খলিফা বানাতে হলে জুব্বা পরিয়ে থাকেন। এজন্য

প্রথমে তাৎপর্যপূর্ণ পোশাক পরিধান করাতেন এবং হাল ও কামালাতের শরবত পান করাতেন। অতঃপর তাঁর খলিফা বানাতেন। ইত্যবসরে আমি হজরত গাওছুছ্ ছাকালায়েন কুদ্দিসা সিররুহুকে দেখলাম। তিনি তাঁর সিলসিলার খলিফা হজরত শাহ্ কামাল কায়থলী র.কে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলেন। আমার প্রতি মনোনিবেশ করলেন। আমার অন্তরকে তাঁর নিয়ন্ত্রণে নিলেন এবং তাঁর খাস নেসবতের গোপন তত্ত্ব ও নূর আমাকে দান করলেন। আমি নূরের সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে হাবুডুবু খেতে লাগলাম। এমনি অবস্থায় এক ঘণ্টা অতিবাহিত হলে ওই হালের আধিক্যের মধ্যে আমার স্মরণ হলো, আমি তো নকশবন্দিয়া তরিকার তরবিয়াতপ্রাপ্ত। তবে আমার এমন অবস্থা হলো কেনো? একথা স্মরণ হতেই আমি দেখলাম, নকশবন্দিয়া সিলসিলার মাশায়েখগণ হজরত খাজা আবদুল খালেক গাজদানী র. থেকে নিয়ে হজরত খাজা বাকিবিল্লাহ (কাদ্দাসাল্লাহু আছরারাহুম) সহ সকলে উপস্থিত হলেন। হজরত বাহাউদ্দিন নকশবন্দ বোখারী [১] হজরত আবদুল কাদের জিলানী র. এর পাশে বসলেন। এরপর নকশবন্দিয়া তরিকার শ্রেষ্ঠ বুজর্গগণ বললেন, ইনি তো আমাদের সিলসিলার তরবিয়াতপ্রাপ্ত। আমাদের তরবিয়াতেই কামাল (পূর্ণতা) ও আকমাল (অধিকপূর্ণতা) এর স্তর পর্যন্ত পৌঁছেছেন। আপনাদের সাথে তাঁর সম্পর্ক কী? কাদেরিয়া সিলসিলার শ্রেষ্ঠ বুজর্গগণ বললেন, শিশুকাল থেকেই সে আমাদের রূহানী পর্যবেক্ষণে রয়েছে। সে আমাদের খাঞ্চা (খাদ্যপাত্র) থেকে স্বাদ গ্রহণ করেছে এবং আমাদের সিলসিলার খেরকা (জুব্বা)ও পরিধান করেছে।

পরস্পরের মধ্যে বাক-বিতণ্ডা চলতে লাগলো। ইতোমধ্যে কাবরাবিয়া এবং চিশতিয়া তরিকার এক বিশাল জামাত এবং অসংখ্য মাশায়েখ সেখানে উপস্থিত হলেন। বুজর্গগণের সমাগম এতোই বিশাল হলো যে, শহর, জঙ্গল, শস্যভূমি সব পরিপূর্ণ হয়ে গেলো। অবশেষে সিদ্ধান্ত এটাই হলো যে, যেহেতু তিনি নকশবন্দিয়া তরিকার তরবিয়াত গ্রহণের মাধ্যমে কামালিয়াত ও তাকমিলের স্তরে পৌঁছেছেন এবং এ বিশ্বাসেই পূর্ণতা অর্জন করেছেন, তাই এই তরিকার উপরেই তাঁর পরিচিতি হবে এবং এই তরিকার উপরেই তিনি মানুষকে তরবিয়াত প্রদানপূর্বক সত্যপথের সন্ধান দিবেন। তদুপরি কাদেরিয়া তরিকায়ও হেদায়েত ও তরবিয়াত প্রদান করবেন।

মুকাশাফা ৬

হাজী হাবীব তাঁর অন্যতম বিশেষ খাদেম ছিলেন। তিনি অনেক খেদমত ও রেয়াজত করতেন। সফরে অবস্থানকালে সর্বদাই তিনি তাঁর সাথে থাকতেন। তিনি বর্ণনা করেন, আজমীর শরীফ সফরে আমি তাঁর সঙ্গী ছিলাম। তখন আমি সত্তর হাজার কালেমা তাইয়্যেবা পাঠ করে তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, আমি এতো পরিমাণ কলেমা শরীফ খতম করেছি। এর সওয়াব আমি আপনার খেদমতে পেশ

করলাম। তিনি তখনই হাত উঠিয়ে দোয়া করলেন। পরদিন বললেন, যখন আমি দোয়া করছিলাম, তখন ফেরেশতাদের দল এই সওয়াব নিয়ে আসমান থেকে আসতে শুরু করলো। তাদের সংখ্যা এতো বেশী ছিলো যে, জমিনে তিল ধারণের ঠাঁই ছিল না। এই খতম আমার জন্য খুবই ফলপ্রসূ মনে হয়েছিলো। এরপর তিনি বললেন, এক হাজার দানার তসবি তৈরী করে সর্বদাই নির্জনে কালেমা তাইয়্যেবার জিকির জবান ও অন্তরের সমন্বয়ে করতাম। জুমআর রাতে হালকায় এ তসবীহ উপস্থিত করা হতো এবং রসুল স. এর প্রতি এক হাজার বার দরূদ শরীফ পাঠ করা হতো। আজও তাঁর বংশে এ নিয়ম অব্যাহত রয়েছে। তাঁর তসবীহ গ্রহণের সূচনা এভাবেই হয়েছিলো।

তিনি হাজী হাবীবকে বললেন, যা কিছু আমি তোমাকে বললাম, এতে বিস্মিত হয়ো না। আমার হালের কথাও আমি তোমাকে বলছি। আমি প্রত্যেক রাতে তাহাজ্জুদের পরে সেহেরীর সময় (ভোর রাতে) পাঁচশত বার কালেমা তাইয়্যেবা পড়ে পরলোকগত পুত্রদ্বয় মোহাম্মদ ঈসা, মোহাম্মদ ফররুখ, কন্যা উম্মেকুলসুমের উপর বখসিশ করতাম। তারপর প্রত্যেক ভোর রাতে ঈসার [১] রূহ এসে আমাকে জাগ্রত করতো এবং আমাকে কালেমা তাইয়্যেবার খতম করার প্রতি উৎসাহিত করতো। আমাকে জাগিয়ে দিয়ে চলে যেতো। সে তার ভাই মোহাম্মদ ফররুখ এবং নিজের বোন উম্মে কুলসুমের রূহকে ডেকে নিয়ে আসতো। বলতো, চলো যাই— আমাদের পিতা জাগ্রত হয়েছেন। আমি ওজু করে তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করে যতোক্ষণ পর্যন্ত না কালেমা তাইয়্যেবা খতম করতাম, ততোক্ষণ ওই রূহগুলো আমার পাশেই অবস্থান করতো, যেমন মায়ের কাছে শিশুরা রুটি পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করে থাকে। যখন কালেমা তাইয়্যেবার সওয়াব তাদের উপর বখশিশ করতাম, তখন তারা চলে যেতো। কিন্তু এখন তারা অধিক সওয়াবে পরিপূর্ণ। তাই তারা আর আসে না।

মুকাশাফা ৭

একদা তিনি সেরহিন্দ শহরের একটি গ্রাম প্রসঙ্গে বললেন, (যে স্থানটি বাদশাহ্‌র পক্ষ থেকে খানকার খাদেমদের অবস্থানের জন্য জায়গীর হিশেবে দেওয়া হয়েছিলো) সেখানে দেখা গেলো, মহান আল্লাহ্‌ শ্রেষ্ঠত্ব ও জালালাতসহ আনুরূপ্যবিহীন অকল্পনীয় অবস্থায় আবির্ভূত হলেন এবং একটি সুসজ্জিত উঁচু তাঁবুও স্থাপন করা হলো এবং তিনি অতুলনীয় দৃষ্টান্তহীন অবস্থায় [২] প্রকাশিত হলেন।

১. এই তিন জনই ভাই বোন। ১০২৫ হিজরীতে তাঁদের বড় ভাই খাজা মোহাম্মদ সাদেক র. এর সাথে প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন।

২. মুকাশাফা ৭ জনাব মাওলানা মাহবুব ইলাহীর ফার্সি কিতাবে নেই। অবশ্য মাওলানা ইরফান আহমদ আনসারীর অনুবাদের মধ্যে তা পাওয়া গেছে।

মুকাশাফা ৮

কোনো একদিন তিনি কোনো নিকটবর্তী স্থান থেকে শাহ্ আব্বু বুখারী র. এর মাজার জিয়ারতের জন্য সেরহিন্দে আগমন করলেন। এ নগণ্য লেখক তাঁর সঙ্গী ছিলেন। মাজারের পাশে তিনি দীর্ঘক্ষণ ধরে বসে থাকলেন এবং গভীর একাগ্রতার সঙ্গে মোরাকাবা করলেন। সেখান থেকে যখন তিনি খানকায় এলেন, তখন কয়েকজন বিশিষ্ট মারেফাতের গোপনতত্ত্ববিদ তাঁর কাছে তাঁর এবং শাহ্ আব্বুর সাথে কী কথাবার্তা হয়েছে— তা জানতে চাইলেন। তিনি বললেন, শাহ সাহেব এলেন এবং আমার প্রতি বিশেষভাবে সম্মানপ্রদর্শন করলেন। বিশেষ অনুগ্রহ ও ভালোবাসা প্রকাশ করলেন। দীর্ঘ আলোচনা হলো। সবকিছু তো বলা যাবে না। এতোটুকু শুধু বলা যেতে পারে যে, তিনি নিজেকেই এখানকার সাহেবে বেলায়েত (বেলায়েতের ধারক) বলেছেন এবং এও বলেছেন যে, আপনার মতো এমন বুজর্গ মেহমান আমার কাছে এসেছেন— এর চেয়ে উত্তম তোহফা (উপঢৌকন) আর হতে পারে না। আমি আমার বেলায়েত আপনাকে প্রদান করবো। সুতরাং আজ থেকে এ রাজ্যের সাহেবে বেলায়েত আপনি এবং এ রাজ্য আপনার নিয়ন্ত্রণেই থাকবে। এই ঘটনার বেশ কিছুকাল পরে তাঁর প্রকাশ্য ও বিশুদ্ধ কাশফ অনুযায়ী এক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি এ নগণ্য লেখককে বললেন, সেরহিন্দের একজন বিখ্যাত বুজর্গের নাম মাজযুব শায়েখ দাউদ। তাঁর মাজার শায়েখ মাজদুদ্দীন কাসদারী র. (খাজদার) এর কবরখানায় অবস্থিত। যখন তাঁর মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হলো, তখন এক ব্যক্তিকে শায়েখ আব্বু বুখারীর কাছে পাঠিয়ে তাঁকে ডেকে আনতে বললেন। তিনি বললেন, শাহ আব্বু একজন মজযুব ব্যক্তি। তিনি সেরহিন্দের একটি বড় পুকুরের পানির মধ্যে সর্বক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন। আমি তাঁকে কী বলবো? তিনি বললেন, তুমি আমার খবরটি তাঁকে পৌঁছে দাও। সে নিজেই চলে আসবে। ওই ব্যক্তি গিয়ে শায়েখ দাউদের খবরটি পৌঁছে দিলো। খবরটি শুনতেই সে সঙ্গে সঙ্গে রওয়ানা হয়ে গেলো এবং শায়েখ দাউদের দরবারে হাজির হলো। শায়েখ দাউদ তাঁকে বললেন, এখন পর্যন্ত এই শহরের বেলায়েতের দায়িত্বে নিয়োজিত আছি। এর পাহারাদার ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব আমার উপরেই ন্যস্ত। এখন আমি বিদায় নিচ্ছি (ইন্তেকাল করবো)। এই শহরের বেলায়েতের দায়িত্ব তোমার উপর ন্যস্ত করা হলো। খুব সতর্ক থাকবে। একথা বলেই তিনি ইন্তেকাল করলেন। অতঃপর শাহ আব্বু এসে তাঁর স্থানে অবস্থান গ্রহণ করলেন। ওই দিন থেকেই লোকেরা তাঁর কাছে ভীড় জমাতে থাকে। দেখতে থাকে অনেক অলৌকিক ঘটনাবলী।

একটি ঘটনা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। তিনি একবার সকল কুকুরকে নিমন্ত্রণ করলেন। একটি কুকুরকে ডেকে বললেন, যাও। শহরের সকল কুকুরকে ডেকে নিয়ে এসো। সে গিয়ে অন্যান্য কুকুরগুলোকে খবর দিলো। তারাও পরস্পর পরস্পরকে খবর

দিলো। এভাবে খবর পেয়ে কুকুরেরা সারিবদ্ধভাবে শাহ সাহেবের দরবারে উপস্থিত হলো। বিষয়টি শহরে আলোড়ন সৃষ্টি করলো। লোকেরা দেখার জন্য সমবেত হলো। যখন সকল কুকুর একত্রিত হলো, তখন শাহ্ সাহেব উঠে চারিদিকে দেখে নিয়ে বললেন, যার জন্য এ মেহমানদারীর আয়োজন করা হয়েছে সেই কুকুরটি আসেনি। একটু পরে একটি কুকুর শহর থেকে এলো। তাকে কাছে ডেকে নেওয়া হলো। সিনি রান্না করা হয়েছিলো। প্রতিটি কুকুরের সামনে একটি মাটির পাত্র রাখা হলো। সকলে কোনো ঝগড়াঝাটি ব্যতীত শৃঙ্খলার সঙ্গে মিলে-মিশে খেয়ে নিলো। তারপর সকলে তাঁর নির্দেশের অপেক্ষায় বসে থাকলো। শাহ্ সাহেব বললেন, যাও। নির্দেশ পাওয়া মাত্র সকলে চলে গেলো । ওই নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি আমাকে আরো বললেন, শাহ আব্দুর অনেক ছাগল ছিলো। সেরহিন্দের পূর্বপ্রান্তে সেগুলো থাকতো। চতুর্দিকে ক্ষেত ছিলো। ছাগলগুলো ক্ষেতের ফসল খেয়ে ফেলতো। চাষীরা শাহ আব্দুর কাছে অভিযোগ জানালো। তিনি বললেন, অভিযোগ কোরো না। তাদেরকে খেতে দাও। অন্যান্য এলাকার ক্ষেতে যে পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হয়, ইনশাল্লাহ্ তোমাদের ক্ষেত থেকেও তোমরা সে পরিমাণ ফসল পাবে। আশ্চর্য ব্যাপার! অন্য এলাকার চাষীরা ফসল কাটার পর যে পরিমাণ ফসল পেলো, যে সকল চাষীদের ফসল ছাগলে খেয়ে দানাশূন্য করে ফেলেছিলো, তারা তাদের ক্ষেতের ফসল কাটার পর আরো বেশি ফসল পেলো।

মুকাশাফা ৯

একদিন লাহোরের এক সবজি বিক্রেতা তাঁর দরবারে উপস্থিত হলো। তিনি তাঁর সম্মানে দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁর প্রতি অত্যধিক সম্মানপ্রদর্শন করলেন। তাঁর চলে যাওয়ার পর উপস্থিত সকলে বললেন, সে তো একজন সবজি বিক্রেতা। তিনি বললেন, তিনি আবদাল। নিজেকে গোপন করার জন্যই এ ছদ্মবেশ ধারণ করেছেন।

মুকাশাফা ১০

রমজান মাসের শেষ দশকের কোনো একদিন তিনি বললেন, আজ আমি এক আশ্চর্য ঘটনা দেখেছি। মোরাকাবার মধ্যে দেখলাম, হঠাৎ এক ব্যক্তি আমার খুব নিকটে এসে বসলেন। আমি খুব খেয়াল করে দেখলাম, ওই মহান ব্যক্তি হলেন সরোয়ারে কায়েনাত সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি স. বললেন, আমি তোমাকে একটি এজাযতনামা লিখে দিতে এসেছি, যা আজ পর্যন্ত কাউকে দেইনি। এই এজাযতনামার মধ্যে বিশেষ অনুগ্রহ ও সূক্ষ্ম বিষয় লিপিবদ্ধ ছিলো, যা ছিলো পার্থিব বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। প্রতিটি পাতায় অধিক দয়া ও উচ্চমর্যাদার কথা লিপিবদ্ধ ছিলো। ঘটনাটি মকতুবাত শরীফের তৃতীয় খণ্ডের ১০৬ নং মকতুবে উল্লেখ করা হয়েছে।

মুকাশাফা ১১

তিনি বর্ণনা করেছেন, আমাকে সর্বদাই তাহাজ্জুদ নামাজের জন্য আজান, সংকেত অথবা কোনো শব্দের দ্বারা অথবা অন্য কোনো উপায়ে জাগিয়ে দেওয়া হতো। আমি নিজে নিজে কখনো তাহাজ্জুদ নামাজের জন্য উঠতাম না। একবার প্রকাশ্য কোনো শব্দ এলো না অথচ আমি জেগে ওঠলাম। মনে মনে বললাম, আমি কে যে আমি নিজে নিজে নিদ্রা থেকে জেগে উঠেই ইবাদত ও আনুগত্যে লিপ্ত হবো। একথা মনে করে পুনরায় শুয়ে পড়লাম। একটু পরেই চতুর্দিক থেকে আজান ও সংকেতধ্বনি আসতে লাগলো। তখন আমি উঠে তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করলাম।

মুকাশাফা ১২

তিনি বর্ণনা করেছেন, আমি শরীয়তকে দেখলাম, আমি এ মাকামকে এমনভাবে অতিক্রম করেছি যেমন কোনো কাফেলা (পথচারি দল) কোনো স্থানকে অতিক্রম করে থাকে। তারপর তিনি তাঁর মসজিদ ও খানকার দিকে ইঙ্গিত করলেন।

মুকাশাফা ১৩

তিনি বলেন, রমজান মাসের শেষ দশদিনের কোনো এক সময় আমি তারাবী নামাজ পড়ে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়লাম। খাদেম আমার পা টিপে দিচ্ছিলো। আমি ভুলবশতঃ বাম পাশে শুয়ে পড়েছিলাম। ইত্যবসরে আমার স্মরণ হলো ডান পাশে ফিরে শোয়া সুন্নত। এই সুন্নত তো বাদ পড়ে গেলো। কিন্তু মনে মনে উদয় হলো ভুলবশতঃ এমন কোনো ঘটনা ঘটে গেলে তা ক্ষমার যোগ্য। তবু আমি ভীত হলাম। উঠে পুনরায় সুন্নত নিয়ম অনুযায়ী ডান কাত হয়ে শুয়ে পড়লাম। এ সুন্নতের অনুসরণ করতেই আমার প্রতি অনুগ্রহ ও বরকতের ধারাবাহিকতা প্রকাশ হতে লাগলো। আওয়াজ এলো— সুন্নতের প্রতি তোমার এ ধরনের যথার্থ অনুসরণের জন্য পরকালে তোমার কোনো প্রকার শাস্তি হবে না। আর এখন যে খাদেম তোমার টিপে দিচ্ছে, তাকেও ক্ষমা করে দেওয়া হলো।

মুকাশাফা ১৪

তিনি বর্ণনা করেন, আজ জোহরের নামাজের পরে মজলিসের মধ্যে হাফেজে কোরআন যখন পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করছিলেন, তখন আমার অন্তরে কোরআন পাক সম্পর্কে বিভিন্ন ওয়াছ্ওয়াছা সৃষ্টি হচ্ছিলো। আমি খুবই চিন্তিত হলাম। আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে আমার নফস মুতমাইন্না হয়েছে। বেলায়েতও হাসিল হয়েছে। অর্জিত হয়েছে ফানা ও বাকা। এরপরেও কেনো এই কুমন্ত্রণা। আমি আল্লাহ্‌র শরণাপন্ন হলাম। বিশেষ একাগ্রতা ও অনুনয় বিনয়ের পর দেখলাম, একটি বড় পাখি আমার বক্ষদেশ থেকে বের হয়ে উড়ে চলে গেলো।

অদৃশ্য থেকে আওয়াজ ভেসে এলো— এটাই খান্নাস শয়তান, যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করে। রসুল স.ও এই খান্নাস থেকে আল্লাহ্‌র কাছে পরিত্রাণ চেয়েছিলেন। যেমন মহান আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন— কুল আউযু বিরব্বিন্নাস মালিকিন্নাস ইলাহিন্নাস মিন শাররিল ওয়াসওয়াসিল খন্নাস। আল্লাজি ইউওয়াস বিসু ফী সুদূরিন্নাস মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্নাস।

অর্থঃ হে নবী! আপনি বলুন, আমি আশ্রয়প্রার্থনা করছি মানুষের পালনকর্তার কাছে, মানুষের মালিক মাবুদের কাছে। খান্নাসের কুমন্ত্রণার ক্ষতি থেকে, যে খান্নাস কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের ছদর বা বক্ষের মধ্যে। জ্বিন ও মানুষ জাতির মধ্য হতে।

এরকমও এলহাম হলো যে, দ্বীনের শাখা-প্রশাখার মধ্যে যে খারাপ ধারণা সৃষ্টি হয়, খান্নাসই তার উৎস। অন্তরেই তার অবস্থান, সে সর্বদাই খোঁচা মারতে থাকে। আরো বলা হলো, আমি তোমার অন্তরকে বিদ্বেষমুক্ত করে খান্নাস শয়তানকে তাড়িয়ে দিয়েছি। আমি অনুভব করলাম, খান্নাস শয়তান বের হয়ে যাবার পর আশ্চর্যজনকভাবে আমার শরহে সদর (বক্ষ সম্প্রসারণ) হতে লাগলো।

মুকাশাফা ১৫

তিনি বর্ণনা করেন, কিছুদিন পর্যন্ত আমার হাল এমন যাচ্ছিলো যে, আমার ক্রুটিগুলো খুব বেশি বেশি দৃষ্টিগোচর হচ্ছিলো। অবস্থা এমনই হয়ে গেলো যে, যখন আমি নামাজের মধ্যে সূরা ফাতেহার শব্দ 'ইয়্যাকা' পড়তাম তখনই অস্থির হয়ে যেতাম। ভাবতাম, আমার কী করা উচিত। যদি পড়ি 'ইয়্যাকানা'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতাঈন (আমরা শুধু তোমারই উপাসনা করি এবং তোমারই সাহায্যপ্রার্থনা করি) তবে এই আয়াতের 'লিমা তাকুলূনা মালা তাফআ'লুন' (তুমি যা করো না, তা বলো কেনো) এর সত্যতা প্রমাণিত হয়। আর যদি না পড়ি, তাহলে ওয়াজিব বাদ পড়ে যায়। সহসা আওয়াজ এলো, আমি তোমার ইবাদতকে শিরিকমুক্ত করে দিয়েছি। এভাবে 'আলা লিল্লাহিদ্‌দ্বীনুল্ খলিস্' (জেনে নাও আল্লাহ্‌র জন্যই বিশুদ্ধ দ্বীন) এর উদ্দেশ্য সাধিত হলো।

মুকাশাফা ১৬

তিনি বলেন, একদা আমি সকালের হালকায়ে (মজলিসে) বসে ছিলাম। হঠাৎ এক প্রকার বিশেষ ফানা আমার উপর প্রকাশিত হলো— যা আমার বিশ্বাস (ইয়াকীন)কে বিলুপ্ত করে দিচ্ছিলো। এ অবস্থা দীর্ঘক্ষণ বিরাজ করলো। ওই দিন আসর নামাজের পর আমি দেখলাম, ইমাম আজম আবু হানিফা র. তাঁর সকল শিষ্য এবং তাঁর তরিকার সকল মুজতাহিদ (গবেষক) এবং কিছু শিক্ষক যেমন হজরত ইব্রাহীম নাখয়ী র.ও অন্যান্যদেরকে নিয়ে আমার পাশে উপস্থিত হয়ে আমাকে ঘিরে নিলেন। আমি দেখলাম, ইমাম আজম র. ও অন্যান্য ইমামদের নূর

আমার অন্তরে প্রবেশ করেছে। আমি ওই নূরের বাস্তবতা অর্জন করলাম। ওই নূরের প্রতীক হয়ে গেলাম। প্রত্যেকের নূর পৃথক পৃথকভাবে আমার অংশ হয়ে গেলো। দুই-তিন দিন পর ইমাম শাফী র. ও তাঁর শিষ্যবৃন্দ এবং তাঁর মাযহাবের মুজতাহিদদের নূরের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে বাকার অবস্থায় উপনীত হলাম। দেখলাম, উলামায়ে হানাফিয়াদের নূর আমার অন্তর থেকে দূরীভূত হয়েছে। নিজেকে কেবল শাফী মাযহাবের নূরের মধ্যে অবলোকন করলাম এবং তাঁদের সকলের নূর পৃথক পৃথকভাবে আমার অংশ হয়ে গেলো। প্রথম বার হানাফি মাযহাবের নূর সম্পর্কে যেমন হয়েছিলো— সেরকমই হলো। এরপর দেখলাম, যে নূর আমার থেকে বের হয়ে গিয়েছিলো তা ফিরে এলো। এবার আমি দুই মাযহাবের নূরের বাস্তবতা লাভ করলাম। এও দেখলাম, এই দুইটি মাযহাব প্রকৃত সত্য থেকে দূরে নয়। অর্থাৎ হানাফিয়াগণ যখন কোনো সত্য বিষয় উদঘাটনে অক্ষম হয়েছেন, শাফিয়ীগণ তা উদঘাটন করেছেন এবং তাঁদেরকে সীমালংঘন করতে দেখিনি।

এ ঘটনার তিনি সবিস্তার বিবরণ দিয়েছেন। এও বলেছেন, ইমাম আবু হানিফা র. এর সাথে দুই অথবা তিন অংশ হক রয়েছে এবং তৃতীয় ও চতুর্থ অংশ হক রয়েছে ইমাম শাফেয়ী র. এর সঙ্গে এবং ইমাম শাফেয়ী থেকে হক আর সামনে অগ্রসর হয়নি। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে হজরত মোজাদ্দেদ র.কে হানাফী এবং শাফেয়ী উভয়ই বলা যায়।

মুকাশাফা ১৭

তিনি বলেন, একথা নির্দ্বিধায় ও বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলা যায় যে, হানাফী মাযহাবের নূর আমার কাশফের দৃষ্টিতে এক মহাসমুদ্র। সে তুলনায় অন্যান্য মাযহাব ঝর্ণা অথবা চৌবাচ্চাতুল্য।[১]

মুকাশাফা ১৮

তিনি বলেন, একদিন আমি এক মৃত শিশুর আত্মার ক্ষমাপ্রার্থনার জন্য ফকির-দরবেশদের উদ্দেশ্যে কিছু খাবার তৈরী করিয়েছিলাম। এমন সময় আমার মুখে একথা এসে গেলো যে, এই সদকা কেমন করে কবুল হবে? মহান আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন 'ইন্নামা ইয়াতাকাব্বালুল্লাহু মিনাল মুত্তাক্বীন' (মহান আল্লাহ্ মুত্তাকীদের মাধ্যমে কবুল করে থাকেন)। আমি দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পতিত হলাম। অতঃপর হক জাল্লা জালালাহুর পক্ষ থেকে আওয়াজ এলো— 'ইন্নাকা মিনাল মুত্তাক্বীন' (নিঃসন্দেহে তুমি মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত)।

১. দেখুন মকতুবাত নং ৫৫/২

মুকাশাফা ১৯

তিনি বলেন, আমাকে এই মর্মে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে, যে জানাযা নামাজে তুমি অংশগ্রহণ করবে, সেই মৃত ব্যক্তিকে আমি ক্ষমা করে দিবো। তিনি আরো বলেছেন, রসুলে পাক স. এর পক্ষ থেকে এই সুসংবাদটি দেওয়া হয়েছে যে, কিয়ামত দিবসে অসংখ্য মুসলমানকে তোমার সুপারিশে মাফ করে দেওয়া হবে।

মুকাশাফা ২০

তিনি বলেন, আমাকে অবগত করানো হয়েছে যে, হিন্দুস্তানেও বহু নবী [১] এসেছিলেন। কোনো নবীর দ্বারা দু'জন, কারো দ্বারা তিন জন, কারো মাধ্যমে একজন ইমান এনেছিলো। কিন্তু তিনজনের অধিক ইমান এনেছিলো— এরকম দেখা যায় না। আমি ইচ্ছা করলে ওই নবীগণের নবুওয়াতপ্রাপ্তির স্থান এবং তাঁদের আবাসভূমি কোথায় তা বলে দিতে পারি। এমনকি তাদের কবরস্থান কোথায় তাও বলে দিতে পারি। এসকল বিষয়ে আমাকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁদের কবরের উপর এখনো নূর অবতীর্ণ হচ্ছে।

মুকাশাফা ২১

তিনি বলেছেন, আমাকে জানানো হয়েছে যে, আমার যুগ থেকে শুরু করে ইমাম মাহদী আলাইহি রেদওয়ানের আবির্ভাব পর্যন্ত যে কামালাত এবং মুআমালাত (কর্মশক্তি) আমাকে দান করেছেন, কিয়ামত পর্যন্ত তা আর কাউকে দান করা হবে না।

মুকাশাফা ২২

তিনি বলেন, একবার আমি সবকিছু ছেড়ে দিয়ে সকলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে সকলের থেকে পৃথক হয়ে নির্জনতা অবলম্বন করার ইচ্ছা পোষণ করলাম। ইস্তেখারা করলাম। মহান প্রভুর দরবারে অনুমতিপ্রার্থনা করলাম। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আমাকে সম্বোধন করে বলা হলো, তুমি যে অবস্থায় আছো এটাই উত্তম অবস্থা। নির্জনবাসের বাসনা কোরো না।

মুকাশাফা ২৩

তিনি বলতেন, আমার বড় সন্তান খাজা মোহাম্মদ সাদেকের কবরের পাশে আমাকে দাফন কোরো। কেনোনা জান্নাতের বাগানের মধ্য থেকে আমি একটি বাগান সেখানে দেখেছি।

---

১. দেখুন মকতুবাত নং ২৫৯/১। সেরহিন্দের উত্তর-পূর্ব দিকে বারাস নামক স্থানে কয়েকজন নবীর কবর রয়েছে।

মুকাশাফা ২৪

হজরত মোজাদ্দেদ র. এর উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন সন্তান হজরত খাজা মাসুম র. লিখেছেন, হজরত মোজাদ্দেদ র. বলেছেন, আমার রওজার মাটি থেকে যদি এক মুষ্টি মাটি কোনো কবরে ফেলে দেওয়া হয়, তাহলে (আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে) বড়ই রহমতপ্রাপ্তির আশা করা যায়। তাহলে ওই ব্যক্তির মর্যাদা কেমন হবে, যাকে ওই রওজায় দাফন করা হয়েছে।

মুকাশাফা ২৫

তাঁর কবরের গম্বুজের মধ্যে এবং বাইরের জমিন যা মাজারের সীমানার মধ্যে ছিলো— তিনি বর্ণনা করেন, জান্নাতের বাগিচার মধ্য হতে ওইটি একটি বাগিচা (এখন ওই বেষ্টনী অবশিষ্ট নেই, প্রশস্ত হয়ে গিয়েছে)।

মুকাশাফা ২৬

খাজা মাসুম বিল্লাহ র. আরো বর্ণনা করেছেন, হজরত মোজাদ্দেদ র. বলেছেন, হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, আমার কবর জান্নাতের বাগিচার মধ্য থেকে একটি বাগিচা [১] — একথার উদ্দেশ্য এটাই যে, কবর এবং জান্নাতের মধ্যবর্তী দূরত্বকে তুলে দেওয়া হয়। সুতরাং যেনো কবর জান্নাতের মধ্যে বিলীন হয়ে গিয়ে বিরাজমান থাকে। আর রসুল স. এর এই হাদিসের উদ্দেশ্যও ওটাই যে, আমার কবর এবং মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থান জান্নাতের বাগিচার মধ্য হতে অন্যতম একটি বাগিচা। প্রকাশ থাকে যে, এধরনের রওজা একান্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য।

এ বিষয়টি সকল মুসলমানের জন্য সহজবোধ্য নয়। অবশ্য এতোটুকু বলা যেতে পারে যে, যখন তাঁর কবর পবিত্র ও নূরানী হয়ে যাবে তখন এমন অবস্থা হতে পারে যে, জান্নাতের একটি প্রতিবিম্ব ওই কবরে পতিত হবে এবং ওই আয়না সদৃশ হবে, যা স্বচ্ছ।

মুকাশাফা ২৭

তিনি বলেন, সূর্যের দিকে দৃষ্টিপ্রদান সম্ভব, কিন্তু শাহ কামাল র. এর পৌত্র (ছেলের ছেলে) শাহ্‌ সেকান্দার র. এর কলবের দিকে দৃষ্টিপ্রদান সম্ভব নয়। কেনোনা তাঁর কলবের নূর অত্যন্ত তেজদীপ্ত ও প্রখর।

মুকাশাফা ২৮

একদিন তিনি বর্ণনা করলেন, আমাকে অবগত করানো হয়েছে ওই মারেফাত সম্পর্কিত ঘটনা, যা লিখিত হয়েছে— তা হচ্ছে, হজরত মাহদী মাওউদ আলাইহির রেদওয়ানের প্রসঙ্গে। তাঁর চক্ষু থেকেও এ ধরনের তেজদীপ্ত রশ্মি বের হতে থাকবে।

---

১. রসুল স. নিজের মিম্বর এবং ঘরের কথা বলেছেন, মা বাইনা বাইতি ওয়া মিম্বারি রওজাতুন মিন রিয়াজিল জান্নাত।

মুকাশাফা ২৯

তিনি বলেন, হজরত মাহদী মাওউদ এই আলীশান নকশবন্দিয়া নেসবতভুক্ত হবেন (এর মধ্যে তিনি তাঁর খাস নেসবতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, যেমন তাঁর লিখিত গ্রন্থ ও মকতুবাতের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে)।

মুকাশাফা ৩০

তিনি বর্ণনা করেছেন, এক রাতে আমার প্রতি ওই কথাটি প্রকাশিত হলো যে, কেউ যদি বিতির নামাজ বিলম্বে আদায় করার ইচ্ছা করে, এমন কি যদি তাহাজ্জুদের সময় হয়ে যায় এবং সে যদি মনে করে রাতের শেষ অংশে বিতির নামাজ আদায় করবো, তাহলে এর মধ্যবর্তী রাত বিতির নামাজ আদায় করা পর্যন্ত তার আমলনামায় নেকী লেখা হতে থাকবে। সুতরাং বিতির নামাজ যতো দেরীতে আদায় করা যায়, ততোই ভালো।

মুকাশাফা ৩১

তিনি বর্ণনা করেছেন, কাশফের মাধ্যমে আমি জেনেছি, সমস্ত পৃথিবী বেদাতের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে এবং সুন্নতের নূর জোনাকী পোকার আলোর মতো থেমে থেমে কোনো কোনো স্থানে দৃশ্যমান হচ্ছে।

মুকাশাফা ৩২

একবার তিনি কলেমা তাইয়্যেবা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ’র মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে বললেন, আফসোস! পৃথিবীর সবকিছু এই কলেমার তুলনায় বিশাল সমুদ্রের মাঝে বিন্দুতুল্যও যদি হতো। এই পবিত্র কলেমা সকল কামালাত, বেলায়েত এবং নবুওয়াতের সমষ্টি। লোকেরা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এই কলেমা একবার পড়লে কীভাবে জান্নাতে প্রবেশ সহজ হয়ে যায় এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যায়? তিনি বললেন, আমি অনুভব করি ও বিশ্বাস করি, সকল বিশ্ববাসী যদি একবার কলেমা তাইয়্যেবা পাঠ করে, তাহলে সকলকে মাফ করে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়াও সম্ভব। যদি এ কলেমার বরকত পৃথিবীর সৃষ্টিকুলের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়, তাহলে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চিরদিন ভরপুর ও পর্যাপ্তই থেকে যাবে।

মুকাশাফা ৩৩

তিনি বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি আমার এ তরিকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বা হবে কোনো মাধ্যম বা মাধ্যম ব্যতীত, পুরুষ অথবা নারী— সকলকে আমার সামনে উপস্থিত করা হয়েছিলো। তাদের নাম, পিতার নাম এবং বংশপরিচয় ও ঠিকানা আমাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। যদি আমি চাই তাহলে সবই বলে দিতে পারি।

মুকাশাফা ৩৪

তিনি বর্ণনা করেছেন, মহান আল্লাহ্ তাঁর অপার অনুগ্রহ, কৃপা, দয়া এবং তাঁর বিশেষ রহমত থেকে আমাকে সুসংবাদ দিয়েছেন যে, তোমার জন্য এই দুনিয়াকেও আখেরাত বানিয়ে দিয়েছি।

মুকাশাফা ৩৫

একদিন তিনি তাঁর শৌচাগারে প্রবেশ করে দেখলেন, মাটির একটি ভাঙ্গা পাত্র থেকে দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। পাত্রটিতে আল্লাহ্র নাম খোদাই করা ছিলো। তিনি মাটির ওই ভাঙ্গা পাত্রটি নিয়ে বাইরে এলেন। খাদেমকে পানি আনতে বললেন। নিজ হাতে পাত্রটি পরিষ্কার করলেন। খাদেম নিজে পরিষ্কার করতে চাইলো। তিনি রাজি হলেন না, পরিষ্কার করার পর পাত্রটিকে তিনি একটি শাদা কাপড়ে আবৃত করে অত্যন্ত সম্মানের সাথে তাকের উপরে রেখে দিলেন। পানি পান করার ইচ্ছা হলে ওই পাত্রে পানি পান করতেন। ইত্যবসরে মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলা হলো, তুমি যেমন আমার নামের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করেছো— তদ্রূপ দুনিয়া ও আখেরাতে আমি তোমার সম্মানকে সমুন্নত করবো। তিনি বলেন, আমি যদি শত বছরও রেয়াজত ও মুজাহাদার মধ্যে থাকতাম, তবুও এর থেকে অধিক ফয়েজ ও বরকত হাসিল করতে পারতাম না।

মুকাশাফা ৩৬

হজরত মখদুমজাদা খাজা মোহাম্মদ মাসুম র. তাঁর কোনো এক মকতুবে উল্লেখ করেছেন, তিনি (মোজাদ্দেদ র.) বলেছেন, আমার কন্যা উম্মে কুলসুমের জানাযা উপস্থিত করা হলো। আমার ওজুর মধ্যে সন্দেহ ছিলো। আমি পুনরায় ওজু করে জানাযা নামাজ আদায় করবো চিন্তা করলাম। এমন সময় গায়েবী আওয়াজ এলো— তুমি যদি এ অবস্থায় জানাযা নামাজ আদায় করো তাহলেও আমি এই মৃতকে ক্ষমা করে দিবো।

মুকাশাফা ৩৭

একদিন সকালে মজলিসের মধ্যে তিনি মোরাকাবারত অবস্থায় ছিলেন। তখন বিগত জীবনের ত্রুটিপূর্ণ আমলের প্রতি তাঁর খেয়াল নিবদ্ধ হলো। তাই তাঁর উপর অক্ষমতার ও বিনয়ের হাল প্রবল হয়ে গেলো। হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, 'মান তাওয়াজাআ লিল্লাহ্ রফাআল্লাহু' (যে আল্লাহ্র জন্য বিনয়ী হয়, আল্লাহ্ তাঁর মর্যাদা সমুন্নত করেন)। এই হাদিসের সত্যতা প্রমাণকারী মহান আল্লাহ্ যিনি গোনাহ ক্ষমাকারী ও দোষ গোপনকারী— তাঁর পক্ষ থেকে সম্বোধন করা হলো, আমি তোমাকে মাফ করে দিয়েছি এবং যারা তোমাকে উছিলা হিসেবে গ্রহণ করেছে, মাধ্যমে অথবা বিনা মাধ্যমে কিয়ামত পর্যন্ত— তাদেরকেও ক্ষমা করে দিয়েছি এবং এই সুসংবাদ প্রকাশ করার নির্দেশও তোমাকে দিলাম।

মুকাশাফা ৩৮

কুতুবুল আকতাব হজরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী কুদ্দিসা সিররুহুর পবিত্র মাজার জিয়ারতের জন্য আগমন করলেন। দীর্ঘক্ষণ ধরে এই নক্ষত্রতুল্য আউলিয়ার দরবারে মোরাকাবা করলেন। শেষে বাইরে এসে লোকদেরকে বললেন, হজরত র. খুব বেশি লুত্ফ ও করম (সম্মান ও সূক্ষ্মতা) প্রদর্শন করেছেন। তাঁর খাস বরকত দ্বারা আমাদেরকে আপ্যায়ন করেছেন এবং মারেফাতের গোপন রাজ্যের অনেক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় বর্ণনা করেছেন। তারপর যাঁরা সৈন্য দিয়ে গার্ড অফ অনার প্রদানের জন্য চেষ্টা করছিলেন, তাদেরকে নিষেধ করলেন এবং বিষয়টি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উপর ছেড়ে দিতে নির্দেশ দিলেন। ইতোমধ্যে এই ঘটনাটি ঘটলো— হজরত খাজা র. এর কবরে প্রতি বছর নতুন গেলাফ পরানো হয় এবং পুরাতন গেলাফ বড় বড় বুজর্গ অথবা বাদশাহ্‌র কাছে প্রেরণ করা হয়। বাদশাহ্ সেগুলোকে অতি যত্নে আদব ও সম্মানের সাথে সিন্দুকে সংরক্ষণ করেন। ওই গেলাফ বা চাদর উপঢৌকন স্বরূপ মোজাদ্দেদ র. এর কাছে উপস্থিত করা হলো। মাজারের খাদেমগণ বললেন, এই তাবারকপ্রাপ্তির অধিক উপযুক্ত হকদার আপনার থেকে আর কে আছে? তিনি অত্যন্ত আদব ও সম্মানের সাথে গেলাফ গ্রহণ করলেন এবং বললেন, হজরত খাজা র. কর্তৃক প্রদত্ত এই বরকতপূর্ণ চাদর বা গেলাফ আমার কাফনের জন্য রেখে দিয়ো। হজরত খাজা র. প্রদত্ত এই চাদর বা গেলাফের অসিলায় আল্লাহ্ যেনো আমার প্রতি অনুগ্রহ করেন।

মুকাশাফা ৩৯

তিনি পীড়িত থাকাকালে শেষ সময়ের দিকে বলেছিলেন, প্রতিটি কামালাত যা মানুষের জন্য চিন্তা করা যেতে পারে এবং যা তার পক্ষে অর্জন করা সম্ভব, মহান আল্লাহ্ তা রসুল স. এর দানের মধ্য হতে একটি অংশ আমাকে দান করেছেন। এ অনুগ্রহের ব্যাখ্যা তাঁর সন্তানগণ বলে দিয়েছেন।

মুকাশাফা ৪০

তিনি তাঁর মকতুবাতের তৃতীয় খণ্ডে এরূপ বর্ণনা করেছেন—

কুদসিয়্যাহ

সৃষ্টিকুলের তিরস্কার সুফী-সাধকদের জন্য নেকী বা সৌন্দর্য এবং তাঁদের পাপের মরিচা দূর করার জন্য শানযন্ত্র স্বরূপ। এ খলকের মধ্যে প্রবেশ বা তাঁর দ্বারা পংকিলতা হওয়া কেমন করে হতে পারে? প্রথমে আমি যখন গোয়ালিয়র দূর্গে বন্দী হলাম তখন এমন মনে হতো যে, মখলুকের তিরস্কারের কারণে বিভিন্ন শহর ও গ্রামে নূর বৃষ্টির মতো একের পর এক পৌঁছতে থাকতো। আমার অবস্থা নিম্ন থেকে ঊর্ধ্বে উন্নীত হতে লাগলো। প্রথমে তো এক বছর পর্যন্ত আমাকে

রূহানী সফরের দূরত্ব অতিক্রম করানো হতো জামালীভাবে। এখন জালালিভাবে ওই পথ অতিক্রম করানো হচ্ছে। এই মাকাম সবরের মাকাম। বরং রেজার মাকাম । আমি জামাল ও জালালকে সমান জানতাম। প্রেমাস্পদের দেওয়া কষ্ট, দুঃখ, বেদনা, তাঁর দেওয়া সুখ-শান্তি থেকে অধিক আস্বাদপূর্ণ।[১]

মুকাশাফা ৪১

তিনি বলতেন, শায়েখ ইবনে আরাবী র. এর সকল বর্ণনা এবং শাতীহাত (আলোচনায় সমালোচিত) হওয়া সত্ত্বেও মহান আল্লাহ্‌র দরবারে কবুলকৃতদের মধ্যে দৃশ্যমান হয় এবং তাঁকে আউলিয়া কেরামদের অন্তর্ভুক্ত পরিদৃষ্ট হয়। কৃপাপ্রাপ্তদের জন্য কোনো কাজই অসাধ্য নয়। আল্লাহ্‌প্রেমিকগণ দোয়া করাতে কখনো নিরানন্দ বোধ করেন। আবার কখনো গালি শুনেও হাসেন। শায়েখ ইবনে আরাবীকে যাঁরা অস্বীকার করেন, তাঁরা সমস্যাকবলিত এবং তাঁর বর্ণনা গ্রহণকারীগণও সমস্যা মুক্ত নয়। এজন্য শায়েখকে তো গ্রহণ করতে ইচ্ছা করি— কিন্তু তার শাতীহাত (সমালোচনাপূর্ণ আলোচনা) তো কবুল করতে ইচ্ছা হয় না। এই ফকির তাঁকে কবুল করা ও না করার মধ্যবর্তী অবস্থানে আছে।

মুকাশাফা ৪২

তাঁর চিরাচরিত নিয়ম ছিলো, ফজর নামাজের পরে উপস্থিত লোকদের দিকে মুখ করে বসতেন এবং দোয়া শেষে মোরাকাবা করতেন। একদা আরাফার দিন ফজর নামাজের সালাম ফিরিয়ে কেবলামুখী হয়েই বসে থাকলেন। এতোক্ষণধরে বসে থাকলেন যে, সূর্য উদিত হলো। মোরাকাবা শেষে বিশিষ্ট মারেফাতধারী ব্যক্তিদেরকে বললেন, আজ আমার কাবা শরীফ জিয়ারতের বাসনা প্রবল হলো। আমি দেখলাম, কাবা ঘর আমাকে তাওয়াফ করার জন্য এসেছে এবং আমার চারিদিকে প্রদক্ষিণ করছে। আশ্চর্যের বিষয়, কাশফধারী ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ বে-খবর ছিলেন। যদি তাই না হতো, তাহলে তারাও আমার সঙ্গে তাওয়াফে শরীক হয়ে যেতো।

মুকাশাফা ৪৩

এক রমজানের ২৭ তারিখে তিনি বললেন, আজ কদরের রাত। তারাবী নামাজ শেষে বললেন, আমার প্রতি শবেকদর পরোক্ষভাবে প্রকাশিত হয়েছে এবং

১. ডাঃ সিরাজ আহমদ খান স্বীয় গ্রন্থ 'মকতুবাতে ইমামে রব্বানী র. এর দ্বীনি ও দৈনন্দিন জীবনের গুরুত্ব' এর চতুর্থ অধ্যায়ে রয়েছে, হজরত মোজাদ্দেদ র. ১লা রজব ১০২৮ হিজরী শুক্রবার ৪ঠা জুন ১৬১৯ খ্রিস্টাব্দ বন্দী হয়েছিলেন এবং ১০২৯ হিজরী ১১ রজব ২১শে জুন ১৬২০ খৃস্টাব্দে মুক্তি পেয়েছিলেন। দেখুন মকতুবাত নং ৬/৩, ৩১, ৩৭, ৪৩, ৫৬, ৮২, ১০৪, ১০৫, ১০৬। ১০২৯ হিজরী মুক্তি পাওয়ার পর ১০৩৩ হিজরী পর্যন্ত সরকারি সৈন্যদের সাথে ছিলেন। এ সময়ে তিনি আজমীর গমন করেছিলেন। যুবদাতুল মাকামাতের (পৃঃ ১৬২) লেখক এক সফরে তাঁর সাথী ছিলেন।

এ রাতের শেষ অংশ আমার নসীব হয়েছে। যেমন সেনাদল সামনে চলে এবং শিশুরা পিছনে পিছনে ধীর গতিতে অনুসরণ করে— এভাবে আমি শবে কদরকে দেখেছি।

মুকাশাফা ৪৪

এক শবে বরাতের সকালে কাশফের মাধ্যমে তিনি দেখলেন, শায়েখ তাহের লাহোরী, যিনি ছিলেন তাঁর বিশিষ্ট মুরিদদের অন্যতম, তাঁকে নেককারদের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে বদকারদের তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। হজরত মোজাদ্দেদ র. মহান আল্লাহ্র দরবারে খেয়াল করে এ দুরাবস্থা নিরসনের চেষ্টা করলেন। জানতে পারলেন, বিষয়টি লওহে মাহফুজে মুবরাম (অপরিবর্তিত) ফয়সালার অন্তর্ভুক্ত। তিনি খুবই দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেন। এমন সময় গাওছুছ্ ছাকালাইন কুদ্দিসা সিররুহুর এই বাণী আমার স্মরণ হলো— মুবরাম ফয়সালায় আমি ব্যতীত অন্য কারো হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই। আমি মহান আল্লাহ্র দরবারে কাকুতি মিনতি করে নিবেদন করলাম, হে প্রভু! তুমি যখন তোমার এক প্রিয় বান্দার জন্য মুবরাম ফয়সালায় হস্তক্ষেপের সুযোগ দান করেছো, তখন এই দরবেশকেও ওই অমূল্য নেয়ামত দান করে ধন্য করো। তুমি তো তোমার অনুগ্রহ থেকে দূরে নও। তাঁর এই দোয়া কবুল করা হলো। তিনি বিষয়টি সম্পর্কে এই কথাটিও অবগত হলেন যে, লওহে মাহফুজের নির্ধারিত ভাগ্যের একটি প্রকার হচ্ছে মুবরাম (মকতুবাত নং ২৭১/১)। আর আল্লাহ্র নিকটে কোনো সুপারিশ বা কোনো হুকুমের সাথে তা মুআল্লাক (ঝুলন্ত)। এ মুবরাম ফয়সালায় (অপরিবর্তিত নির্ধারিত ভাগ্য) বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ্ হস্তক্ষেপের অধিকার দান করে থাকেন। এটাই আল্লাহ্র নিকট মুবরাম, যা অপরিবর্তনীয়। মহান আল্লাহ্র ঘোষণা 'আমার বাণীর কোনো পরিবর্তন হয় না'— এই মহাবাণী থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়।

মুকাশাফা ৪৫

পাহাড়ের গুহায় অবস্থানকারী এবং রসুলগণ আগমনের মধ্যবর্তী সময় অবস্থানকারী মুশরিকদের সম্পর্কে বলেছেন— এক দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর মহান আল্লাহ্র অনুগ্রহে এ বিষয়টির সমাধান হলো। অর্থাৎ কাশফের মাধ্যমে আমাকে জানানো হয়েছে যে, একদল লোক বেহেশতেও থাকবে না, দোযখেও থাকবে না। বরং পুনরুত্থানের পর তাদেরকে হিসাব নিকাশের স্থানে রেখে তাদের পাপ অনুযায়ী তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। শাস্তি পূর্ণ হলে পশু বা প্রাণী যাদের উপর শরীয়তের বিধান কার্যকর নয়, তাদের মতো এদেরকেও অস্তিত্বহীন ও নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হবে। সুতরাং তাদের কোনো স্থিতি হবে না এবং তারা

চিরদিনও থাকবে না। এই অলৌকিক বিষয়টি যখন আমি আম্বিয়াগণের সামনে বললাম, তখন সকলেই সমর্থনপূর্বক এর সত্যতা স্বীকার করলেন।[১]

মুকাশাফা ৪৬

তিনি বলেন, তকদীরের ফয়সালার ব্যাপারে আমাকে খুব গোপনভাবেই অবগত করানো হয়েছে। বিষয়টি আমার সামনে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যে, শরীয়তের বিধানের সাথে যেনো কোনোরকম বৈপরিত্ব না থাকে। আর যে সকল স্বীকৃত ত্রুটি এবং আদানপ্রদান ক্ষেত্রে বাধ্য হওয়া ত্রুটি থেকে নিশ্চিত পবিত্র, সে সকল বিষয়ও আমার কাছে পূর্ণিমার চন্দ্রের রাতের মতো স্পষ্ট। আশ্চর্যের বিষয়, শরীয়তের বিধানের সাথে বৈপরিত্য না থাকা সত্ত্বেও (কোনো ভালো উদ্দেশ্যে) গোপন রাখা হয়েছে। যদি মতানৈক্যের কোনো অবকাশ থাকতো, তাহলে গোপন রাখা যুক্তিসঙ্গত ছিলো। যাই হোক, মহান আল্লাহ্ যা করেন, তাতে জিজ্ঞাসা করার মতো সাহস কে রাখতে পারে।[২]

আল্লামা শেখ সাদী বলেছেন—

কর আজ হেরায়ে আঁ কেহ আঝ বাছীমে উঁ
কুশায়েদ জবানঁ জঝবাহ তাছ লীমে উঁ
কাহা কিছমেত কাত কেহ খুলে জবান
ইয়েহ লাযেম হায় তাহলীম হু হর বয়ান

মুকাশাফা ৪৭

মখদুমজাদা হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম বিল্লাহ র. তাঁর দিনলিপিতে লিখেছেন, হজরত মোজাদ্দেদ র. সাধারণ লোকের দাওয়াত গ্রহণ করতেন না। একদিন এক সম্পদশালী ব্যক্তি তাঁর এক আত্মীয়ের আত্মার মাগফেরাতের জন্য তাঁর দরবারে বিনয়ের সাথে দাওয়াত করলেন। বললেন, তাঁরা তাঁর আত্মীয়ের মাগফেরাতের খাবার তৈরী করেছেন। সুতরাং আপনি দাওয়াত কুবল করুন। তিনি এই সাধারণ দাওয়াত কবুল করলেন না। ওই ব্যক্তি নিতান্তই ব্যাকুলভাবে তাঁর প্রতি অনুনয় প্রকাশ করলেন। তখন তাঁর প্রতি এলহাম হলো— যদি তুমি সেখানে গমন করাকে হারাম[৩] বা অসম্মানজনক মনে করো, তাহলে কিয়ামতের

১. মকতুবাত ২৫৯/১ এর মধ্যে বিস্তারিত রয়েছে।

২. এ কাসীদা হজরত শেখ সাদী র. এর, যার ছন্দে সমিল শব্দ 'উঁ' নয় 'তু' রয়েছে।

৩. মাওলানা মাহবুব ইলাহী তাঁর ফারসী ভাষায় লিখিত গ্রন্থের ১৮ পৃষ্ঠায় 'শাকে হুরমাত' এর পরিবর্তে 'হাতেক হুরমাত' শব্দটি উল্লেখ করেছেন। তাঁর ওই বাক্যের সরল অর্থ এরূপ হবে— যদি তুমি সেখানে যেতে অসম্মানবোধ করো তাহলে যে মৃত ব্যক্তির ইসালে সওয়াবের জন্য আয়োজন করা হয়েছে, তার মর্যাদা বৃদ্ধি স্বরূপ তাকে এতো পরিমাণ নূর দান করবো যে, সেই নূরের আলোকে সমগ্র হাশরের ময়দান আলোকিত হয়ে যাবে। তিনি চিন্তিত হলেন একথা ভেবে যে, হাতেক হুরমাত (অসম্মানবোধ ত্যাগ করা) কোনটি— যে বিষয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তখন স্পষ্ট করা হলো যে, ওই মজলিসে গমন করাই হাতেকে হুরমাত বা অসম্মানবোধ ত্যাগ করা।

দিন ওই মৃত ব্যক্তিকে আমি এমন নূর দান করবো, যার দ্বারা সকল হাশরবাসী নূরান্বিত হয়ে যাবে। এই এলহামের কারণে তিনি চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ভাবতে লাগলেন, এই হারাম বলাটা কেমন করে দূর হবে। বললেন, এই হারাম বক্তব্যটির নিষ্পত্তির উপায় হলো ওই মজলিসে উপস্থিত হওয়া। তিনি তাই করলেন।

মুকাশাফা ৪৮

একদিন তিনি বললেন, 'রেজা' মাকামের উপরে রসুলুল্লাহ স. ছাড়া আর কেউ পৌঁছতে পারে না। কিছুদিন পর তিনি বললেন, একদিন আমি তাহাজ্জুদ নামাজ শেষে সকল আম্বিয়াগণের উপর দরূদ প্রেরণ করছিলাম। তখন দেখলাম, সকলেই রেজা মাকামের উপরের মাকামে কিছু মাধ্যমে ঊর্ধ্বারোহণ করে মিলিত হয়েছেন। এর পর সরোয়ারে কায়েনাত স.ও ওই মাকামে ঊর্ধ্বারোহণ করলেন, যে মাকাম হজরত ইব্রাহীম আ. এর মিল্লাতের (জাতির) অনুসরণের জন্য প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

মুকাশাফা ৪৯

তিনি বলেন, আমাকে কাশফের মাধ্যমে জানানো হয়েছে, দু'চশমী [১] হা এর হকিকত (মুকাত্তাআতের চিহ্নের অন্তর্ভুক্ত) মহান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের মধ্য হতে রহমতের ভাণ্ডারস্বরূপ। কোনো রহমতই এই ভাণ্ডারের বাইরে নয়, যদিও সে রহমত দুনিয়া অথবা পরকালবিষয়ক হয়। ৯৯ রহমত তো আখেরাতের জন্যই রাখা হয়েছে। এটি হলো দু'চশমী হা এর একটি চশমা। আর দু'চশমী হা এর অপর চশমাটি ওই রহমতের ভাণ্ডার, যা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

মুকাশাফা ৫০

একদা তাঁর জীবদ্দশায় যে সন্তানগণ ইন্তেকাল করেছিলেন, তাঁদের প্রতি দোয়া বখশিস করার জন্য খাবার প্রস্তুত করেছিলেন। তিনি বলেন, অধিক তাওয়াজ্জোহের পর ওই খাবার আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হয়। তখন আমি কাশফের মাধ্যমে দেখলাম, ফেরেশতারা খানার পাত্র নিয়ে তাদের কবরে পৌঁছে দিচ্ছে। আর বেহেশতের একটি উদ্যানে খাবারগুলো একত্রিত করা হচ্ছে। যখন তারা সকল খাবার একত্রিত করলো, তখন দেখলাম, আমার সন্তানেরা ওই খাবারের কাছে গেলো এবং সকল খাদ্য উদরস্থ করলো। আরো দেখলাম, তাদের মধ্যে ঊর্ধ্বারোহণের যোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তারা উরুজ (ঊর্ধ্বারোহণ) লিপ্ত। তারা যখন অনেক ঊর্ধ্বে গেলো তখন একটি বেহেশত প্রকাশিত হলো, যার মধ্যে উচ্চস্ত রসমূহের শেষ স্তরও ছিলো। সেগুলো ছিলো খুবই সুন্দর ও জাঁকজমকপুর্ণ। তারা সকলে ওই বেহেশতে প্রবেশ করলো।

১. মকতুবাত ৩১১/১ দেখুন।

তিনি ইসালে সওয়াবের মধ্যে সকল মুমিন স্ত্রী, পুরুষ ও উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ফেরেশতাদেরকে একত্র করলেন। তিনি বললেন, কোনো মুমিন মুমিনাতের কবর এমন দেখলাম না, যেখানে খাবার পৌঁছানো হয়নি। আরো দেখলাম, ফেরেশতাদের কাছেও বিভিন্ন রকম খাবারের পাত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং তাদের সওয়াব থেকে কোনো অংশও কর্তন করা হয়নি। এভাবে তিনি যখনই আত্মার ক্ষমার জন্য কোনো ইসালে সওয়াব করতেন, তখন কাশফের মাধ্যমে এরকম অনেক কিছু দেখতেন।

মুকাশাফা ৫১

একদিন তিনি এক রোগীকে দেখতে গেলেন। রোগী মরণাপন্ন ছিলো। তিনি তার বাতেনী অবস্থার দিকে তাওয়াজ্জোহ দিলেন। দেখলেন, তার অন্তর কালোবর্ণের। কালো রঙ দূর করার জন্য তিনি তাওয়াজ্জোহ দিলেন। কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা গেলো না। জানতে পারলেন, তার অন্তরে অতি সূক্ষ্মভাবে কুফরী প্রবেশ করেছে। তাই কলব হয়েছে কালো বর্ণের। কাফেরদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার কারণেই এরকম দুরাবস্থা হয়েছে তার। তার কলবের কালিমা দূর হওয়া নির্ভর করছে জাহান্নামের শাস্তির উপর, যা কুফরির বিনিময়। তিনি আরো জানতে পারলেন, এই ব্যক্তির কলবে অতি ক্ষুদ্র ইমানের অস্তিত্বও রয়েছে, যার বরকতে অবশেষে সে জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ পাবে। তিনি ভাবলেন, এ লোকের জানাযা নামাজ পড়া যাবে কিনা। অতঃপর তাওয়াজ্জোহের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, জানাযা পাঠ করতেই হবে।

মুকাশাফা ৫২

তিনি বলেছেন, একবার আজানের পরে আমি দোয়া করছিলাম— হাত হাঁটুর উপরে ছিলো। এমতাবস্থায় আমার খেয়াল হলো, হাত না উঠিয়ে দোয়া করা আদবের অনুকূলে নয়। সুতরাং আমি হাত হাঁটু থেকে উপরে উঠিয়ে দোয়া করতে লাগলাম (আল্লাহ্‌র কী শান!)। শুধু মাত্র এতোটুকু আদবের অনুসরণের জন্য ক্ষমাশীল ও দোষ গোপনকারী প্রভুর পক্ষ থেকে আওয়াজ এলো— পরকালে তোমার প্রতি কোনো রকম শাস্তি আরোপ করা হবে না।

মুকাশাফা ৫৩

মখদুমজাদা হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম র. বর্ণনা করেন, হজরত মোজাদ্দেদ র. বলতেন, হাদিস শরীফে এসেছে, যদি কোনো ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা যায় তাহলে তার রূহ পরিত্রাণ পায় না— যতক্ষণ না তার পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ করা হয় এবং অন্যের নষ্টকৃত হক আদায় না করা হয়। ওই আত্মা অগ্নিউপাসক হিসেবে থাকে। তার আত্মা আসমানের উপরে নেওয়া হয় না।

হজরত মোজাদ্দেদ র. বলেন, আমার প্রতি এই বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে যে, এই হুকুম বিশেষ করে ওই ব্যক্তির জন্য যে দুনিয়ায় পরিত্রাণ পায়নি। কিন্তু দুনিয়ায় এ সকল বিষয় ব্যতীত যদি সে পরিত্রাণ পায়, তাহলে মৃত্যুর পরেও সে পরিত্রাণ পাবে। কিন্তু দুনিয়াতে যারা মূর্তিপুজারী বা অগ্নিউপাসক ছিলো, মৃত্যুর পরেই তাদেরকে গ্রেফতার করা হবে। কেনোনা মৃত্যুর পরে পরিত্রাণপ্রাপ্তি দুনিয়া থেকে মুক্ত হওয়ার উপর নির্ভরশীল।

মুকাশাফা ৫৪

মখদুমজাদা হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম র. তাঁর বিশেষ দিনলিপিতে লিখেছেন, মহান আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন 'এটি আমার কিতাব, যা তোমাদের প্রতি সত্য হিসেবে সাক্ষ্য দেবে। আর আমি তোমাদের আমল লিখে [১] রাখি'। ওলামা কেরাম বলেছেন, ফেরেশতারাই লেখেন। আল্লাহ্ লেখেন কথাটি রূপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। হজরত মোজাদ্দেদ র. বলেন, একবার এই আয়াত আমি বারংবার তেলাওয়াত করছিলাম। এমন সময় আমার অন্তরে উদয় হলো, এ স্থানে লেখা বিষয়টি আল্লাহ্পাক যে নিজের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন, অবশ্যই এর বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য রয়েছে। এরপর এরকমই স্পষ্ট হলো যে, 'মরতবায়ে মুকাদ্দাসাহ্' এর মধ্যে ফেরেশতা কর্তৃক আমলনামা লেখা ব্যতীত আরেক প্রকার লেখার কথা উল্লেখ রয়েছে। আর তা ওই সকল ব্যক্তির জন্য হবে, যাঁদের খবর আল্লাহ্ ফেরেশতাদেরকেও জানাতে ইচ্ছা করেন না। এটি আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা তাকে দান করে থাকেন— এ বিষয়ে এটাই হচ্ছে গোপন রহস্য যে, মহান আল্লাহ্ তাঁর বিশেষ পছন্দনীয় ব্যক্তির আমলকে কিরামান কাতিবীন ফেরেশতাদের থেকে গোপন রাখতে চান।

মিয়ানে আশেকো মাশুক রমিজীস্ত
কিরামান কাতেবীন রা হাম খবর নিস্ত

আশেক মাশুকের ইশারা ইঙ্গিত এরকমই যে, কিরামান কাতেবীনও সে বিষয়ে অজ্ঞ।

আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন 'মৃত্যুর সময় জান আমি কবজ করি' [২] এখানে জান কবজ করার বিষয়টি আল্লাহ্ নিজেই নিজের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন, যদিও মৃত্যুর জন্য নির্ধারিত ফেরেশতা রয়েছে। এ জন্য বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির জান কবজ মৃত্যুর ফেরেশতা ছাড়াও হতে পারে। অন্যান্য হাদিসে জান কবজ বিষয়টি

১. সূরা আল জাছিয়্যাহ্ ২৯
২. সূরা যুমার ৪২ আয়াত প্রসঙ্গে উপরের বর্ণনাসমূহ ফারসী ভাষায় লিখিত পাণ্ডুলিপিতে বিভিন্ন মুকাশাফাতের মধ্যে পাওয়া গিয়েছে। ধারণা হচ্ছে, এই বর্ণনা উপরের বর্ণনার সাথে সম্পর্কযুক্ত।

মালাকুল মউতের মাধ্যমে হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ নিয়ম সর্বসাধারণের জন্য। সুতরাং আয়াতের অর্থ একটু চিন্তা করলেই বুঝা যাবে। অতএব গভীরভাবে অনুধাবন করো।

মুকাশাফা ৫৫

হজরত মোজাদ্দেদ র. এর মকতুবাত (১ম খণ্ড) যখন আসহাবে বদরের সংখ্যা অনুযায়ী ৩১৩ হলো তখন কোনো কোনো হজরত বললেন, নির্দেশ পেলে পরবর্তী মকতুবগুলোও একত্র করে দ্বিতীয় খণ্ডের কাজ শুরু করে দেওয়া যায়। তখন বলা হলো, মারেফাতের বিষয়ে সকল এলেম যা মকতুবাতের মধ্যে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তা আল্লাহ্র দরবারে কবুল হয়েছে, না হয়নি।

এমন সময় তিনি অত্যন্ত বিনীতভাবে ব্যথিত হৃদয় নিয়ে বিশেষ তাওয়াজ্জোহের সাথে দরবারে ইলাহীর সকাশে প্রার্থনা জানালেন। অদৃশ্য থেকে আওয়াজ এলো, এলমে মারেফাত বিষয়ে যে সকল জ্ঞানভাণ্ডার তোমরা লিপিবদ্ধ করেছো আর যে বিষয়ে তোমরা আলোচনা করছো, আমার দরবারে ওই সকল বিষয় কবুল ও মঞ্জুর করে নেওয়া হয়েছে। বরং এই মর্মেও ইঙ্গিত করা হলো যে, এগুলো আমারই কথা। এরপর তিনি বলেন, এ সময় আমি সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিতভাবে ওই এলেম লিপিবদ্ধ করলাম এবং যে সকল বিষয়ে আমার কিছুটা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিলো সেগুলোও লিপিবদ্ধ করলাম। উপরের ইঙ্গিতের প্রেক্ষিতে সবই এই নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় আমি দ্বিতীয় খণ্ডের কাজ শুরু করার নির্দেশ দিলাম।

মুকাশাফা ৫৬

ফিকাহ্ শাস্ত্র ও আকাইদ শাস্ত্র অধ্যয়ন পূর্বক অনুধাবন করলাম, কবীরা গোনাহের সংখ্যা নিয়ে ইমামদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে।

হজরত মোজাদ্দেদ র. বলেন, এক রাতে তাহাজ্জুদের নামাজের পরে এই খেয়াল হলো যে, কবীরা গোনাহের সংখ্যা জানার জন্য আল্লাহ্র দরবারে বিশেষভাবে মিনতি জানাবো। (আল্লাহ্র অনুগ্রহ হলো) কিছুক্ষণ তাওয়াজ্জোহের পর আমাকে জানানো হলো, কবীরা গোনাহর সংখ্যা মাত্র সাতটি। যেমন হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে— তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক বিষয় থেকে বিরত থাকো। ওই ধ্বংসাত্মক বিষয়ের মধ্যে মূল হলো শিরিক। অন্য ছয়টি গোনাহ শিরিককে কেন্দ্র করে ঘুর্ণায়মান। যেমন শিরিক হলো মূল বৃক্ষ এবং অন্য ছয়টি তার শাখা। এতদ্ব্যতীত অন্য সকল গোনাহ ছোট গুনাহ। কিছু ছোটো গোনাহ শিরিকে সগীরের মধ্যেও পরিগণিত বলে তিনি উল্লেখ করেন। যেমন সুদ খাওয়া, মিথ্যা বলা, গীবত করা— এগুলোকে তিনি শিরকে সগীর (ছোট শিরিক) বলে উল্লেখ করেছেন।

সপ্তম হাজ্‌রাত

হজরত মোজাদ্দেদ র. এর বক্তব্য ভিন্নমত পোষণকারীদের সন্দেহের জবাব এবং তাঁর বক্তব্যের প্রশংসা প্রসঙ্গে বর্ণনা—

প্রকাশ থাকে যে, হজরত মোজাদ্দেদ র. পূর্ণ ছোহো ও সুন্নতে রসুলের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য পোষণ করা সত্ত্বেও কখনো কখনো তাঁর সুমধুর জবান থেকে কিছু মত্ততাপূর্ণ কথা বের হয়েছে। এজন্য কোনো কোনো মাশায়েখ লিখেছেন, তাঁর আপাদমস্তক ছোহো (স্বাভাবিকতা)তে পরিপূর্ণ ছিলো— তা সত্ত্বেও তাঁর থেকে মত্ততাপূর্ণ কথা কেমন করে প্রকাশ হলো? তিনি এর উত্তরে বলেছেন, প্রকৃত ছোহো (স্বাভাবিকতা) তো সাধারণেরও হয়, যা চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় । কিন্তু সুফী সমাজের কিছু বিশেষ ছোহো রয়েছে, যা ছোকর (মত্ততা) ব্যতীত হয় না এবং ছোহো এ সব ধরনের এলেম প্রকাশ করার শক্তি রাখে না। অথচ তিনি তো এ সকল বিষয় প্রকাশ করার জন্যই আদিষ্ট ছিলেন (যখন একথা তুমি জেনেছো তখন এও শুনে নাও)।

সন্দেহ ১. কোনো কোনো ভিন্ন মতাবলম্বী তাঁর বক্তব্যে এই মর্মে আপত্তি করেছেন যে, তিনি তাঁর পীর-মোর্শেদ হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ র. এর খেদমতে ১১ নং মকতুবে (প্রথম খণ্ড) লিখেছেন— দ্বিতীয়তঃ কথা হচ্ছে, এ মাকাম সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করতেই পুনরায় অন্য কিছু মাকাম প্রকাশিত হলো— যা পরস্পর থেকে উচ্চতর। তারপর আজেয বা অক্ষমতা ও বিনয়ের মাধ্যমে খেয়াল করাতে অগ্রবর্তী মাকামের সামনের মাকামে উপনীত হলাম। জানতে পারলাম, এ মাকাম হচ্ছে জিন্‌নুরাইন হজরত ওসমান রা. এর মাকাম। অন্যান্য খোলাফায়ে রাশেদীনও এই মাকাম অতিক্রম করেছেন। এই মাকাম হচ্ছে তাকমীল ও এরশাদের মাকাম। সামনে আরো দু'টি মাকাম রয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে এখন আলোচনা করা হচ্ছে। পূর্ববর্তী মাকামের উপর আরো একটি মাকাম দৃশ্যমান হলো। যখন সেই মাকামে উপনীত হলাম, তখন জানতে পারলাম, এটি হজরত ওমর ফারুক রা. এর মাকাম। অন্যান্য খোলাফায়ে রাশেদীনও এই মাকাম অতিক্রম করেছেন। এই মাকামের অগ্রভাগে হজরত সিদ্দীক আকবর রা. এর মাকাম প্রকাশিত হলো। সেখানেও উপনীত হলাম। আমার মাশায়েখদের মধ্যে হজরত খাজা নকশবন্দ কুদ্দিসা সিররুহুকে সকল মাকামে সাথে পেয়েছিলাম। এই মাকামও অন্যান্য খোলাফায়ে রাশেদীন অতিক্রম করেছেন। এর মধ্যে অতিক্রম, মাকাম, গমন এবং অবস্থান ব্যতীত কোনো পার্থক্য ছিলো না। এর উর্ধ্বে রসুলুল্লাহ স. এর মাকাম ব্যতীত অন্য কোনো মাকাম দেখলাম না। হজরত আবু বকর রা. এর সমমাকামের এক জ্যোতির্ময় মাকাম দৃশ্যমান হলো, যা ইতোপূর্বে

কখনো দেখিনি। সেই মাকাম এই মাকাম থেকে একটু ঊর্ধ্বে ছিলো— যেমন সমতল জমিন থেকে একটু উঁচু উঠান বানানো হয়। জানতে পারলাম, ওই মাকাম মাহবুবিয়াতের মাকাম। ওই মাকামখানি ছিলো রঙিন ও সুসজ্জিত। আমার নিজেকেও ওই মাকামের প্রতিবিম্ব দ্বারা রঙিন ও সুসজ্জিত অবস্থায় পেলাম। তারপর এই অবস্থায় নিজেকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম অবস্থায় পেলাম— এমনই যে, বাতাস এবং বৃষ্টি-বিন্দুর মতো নিজেকে আকাশে বিস্তৃত দেখলাম। আমার পরিপার্শ্বকেও অনুরূপ অবস্থায় মিলিয়ে নিলাম। খাজা নকশবন্দ কুদ্দিসা সিররুহুকে হজরত আবু বকর রা. এর মাকামে দেখলাম। আর আমার অস্তিত্বকে এই মাকামের সমপর্যায়ে এমন অবস্থায় পেলাম, সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে (এখানেই হজরত মোজাদ্দেদ র. এর কথা শেষ হলো)।

এ সকল বরকতপূর্ণ আলোচনা থেকে ওই সকল লোক, যাদের অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত , তারা এ উদ্দেশ্য ধরে নিয়েছিলো যে, তিনি নিজেকে হজরত আবু বকর রা. থেকে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন মনে করেছিলেন।

উত্তরঃ আমি বলতে চাই যে, এ আপত্তি গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে কাজ না করার জন্যই হয়েছে। সূফী সাধকদের পরিভাষা সম্পর্কে অনভিজ্ঞতাও এর অন্যতম কারণ। কেনোনা অর্জন এবং উপস্থিতি এক নয়। অনেক সময় এরকমও হয় যে, একদল লোক মত্ততা ও মাতলামির কারণে নিজেদেরকে বাদশাহ্ মনে করে। অথচ তারা বাদশাহ্র দরজায় পৌঁছতে পারে না। হজরত মোজাদ্দেদ র. তো শুধুমাত্র এতোটুকু বলেছেন যে, ওই মাকামের প্রতিবিম্ব দ্বারা আমি আমাকে রঞ্জিত পেয়েছি। তিনি তো একথা বলেননি যে, আমি ওই মাকামে পৌঁছে গিয়েছি, বা ওই মাকাম অর্জন করেছি। মনে করা যাক, সূর্য চতুর্থ আসমানে এবং এর প্রতিবিম্ব পৃথিবীতে কিরণ দিচ্ছে। সে জন্য তো একথা বলা যায় না যে, পৃথিবী সূর্যের কাছে পৌঁছে গিয়েছে। তিনি তাঁর বর্ণনার মধ্যে (স্বীয় পীরবুজর্গকে) এই বাক্যের প্রথমে উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, এই মাকাম অন্যান্য খোলাফায়ে রাশেদীনও অতিক্রম করেছেন। এর মধ্যে অতিক্রম, মাকাম, গমন ও অবস্থান ব্যতীত অন্য কোনো পার্থক্য নেই। এ উত্তরই যথেষ্ট যে, ওই লোকগুলো অন্তরের ব্যাধিতে নিমজ্জিত। অর্থাৎ হজরত আবু বকর রা. এর মাকাম ওটিই ছিলো এবং অন্যান্য খলিফাগণও তা সময়মত অতিক্রম করার সুযোগ লাভ করেছিলেন।

তাঁর এ সমস্ত কথার জন্য তাঁকে বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর তলব করেছিলেন। বলেছিলেন, আমি শুনেছি আপনি নাকি আপনার মর্যাদা হজরত আবু বকরের মর্যাদার চেয়ে ঊর্ধ্বে বলেছেন। তিনি একথার যথাউত্তর দিয়েছিলেন, একটি দৃষ্টান্ত ও উপস্থাপন করেছিলেন এই মর্মে যে, আপনি নিম্নপর্যায়ের এক ব্যক্তিকে আপনার কাছে ডেকে অনুগ্রহ করে তার কানে কানে কিছু কথা বললেন। ওই লোকটি আনুমানিক পাঁচ হাজার আমির ও সম্ভ্রান্ত লোককে অতিক্রম করে আপনার কাছে

উপস্থিত হলো। অতঃপর সে পুনরায় তার নিজের অবস্থানে চলে গেলো। এর দ্বারা তো একথা প্রমাণিত হয় না যে, ওই লোকটির মর্যাদা পাঁচ হাজার আমির ও সম্ভ্রান্ত লোকের চেয়ে অধিক। একথা শুনে জাহাঙ্গীরের ক্রোধ প্রশমিত হলো। কিন্তু এমন সময় এক ব্যক্তি, যে আল্লাহ্‌কে ভুলে গিয়েছিলো সে বাদশাহ্‌কে বললো, আপনি তো এই শায়েখের প্রতারণার প্রতি লক্ষ্য করেননি। আপনি তো জিল্লুল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র খলিফা। সে তো আপনাকে সেজদা করেনি এবং আপনার প্রতি সে বিনয়ীও নয়। সর্বসাধারণের মতো শাহী সমীহবোধও তার নেই। একথা শুনে বাদশাহ্ রাগান্বিত হলেন। হজরত মোজাদ্দেদ র. কে গোয়ালিয়র দূর্গে বন্দী করার নির্দেশ দিলেন।

এ ঘটনায় শাহজাদা শাহজাহান, যিনি তাঁর প্রতি পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাসী ও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, তিনি সেখানে বড় বড় ফেকাহশাস্ত্রবিদ আলেমদেরকে প্রেরণ করলেন—যেমন আফজাল খান, মুফতি আবদুর রহমান ও অন্যান্য। উদ্দেশ্য ছিলো তাঁরা এই ফতোয়া প্রদান করবেন যে, সম্মানসূচক সেজদা প্রদান বৈধ। তিনি যদি বাদশাহ্‌কে সেজদা করেন, তাহলে বাদশাহ্‌র আর কোনো ক্ষোভ থাকবে না। এ বিষয়ে ফতোয়া দানের সকল দায়দায়িত্ব আমার। তিনি বললেন, এই মাসআলা প্রত্যাখ্যান করা হলো। এ বিষয়ে দৃঢ়তা হচ্ছে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে সেজদা না করা। এ আপত্তির জবাবে এ কথা বলা যায় যে, হজরত মোজাদ্দেদ র. যে স্বীয় পীরবুজর্গ সম্পর্কে এই বর্ণনায় একথাটিও উল্লেখ করেছেন যে, এই ফকির নিজেকে একজন নিকৃষ্ট কাফের থেকেও নিকৃষ্ট মনে করেন। তাঁর বিনয় ও নম্রতা ছিলো এ পর্যায়ের। সুতরাং সে ক্ষেত্রে নিজেকে হজরত আবু বকর রা. থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করা নিছক জ্ঞানশূন্যতা ও বিবেকবর্জিত একটি ব্যাপার।

তিনি শায়েখ হামিদ বাঙ্গালীর কাছে একটি চিঠিতে (প্রথম খণ্ড ২২০ নং মকতুব) লিখেছিলেন— বিনীতভাবে জানাচ্ছি যে, এ অতীব অদৃশ্য পথে সাধকগণের পদস্খলনের অনেক স্থান আছে। সূফীগণের ভ্রান্তির মাকাম বা স্থল যথা— সালেক ঊর্ধ্বারোহণকালে নিজেকে অনেক সময় ওই সকল ব্যক্তি যাদের শ্রেষ্ঠত্ব সর্ববাদীসম্মত তাঁদের মাকামের ঊর্ধ্বে প্রাপ্ত হয়। এটা সঠিক যে, উক্ত সালেকের মাকাম উল্লেখিত ব্যক্তিগণের মাকাম হতে নিম্নতর। বরং সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি পয়গম্বর আ.গণের সম্বন্ধেও অনেক সময় সালেকের এরূপ ধারণা হয়ে থাকে। এ প্রকারের ধারণা হতে আমরা আল্লাহ্‌পাকের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করছি। সালেকগণের এরূপ ধারণা হওয়ার কারণ এই যে, ওলী হোক অথবা নবী— তাঁদের উৎপত্তি যে এসেম বা আল্লাহ্‌তায়ালার নাম হতে, আরোহণকালে প্রথমততঃ সেই এসেম পর্যন্ত তাঁরা উপনীত হন এবং আরোহণ দ্বারাই তাঁরা ওলী বা নৈকট্যধারী নাম প্রাপ্ত হন। তৎপর উক্ত এসেমের মধ্যে উন্নতি করতে থাকেন এবং তা হতে ক্রমান্বয়ে আল্লাহ্‌পাকের যতদূর ইচ্ছা উন্নতি করেন। এতদসত্ত্বেও

তাঁদের প্রত্যেকের মনজিল বা নিদিষ্ট স্থান ওই এসেম, যা তাঁদের অস্তিত্বের উৎপত্তি স্থান। অতএব যদি কেউ তাঁদেরকে উন্নতির মাকামসমূহে অন্বেষণ করে, তবে প্রায়শঃ তাঁদের উৎপত্তি স্থান যে এসেম, তথায় প্রাপ্ত হয়। কেনোনা উন্নতির মাকামে ঐটাই তাঁদের স্বাভাবিক স্থান। ওই স্থান থেকে ঊর্ধ্বরোহণ বা অবতরণ, আনুষঙ্গিক কারণবশতঃই হয়ে থাকে।

যে সালেক উচ্চ মনোবৃত্তিধারী, সে যখন ঊর্ধ্বারোহণ করতে থাকে, তখন উক্ত এসেম হতেও উন্নতি করে যায় এবং তারই পূর্ববর্ণিত প্রকারের ধারণা হয়ে থাকে। আল্লাহ্ রক্ষা করুন, এ ধারণা যেনো তার ইতোপূর্বের বিশ্বাস নষ্ট না করে ও পয়গম্বর আ. গণের শ্রেষ্ঠত্বের এবং সর্ববাদীসম্মত উৎকৃষ্ট ওলীগণের শ্রেষ্ঠত্বে সন্দেহ না জন্মায়। এটা সালেকদের পদস্খলনের একটি স্থান। তখন তারা বুঝতে পারে না যে, বুজর্গগণ উক্ত এসেমসমূহ হতে বহু ঊর্ধ্বে উঠেছেন এবং তা হতেও ঊর্ধ্বতম মাকামে উপনীত হয়েছেন। এ কথাটিও সালেকগণ বুঝতে পারে না যে, যে এসেম হতে তাঁরা উন্নতি করে ঊর্ধ্বে উঠেছেন তা তাঁদের স্বাভাবিক স্থান এবং উক্ত সালেকের স্বাভাবিক স্থান ওই স্থান হতে অতি নিম্নে।

প্রত্যেক ব্যক্তির স্বীয় উৎপত্তিস্থানের পুরোবর্তিতার কারণেই তার শ্রেষ্ঠত্ব হয়ে থাকে। কোনো কোনো মাশায়েখ বলে থাকেন, আরেফ (সাধক) উন্নতির মাকামসমূহে অনেক সময় বৃহত্তম মধ্যস্থ হজরত স. কেও ব্যবধানপ্রাপ্ত হয় না এবং তাঁর মধ্যস্থতা ব্যতীতই উন্নতি করে যায়। এটাও উক্ত প্রকারের বাক্য। আমার পীর কেবলা বলেছেন, হজরত রাবেয়া বসরী র.ও ওই দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁরা আরোহণকালে যখন বৃহত্তম মধ্যস্থ রসুল স. এর উৎপত্তি স্থান হতেও উন্নতি করে, তখন মনে করে যে, মধ্যস্থলে বৃহত্তম ব্যবধান আর নেই। তাঁরা বৃহত্তম ব্যবধান হতে হজরত নবী করিম স. এর হকিকত বা প্রকৃত তত্ত্ব অর্থ নিয়েছেন। এ বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

এরূপ ভ্রমে পতিত হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হলো, সালেকের উৎপত্তিস্থান যে এসেম তার মধ্যে যখন সে সায়ের বা ভ্রমণ করে, উক্ত এসেম আবার যখন সংক্ষেপতঃ যাবতীয় এসেমের সমষ্টি, যা মানবের সমষ্টিভূত হওয়ার কারণ, তখন ওই সায়ের করার মধ্যেই সংক্ষেপতঃ অন্যান্য মাশায়েখগণের উৎপত্তিস্থানও অতিক্রম করে যায় ও উক্ত এসেমের শেষ প্রান্তে উপনীত হওয়ার ধারণা করে বলে, আমিই শ্রেষ্ঠ। সে তখন এটা বুঝতে পারে না যে, সে যাকে মাশায়েখগণের মাকাম বলে দেখেছে এবং যা অতিক্রম করেছে, তা তাঁদের মাকামের নিদর্শন মাত্র। তাঁদের প্রকৃত মাকাম নয়। সালেক নিজেকেই সমষ্টিস্বরূপ প্রাপ্ত হয় এবং সকলকে নিজের অংশ বলে ধারণা করে। অতএব সন্দেহে পতিত হয়ে নিজেকে উৎকৃষ্ট ভাবে। এরকম মাকামেই হজরত বায়েজীদ বোস্তামী র. বলেছেন 'আমার পতাকা হজরত মোহাম্মদ স. এর পতাকা হতে উচ্চ'। মত্ততার প্রাবল্যহেতু তিনি

জানতে পারেননি যে, তাঁর পতাকা হজরত মোহাম্মদ স. এর পতাকা হতে উচ্চ নয়, বরং হজরত মোহাম্মদ স. এর পতাকার নিদর্শন হতে উচ্চ, যা তিনি স্বীয় এসেমের হকিকত বা প্রকৃত তত্ত্বের মধ্যে দেখতে পেয়েছেন। তিনি ক্বলবের প্রশস্ততার বিষয়ে আরো বলেছেন, 'আরশ এবং যা কিছু তাতে আছে, তা যদি আরেফের ক্বলবের এক কোণে নিক্ষেপ করা যায়, তবে তার কিছুই অনুভূত হবে না। এ-ও উক্ত প্রকারের বাক্য। এ স্থলে প্রকৃত বস্তু এবং নিদর্শনের মধ্যে দৃষ্টিভ্রম হয়েছে। নতুবা আরশ, যাকে আল্লাহ্পাক আজীম বা বৃহত্তম বলেছেন, আরেফের ক্বলবের তথায় মূল্যই বা কী এবং অস্তিত্বই বা কোথায়? আরশের মধ্যে মহান আল্লাহ্র যে আবির্ভাব আছে, তার এক শতাংশও ক্বলবের মধ্যে নেই, যদিও তা আরেফের ক্বলবই হয় না কেনো। পরকালে মহান আল্লাহ্র দীদার (দর্শন) আরশের আবির্ভাব দ্বারাই সংঘটিত হবে।

উপস্থিত আমার একথা কতিপয় সূফীগণের নিকট যদিও অপছন্দনীয় মনে হচ্ছে, তবু অবশেষে তাঁরা নিশ্চয়ই এটা বুঝতে পারবেন। একটি উদাহরণ দিয়ে আমি বিষয়টি স্পষ্ট করে দিচ্ছি। মানব পার্থিব ও আকাশস্থিত বস্তুসমূহের সমষ্টি। সে যখন স্বীয় সমষ্টিভূতির প্রতি লক্ষ্য করে, তখন পঞ্চভূত ও আকাশকে নিজের অংশ দেখতে পায় এবং যখন তার এই দৃষ্টি প্রবল হয়, তখন এরূপ বলা তার পক্ষে অসম্ভব নয় যে, আমি ভূমণ্ডল হতে বৃহৎ এবং আসমানসমূহ হতেও উচ্চতর। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ তখনই বুঝবেন যে, তার এই উচ্চতা তার অংশসমূহ হতে । ভূমণ্ডল বা আকাশ তার অংশ নয়। বরং তার মধ্যে ওগুলোর নিদর্শন আছে। সেই নিদর্শনসমূহ হতে সে নিজেকে বৃহত্তর মনে করছে, প্রকৃত ভূমণ্ডল ও আকাশ হতে নয়। এরূপ নিদর্শনকে প্রকৃত বস্তু ধারণা করে ফতুহাতে মক্কিয়ার সম্পাদক (শায়েখ মহিউদ্দীন আরাবী) বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালার সমষ্টিভূতি হতে হজরত মোহাম্মদ স. এর সমষ্টিভূতি অধিকতর। কেনোনা হজরত মোহাম্মদ স. এর সমষ্টি সৃষ্ট পদার্থ ও স্রষ্টা উভয় তত্ত্বসম্ভূত। অতএব এটাই অধিক সমষ্টিভূত। কিন্তু তিনি এটা বুঝতে পারেননি যে, হজরত স. এর সমষ্টি আল্লাহ্তায়ালার উলুহিয়াত (উপাস্য হওয়া) এর মর্তবার কোনো এক প্রতিবিম্বের সমষ্টি ও তথাকার নিদর্শন মাত্র। প্রকৃত পক্ষে সেই পবিত্র মর্তবা নয়। বরং সে পবিত্র মর্তবা যা আজমত (মহত্ত্ব) কিবরিয়ায়ী (উচ্চতা) সম্ভূত, সেখানে মোহাম্মদ স. এর সমষ্টিভূতির কোনোই মূল্য নেই। মৃত্তিকার সাথে পালনকারীগণের পালনকর্তার কী আর তুলনা হবে। এরূপ মাকামে যখন সালেক তার উৎপত্তি যে এসেম হতে, তাতে সায়ের করে, তখন অনেক সময় ধারণা করে যে, যে বুজর্গগণ উক্ত সালেক হতে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ, তাঁরা তার মাধ্যমে কোনো কোনো উচ্চ স্তরে পৌঁছেছেন এবং উহারই অসিলায় উন্নতি করেছেন। এটিও সাধকদের একটি পদস্খলনের স্থান। আল্লাহ্ রক্ষা করুন। এই ধারণায় তারা নিজেকে শ্রেষ্ঠ ভেবে ইহ-পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত না

হয়। যদি কোনো পরাক্রমশালী বাদশাহ্ তাঁর রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত কোনো জমিদারের জমিদারীর মধ্যে যেয়ে তার পথপ্রদর্শনের সাহায্যে কোনো স্থানে গমন করে, তবে কী আর আশ্চর্যের কথা এবং তাতে ওই জমিদারের কী আর শ্রেষ্ঠত্ব হতে পারে। ফলকথা এমতাবস্থায় আংশিক শ্রেষ্ঠত্বের সম্ভাবনা আছে মাত্র— যা আলোচনাবহির্ভূত। নাপিত, তাঁতীরাও শ্রেষ্ঠ আলেম ও উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক হতে কোনো না কোনো বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব রাখে, কিন্তু তা ধর্তব্য নয়। সর্ববিষয়ে পূর্ণ শ্রেষ্ঠত্ব হওয়াই ধর্তব্য, যা আলেম ও বৈজ্ঞানিকগণের হয়ে থাকে। আমারও এরূপ সন্দেহ হয়েছিলো এবং এরূপ ধারণা জেগেছিলো। বহুদিন পর্যন্ত এই অবস্থায় ছিলাম। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালার হেফাজত থাকাহেতু পূর্বের বিশ্বাসের চুলমাত্র ব্যতিক্রম ঘটেনি এবং সর্ববাদীসম্মত মতের অনুরূপ বিশ্বাসের ন্যূনাধিক্য হয়নি। এই হেতু আল্লাহ্পাকের প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বরং তাঁর যাবতীয় নেয়ামতের জন্য শোকরগোজারী করছি। একতাবদ্ধ বিষয়ের বিপরীত যা উপলব্ধি হতো, তা ধর্তব্য মনে করতাম না এবং ওগুলোকে সৎভাবে পরিচালিত করতাম। সংক্ষেপে এরূপ ভাবতাম যে, যদি আমার এই কাশফ্ সত্য হয়, তাহলে এই উৎকর্ষ আংশিকভাবেই হবে। অবশ্য এরূপ ধারণাও সামনে উপস্থিত হতো যে, আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্যের উপর শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে এবং ওই নৈকট্যের মধ্যেই আমার উন্নতি অধিক। অতএব আংশিক হবে কেনো? কিন্তু পূর্ববর্তী বিশ্বাসের সম্মুখে এরূপ ধারণা ধূলিকণার মতো উড়ে যেতো এবং কোনোই মূল্য পেতো না। বরং আল্লাহ্তায়ালার নিকট তওবা, এস্তেগফার ও অনুনয়বিনয় করতাম— যাতে এরূপ কাশফ্ প্রকাশ না পায় এবং সুন্নত জামাতের আলেমগণের বিশ্বাসের বিপরীত লোমাগ্র পরিমাণও যেনো কাশফ্ না নয়। একদিন এই ভেবে অত্যন্ত ভীত হলাম যে, এই কাশ্ফের জন্য আমি যদি ধৃত ও জিজ্ঞাসিত হই তবে কী হবে— এই ভয়ে অস্থির হয়ে পড়লাম এবং আল্লাহ্তায়ালার দরবারে দ্বিগুণ কাঁদাকাটি আরম্ভ করলাম। কিছুকাল এই অবস্থা চলতে থাকলো। ঘটনাক্রমে একদিন কোনো এক বুজর্গের মাজার শরীফ অতিক্রমকালে আমার বিষয়টিতে তাঁর সাহায্য কামনা করলাম। তখন আমার প্রতি আল্লাহ্তায়ালার অনুকম্পার দৃষ্টি পতিত হলো এবং প্রকৃত তত্ত্ব যথাযথভাবে প্রকাশ পেলো। তখন নবী করিম স. এর রূহপাকের আবির্ভাব হলো এবং আমার ব্যথিত প্রাণে সান্ত্বনা প্রদান করলো। আমি বুঝলাম, আল্লাহ্পাকের নৈকট্যের দ্বারাই পূর্ণশ্রেষ্ঠত্ব লাভ হয়ে থাকে বটে, কিন্তু আমার যে নৈকট্য লাভ হয়েছে তা উলুহিয়্যাত বা উপাস্য বস্তুর প্রতিবিম্বসমূহের কোনো এক প্রতিবিম্ব— যা আমার উৎপত্তি স্থান বা রব— এই এসেমের সাথে বৈশিষ্ট্য রাখে। এই হাল হতে পূর্ণ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ হয় না। তৎপর উক্ত মাকামের আলমে মেছাল বা উদাহরণের জগতস্থিত আকৃতি আমার প্রতি

এরূপভাবে প্রকাশ করে দিলেন যে— আমার এ বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ থাকলো না এবং কালিমাসমূহ বিদূরিত হয়ে গেলো। এই প্রকার এলেম, যাতে সন্দেহের অবকাশ ছিলো এবং যার অনেক অর্থ ও বিশ্লেষণ স্বীয় পুস্তকাদিতে লিখে প্রচার করেছিলাম— আমার মনে জাগলো যে, আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহে যখন ভূল সংশোধিত হলো, তখন আমি তা লিখে প্রচার করি। যেহেতু প্রকাশ্য গুনাহর তওবাও প্রকাশ্যভাবে করতে হয়— যাতে সর্বসাধারণ উক্ত এলেমসমূহ হতে শরীয়তের বিপরীত না বুঝে এবং ওগুলোর অনুসরণ করে পথভ্রষ্ট না হয়ে যায়, অথবা পক্ষপাতিত্ব ও অতিরিক্ততা করতঃ অন্যায়ভাবে আমাকে ভ্রষ্ট ও অজ্ঞ বলে দোষী না করে। যেহেতু এই অতীব অদৃশ্য পথে অনেক সময় এই প্রকারের পুষ্প বিকশিত হয়ে থাকে। তা কাউকে পথপ্রদর্শন করে এবং কাউকে করে পথভ্রষ্ট। আমি স্বীয় পিতা মরহুমের নিকট শুনেছিলাম, তিনি বলতেন, বাহাত্তর ফেরকার (দলের) অধিকাংশ দলের পথভ্রষ্ট হওয়ার কারণ এই যে, তারা সূফীগণের তরিকায় দাখিল হয়ে তরিকার শেষে উপনীত হয়নি এবং ভুল করে পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছে (২২০ নং মকতুব এখানে সমাপ্ত)।

হজরত মোজাদ্দেদ র. এ ধরনের সন্দেহ নিরসনের জন্য এরূপ লিখেছেন যে, সালেকের ঊর্ধ্বারোহণের বিষয়টি তার এসেমের সাথে সম্পৃক্ত, যা তার নিজের স্বাভাবিক উৎপত্তিস্থান। একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি আরো স্পষ্ট করে দেওয়া হলো (প্রথম খণ্ড ২০৮ নং মকতুব)।

বৈজ্ঞানিকগণ বলে থাকেন, ধোঁয়ার মধ্যে মৃত্তিকা এবং অগ্নির অংশ আছে। যখন তা উপরে উঠতে থাকে, তখন মাটির অংশ অগ্নির সাহায্যে উপরে উঠে যায়। এটা তার নিজস্ব ক্ষমতা বলে নয়। অন্যের সাহায্যে হয়ে থাকে। তারা আরো বলেন, ধোঁয়া প্রবল হলে অগ্নির গোলক পর্যন্ত উঠতে পারে। অতএব তখন উক্ত মাটির অংশ পানি এবং বায়ুর গোলক পর্যন্ত উপনীত হয়, যা স্বভাবত উহা হতে ঊর্ধ্বে— তা হতেও ঊর্ধ্বারোহণ করে। এ স্থলে বলা যাবে না যে, পানি ও বায়ু হতে উক্ত মাটির অংশগুলোর স্থান উপরে, যেহেতু সে অন্যের সাহায্যে উপরে উঠেছে। নিজস্ব হিশেবে নয়। অগ্নির গোলকে উপনীত হয়ে ওই মাটির অংশগুলো যখন অবতরণ করবে এবং স্বীয় স্বাভাবিক স্থানে উপনীত হবে, তখন নিশ্চয় তার স্থান পানি ও বায়ুর স্থান থেকে নিম্নতর হবে। আমাদের আলোচ্য বিষয়েও উক্ত সাধক উল্লেখিত মাকামসমূহ হতে অন্যের সাহায্যে ঊর্ধ্বে উঠে থাকে। তার উক্ত সাহায্যকারী আল্লাহ্তায়ালার অতিরিক্ত মহব্বতের উষ্ণতা এবং ইশকের আকর্ষণশক্তি (জয্বা)। নতুবা তার স্বাভাবিক স্থান উক্ত মাকামসমূহ হতে নিম্নে।

উপরে যে উত্তর দেওয়া হলো, তা দেওয়া হলো শেষ স্তরে উপনীত ব্যক্তির অবস্থার অনুপাতে। কিন্তু যদি প্রারম্ভেই এ রকম ধারণা করে ও নিজেকে পয়গম্বর

আ. গণের মাকামে প্রাপ্ত হয়— তার কারণ এই যে, প্রত্যেক মাকামের প্রারম্ভে ও মধ্যবর্তী অবস্থায় উক্ত প্রতিচ্ছায়া ও অনুরূপ বস্তু আছে। প্রারম্ভ ও মধ্যবর্তী অবস্থার সাধকগণ যখন উক্ত প্রতিচ্ছায়াসমূহে উপনীত হয়, তখন ধারণা করে, সে প্রকৃত মাকামে পৌঁছেছে। প্রতিচ্ছায়া ও প্রকৃত বস্তুর মধ্যে পার্থক্য করতে সে পারে না, তদ্রূপ পয়গম্বর আ.গণের উদাহরণ অনুরূপ বস্তু— যখন তাদের মাকামের প্রতিচ্ছায়ার মধ্যে নিজেকে প্রাপ্ত হয়, তখন তারা ধারণা করে যে, পয়গম্বর আ.গণের সাথে তাঁদের মাকামে তারা সমকক্ষ হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। এ স্থলে প্রতিবিম্বকে প্রকৃত বস্তু বলে সন্দেহ করা হয় মাত্র।

হে আল্লাহ্! ইহ-পরকালের ও পূর্ববর্তীদের অধিনায়ক হজরত নবীয়ে করীম স. এর তোফায়েলে আমাদেরকে প্রত্যেক বস্তুর তত্ত্ব যথাযথভাবে দেখাও এবং খেলাধুলায় লিপ্ততা হতে বিরত রাখো (২০৮ নং মকতুব সমাপ্ত)।

আমি তো এ কথাও বলি যে, ইসলামের মধ্যে এটি এমন কোনো কাঁচ নয়, যা প্রথমেই ভেঙে ফেলা হয়েছে। বরং অতি আদিমকাল থেকেই কলেমা মুতাশাবিহার প্রচলন ছিলো। পবিত্র কোরআন মজীদে এই শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে— ইয়াদ (হাত), ছাক্ব (রান) এবং ইছতাওয়া (সমান্তরাল)। এ বিষয়গুলোকে এক শ্রেণীর লোক নিজের ইচ্ছামতো ব্যাখ্যা করে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুৎ হয়েছে। হাদিস শরীফেও এ ধরনের কথা আছে—

১. নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ্ আদমকে তাঁর নিজস্ব আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন।
২. আমি আমার প্রভুপালককে দাড়িমোঁচবিহীন এক যুবকের আকৃতিতে মদীনার গলিতে চলতে দেখেছি (মাবদা ওয়া মাআদ গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠায় বিষয়টি আলোচিত হয়েছে)।

মাশায়েখদের মধ্য হতে হজরত বায়েজীদ বোস্তামী র. বলেছেন, আমার পতাকা হজরত মোহাম্মদ স. এর পতাকা থেকে উন্নত (যেমনটি এসম্পর্কিত বিস্ত ারিত আলোচনায় এসেছে)। শায়েখ মুহিউদ্দীন আরাবী বলেছেন, নবুওয়াতের আঙটি রৌপ্যের ইট এবং বেলায়েতের আঙটি স্বর্ণের ইট।

তিনি আরো বলেছেন, খাতুমুন নবুওয়াত, খাতেমে বেলায়েতের মারেফাত এবং জ্ঞান সংকলন করে থাকে। হজরত খাজা নকশবন্দ বোখারী কুদ্দিসা সিররুহ বলেছেন, আমি শায়েখ মনসুর হাল্লাজ র., শায়েখ বায়েজীদ বোস্তামী র. এবং শায়েখ জুনায়েদ বোগদাদী র. এর মাকামসমূহে ভ্রমণ করেছি। তাঁরা যে পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন আমি সে পর্যন্ত পৌঁছেছি। এমনকি আমি এমন এক দরবার পর্যন্ত পৌঁছেছি, যার ঊর্ধ্বে অন্য কোনো মহান দরবার নেই। আমি এলহামপ্রাপ্ত হলাম, এই দরবার হজরত মোহাম্মদ আলা সাহিবিহাস্ সলাতু ওয়াস্সালামের। কিন্তু আমি ঔদ্ধত্য দেখাইনি। যা বায়েজীদ বোস্তামী র. করেছেন, আমি তা করিনি।

হজরত খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দ র. উল্লেখ করেছেন, বায়েজীদ বোস্তামী র. বলেছেন, আমি আম্বিয়া কেরামের মাকামসমূহ ভ্রমণ করেছি এবং হজরত মোহাম্মদ স. এর দরবার পর্যন্ত পৌঁছেছি। তাঁর মাকাম ভ্রমণ করার ইচ্ছা করলে তিনি আমার ললাটে তাঁর পবিত্র হাত রাখলেন। আমি মহান আল্লাহ্র অনুগ্রহে ওই মাকামসমূহ ভ্রমণ করতে করতে তাঁর মাকামে উপনীত হলাম। আমি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিনি। বরং আমার পুঞ্জীভূত অনুরাগকে আমি রসুলুল্লাহ স. এর ছত্রছায়ায় রেখে দিলাম। তখন তিনি স. আমার প্রতি অনুগ্রহশীল হয়ে আমাকে ওই মাকামের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। প্রকাশ থাকে যে, যে ব্যক্তি মাকামে মোহাম্মদীতে (আলা সাহিবিহাস্ সলাতু ওয়াস্সালাম) উপনীত হবেন, তিনি অবশ্যই আম্বিয়া কেরাম ও প্রসিদ্ধ খলিফাবৃন্দের মাকাম অতিক্রম করেই ঊর্ধ্বে গিয়েছেন। সুতরাং এখানে যদি কিছু বিশ্লেষণের ব্যাপার থাকে, তাহলে তথায়ও (হজরত মোজাদ্দেদ র. এর উক্তিকেও) বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

শায়েখ আতাউর রহমাতুল্লাহ বর্ণনা করেছেন, নবীগণ এবং তাঁর খলিফাবৃন্দের জন্য আলমে শাহাদাতে (সাক্ষ্যজগতে) যেমন বিশেষ মাকাম থাকে, যাদের দর্শনের জন্য মুসাফির এই পরিদর্শনকারীগণ আগমনপূর্বক উপকৃত হন, তেমনি আলমে গায়েবেও (অদৃশ্যজগতেও) তাঁদের নিজস্ব মাকাম রয়েছে। সেখানে তরিকতের সালেকগণ সাফল্য লাভ ও তাদের বাতেনী হালের নেয়ামতপ্রাপ্তির জন্য আম্বিয়া আ. ও আউলিয়া কেরামদের মাকামসমূহে পৌঁছে তাঁদের ছত্রছায়ায় পরিপূর্ণভাবে নিবেদিত হয়ে তাঁরা স্বীয় কাজের সাফল্য কামনা করেন। অনেক ক্ষেত্রে এমনও হয় যে, তাঁদের উদ্দেশ্য সফল হয় না। অবশেষে রসুল স. এর ছত্রছায়ায় উপনীত হয়ে ফয়েজ লাভ করেন।

দ্বিতীয় সন্দেহঃ বলা হয়ে থাকে, হজরত মোজাদ্দেদ র. ওলামায়ে মুতাআখ্খেরীন (পরবর্তী আকায়েদ বিশেষজ্ঞ) দের ঐকমত্যপ্রসূত ওয়াহ্দাতুল অজুদ (একের অস্তিত্ব) কে অস্বীকার করেন।

উত্তরঃ হজরত মোজাদ্দেদ র. বলেন, তাঁর লেখনী থেকে যা প্রকাশিত হয়, তা হচ্ছে, তরিকতের সালেকগণ ওয়াহদাতুল অজুদে বিচরণের সময় তার উপর মারেফাতের যে বিষয়গুলো উন্মোচিত হয়, তা পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি না করার কারণে সে ক্ষেত্রে তারা কোনো উন্নতি করতে সক্ষম হয় না। সুতরাং তিনি উল্লেখ করেছেন, ওয়াহ্দাতুল অজুদের হাল অতি উত্তম, কিন্তু শর্ত হচ্ছে তা অনুধাবন, অতিক্রম বা হৃদয়ঙ্গম করা।

তাঁর প্রাথমিক অবস্থায় এই হাল লাভ হয়েছিলো। তিনি উল্লেখ করেন, ওয়াহদাতুল অজুদের মাসআলা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, এই দরবেশকে প্রাথমিক

অবস্থায় হালে উপনীত করে ধন্য করা হয়েছিলো এবং তার শুহুদে আহাদিয়াত (একত্বের দর্শন) লাভ হয়েছিলো। এরপর এই মাকাম থেকে উর্ধ্বে উপনীত হলাম। এ বিষয়ে আমাকে বহুবিধ মারেফাত সম্পর্কে জ্ঞান দান করা হয়েছিলো। কিন্তু ওই মাকামসমূহের প্রাপ্ত মারেফাতের সত্যতা স্পষ্টভাবে সূফীদের ভাষা থেকে প্রকাশিত হয়নি। কোনো কোনো বুজর্গের আলোচনা থেকে ইঙ্গিতপূর্ণভাবে, সংক্ষিপ্ত আকারে কিছু কিছু পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁদের দৃঢ়তা শুধুমাত্র শরীয়তের ইজমা ও আহলে সুন্নতের পক্ষে সাক্ষ্য বহন করে। শরীয়তের গভীরতার সাথে বিন্দুমাত্রও বৈপরিত্য নেই। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে দার্শনিকদের সাথে ঐকমত্য হয় না এবং তাদের নিয়ম-কানুন ও বিবেকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণও নয়। বরং ইসলামী চিন্তাবিদদের চিন্তার সাথেও সাদৃশ্যপূর্ণ নয়— যা সরাসরি আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মতের পরিপন্থী।

তিনি শায়েখ সূফীকে (১ম খণ্ড ৩১ নং মকতুব) ওয়াহদাতুল অজুদ সম্পর্কে লিখেছেন— হে মান্যবর ভ্রাতঃ শৈশব হতেই আহলে তৌহিদের দিকে আমার লক্ষ্য ছিলো। কারণ আমার বুজর্গ পিতা এই পথাবলম্বী ছিলেন এবং আজীবন তিনি ওই ভাবেই কাটিয়েছেন। বাতেনের দিকে পূর্ণ লক্ষ্য থাকা সত্ত্বেও তাঁর প্রকারবিহীন মর্তবা হাসিল ছিলো। পণ্ডিতের পুত্র অর্ধপণ্ডিত— প্রবাদসূত্রে আমারও উক্ত মাকামের প্রতি পূর্ণআগ্রহ ছিলো এবং তাতে বিশেষ আনন্দও অনুভব করতাম। তৎপর যখন আল্লাহ্তায়ালার অসীম অনুগ্রহ আমাকে হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ র. এর মাকামে পৌঁছে দিলো এবং তিনি নকশবন্দিয়া তরিকায় আমাকে দীক্ষিত করলেন, তখন অল্পকালের মধ্যেই আমার মধ্যে তৌহিদে অজুদীর (একবাদের) বিকাশ ঘটলো। এই হাল এতো অধিক হলো যে, উক্ত মাকামের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কোনো বিষয়ই আমার অজ্ঞাত রইলো না।

আল্লাহ্পাক শায়েখ মহিউদ্দীন আরাবী র. এর মারেফাতসমূহের গূঢ়তত্ত্বসমূহকে আমার প্রতি যথাযথ প্রকাশ করে দিলেন। 'ফুছুছ' গ্রন্থের লেখক যে তাজাল্লীয়ে যাতিকে আল্লাহ্তায়ালার যাত পাকের আবির্ভাব বলে বর্ণনা করেছেন, যাকে তিনি উন্নতির চরম সীমা বলেছেন এবং একথাও বলেছেন যে, এর পর শুধু নাস্তি ব্যতীত আর কিছুই নেই— সেই তাজাল্লীয়ে যাতিও আমি লাভ করলাম। উক্ত তাজাল্লীর এলেম ও মারেফাতসমূহ যা 'খাতেমুল বেলায়েত' অর্থাৎ বেলায়েতের সমাপ্তকারীর (তার নিজের) সাথে বিশিষ্ট বলে মনে করেন, সে সকলও আমি বিস্তৃতভাবে অবগত হলাম।

উক্ত মাকামে আমার ছোকর বা মত্ততা অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে স্বীয় পীর কেবলা র. এর নিবেদন পত্রে পূর্ণ মত্ততাসম্ভূত নিম্নোক্ত শ্লোকটি লিখেছিলাম—

হায়রে অন্ধের ধর্ম এই শরীয়ত
আমাদের ধর্ম বটে কাফেরীর পথ
বদন কেশের শোভা প্রেম-প্রতিমার
ইমান কুফর বটে জানো অনিবার।
ধর্ম্মাধর্ম্ম দেখি, এ পথে একাকার,
সকলেই এক যেনো প্রেমিক খোদার।
(আল্লাহ্ হেফাজত করুন)।

এই অবস্থা আমার দীর্ঘদিন— এমনকি মাসের পর মাস এবং বছরকাল ধরে চললো। কিছুদিন পর হঠাৎ অদৃশ্য জগত হতে আল্লাহ্তায়ালার অশেষ অনুকম্পার গবাক্ষ খুলে গেলো। আল্লাহ্পাকের প্রকারবিহীন যাতের সম্মুখস্থ পর্দা অপসারিত হলো। সঙ্গে সঙ্গে ওয়াহদাতুল অজুদ সম্পর্কীয় পূর্ববর্তী জ্ঞান অন্তর্হিত হতে লাগলো। এহাতা (বেষ্টন), ছারয়ান (অনুপ্রবেশ), কুরব (নৈকট্য) এবং মাআইয়্যাত (সঙ্গতা) সম্বন্ধীয় যাবতীয় জ্ঞান বিলুপ্ত হলো। দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে জানতে পারলাম যে, সৃষ্টির সাথে মহান স্রষ্টার উক্ত সম্বন্ধের কোনো একটি সম্বন্ধও নেই। বেষ্টন, নৈকট্য প্রভৃতি যা কিছু অনুভূত হোক না কেনো, তা জ্ঞানতঃ মাত্র, যেরূপ সুন্নত জামাতের আলেমগণের অভিমত। আল্লাহ্পাক কোনো বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত নন। তিনি তাঁর মতো আছেন এবং জগত জগতরূপে বিদ্যমান। তিনি সাদৃশ্য ও প্রকারবিহীন এবং জগত রকম ও প্রকারের কলঙ্কে কলঙ্কিত। প্রকারবিহীনকে প্রকারযুক্ত বলা সঙ্গত নয়। অবশ্যম্ভাবী যাতকে সম্ভাব্য বলা অনুচিত। অনাদি কখনো অবিকল আদিবস্তু হয় না। ধ্বংসবিহীন যাত ধ্বংসশীল বস্তু হয় না। জ্ঞানতঃ বা ধর্মতঃ বস্তুর প্রকৃত তত্ত্ব পরিবর্তিত হওয়া অসম্ভব। দুটি বিপরীত বস্তু কোনো ক্রমেই একটির বিধেয় অপরটি হতে পারে না।

আশ্চর্যের বিষয় যে, শায়েখ মহিউদ্দীন ও তাঁর অনুচরগণ আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র যাতকে মজহুলে মুতলাক (পূর্ণ অজ্ঞাত) বলেন এবং তিনি কোনো বিষয়ের উদ্দেশ্য হন না বলে থাকেন।[১] কিন্তু তাঁরা আবার আল্লাহ্তায়ালাকে স্বীয় যাত কর্তৃক নৈকট্যধারী এবং সর্ববস্তুর সাথে সম্মিলিত বলে প্রমাণ করেন। অথচ এর দ্বারা আল্লাহ্তায়ালার যাত পাকের উপর হুকুম বর্তান হয়। অতএব সুন্নত জামাতের আলেমমণ্ডলী যে বলেন— উক্ত বেষ্টনী, নৈকট্য, সম্মিলন তাঁর এলেম কর্তৃক সম্পাদিত, তা-ই সত্য।[২]

---

১. মকতুবাত শরীফে এখানে একটি বাক্য অতিরিক্ত রয়েছে। এহাতা, কুরব, মাআইয়্যাত ও ইছবাত।
২. এই মকতুবও প্রথম যুগের । পরবর্তীতে তিনি এলেম ও যাতের সাথে সম্পৃক্ততার ব্যাপারে নিরবতা অবলম্বন করেছেন, যেমন প্রথম খণ্ডের ২৬৬ নং মকতুবে উল্লেখ রয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডের ৮ নং মকতুবে এবং মাবদা ও মাআদ গ্রন্থের মিনহা ৩৫ এর মধ্যেও উল্লেখ রয়েছে।

বিস্তারিত আলোচনায় বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ অবশ্যই অবগত হবেন যে, হজরত মোজাদ্দেদ র. উচ্চ পর্যায়ের ওয়াহদাতুল অজুদের সমর্থক ছিলেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর ভিন্নতা সূফীয়ানে কেরামদের সাথে এতোটুকু যে, এই হজরতগণ মহাবিশ্বকে আল্লাহ্তায়ালার নাম গুণাবলীর দর্পনস্বরূপ বলেন, তবুও তা তার আবির্ভাবস্থলও বলে মনে করেন। এ জন্য তাঁরা সৃষ্টিকে স্রষ্টার দর্পন এবং তাঁর নাম ও গুণাবলীর পূর্ণতাসমূহের আবির্ভাবস্থল মনে করেন। এটা শুধু ধারণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এমনিভাবে তাঁরা সৃষ্টিকে স্রষ্টার দর্পণও মনে করেন। হজরত মোজাদ্দেদ র. বলেন, আল্লাহ্পাক কোনো বস্তুর সাথে সম্মিলিত নন। সৃষ্টি স্রষ্টার নিদর্শন বা চিহ্ন মাত্র। তাঁর নাম ও গুণাবলীর পূর্ণতাসমূহের আবির্ভাবস্থলও। কিন্তু অনাদি কখনো অবিকল আদি বস্তু হয় না। ধ্বংসবিহীন যাত ধ্বংসশীল হয় না। এ জন্য তিনি সৃষ্টিকে ঠিক দর্পনস্বরূপও মনে করেন না। তিনি শরীয়ত এবং হকিকতের প্রকৃত সত্যে উপনীত হয়ে উচ্চস্তরের তাওহীদের কথা বলেছেন। এখন সচেতন বিজ্ঞজনদের কাছে এই দুটি ধারার মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য অস্পষ্ট রইলো না। এই দুইয়ের মধ্যে কে প্রকৃত তওহীদের সুধা পানকারী এবং রসুল স. এর পূর্ণ অনুসরণের মাধ্যমে কে অধিক নৈকট্য লাভকারী তা-ও স্পষ্ট হয়ে গেলো।

সন্দিহান যে, সে নিজের সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে অদৃশ্যের মধ্যে অন্যকে সন্ধান করে।

সুতরাং এই মাসআলার বিস্তারিত বর্ণনা তাঁর মকতুবের মধ্যে কুদসী আয়াতের মাঝে উল্লেখ করা হয়েছে।

তৃতীয় সন্দেহঃ তিনি মাবদা ওয়া মাআদ গ্রন্থে ৪৮ নং মিনহার মধ্যে উল্লেখ করেছেন, 'সুরতে কাবা যেমন সুরতে মোহাম্মদী স. এর সেজদার স্থান, তদ্রূপ হকিকতে কাবাও হকিকতে মোহাম্মদীর সেজদার স্থান'। এই বাক্যের দ্বারা হকিকতে মোহাম্মদীর উপর অবশ্যই হকিকতে কাবার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। অথচ একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্যই হচ্ছেন হজরত মোহাম্মদ স.। এইমর্মে হাদিসে কুদসীতে উল্লেখ রয়েছে, যদি আমি আপনাকে সৃষ্টি না করতাম, তাহলে মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করতাম না এবং আমার প্রভুত্বকেও প্রকাশ করতাম না।

উত্তরঃ হজরত মোজাদ্দেদ র. এ সমস্যা সমাধানের জন্য উল্লেখ করেছেন যে, হকিকতে কাবার দ্বারা উদ্দেশ্য ইট বা পাথর নয়। যদি তা না-ও হয়, তাহলেও কাবা কাবাই এবং তা সৃষ্টিকুলের সেজদার স্থান। দৃশ্যমান কাবা জড়জগতের অন্তর্ভুক্ত, যেমন অন্যান্য সৃষ্ট বস্তু। কিন্তু এটি এমনই একটি বাতেনী বিষয়, যা অনুভূতি ও ধারণাবহির্ভূত। এটি অনুভূতিজগতের, কিন্তু অনুভূত নয়। সে সকলের খেয়ালের কেন্দ্রবিন্দু, কিন্তু খেয়ালের মধ্যে নেই। এটি এমনই এক সত্তা, যা নাস্তির পোশাক পরিহিত এবং সে নিজেই নাস্তি (অস্তিত্বহীন), যা অস্তিত্বের পোশাকে বিরাজমান। সে দিকের মধ্যে থেকে দিকশূন্য। সে লক্ষ্যের মধ্যে হয়েও

লক্ষ্যহীন। মোটকথা এটি এমনই একটি অবস্থা, যা হকিকতের সাথে সম্পৃক্ত। এমনই বিস্ময়কর ব্যাপার যে, জ্ঞানের দ্বারা তাকে উদঘাটন করা অসম্ভব। জ্ঞানী বক্তিরাও এর উপলব্ধিতে অক্ষম। এ যেনো নিরাকার জগতের এক দৃষ্টান্ত এবং দৃষ্টান্তহীনের নিদর্শন। যদি কাবা এরূপ না হতো তাহলে যাকে সেজদা করা হয়, তার প্রতীক হতো না এবং শ্রেষ্ট মানব অর্থাৎ রসুলে রহমত স. একান্ত আগ্রহবশতঃ তাকে কেবলা বানাতেন না।

'ফিহি আয়াতুম বাইয়্যেনাত' (এর মধ্যে রয়েছে প্রকাশ্য নিদর্শন)— এ আয়াত পবিত্র কাবা প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনের সুস্পষ্ট বাণী এবং 'ওয়ামান দাখালাহু আ-মিনা (যে এর অন্তর্ভুক্ত হবে সে নিরাপদ)— এ আয়াতটি এ কাবা প্রসঙ্গেই। কোরআন মজিদ বায়তুল্লাহ্‌র প্রশংসাকারী। কাবার মালিক অর্থাৎ মহান আল্লাহ্‌র সাথে বিশেষ সম্পৃক্ততা কাবার রয়েছে। নিরাকার, রূপহীন, অপ্রকাশ্য স্বরূপের সাথে সম্পৃক্ততা ও বিশেষ সম্পর্কও কাবার রয়েছে। 'ওয়ালিল্লাহিল মাছালুল আ'লা' (আল্লাহ্‌র জন্যই হচ্ছে সুমহান দৃষ্টান্ত) যা রূপকজগতে বাস্তবতার সেতু স্বরূপ (আলমাজাজু কানতারাতুল হকিকত) যা এরূপ ঘর হওয়ার সুসংবাদদাতা, যা কাবার মালিকের অবস্থান এবং বিশ্রামগ্রহণের স্থানই হচ্ছে এই কা'বা। এরূপ ধরে নিতে পারো যে, ধনী লোকদের জন্য ওঠা-বসা বা ব্যবহারের অনেক কক্ষ হয়ে থাকে, কিন্তু তার নিজস্ব যে ঘর সেটি ঘরই হয়ে থাকে— যেখানে সাধারণের অনুপ্রবেশ ঘটে না। ওই ঘর হয়ে থাকে প্রিয়জনের আবাসন। হাদিসে কুদসীতে উল্লেখ রয়েছে, 'ওয়ালাকিন ইয়াসা'নী ক্বলবু আবদিল্ মু'মিনি' (আমার মুমিন বান্দার অন্তরে আমার স্থান সংকুলান হয়)—এই বাক্য অনুযায়ী একজন মুমিন বান্দার অন্তরে নিরাকার আবাসনের অবকাশ থেকে যায়। কিন্তু ঘর বলতে যিনি শুধু মাত্র দৃশ্যমান আবাসনস্থল মনে করেন, তিনি অন্তরের আবাসন কীভাবে আবিষ্কার করবেন? এবং যে ঘর সাধারণের অনুপ্রবেশ থেকে স্বতন্ত্র, তা তিনি কীভাবে চিন্তার মধ্যে আনবেন? যেহেতু এ স্থানে অন্য কারো কর্তৃত্ব নেই। নেই প্রবেশাধিকার। সে জন্যই এ ঘর মখলুকের জন্য সেজদার স্থান হয়েছে— যেনো অন্য কারো সেজদা করা না হয়। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে সেজদা করা নিষিদ্ধ। হজরত মোহাম্মদ স. তাঁর নিজের দিকে সেজদার কথা বলেননি। বরং তিনি নিজেও আল্লাহ্‌র ঘরের দিকে অধিক আগ্রহ ও ভালোবাসাসহ সেজদা করেছেন। এ বর্ণনা থেকে বিষয়টির মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করে নেওয়া উচিত। 'শাত্তানু মা বাইনাস্ সাজিদি ওয়াল্ মাসজূদ' (সেজদাকারী এবং যাকে সেজদা করা হয়— উভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে)।

হে ভ্রাতঃ! তুমি যখন দৃশ্যমান কাবা সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি করেছো, তখন হকিকতে কাবার সম্পর্কে কিছু কথা জেনে নাও। হকিকতে কাবার দ্বারা উদ্দেশ্য

নিরাকার সত্তা ওয়াজিবুল অজুদ— যেখানে তার আশে পাশে প্রতিবিম্বের ছায়াও পৌঁছাতে পারে না এবং তিনিই একমাত্র সেজদা ও প্রভুত্বের প্রতীক। যদি এই অবস্থাকে হকিকতে মোহাম্মদীর সেজদার মহল বলা হয়, তবে কি ভুল বলা হবে? এবং তার শ্রেষ্ঠত্বে কী কোনো ঘাটতি আসবে? এ কথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে, হকিকতে মোহাম্মদী দুনিয়ার সকল বস্তু থেকে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু হকিকতে কাবা এ জগতেরই বিষয় নয় যে, তার সাথে এই জগতকে সম্পৃক্ত করা যাবে এবং তার শ্রেষ্ঠত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট সাব্যস্ত করা যাবে। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় (সুরতে কাবা এবং সুরতে মোহাম্মদী স. এর প্রকৃতির মধ্যে যে পার্থক্য— তদ্রূপ পার্থক্য সাজেদ (সেজদাকারী) এবং মাসজুদ (যাকে সেজদা করা হয়) এর মধ্যে। অনেক বিজ্ঞজন (অজ্ঞতাবশতঃ) এই দুয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেননি। এ জন্য তাঁরা সন্দেহ পোষণ করেছেন এবং অহেতুক তর্কযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন। মহান আল্লাহ্ তাঁদেরকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার সুযোগ দান করুন, যেনো তাঁরা না বুঝে আপত্তি করা থেকে বিরত থাকতে পারেন। ‘রব্বানাগ্ফির্লানা যুনূবানা ওয়া ইছরাফানা ফী আমরিনা ওয়া ছাব্বিত আক্বদামানা ওয়ান্সুরনা আলাল্ ক্বওমিল্ কাফিরীন (হে আমাদের প্রভু! আমাদের গোনাহ্সমূহ মাফ করো। আমাদের কাজের ত্রুটি মার্জনা করো। আমাদেরকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখো এবং কাফেরদের উপর আমাদেরকে বিজয় দান করো)।[১]

চতুর্থ সন্দেহঃ হজরত মোজাদ্দেদ র. উল্লেখ করেছেন, আমি আল্লাহ্র মুরিদ এবং মুরাদও বটে। আমার সিলসিলা কোনো মধ্যস্থতা ব্যতীত মহান আল্লাহ্র সাথে সংযুক্ত। আল্লাহ্র হাত আমার হাতের উপর এবং আমার এরাদা (ইচ্ছা) রসুল স. থেকেও অসংখ্য মধ্যস্থতায় রয়েছে। (অর্থাৎ নকশাবিন্দয়া তরিকা থেকে ২১টি, কাদেরীয়া তরিকা থেকে ২৫টি, চিশতিয়া তরিকা থেকে ২৭টি মাধ্যম রয়েছে)। কিন্তু আমার ইচ্ছা, যা মহান আল্লাহ্র সাথে সম্পৃক্ত, তা মধ্যস্থতা কবুল করে না— যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং আমি রসুল স. এর মুরিদ এবং শিশুদের মতো অনুকরণকারীও বটে। আমি এই খাঞ্চার নেয়ামতের মাধ্যমে প্রতিপালিত হয়েছি। কিন্তু আমাকে নিমন্ত্রণ করা হয়নি। যদিও আমি অধীনস্থ, তবু মূল বস্তু বা সংযোগ থেকে বঞ্চিত হইনি। আমি তাঁর উম্মত, কিন্তু তাঁর নেয়ামতের মধ্যে অংশীদার। তবে ওই অংশীদারিত্ব নয়, যা আমরা সচরাচর মনে করে থাকি (সমকক্ষতার দাবী)। বরং ওই অংশীদারিত্ব যা ভৃত্য এবং মনিবের মধ্যে হয়ে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত আহবান করা হয়নি, ততক্ষণ পর্যন্ত ওই নেয়ামতের খাঞ্চার কাছেও উপস্থিত হইনি। যতক্ষণ পর্যন্ত অনুমতি পাইনি, ততক্ষণ

১. মকতুবাত ১২৪/৩

পর্যন্ত ওই নেয়ামতের প্রতি হাত বাড়াইনি। যদিও [১] উওয়ায়সী (অর্থাৎ আত্মিক সাহায্যে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভকারী) তথাপি আমার শায়েখ উপস্থিত। যদিও নকশবন্দিয়া তরিকায় আমার পীর বাকী বিল্লাহ র. কিন্তু আমার তরিকত বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে আল্লাহুল বাকীর [২] পক্ষ থেকে। আমি মহান আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহে তরবিয়াত প্রাপ্ত হয়েছি এবং নির্বাচিত পথে চলেছি। রহমানী (অনুকম্পনীয়) আমার সিলসিলা এবং আমিই আবদুর রহমান (রহমানের বান্দা)। কেনোনা আমার প্রভুই হচ্ছে রহমান এবং আমার শায়েখ আরহামুর রাহেমীন (অধিক অনুকম্পাকারী)।

আমার তরিকা 'সোবহানী' বা পবিত্র তরিকা। পবিত্রতার পথে চলেছি। মহান আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলী হতে পবিত্র যাত ব্যতীত অন্য কিছু কামনা করিনি। এই 'সোবহানী' বা পবিত্রতা বায়েজীদ বোস্তামীগণ যে সোবহানী বলে থাকেন— তা নয়। এ সবের সাথে এর কোনো সম্বন্ধ নেই। যেহেতু তা তাঁদের স্বীয় নফস বা প্রবৃত্তির বৃত্ত অতিক্রম করেনি এবং এ বিষয়টি নফস বা বহির্জগতের বৃত্তের বর্হিভূত। তাঁদের ওই তাশবীহ্ বা একবাদ যা তানজীহ্ বা দ্বিত্ববাদের পোশাক পরিধান করেছে। কিন্তু আমার এই তানজীহ বা দ্বিত্ববাদে একবাদের ধূলিকণাও প্রবিষ্ট হয়নি। তাদের হাল মত্ততার নির্ঝর হতে প্রবাহিত [৩] হয়েছে। আর এই ঝর্ণা প্রবহমান রয়েছে নিছক সংজ্ঞা হতে। আরহামুর রহিমীন আল্লাহ্‌পাক আমার প্রতিপালনের জন্য উপকরণসমূহ আনুষঙ্গিক নির্ভরশীল বস্তু করেছেন মাত্র। প্রকৃত কর্তা তাঁর অনুগ্রহ ব্যতীত অন্য কিছু নয়। পূর্ণ অনুগ্রহ ও লজ্জাবোধ হেতু এই অনুমোদন করেননি যে, অন্য কেউ আমার রক্ষণাবেক্ষণ করে, অথবা আমি অন্য ব্যক্তির দিকে লক্ষ্য করি। সুতরাং আমি স্বয়ং আল্লাহ্‌র মনোনীত ও অসংখ্য অনুগ্রহ দ্বারা প্রতিপালিত।

'অসাধ্য কিছু নহে কৃপা প্রাপ্তদের তরে'

(এখানে মকতুবাত শরীফ ৩য় খণ্ড ৮৭ নং মকতুবের অনুবাদ শেষ হলো।)

কোনো কোনো ব্যক্তি এই মকতুবের উপর আপত্তি করেছেন। হজরত মোজাদ্দেদ র. এই সন্দেহ বা আপত্তি অনুধাবনপূর্বক একটি মকতুব লিখেছেন, যার দ্বারা আপত্তি ও জবাব উভয়ই প্রস্ফুটিত হয়েছে। মকতুবাত ৩য় খণ্ডের ১২১ নং মকতুবের প্রয়োজনীয় অংশ এখানে উল্লেখ করা হলো।

---

১. মকতুবাত ৩য় খণ্ডে উওয়ায়সী শব্দের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

২. একই মকতুবে আবদুল বাকীর বিবরণও রয়েছে।

৩. বিস্তারিত জানার জন্য মকতুবাত শরীফ ২য় খণ্ড ৪২ নং মকতুব দেখুন।

আমার পীর কেবলা হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ র. এই ফকীরের সায়েরকে প্রথমতঃ মোরাদী সায়ের বলে স্থির করেছেন। হয়তো বন্ধুগণও একথা তাঁর থেকে শ্রবণ করে থাকবেন। তিনি এই ফকিরের অবস্থার অনুকূল জেনে মসনবী শরীফের নিম্নোক্ত ছন্দগুলো পাঠ করে শোনাতেন।

প্রেয়সীগণের প্রেম অতীব গোপন,
প্রেমিকের প্রেম-ধ্বনি, ঢোলক যেমন।
প্রেমিকের প্রেম বটে- কায়া কৃশ করে
প্রিয়গণ পুষ্ট হয়- প্রফুল্ল অন্তরে।

মোরাদগণের মধ্যে যারা সম্মিলন লাভ করেছে, তারা ইজতেবা বা নির্বাচনের পথে লাভ করেছে। এই ইজতেবার পথ যে শুধু পয়গম্বর আ. গণের জন্যই বিশিষ্ট তা নয়। 'আওয়ারেফ' গ্রন্থ প্রণেতা মজযুবে সালেক (প্রেমাকর্ষণের নূর ভ্রমণকারী) এবং সালেকে মজযুব (ভ্রমণের পর প্রেমাকর্ষণ লাভকারী) এর বর্ণনায় এ বিষয়ের বিস্তৃত বর্ণনা করেছেন এবং তিনি মুরিদদের পথকে এনাবত বা প্রত্যাবর্তন করার পথ এবং মোরাদগণের পথকে ইজতেবা বা নির্বাচনের পথ বলেছেন।

আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন— 'আল্লাহ্পাক যাকে ইচ্ছা নিজের দিকে নির্বাচিত করেন। যে তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করে তাকে তিনি পথপ্রদর্শন করেন'। হ্যাঁ, ইজতেবার পথ নিজস্ব হিসেবে পয়গম্বর আ.গণ প্রাপ্ত হন এবং উম্মতগণ অন্যান্য পূর্ণতাসমূহের মতো এতে তাঁদের অনুগামী। এরূপ নয় যে, 'ইজতেবা' শুধু পয়গম্বর আ.গণের জন্য নির্দিষ্ট, উম্মতগণ তা মোটেই প্রাপ্ত হবেন না— এ কথা ঠিক নয়।

হে মান্যবর! হজরত নবীয়ে করীম স. এর মধ্যস্থতায় সাধক ওই পর্যন্ত ফয়েজপ্রাপ্ত হতে থাকে— যে পর্যন্ত উক্ত সাধকের হকিকত অর্থাৎ মোহাম্মাদীআল মাশরাবধারী সাধক হকিকতে মোহাম্মদীর সাথে সম্মিলিত ও একত্রিত হয় না। কিন্তু যখন পূর্ণ অনুসরণ দ্বারা বরং আল্লাহ্তায়ালার নিছক অনুগ্রহে উন্নত করে সাধকদের হকিকত উক্ত হকিকতে মোহাম্মদীর সাথে একত্রিত হয়, তখন তার জন্য মধ্যস্থতা উঠে যায়। কেনোনা মধ্যস্থতা ও ব্যবধান দুই ভিন্ন বস্তুর মধ্যে হয়ে থাকে। এক বস্তুর মধ্যে মধ্যস্থ ও মধ্যস্থতাধারী হয় না। আবরক ও আবৃত বস্তু এক হয় না। একত্র হলে সমকক্ষের পর্যায়ভুক্ত হয়। কিন্তু সাধক যখন অনুবর্তী বা পরবর্তী এবং শরণাগত, তখন তার সমকক্ষতা প্রভুর সাথে সেবক ও ভৃত্যের সমতুল্য। এরূপ নয় যে, হজরত নবীয়ে করীম স. এর হকিকতের সাথে তার হকিকত এক হয়ে যায়।

এর বিশাদ বর্ণনা এই যে, হকিকতে মোহাম্মদী যা যাবতীয় হকিকত বা তত্ত্বের সমষ্টি এবং একে হকিকাতুল হাকায়েক বা তত্ত্বসমূহের সমষ্টি বলা হয় এবং অন্য সকলের হকিকত এরই অংশ বা ব্যষ্টিতুল্য; কারণ উক্ত সাধক যদি মোহাম্মাদীআল মাশরাব হয় (অর্থাৎ হজরত মোহাম্মদ স. এবং সে একই এসেম হতে উৎপন্ন হয়) তবে তার হকিকত মোহাম্মদ স. এর হকিকতের সমষ্টির ব্যষ্টিতুল্য এবং এর বিধেয় হতে পারে। আর মোহাম্মাদীআল মাশরাব না হলে তার অংশস্বরূপ হবে, কিন্তু এর বিধেয় হবে না। এই মোহাম্মাদীআল মাশরাব ব্যতীত অন্য হকিকতধারী সাধক যখন উন্নতি করে উর্ধ্বারোহণ করে, তখন সে নবীগণের হকিকত পর্যন্ত উপনীত হবে, যে নবীর পদক্ষেপে সে আছে এবং তা সে নবীর হকিকতের উদ্দেশ্যে বিধেয় হতে পারবে ও তাঁর পূর্ণতাসমূহের অনুকূল সমকক্ষতা সৃষ্টি করবে। কিন্তু ভৃত্য যেরূপ প্রভুর সাথে শরীক হয়, এ সমকক্ষতাও তদ্রূপ।

আবার যখন উক্ত মোহাম্মাদীআল মাশরাবধারী সাধকের হকিকত যা ব্যষ্টিতুল্য, তাঁর পুর্ণ অনুসরণ দ্বারা বরং আল্লাহ্পাকের নিছক অনুগ্রহে তার সমষ্টির সাথে বিশেষ মহব্বতের সৃষ্টি করে অর্থাৎ তার প্রেম সৃষ্টি হয় ও তথায় উপনীত হবার আকাঙ্ক্ষা জন্মে, তখন সে বন্ধন দ্বারা ব্যষ্টি ও সমষ্টির সাথে পূর্ণ সম্মিলন লাভ করে। আমি বললাম, বিশেষ মহব্বত সৃষ্টি হয়, যেরূপ আল্লাহ্পাকের নিছক অনুগ্রহে এ ফকিরের হয়েছিলো। ওই মহব্বতের প্রাবল্যে আমি বলতাম— আমি আল্লাহ্পাককে এজন্য ভালবাসি, যেহেতু তিনি মোহাম্মদ স. এর প্রভু। [১]

মিঞা শায়েখ তাজ [২] এবং অন্যান্য বন্ধুগণ আমার একথায় বিস্মিত হতেন। মনে হয় আপনিও ভুলে যাননি। যতক্ষণ পর্যন্ত এই প্রকারের প্রেম সৃষ্টি না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা মোহাম্মদ স. এর তত্ত্বের সাথে সম্মিলিত ও একত্রিত হতে পারবে না। এ-ও আল্লাহ্ পাকের অনুগ্রহ— যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ্পাক অতি উচ্চ অনুকম্পাশীল।

মধ্যস্থতা হওয়া ও না হওয়ার তত্ত্ব বর্ণনা করছি। মনোযোগ সহকারে শুনুন। জযবার (আকর্ষণের) পথে যখন বাঞ্ছিতজনের (আল্লাহ্পাকের) পক্ষ হতে আকর্ষণ হয় এবং আল্লাহ্পাকের অনুকম্পা তাঁর অবস্থার দায়িত্ববিশিষ্ট জিম্মাদার হয়, তখন উক্ত সাধকের জন্য মধ্যস্থতা গৃহিত হয় না বা আবশ্যক হয় না। কিন্তু সুলুক বা ভ্রমণের পথে যখন সাধকের পক্ষ হতে প্রত্যাবর্তন ঘটে, তখন মধ্যস্থতা ব্যতীত উপায় নেই। শুধু জযবার মধ্যে যদিও মধ্যস্থতা আবশ্যক করে না, কিন্তু এর পূর্ণতা

---

১. মাবদা ওয়া মাআদ যা তিনি ১০১৯ হিজরীতে লিখেছেন, তার মধ্যে মিনহা ২৭ এর মধ্যে এক স্থানে এরূপ বর্ণনা রয়েছে "আমি হক সুবহানাহু তায়ালাকে এ কারণে প্রিয় মনে করি যে, তিনি মোহাম্মদের রব"।

২. অর্থাৎ মীর্জা হুসামউদ্দীন আহমদ

সুলুক বা ভ্রমণের প্রতি নির্ভর করে। সুলুক অর্থাৎ তওবা (অনুশোচনা), জোহদ (নির্লিপ্ততা) ইত্যাদি শরীয়ত পালন যদি জযবার সাথে সম্পন্ন না হয়, তবে জযবা অপূর্ণ থেকে যায়। অনেক ভ্রষ্ট ও কাফের ধর্মহীন ব্যক্তিদের দেখেছি, তাদের জযবা আছে, কিন্তু শরীয়ত পালন নেই বলে তাদের অবস্থা নিতান্তই জঘন্যতম। শুধু বাহ্যিক জযবা ব্যতীত তারা অন্য কিছু প্রাপ্ত [১] হয়নি।

জযবার পথে শরীয়তের মালিক হজরত স. এর অনুসরণ, যাকে সুলুক বলা হয় তা দ্বারা যদি উদ্দিষ্ট বস্তুতে উপনীত হওয়া সংঘটিত হয়, তখন মধ্যস্থতা ও ব্যবধান ব্যতীত কার্যসিদ্ধি হয়ে থাকে। কথিত আছে— যদি তোমরা পানি উঠানোর পাত্র বালতি কূপে নিক্ষেপ করো, তবে তা তোমরা আল্লাহ্পাকের উপর ফেলবে। অর্থাৎ তোমরা যদি আল্লাহ্র দিকে ধাবিত হও এবং গুপ্তের সূক্ষ্ম স্তরে উপনীত হও, তাহলে নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে ও আল্লাহ্পাকের মধ্যে কোনো বস্তুর ব্যবধান থাকবে না।

আপনার স্মরণ থাকতে পারে যে, আমার পীর কেবলা কুদ্দিসা সিররুহু বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালার স্বীয় বান্দাদের সাথে যে একাত্মতা ও সঙ্গতা আছে, তা যদি কারো এ পথে সম্মিলন লাভ হয়, তবে তা ব্যবধানরহিত হয়ে থাকে— যা সঙ্গতার অনুকূল। যদি মধ্যস্থতা থাকে, তবে তা প্রতিপালনের জন্য থাকে, যাকে সুলুক বলা হয়। মা'ইয়্যাত বা সঙ্গতার পথ জযবার পথসমূহের একটি পথ। 'যে যাকে ভালোবাসে সে তার সঙ্গে'— হজরত নবীয়ে করীম স. বলেছেন, তা একথারই পৃষ্ঠপোষক। কেনোনা কোনো ব্যক্তি যখন স্বীয় মাহবুবের সাথে একত্রিত হয়, তখন তার মধ্যস্থতা উঠে যায়।

(মকতুবাত শরীফ ৩য় খণ্ডের ১২১ নং মকতুবের পর্যালোচনা এখানে শেষ হলো, কিন্তু পরবর্তীতে এ মকতুবের আরো আলোচনা রয়েছে)। এ মকতুবের মধ্যে হজরত মোজাদ্দেদ র. অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে মধ্যস্থতা ও অ-মধ্যস্থতা বিষয়ে বিশদ আলোচনা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। এ মকতুবের মধ্যে আরো উল্লেখ করেছেন—

হে মান্যবর! 'উওয়ায়সী' [২] বলা জাহেরী পীরকে অস্বীকার করা নয়। কারণ ওই ব্যক্তিকে উওয়ায়সী বলা হয় যার প্রতিপালনের মধ্যে রূহানীগণের অধিকার থাকে। হজরত খাজা আহরার কুদ্দিসা সিররুহুর জাহেরী পীর থাকা সত্ত্বেও তিনি

---

১. মকতুবাত শরীফ ৩য় খণ্ডের ১২১ নং মকতুবের কিছু অংশ হাজ্‌রাতুল কুদুসে উল্লেখ করা হয়নি।

২. হজরত মোজাদ্দেদ র. তৃতীয় খণ্ডের ৮৭ নং মকতুবে উল্লেখ করেছেন যে, আমার শায়েখ প্রতিটি মুহূর্তেই হাজের নাজের আছেন। এ কথার উপর কিছু লোকে আপত্তি জানালে তিনি এখানে তার উত্তর দিয়েছেন।

যখন হজরত খাজা নকশবন্দ কুদ্দিসা সিররুহুর রূহানী সাহায্য প্রাপ্ত হয়েছিলেন তখন তিনি নিজেকে উওয়ায়সী বলতেন। এরূপ খাজা নকশবন্দ কুদ্দিসা সিররুহুর জাহেরী পীর থাকা সত্ত্বেও হজরত খাজা আবদুল খালেক গজদানী কুদ্দিসা সিররুহুর রূহানী সাহায্য পেয়েছিলেন বলেও তিনি 'উওয়ায়সী' ছিলেন। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি উওয়ায়সী হওয়া সত্ত্বেও জাহেরী পীরকে স্বীকার করেন, পীর অস্বীকার করার পাপ বলপূর্বক তার মাথায় চাপানো— এ কেমন প্রকারের বিচার?

হে মান্যবর! 'আবদুল বাকী' শব্দদ্বয়ের সংযোজন কর্তৃক তার সম্বন্ধিত [১] অর্থ নিতে হবে, তার নামগত অর্থ নয়— যদিও নামগত অর্থ অধিকতর বোধগম্য হয়। অর্থাৎ পীর যদিও বাকীর বা আল্লাহ্তালার বান্দা তথাপি স্বয়ং আল্লাহু বাকী আমার প্রতিপালনের দায়িত্বশীল। এ স্থলে বৈপরিত্য কোথায় এবং অসম্মানই বা কোথায়? আল্লাহ্পাক তাদের ইনসাফ প্রদান করুন।

মান্যবর! হজরত বায়েজীদ বোস্তামী কুদ্দিসা সিররুহর 'সোবহানী' বাক্যের মধ্যে যে ক্রুটি আছে, তা তিনি মত্ততার প্রাবল্য হেতু উল্লেখ করেছিলেন। এর দ্বারা একথা অনিবার্য হয় না যে, উক্ত ক্রুটি তাঁর মধ্যে স্থায়ী ছিলো, যার জন্য অন্য কেউ তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ হয়। কেনোনা অনেক মারেফাত কোনো সময় সে সময়ের চাহিদা অনুযায়ী সংঘটিত হয়। কিন্তু অন্য সময় আল্লাহ্পাকের অনুগ্রহে তার ক্রুটি অবগত হয়ে এ স্তর অতিক্রম করে ঊর্ধ্ব মাকামে উপনীত হন। আপনার পত্রে একথা ছিলো যে, মত্ততাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ যদি এরূপ অমূলক বাক্য লেখেন তবে তা সম্ভব। কিন্তু যারা জ্ঞানসম্পন্ন তাদের থেকে এরূপ কথা প্রকাশ পাওয়া অনাকাঙ্ক্ষিত ও অশোভনীয়।

হে মান্যবর! যে কেউ এ প্রকারের বাক্য লিখেছে, তা মত্ততা হতে উৎপন্ন হয়েছে। মত্ততার সংমিশ্রণ ব্যতীত এ বিষয়ে কেউ তুলিকা ধারণ করতে পারে না। ফলকথা মত্ততার মধ্যে বহু স্তর আছে। মত্ততা যতোই অধিক হবে, ততোই অমূলক বাক্যের আধিক্য বৃদ্ধি পাবে। হজরত বায়েজীদ বোস্তামী কুদ্দিসা সিররুহর মতো মত্ততা আবশ্যক— যাতে বিনা দ্বিধায় আমার পতাকা মোহাম্মদ স. এর পতাকা হতে উচ্চ বলতে পারে। যার মধ্যে সংজ্ঞা আছে— ভাববেন না যে, তার মধ্যে কিছু মত্ততা নেই। যেহেতু মত্ততাশূন্য হওয়া নিছক ক্রুটি। কেনোনা বিশুদ্ধ সংজ্ঞা সর্বসাধারণের অংশ। যারা সজ্ঞানতাকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন তাদের অর্থ সংজ্ঞার প্রাবল্য, নিছক সংজ্ঞা নয়।

---

১. হজরত মোজাদ্দেদ র. এ মকতুবেই উল্লেখ করেছিলেন 'তরিকায়ে নকশবন্দিয়ার পীর আবদুল বাকী'। একথার পরেও লোকেরা আপত্তি তুলেছিলো। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে এই যে, হজরত বাকী বিল্লাহ র. তাঁর কোনো কোনো লেখনীর মধ্যে তাঁর নাম মোহাম্মদ ইবনে বাকী লিখেছেন। আবদুল বাকী লেখেননি।

পক্ষান্তরে যারা মত্ততাকে শ্রেষ্ঠ বলেন, তাদের উদ্দেশ্য মত্ততার প্রাবল্য, নিছক মত্ততা নয়। যেহেতু নিছক মত্ততা একটি বিপদ। হজরত জুনায়েদ কুদ্দিসা সিররুহু, যিনি সংজ্ঞাধারীগণের শীর্ষস্থানীয় এবং যিনি মত্ততা হতে সংজ্ঞাকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, তাঁরও কিন্তু মত্ততাসম্ভূত এমন বহু বাক্য আছে যে, তার অন্ত নেই। যথা— তিনি বলেছেন, 'তিনিই আরেফ এবং তিনিই মারুফ (পরিচয় লাভকারী ও পরিচিত ব্যক্তি), পাত্রের রঙই পানির রঙ'। আরো বলেছেন, আদিসম্ভূত যখন অনাদির সাথে সম্মিলিত হয়, তখন আদির কোনো চিহ্ন থাকে না।

'আওয়ারেফ' পুস্তকের লেখক যিনি 'ছোহো' বা সংজ্ঞাধারীগণের মধ্যে কামেল ব্যক্তি, তাঁর কেতাবেও এতো অধিক মত্ততার কথা উল্লেখ আছে যে, তা আর কী বলবো। এ ফকীর তাঁর মত্ততার বাক্যসমূহ এক পৃষ্ঠায় একত্র করেছিলো। গুপ্তরহস্যসমূহ প্রকাশ করাও এক প্রকার ছোকর বা মত্ততা। ঔদ্ধত্য এবং গৌরবও ছোকরের অন্তর্ভুক্ত। আবার অন্য সকল হতে নিজেকে শ্রেষ্ঠত্ব মনে করাও মত্ততা। যদি নিছক সংজ্ঞা থাকে, তাহলে গুপ্তরহস্য প্রকাশ করা কুফর সদৃশ এবং নিজেকে অন্য থেকে শ্রেষ্ঠ জানা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। 'ছোহো' বা সংজ্ঞার মধ্যে ছোকর বা মত্ততার অবশিষ্ট যেনো লবণ তুল্য, যা দ্বারা ব্যঞ্জনের সংশোধন হয়। লবণ ব্যতীত খাদ্য নিরর্থক ও বিস্বাদ হয়ে যায়।

বিশ্বে যদি না রইতো এ দুঃখভরা প্রেম আচার
এ সুমধুর বাক্য কে বা বলতো কে বা শুনতো আর।

হজরত আবদুল কাদের জীলানী বলেন— 'আমার পদদ্বয় প্রত্যেক ওলীর স্কন্ধে অবস্থিত' বাক্যটি তিনি মত্ততাহেতু বলেছেন বলে 'আওয়ারেফ' গ্রন্থের লেখক প্রমাণ করেছেন। তার অর্থ একথার ত্রুটি অন্বেষণ করা নয়। যেরূপ অনেকে ধারণা করে থাকেন। এটা তাঁর প্রশংসা মাত্র। বরং তাঁর প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ এ প্রকারের বাক্য, যা দ্বারা গৌরব ও অহংকার অনুমিত হয়, তা মত্ততা ব্যতীত হতে পারে না। পূর্ণ সংজ্ঞা থাকলে এরূপ কথা বলা সত্যিই দুষ্কর। এ ফকীর এ সূফী সম্প্রদায়ের এলেম ও রহস্যসমূহের বিষয়ে যে সকল পুস্তক লিখেছেন, বাহ্যতঃ আপনি ভাবছেন যে, এ নিছক সংজ্ঞা হিশেবে লিখেছেন, এতে মত্ততার অংশ নেই, কিন্তু আসলে তা নয়। যেহেতু তা হারাম, ঘৃণিত ও প্রতারণা এবং বাক্যসংকলন মাত্র। যারা বাকচতুর তারা নিছক সংজ্ঞাধারী। এরূপ ব্যক্তি যথেষ্ট আছে। কিন্তু তারা এ সকল ব্যাপার নিয়ে কোনো আলোচনা করে না বা সাধারণের মন আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে না।

হাফেজের বাক্য এ – অমূলক নয়,
আশ্চর্য রহস্য বিদ্যমান আছে সুনিশ্চয়।

হে মান্যবর! এরূপ রহস্যপ্রকাশের আলোচনাসূচক বাক্য, যার বাহ্যিক অর্থ করা অনুচিত, তা প্রত্যেক যুগের আল্লাহ্‌র ওলীগণের থেকে প্রকাশ পেয়েছে। এ যেনো তাদের চিরঅভ্যাস হয়ে গিয়েছে। এ এমন কোনো কার্য নয় যা এই ফকীর নতুনভাবে আবিষ্কার করেছে। এ ইসলাম ধর্মের মধ্যে প্রথম বোতল ভাঙা নয়, অর্থাৎ এটা যে, আমিই প্রথম করেছি তা নয়। তা হলে এরূপ চিৎকার ও কোলাহল কেনো? যদি আমি কোনো কথা বলে থাকি, যা বাহ্যিকশরীয়তপরিপন্থী, তা একটু চিন্তা করলেই এবং বাহ্যিক অর্থ ফিরিয়ে নিলেই অনুকূল অর্থ হতে পারে। কিন্তু কোনো মুসলমানকে দোষী সাব্যস্ত করা উচিত নয়। গর্হিত বাক্যপ্রচার এবং ফাসেক ব্যক্তিকে অপদস্থ করাও যখন শরীয়তে নিষিদ্ধ, তখন সামান্য সন্দেহের জন্য একজন মুসলমানকে অপদস্থ করার হেতু কী? এ বিষয়টি প্রত্যেক শহরে-নগরে প্রচার করার কারণই বা কী? এটাই কী প্রকৃত ধার্মিকের পরিচয়? মুসলমানী ও মেহেরবানী বা অনুগ্রহের পথ এই যে, যদি কোনো ব্যক্তি বাহ্যিক শরীয়তের বিপরীত কোনো কথা বলে, তখন দেখতে হবে যে, সমালোচনাকারী কে? যদি কোনো বে-দ্বীন, ফাসেক ব্যক্তি তার সমালোচনাকারী হয়, তাহলে তাকে প্রতিহত করতে হবে, সমঝোতার চেষ্টা করা উচিত নয়। আর যদি সমালোচক কোনো মুসলমান বা আল্লাহ্ ও রসুলের প্রতি বিশ্বাসী হয়, তাহলে উক্ত বাক্যের সমাধানের চেষ্টা করা উচিত এবং উহা প্রয়োগের সঠিক স্থল আবিষ্কারের প্রতি মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। নতুবা সমালোচকের নিকট তার সমাধান তলব করা আবশ্যক, যদি সে সমাধানে ব্যর্থ হয়, তাহলে তাকে সদুপদেশ প্রদান করা কর্তব্য। সরলতার সাথে সৎকাজের আদেশ–নিষেধ প্রদান সর্বোৎকৃষ্ট, যেনো লোকেরা সহজে গ্রহণ করতে পারে। যদি গ্রহণ করা উদ্দেশ্য না হয়, কেবল তাকে অপদস্থ করা উদ্দেশ্য হয়, তবে তা ভিন্ন কথা। আল্লাহ্‌পাক সৎকাজের শক্তিদান করুন। (মকতুবের বাক্য এখানে শেষ)।

এ মকতুবটি মকতুবাত শরীফের ৩য় খণ্ডের শেষে ১২১ নং মকতুব। এ মকতুবটি অনেক দীর্ঘ। এ পুস্তকটির কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় এখানে সম্পূর্ণ সংকলন করা হয়নি। মকতুবের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রয়েছে। প্রয়োজনে দেখে নিলে উপকৃত হতে পারবেন, এ মকতুবের শেষাংশে তিনি যা লিপিবদ্ধ করেছেন, সন্দেহ পোষণকারীদের সন্দেহ নিরসনের জন্য এটাই যথেষ্ট।

প্রকাশ থাকে যে, মাবদায়ে ফাইয়াজ (ফয়েজের উৎস) থেকে মারেফাতের যে সকল সূক্ষ্মরহস্য মোজাদ্দেদ র. এর বাতেনী রাজ্যে পতিত হয়, তা কয়েক প্রকারের হতে পারে।

প্রথম প্রকার হচ্ছে— যা তিনি অন্তর থেকে মুখে আনতেন না, এমনকি ইশারাইঙ্গিতেও প্রকাশ করতেন না। যেমন হরূফে মোকাত্তাআত এবং পবিত্র কোরআনের আয়াতে মুতাশাবিহাত (রহস্যাবৃত আয়াতের ব্যাখ্যা) তাঁর প্রতি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছিলো।

দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে— তিনি মারেফাতের গুপ্তরহস্যগুলো কেবল তাঁর পুত্রদের কাছে বলতেন। অন্য কাউকে নয়। এমনকি লিখেও রাখতেন না।

তৃতীয় প্রকারের মারেফাত— তিনি তাঁর বিশিষ্ট মুরিদদের— যারা কামেল, দরজা বন্ধ করে নিরিবিলি তাদেরকে বলতেন। ঘটনাক্রমে যদি কেউ এ সময় এসে যেতো তিনি চুপ হয়ে যেতেন, বিব্রত বোধ করতেন। অন্যান্য তত্ত্বগুলো সুযোগ মতো পরবর্তীতে বলতেন। এমন গভীর মারেফাতের বিষয়গুলোও তিনি লিপিবদ্ধ করতেন না। যদি কোনো বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি এ বিষয়ে অনুরোধ করতেন, তখন উত্তরপ্রদানের ক্ষেত্রে তিনি বলতেন, এ বিষয়টি সকলে অনুধাবন করার ক্ষমতা রাখে না।

চতুর্থতঃ কেউ কোনো বিষয়ে জানতে চাইলে সাধারণ উপকারার্থে তিনি সামান্য কিছু লিখে দিতেন। তাঁর মকতুবাত বড়ই বরকতপূর্ণ, যা তিনটি খণ্ডে বিভক্ত। এ লেখাগুলোকে চতুর্থ খণ্ড হিশেবে ধরে নেওয়া হয়। এ সকল লেখনীর মধ্যে প্রত্যেকটি মারেফাত ব্যাধিযুক্ত অন্তরের প্রতিষেধক এবং আল্লাহ্‌বঞ্চিত লোকদের মিলনতত্ত্ব।

এ সকল মকতুবাত, কুদসী আয়াত ও পত্রলিপির পরিমাণ চল্লিশ হাজার পঙক্তি থেকেও বেশি হবে। মকতুবাত শরীফ প্রথম খণ্ডে ৩১৩টি মকতুব রয়েছে, যা তাঁর নির্দেশে আসহাবে বদর রা. দের সংখ্যা অনুযায়ী রাখা হয়েছে এবং ১০৩৫ হিজরীতে সুসম্পন্ন হয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ড ৯৯টি মকতুবাতে সীমাবদ্ধ। আসমাউল হুসনার সংখ্যা অনুযায়ী এর সংখ্যা রাখা হয়েছে এবং পরিচিতি নাম 'নূরুল খালায়েক' ১০২৮ হিজরী সুসম্পন্ন হয়েছ।

তৃতীয় খণ্ড ১১৪ টি মকতুবে সমাপ্ত করা হয়েছে। এটি পবিত্র কোরআনের সুরার সংখ্যার অনুকরণে কিন্তু পরবর্তীতে আরো দশটি মকতুব এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ খণ্ডের নাম রাখা হয়েছে 'মারেফাতুল হাকায়েক'। ১০৪০ হিজরীতে সুসম্পন্ন হয়েছে।

হজরত মোজাদ্দেদ র. কর্তৃক লিখিত ১. মাবদা ওয়া মাআদ ২. মাআরিফে লাদুন্নিয়া হাল ও মাকাম সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ৩. মুকাশিফাতে আয়নিয়া ৪. ইছ্‌বাতুন নবুওয়াত ৫. আদাবুল মুরিদীন ৬. শরহে রুবাইয়াত হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ ৭. তা'লীকাতে আওয়ারেফ ৮. রদ্দে শিয়া ও অন্যান্য সকল গ্রন্থ ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে লিখিত। এ সকল গ্রন্থের মধ্যে সূক্ষ্ম তত্ত্ব, উচ্চাঙ্গ ভাষাতাত্ত্বিক বিষয়ের পর্যালোচনা এবং গভীর বিষয়ের ইঙ্গিতপূর্ণ রহস্য এমনভাবে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে, যার দ্বারা তাঁর উচ্চমর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব সহজেই অনুমান করা যায় এবং তাঁর কারামত ও বুজর্গীর বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। এ কারণে স্বনামধন্য আলেম ও

মাশায়েখগণ তাঁর অনুরক্ত হয়ে পড়েন। তিনি হজরত খামছ [১], তাওহীদে অজুদী ওয়া শুহুদী, মুশাহাদা ও মুকাশাফা [২], ইমান ও ইয়াকীন [৩], গায়েব ও দৃশ্যমান, আতওয়ারে [৪] ছাবআহ (সপ্তদিক) এবং আলওয়ানে মুসতালিফাহ (বৈচিত্রময় রঙ), তাজাল্লিয়াতে [৫] মুত্তাকিফাহ ও গায়রে মুত্তাকিফাহ (তাজাল্লিয়াতের স্বরূপ ও স্বরূপহীনতা), তাশবীহ [৬] (উপমা/সাদৃশ্য) ও তানজিয়াহ (পবিত্রতা) এর মধ্যে সমন্বয়, তানাজিয়াহে ছেরফা (খাঁটি পবিত্রতা), খুফয়ায়ে [৭] ইতলাক (গুপ্ত বিষয়ের প্রয়োগ), মাজালে তাআইয়্যানাত (নির্ধারিত বিষয়ের প্রভাব), তাজাল্লিয়ে বরকী [৮] ও দায়ামী (স্থায়ী ও সাময়িক তাজাল্লী) সম্পর্কে অভিমত ও ব্যবহারিক বিষয়, ছোকর ও ছোহু [৯] (মত্ততা ও জ্ঞান), এলেম [১০] উত্তরাধিকার এবং উত্তরাধিকার নয়, বেলায়েতের [১১] শ্রেণী বিভাগ, অর্থাৎ বেলায়েতে সোগরা, বেলায়েতে কোবরা, বেলায়েতে উলিয়া সম্পর্কে পর্যালোচনা, নবুওয়াত [১২] ও রেসালাতের মাকাম সম্পর্কে আলোচনা, সিদ্দীকীয়াত [১৩] এবং কোরবত (সত্যনিষ্ঠা ও নৈকট্য) তাদাল্লী [১৪] ও তাদান্নী (আবরন ও নৈকট্য) মহব্বত [১৫] ও খুল্লাত (ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব), ধারাবাহিক [১৬] সাতটি স্তর, সাবাহাত [১৭] ও মালাহাত (সৌন্দর্য ও মাধুর্য) এবং এ দুয়ের সমন্বয়, সায়েরে [১৮] আফাকী ও আনফুসী (আত্মভ্রমণ ও ধরণীর প্রান্তসীমায় ভ্রমণ এবং আফাক [১৯] ও আনফুস সহ আরো অন্যান্য বিষয়ে যে গভীর হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করেছেন— যা সচেতন ব্যক্তিদের কাছে খুবই সুস্পষ্ট ও পথের দিশারী। মারেফাতের গভীর জ্ঞান সম্পর্কে তিনি যা তাঁর মূল্যবান লেখনীতে তুলে ধরেছেন তা তাঁর মাহাত্ম্য, প্রাঞ্জাল ভাষা ও ব্যাকরণিক অলংকারের কারণে সে যুগে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অসমকক্ষ বলা যায়।

যখন তিনি বিশেষ মুহূর্তে এলহামপ্রাপ্ত এ সকল বিষয় বর্ণনা করতেন, তখন ভিন্ন আরেক হালের অবতারণা ঘটতো। তাঁর লেখনীসমূহ মনে হতো যেনো তাঁর বাণী এবং তাঁর আলোচনা ছিলো হাল তুল্য। ওই লেখনী ছিলো মারেফাতের আলোচনাসমৃদ্ধ এবং এই মালফুজাত (বাণী) এর সম্পর্ক ছিলো 'এল্‌কা' এর সঙ্গে, যা ছিলো আল্লাহ্‌র বিশেষ দান। অর্থাৎ মারেফাতের বিষয় আলোচনা করার

---

১. মকতুবাত ৪৩/১, ২. মকতুবাত নং ৮৯/৩ ৩. মকতুবাত নং ৯১/৩, ৪. মকতুবাত নং ৫৮/১, ৫. মকতুবাত নং ৩/২, ৬. মকতুবাত নং ৬৩/৩, ৭. মকতুবাত নং ২৬-৯৩/৩, ৮. মকতুবাত নং ৭৫/৩, ৯. মকতুবাত নং ১২১/৩, ১০. মকতুবাত নং ২৬৮/১, ১১. মকতুবাত নং ২৬০/১, ১২. মকতুবাত নং ৩০১/১, ১৩. মকতুবাত নং ৪১/১, ১৪. মকতুবাত নং ১১১/৩, ১৫. মকতুবাত নং ৯৫-৮৮/৩, ১৬. মকতুবাত নং ৫৪/৩, ১৭. মকতুবাত নং ১০০/৩, ১৮. মকতুবাত নং ২৬/৩, ১৯. মকতুবাত নং ৪২/২

সময় তিনি নিরবতার মাধ্যমে এমন অভিব্যক্তি প্রকাশ করতেন যে, শ্রোতাদের মধ্যে মত্ততা এবং হুজুরী অবস্থার প্রাধান্য বিস্তার করতো এবং এমনই স্বাদ ও অবস্থার অবতারণা হতো, যা বর্ণনাতীত। তাঁর অন্তর্নিহিত ভাবের মাধ্যমে তাঁর হালের প্রকাশ ঘটাতেন, যা মুরিদদের যথাযথ উপলব্ধিতে উপনীত করতো এবং যখন তাঁর নির্জন বিশেষ কক্ষ থেকে বিশিষ্ট মুরিদগণ বাইরে আসতেন, তখন তাঁরা নিজেদেরকে অপ্রকৃতিস্থ ও পেরেশান বোধ করতেন। যে সকল বিশিষ্ট বুজর্গ তাঁর গোপন কক্ষে মারেফাতের আলোচনা শোনবার সুযোগ পেতেন, তাঁরা পুনরায় ওই সুযোগের অপেক্ষায় থাকতেন।

বিশেষ কোনো বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর রীতি ছিলো, যতক্ষণ পর্যন্ত সে বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান তিনি না পেতেন, কাশফ না হতো, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি আলোচনা করতেন না। কোনো কোনো মোখলেস ব্যক্তি প্রায়ই তাঁর কাছে হজরত খিজির ও ইলিয়াস আলাইহিমুস্ সালাম সম্পর্কে জানতে চাইতেন। তিনি নিরবতা অবলম্বন করতেন। কিছুকাল পর যখন ওই দুই বুজর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো, তারপর তিনি আগ্রহীদেরকে লিখিতভাবে বিষয়টি জানিয়ে দিলেন। এমনিভাবে অনেকে হজরত ইউসুফ আ. এর সাথে হজরত ইয়াকুব আ. এর ভালোবাসা প্রসঙ্গে জানতে চাইলে তিনি নিরবতা অবলম্বন করতেন। সামান্যতম আলোচনাও করতেন না। কিন্তু যখন আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহে তিনি বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হলেন, তখন তিনি এ বিষয়ে আলোচনা করলেন এবং লিখিতভাবে আগ্রহীদেরকে এ রহস্য বিষয়ে জানিয়ে দিলেন।

কোনো কোনো বিশিষ্ট বুজর্গ কিস্‌সায়ে নহল (মৌমাছির ঘটনা) সম্পর্কে জানতে চাইলে ফাজেল নামক এক ব্যক্তির নামে একটি মকতুব লিখলেন। লোকটি দুনিয়াদার লোকদের ফাঁদের মধ্যে থাকায় এরূপ আশংকা ছিলো যে, রোগগ্রস্ত অন্তঃকরণবিশিষ্ট লোকদের কাছে তা প্রকাশ করে না দেয় (তিনি নিরব থাকলেন)। অতঃপর তিনি এ ছন্দটি পড়লেন।

হে প্রভু! তুমি এ অধমের লেখনীকে ফিরিয়ে নাও
কোথাও যেনো কোনো শোরগোল সৃষ্টি বা দৃষ্টিগোচর [১] না হয়।

আল্লাহ্‌র রহমত এবং তাঁর খাস তাওয়াজ্জোহের বরকতে বিষয়টি আল্লাহ্‌র উপর ছেড়ে দেওয়ার জন্য আর মাথা চাড়া দিয়ে উঠেনি এবং কেউ বুঝতেও পারেনি। কখনো কখনো বিশেষ ব্যক্তির এ ধরনের কথা প্রকাশ্যভাবে শরীয়তের অনুকূলে না হওয়ার কারণে বিদ্বেষীরা এটাকে মুখ্য আলোচ্য বিষয়ে পরিণত করে সমস্যা সৃষ্টি করে। এমনকি বিতর্কে পর্যন্ত নিয়ে যায়। অতঃপর সঠিক ব্যাখ্যা ও শরীয়তভিত্তিক বুঝ দিয়ে দেওয়া হয়। অথবা যদি এ ধরনের কথা তাওয়াজ্জোহের

১. এ বিষয়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ একটি ছন্দ আল্লামা ইকবালও লিপিবদ্ধ করেছেন।

মধ্যে মত্ততার প্রাবাল্যবশতঃ মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিলো অথবা তাঁর মধ্যে কাশফগত ত্রুটি ছিলো, তিনি তদ্রূপই বর্ণনা করতেন। কিন্তু তিনি ত্রুটিপূর্ণ কাশফকে ইজতেহাদী (গবেষণা) বিষয়ের মত অনুসরণযোগ্য বলতেন না, যদি স্বল্পজ্ঞানী লোকেরা এটা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালাতো, তখন তিনি ইসলামের সহযোগী এবং দ্বীনদার লোকদের উদ্দেশ্যে রসুলেপাক স. এর পূর্ণ অনুসরণের কারণে পুনরায় ওই আপত্তির উত্তর লিপিবদ্ধ করে দিতেন। সুতরাং তিনি ওয়ারায়ে আনফুস [১] ও আফাক প্রসঙ্গে যা কিছু লিপিবদ্ধ করেছেন, তা সবই এ প্রকারের। সকল লেখা এ ধরনেরই, যা তিনি সাইয়্যেদুত্ তায়েফাহ্র একথার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছেন যে, নতুন বিষয়ে পূর্ব থেকেই যদি পুরাতনের সাথে মিলিত থাকে তাহলে কুদুস (নতুন উদ্ভাবনী) বিষয়ের হুকুম বহাল [২] হয় না।

সন্দেহ পাঁচ

ভিন্ন মতাবলম্বীরা বলে থাকেন, হজরত মোজাদ্দেদ র. শীর্ষস্থানীয় আলেমদের ভালোবাসা ও প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। এর পরেও যদি তাঁর কথায় কোনোরূপ বিদ্রূপ প্রকাশ পেয়ে থাকে তবে তা নিতান্তই সদুদ্দেশ্যে ছিলো এবং যা বিশেষজ্ঞান, এলহাম ও বিশেষ নিদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো। তাঁর হাল, বাণীসমূহ, বুজর্গী, তাঁর জ্ঞানগরিমা, আমলসমূহ পূর্ণমাত্রায় পূর্ণতারই বহিঃপ্রকাশ। তাঁর সুন্নতের অনুসরণের বিষয়টি যদি পর্যালোচনা করা হয়, তাহলে বিনাচিন্তায় নির্দ্বিধায় সন্দেহাতীতভাবে তিনি প্রকৃত সত্যে উপনীত হয়েছিলেন বলা যায়। তিনি তাঁর কাশফ ও এলহামের মাধ্যমে হয়তো আপত্তির বিষয়গুলো বলে থাকতে পারেন। আর এ বিষয়টি অতি প্রাচীন কালের সূচনালগ্ন থেকেই চলে আসছে যে, পরবর্তী আম্বিয়াগণের শরীয়ত পূর্ববর্তী আম্বিয়াগণের শরীয়তের বিপরীত। বরং রহিতকারী হিসেবে এসেছে। এক ওহীও অপর ওহীর পরিপন্থী প্রমাণিত হয়, তাহলে এক এলহাম অন্য এলহামের পরিপন্থী হলে তা কী করে পূর্ববর্তীদের ভর্ৎসনা স্বরূপ বলা যেতে পারে। এমনিভাবে সাহাবা কেরাম রা.দের বিতর্ক ও মতপার্থক্য ইজতিহাদের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। আলেম সমাজের মধ্যে এরূপ মতপার্থক্য অহরহ হচ্ছে। এ ছাড়া মাশায়েখদের মধ্যে কাশফের ভিন্নতার কারণে এরূপ মতপার্থক্য হয়ে থাকে। শায়েখ আলাউদ্দীন ছামনানী র. এবং শায়েখ মুহিউদ্দীন আরাবী র. এর মধ্যে ওয়াহ্দাতুল অজুদকে কেন্দ্র করে যে মতপার্থক্য রয়েছে— তা

১. মকতুবাত ৪২/২
২. উক্তিটি হজরত সাইয়্যেদুত তায়েফাহ হজরত জুনায়েদ বোগদাদী র. এর। যার কারণ ব্যাখ্যাসহ হজরত মোজাদ্দেদ র. তৃতীয় খণ্ড মকতুবাতের ১২১ নং মকতুবে উল্লেখ করেছেন।

সর্বজনবিদিত। [১] অথচ আলাউদ্দৌলা র. তাঁকে আরেফে সুবহানী বলেছেন এবং তাঁর অধিকাংশ বইপুস্তকের মধ্যে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণকীর্তন করেছেন। মুজতাহিদগণের স্বরূপই এরকম যে, তাঁরা এভাবে আপোষে করেন। কেনোনা শিষ্য ইজতিহাদের স্তরে পৌঁছানোর পর তার নিজের মতের অনুসরণ অত্যাবশ্যক— উস্তাদের কাছ থেকে যেমনই আপত্তি হোক না কেনো।

ইমাম আবু ইউসুফ র. শুধুমাত্র খলকে কোরআন (কোরআন মাখলুক)— এ বিষয়টিকে কেন্দ্র করে ছয় মাস পর্যন্ত স্বীয় উস্তাদ ইমাম আজমের সঙ্গে আলোচনা-পর্যালোচনার পর অনেক মাসআলার সমাধান ইমাম আজমের অভিমতের বিপক্ষে এবং তাঁর শিষ্যদ্বয় ইমাম মোহাম্মদ র. ও ইমাম আবু ইউসুফ র. এর অভিমতের অনুকূলে ফতোয়া হয়েছিলো। আরেফ এবং ওলীআল্লাহ্গণের অবস্থা এরকমই। কিন্তু স্বল্পজ্ঞানী নিম্নশ্রেণীর লোকেরা এরূপ যোগ্যতা রাখে না। হজরত মোজাদ্দেদ র. এ ভিন্ন মতের রায় সত্ত্বেও বুজর্গদের প্রতি যেমন সম্মান প্রদান করা উচিত তা তিনি বজায় রাখতেন। একদা তাঁর একজন বিশেষ মুরিদ আওয়ারেফুল মাআরিফ গ্রন্থ পড়া শুরু করলেন এবং তিনি হজরতের কাছে তার ব্যাখ্যাপ্রদানের অনুরোধ করলেন। তখন তিনি ওই গ্রন্থের একটি বিশেষ অংশ অত্যন্ত সুন্দর সহজবোধ্য ও প্রাঞ্জল আরবী ভাষায় লিখে দিলেন। তারপর বললেন, আমি এখন এ গ্রন্থের ব্যাখ্যা লেখা থেকে বিরত রয়েছি এ ভয়ে যে, কোনো ক্ষেত্রে এমন কোনো বিষয় এসে না যায়, যেখানে লেখকের আত্মসম্মানে হস্তক্ষেপ করা হয়ে যায়।

প্রাথমিক অবস্থায় হজরত মোজাদ্দেদ র. হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ কুদ্দিসা সিররুহুর নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর মারেফাত, গোপন তত্ত্ব, কাশফ্ ও তার দৃশ্যময় বিষয়ে লেখা শুরু করলেন এবং তাঁর নির্দেশে নকশবন্দিয়া সিলসিলার বুজর্গদের কাশফ্ লেখা শুরু [২] করলেন। যখন বছর পূর্ণ হলো, তখন হজরত খাজা র. এর বরাবরে প্রেরণ করা হলো। হজরত খাজা র. লেখাটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন, আনন্দিত হলেন এবং সঠিক বলে স্বীকৃতি দিলেন। অনেক বুজর্গের হাল বিষয়ে জিজ্ঞাসাও করলেন। হজরত খাজা র. এর এই মকতুব সম্পর্কে মকতুবাত[৩]

---

১. হজরত মোজাদ্দেদ র. এর নিজের সরাসরি হজরত ইবনে আরাবী র. এর সাথে মতপার্থক্য ছিলো। কিন্তু তিনি তাঁর প্রশংসাও করেছেন। দেখুন মকতুবাত নং ২৬৬/১ ৮ম আকীদা ও ৮৯/৩।

২. মকতুবাত ১১/১ এর মধ্যে এ হুকুমের বর্ণনা রয়েছে। প্রথম খণ্ডে ৪নং মকতুবেও এ হুকুম সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। মুকাশাফাতে আয়নিয়ার প্রথম পাঁচ মুকাশাফা এ পাণ্ডুলিপিরই অংশ বলে মনে হয়।

৩. মকতুবাত ৪-৫/১

শরীফের মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। বরং এ পাণ্ডুলিপিটি প্রচারের জন্য শীর্ষস্থানীয় পূর্ববর্তী আলেমগণ— এমনকি স্বয়ং রসুলপাক স. নিজে আত্মিকভাবে নির্দেশ দিলেন। তিনি এক মকতুবে [১] হজরত খাজা র. এর নামে এ ইঙ্গিতপূর্ণ বিষয়টি তুলে ধরেছেন এভাবে—

"এ পাণ্ডুলিপিটি কোনো বন্ধুবর্গের বিশেষ অনুরোধে লেখা হয়েছিলো। বন্ধুগণের ইচ্ছা ছিলো এর মধ্যে এমন কিছু উপদেশপূর্ণ কথা লেখা হোক, যা তরিকতের জন্য উপকারী এবং সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা যায়। বাস্তবিক পক্ষে ওই পাণ্ডুলিপিটি অধিক পছন্দনীয় ও বরকতপূর্ণ ছিলো। এটি লেখার পর এমনই মনে হলো যে, রসুলেপাক স. অসংখ্য মাশায়েখসহ উপস্থিত হয়ে এ পাণ্ডুলিপিটি নিজের পবিত্র হাতে রাখলেন এবং পূর্ণ মহব্বতের সাথে চুম্বন করলেন এবং ওই মাশায়েখদের উদ্দেশ্যে বললেন, সকলেরই এ ধরনের অবস্থা অর্জন করা উচিত। এর মধ্যে ওই সকল মাশায়েখ, যাঁরা এ এলেম পেয়ে ধন্য হয়েছিলেন, তাঁরা হয়েছিলেন জ্যোতির্ময়, অন্যতম ও প্রিয়ভাজন। তাঁরা সকলেই রসুলে আকরম স. এর সামনে দণ্ডায়মান ছিলেন। ঘটনা অতি দীর্ঘ। এ মজলিসেই আমাকে এ ঘটনা প্রকাশের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো।

'কৃপাপ্রাপ্তদের জন্য কোনো কাজই অসম্ভব নয়'

হজরত মোজাদ্দেদ র. এর ঊর্ধ্বতন বুজর্গ হজরত ফারুক আজম রা. সম্পর্কে হাদিসে উল্লেখ রয়েছে, মহান আল্লাহ্ ওমরের জবানে কথা বলেন এবং প্রত্যেক যুগে উম্মতের জন্য একজন মুহাদ্দাছ (কথোপকথনকারী) হয়ে থাকে; আর এই উম্মতের জন্য মুহাদ্দাছ ওমর। হজরত মোজাদ্দেদ [২] র.কেও মুহাদ্দাছ বানানো হয়েছিলো। সুতরাং মারেফাতের সকল গুপ্তরহস্য যা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে [৩] তাঁর পবিত্র জবানে প্রকাশিত হয়েছিলো, তেমনই বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি মকতুবাত প্রথম খণ্ডের শেষে উল্লেখ করেছেন, এ মারেফাত বিষয় যা লেখনীতে আলোচনা করা হয়েছে (আল্লাহ্পাকের রহমতে) আমি এগুলো সবই এলহামে রহমানী মনে করি। এর মধ্যে শয়তানী প্রভাবের লেশমাত্রও নেই। এর প্রমাণ হচ্ছে এই— যখন এ ফকীর এ এলেম বিষয়ে লেখার জন্য মহান আল্লাহ্র দরবারে বিনীতভাবে সাহায্য প্রার্থনা করলো, তখন

---

১. মকতুবাত ১৬/১

২. মকতুবাত ৫১/২

৩. মকতুবাত প্রথম খণ্ড ইয়ার মোহাম্মদুল জাদীদুল বদাখশী আত্ তলাকানী র. সংকলন করেছেন। এর শেষাংশে হজরত মোজদ্দেদ র. যা বলেছেন, তা আমার কাছে এখন সংরক্ষিত নেই।

দেখলাম, সম্মানিত ফেরেশতাবর্গ এই স্থান থেকে শয়তানকে বিতাড়িত করছে। নিকটবর্তী স্থানেও তাকে থাকতে দিচ্ছে না। সুতরাং নেয়ামতের বহিঃপ্রকাশ ঘটানোও উত্তম সৌন্দর্য্যের অন্তর্ভুক্ত। আমি এ নেয়ামত প্রকাশের সাহস করলাম। আমি আল্লাহ্পাকের কাছে আশা করি বিষয়টি দাম্ভিকতা ও আত্মগর্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। অহমিকার লেশমাত্রও এর মধ্যে নেই। আল্লাহ্পাকের বিশেষ অনুগ্রহ ও সদিচ্ছা সার্বক্ষণিকভাবে দৃশ্যমান হয়েছিলো।

এ গভীর মারেফাতবিষয়ক লেখনীতে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সহায়ক শক্তি হিশেবে কাজ করেছে। তা হলো ১. রসুল স. স্বপ্নের মধ্যে বলেছিলেন, তুমি এলমে কালামের (আকাইদ শাস্ত্রের) মুজতাহিদ (গবেষক)। ২. হজরত আলী মুরতাজা কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু স্বপ্নের মধ্যে বলেছেন, আমি তোমাকে আকাশবিষয়ক জ্ঞান দেওয়ার জন্য এসেছি। [১]

এ মারেফাত বিষয়ে লেখার আরো একটি কারণ হচ্ছে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এমন প্রশান্তি পাচ্ছিলাম যেনো নিজের স্বাভাবিকতাই হারিয়ে ফেলেছিলাম। সুতরাং তিনি উল্লেখও করেছেন যে, একদল আল্লাহ্প্রেমে প্রশান্তির জন্য সেমা ও সঙ্গীতকে গ্রহণ করেছেন। আর একদল আল্লাহ্প্রেমের প্রশান্তির জন্য লেখালেখির কাজকে পছন্দ করে নিয়েছেন। এভাবে তারা নিজেদের বোঝাকে হালকা করেছেন।

এই মারেফাতবিষয়ক গুপ্তরহস্য লেখার আরো একটি কারণ এ-ও হতে পারে যে, তাঁকে জানানো হয়েছিলো এ লেখনী হজরত ইমাম মাহদী [২] আ. রে. এর নজর পর্যন্ত পৌঁছবে এবং তিনি তা গ্রহণও করবেন। এ জন্য তিনি কষ্ট করে অনেক লিখেছেন। বলেছেন—

এলেম এবং মারেফাত (এলহামপ্রাপ্ত) মহান নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত এবং এগুলো অতি উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত রাখে। এ কারণেই পবিত্র কোরআনের মোজেজা সকল মোজেজা থেকে অধিক শক্তিশালী ও মজবুত। চক্ষু খুলে দেখো, যে সকল এলেম এবং মারেফাত বৃষ্টি বিন্দুর মতো বর্ষিত হচ্ছে, সেগুলো কোথা থেকে আসে? এই এলেমের আধিক্য হওয়া সত্ত্বেও এটি শরীয়ত থেকে পশম পরিমাণ বিচ্যুত হওয়ার অবকাশ নেই। স্বীয় অভ্যন্তরীণ সুস্থতার প্রতীক স্বরূপ আমাদের মোর্শেদ হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ কুদ্দিসা সিররুহু লিখেছেন, তোমার সকল জ্ঞান ঠিক আছে। [৩]

---

১. তিনি তাঁর পীর বুজর্গের নামে এক মকতুব (প্রথম খণ্ড ৭নং) এর মধ্যে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন।
২. প্রথম খণ্ড ২৩৪
৩. প্রথম খণ্ড ১০৭

এই মকতুব সমাপ্তির পর তিনি তরিকত সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। বলেছেন, এই তরিকা হচ্ছে ওই তরিকা, যার দ্বারা হক সুবহানাহু তায়ালা এই ফকীরকে অন্যতম ঘোষণা করেছেন এবং সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত এই তরিকার ভিত্তি নকশবন্দিয়া তরিকার উপর— যার মধ্যে সূচনা থেকেই বিশদ আলোচনা রয়েছে। এই ভিত্তির উপরেই এর ইমারত বানানো হয়েছে এবং দুর্লভ হিশেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তা না হলে বিষয়টি এতদূর অগ্রসর হতো না । এর বীজ নেওয়া হয়েছে বোখারা এবং সমরখন্দ থেকে এবং সেরহিন্দের জমিনে তা বপন করা হয়েছে। আর খামীর নেওয়া হয়েছে হারামাইন শরীফ থেকে এবং আল্লাহ্‌র ফজলের পানি এ জমিনে বর্ষণ করে পরিতৃপ্ত করা হয়েছে। এবং ইহসান (সুলুক) এর প্রশিক্ষণে তাকে প্রতিপালিত করা হয়েছে। যখন ওই ক্ষেতের ফসল পরিপক্ক হয়েছে তখন ওই এলমে মারেফাতের ফল প্রকাশিত হয়েছে।

কুদসিয়্যাহ্‌

হাল, জয্‌বা,এলেম ও মারেফাতসমূহ বর্ণনার কালে যদি এ লেখকের বক্তব্যের মধ্যে কোনোরূপ বৈসাদৃশ্য ও বৈপরিত্য পরিলক্ষিত হয়, তবে তা সময়ের বিভিন্নতা এবং হাল ও অবস্থার পার্থক্যের কারণে হয়েছে বলে মনে করতে হবে। কেনোনা, প্রত্যেক সময়ের হাল ও জয্‌বাসমূহ বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে এবং প্রত্যেক অবস্থার জ্ঞান ও মারেফাতসমূহ স্বতন্ত্র হয়। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে এটা কোনো বৈসাদৃশ্য ও বৈপরিত্য নয়। এর উদাহরণ শরীয়তের হুকুম আহকামের মতো। যেমন তা মনসুখ বা রহিত হওয়ার পর বিপরীত হুকুম বলে মনে হয়। কিন্তু যখন সময় ও অবস্থার বিভিন্নতাকে সম্মুখে রাখা হয়, তখন মতানৈক্য ও বৈপরিত্য থাকে না। এর মধ্যে আল্লাহ্‌ সুবহানুহু ওয়া তায়ালার হিকমত ও কল্যাণ নিহিত আছে। কাজেই, তোমরা কেউ-ই সন্দেহবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না (মাবদা ওয়া মাআদ মিনহা ৬১)।

অষ্টম হাজ্‌রাত
হজরত মোজাদ্দেদ র. এর বাণী

মালফুজ ১

এক পবিত্র রজনী (শবে কদর ও শবে বরাত অথবা সেই রজনী, যা উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন) সে সময় তিনি পরিপূর্ণভাবে একটি বিশেষ হালের মধ্যে নিমজ্জিত ছিলেন। এমন সময় হজরত মাওলানা রুমী র. এর কবিতার এই অংশটি তাঁর মুখে উচ্চারিত হলো—

ইশকে মাশুক চুপা রাহ্‌তা হায়
ইশকে আশেক তো মাচাতা হায় শুউর।
ইশকে মাশুক কো করদে ফারবাহ
আওর আশেক কো বানা দে কমজোর।

গুপ্ত থাকে মাশুকের অনুরাগ
আর আশেকের অনুরাগ মুখর সরব।
মাশুকের অনুরাগকে করো শক্তিময়
আর আশেকের অনুরাগকে করো দুর্বল।

তারপর বললেন, মাশুকের ইশক (প্রেমাস্পদের অনুরাগ) সুউন্নত হওয়া সত্ত্বেও আশেকদের ইশক (প্রেমিকের অনুরাগ) এর সাথে কোনোপ্রকার সম্পর্ক রাখে না। কেনোনা মাশুকের ইশকের সম্পর্ক আশেকের মূলের সঙ্গে, গুণের সঙ্গে নয়। কিন্তু আশেকের অনুরাগের সম্পর্ক হয় মাশুকের গুণের সাথে এবং একথাও ঠিক যে, এক পর্যায়ে সময়ের বিবর্তনে অনুরাগ বৃদ্ধি পেয়ে মাশুকের গুণের স্তরকে অতিক্রম করে এবং মাশুকের মূল সত্তা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এ সময় তার মহব্বত (ভালোবাসা) প্রকৃত প্রেমের স্তরে উপনীত হয়। এভাবে মাশুকের ভালোবাসার সাথে আশেকের ভালোবাসার সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। অর্থাৎ মাশুকের গুণাবলী আশেকের মধ্যে প্রবহমান হয়ে যায়। সুতরাং আসল প্রেমিকের চূড়ান্ত পর্বে এরূপ কথা বলা যেতে পারে, নতুবা আশেকের প্রেম দিয়েই ভালোবাসার সূচনা হয় এবং মধ্যবর্তী অবস্থায় তার গুণাবলীই স্মরণপটে চিত্রিত থাকে। যেমন প্রথম প্রেমের মধ্যে হয়ে থাকে। মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য, দৈহিক অবকাঠামোর সৌন্দর্য, মৃদু হাসির ঝিলিক, সুমধুর বাচনভঙ্গী, মোহনীয় অভিব্যক্তি, সুন্দর নাসিকা, ললাট, টানা চক্ষু, দীর্ঘ কুন্তলরাশি, চিবুকের মনোহারিত্ব, বুদ্ধিমত্তার নিদর্শন ইত্যাদি আশেকের মধ্যে আকর্ষণ সৃষ্টি করে, কিন্তু মাশুকের অনুরাগের মধ্যে আশেকের এরূপ কোনো গুণের ছাপ পড়ে না।

তারপর বললেন, মাশুকের গুণের প্রতি অনুরাগের মধ্যে নিরানন্দ ও অবশ্যই বৈচিত্র এসে যায়। এ জন্য এ ধরনের প্রেমে আশেকের অনুরাগ ঢোল বাজিয়ে হয়ে থাকে (গোপন থাকে না)। কিন্তু মাশুকের মূল সত্তার প্রতি প্রেম ভালোবাসার মধ্যেই রয়েছে আনন্দ ও প্রশান্তি। আর এটাই হচ্ছে আশেকের বিলাপ ও অস্থিরতার এবং মাশুকের আবেগহীনতা ও স্বাভাবিক থাকার কারণ। আল্লামা রুমী র. বলেছেন, মাশুকের অনুরাগ বা প্রেম সুপ্ত থাকে। এর দ্বারা মূল সত্তার প্রতি ভালোবাসা, প্রেম বা অনুরাগের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে (গুণাবলীর প্রতি নয়)। কেনোনা সিফাত বা গুণের তুলনাগত ক্ষেত্রে মূল সত্তা উহ্য ও সূক্ষ্ম থাকে। এভাবে তিনি এ ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ্‌র এই বাণীর ব্যাখ্যা করলেন 'ইউহিব্বুহুম ওয়া ইউহিব্বুনাহু' (মহান আল্লাহ্ তাদেরকে মহব্বত করেন এবং তারাও মহান আল্লাহ্‌কে মহব্বত করে)।

মালফুজ ২

একদা এক পুণ্যবান দরবেশ বললেন, গাউছে রব্বানী শায়েখ আবুল হাসান খারকানী কুদ্দিসা সিররুহু বলেছেন, সব কিছুর মধ্যে আনন্দ আছে; কিন্তু ভালোবাসার মধ্যে কোনো আনন্দ নেই। এখানে হত্যা বা শেষ করেও দেওয়া হয়, আবার ঘাতকের কাছে রক্তেরঞ্জিত হওয়ার দাবীও করে— এর অর্থ কী? তিনি কিছুক্ষণ খেয়াল ও ধ্যানমগ্ন থাকলেন। অতঃপর উপস্থিত সকলের দিকে ফিরে বললেন—

এ বাক্যের মধ্যে গভীর দূরদর্শিতার ইঙ্গিত রয়েছে। এমন হালে যাঁরা উপনীত হয়েছেন, তাঁরা এরকমই বলে থাকেন। প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে, এই অবস্থায় বিচ্ছেদ-বেদনার মধ্যেই সুখ নিহিত। কিন্তু ওই ব্যক্তি তাঁর প্রেমিকের সাথে অধিক নৈকট্যের কারণে এবং অধিকতর মিলনাকাঙ্ক্ষার ব্যাকুলতার কারণে কোনোকিছুর মধ্যে সুখ বোধ করে না। প্রিয়তমের সাথে মিলন না হওয়ার কারণে তাঁর নাম, দেশ, ঠিকানা বা অন্যান্য কিছু অবস্থা শুনলেই আনন্দ বোধ করে। কেনোনা সে প্রেমিকের দর্শনকেই সুখ বা আনন্দ মনে করে। কিন্তু যখন মাহবুবের অনুগ্রহের কারণে দূরত্ব দূর হয়ে যায়, তখনও তার ব্যাকুলতা নৈকট্য ও সুখের অন্তরায় হয়ে যায়। অর্থাৎ প্রিয়তমের অনুগ্রহে যখন নৈকট্য লাভ হয়, তখনও প্রেমাকর্ষণের প্রাবল্যহেতু সে নিরানন্দ বোধ করে। সে ভাবে, মাশুকের চক্ষু হয়ে যাওয়ার মধ্যেই রয়েছে আনন্দ। যখন সে মাশুকের অপার অনুগ্রহে তাঁর চক্ষুও হয়ে যায়, যে চক্ষু হওয়া অতি উচ্চ মর্যাদার বিষয়, তথাপিও তার প্রাপ্তির তীব্র বাসনা তাকে আনন্দ দিতে পারে না। অতঃপর নিরুপায় হয়ে পবিত্র কোরআনের বাণী 'হাল্ মীম্ মাজীদ' (আরো কী আছে) বলে সকল উচ্চ মর্যাদা ও স্তরসমূহের অন্বেষী হয়ে যায়। সে ঘাতক থেকে রক্তে রঞ্জিত হওয়ার বাসনা করে। এ কথার

উদ্দেশ্য এই যে, আশেক স্বীয় অস্তিত্বহীনতার মধ্যে নিজেকেই মাকতুল (নিঃশেষ) হয়ে যাওয়া কামনা করে। আর তার মধ্যে 'বাকা' এর নিদর্শন প্রকাশিত না হওয়ার কারণে সে নিজেকে মনে করে রক্তে রঞ্জিত। বড়ই আক্ষেপের সঙ্গে ওরকম বলতে থাকে, যেমন হতে থাকে তার অন্তর্জ্বালা— কিন্তু সে জানে না যে, আরো অধিক উচ্চ মর্তবা লাভের পথে তার নিঃশেষ হয়ে যাওয়াটা এখনও পরিপূর্ণ হয়নি। এখনও পর্যন্ত পার্থিব সৌন্দর্যের চমক অবশিষ্ট রয়েছে। দ্বিতীয়বার নিঃশেষ হওয়ার পর যখন ওই চমকও থাকবে না, তখন এক ভিন্ন ধরনের চমক কাতেলের (নিঃশেষকারীর) দৃষ্টিতে অতিশয় সূক্ষ্মতার বিকাশ ঘটাবে। এরূপ পর্যায়ে আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি থেকে আঘাতকারী (নিঃশেষ হওয়া ব্যক্তি থেকে নিঃশেষকারী) রক্তে রঞ্জিত হওয়াকে কামনা করে। যতক্ষণ না নিঃশেষিত ব্যক্তি পরিপূর্ণভাবে নিজেকে কাতেলের (নিঃশেষকারী) উপর ন্যস্ত করবে এবং যতক্ষণ নিঃশেষ হওয়া ব্যক্তির অনুপরিমাণ নিশানা অবশিষ্ট থাকবে, ততক্ষণ রক্তে রঞ্জিত হওয়ার বাসনা জাগ্রত থাকবে। আমি কী আরো বলবো যে, এ সময় তার উপর কোন অবস্থা বিরাজ করতে থাকে, সে কী দেখে এবং কী প্রদান করে?

মালফুজ ৩

একদিন তিনি বললেন, শায়েখ আলাউদ্দৌলা সামনানী র. বলেছেন—

হেয় অহাম নেহী তুঝসে দুয়ী বাকী হায়
আমকান অ হাদাছ কি কমী বাকী হায়
গর ফজলে ইলাহী রাহে শামেলে হাল
দম ভর কে লিয়ে তুঝ সে তুয়ী বাকী হ্যায়।

অর্থঃ তোমার ক্ষেত্রে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই— দু'টিই বিদ্যমান। স্থিতি ও অস্থিতি কর্মই অবশিষ্ট আছে। যদি ইলাহীর করুণা হালের মধ্যে সর্বক্ষণ বিদ্যমান থাকে, নিঃশ্বাস থাকা পর্যন্ত তোমার মধ্যে আমি নিজেই অবশিষ্ট আছি।

এই পঙ্ক্তিগুচ্ছ বিশেষ জাওয়ালে আইনের (দর্শনের দূরদৃষ্টির) প্রতি ইঙ্গিত বহন করছে। যদিও বর্ণনাকারী এ অবস্থাকে এক মুহূর্তের মধ্যে বলেছে এবং এর কারণ হচ্ছে এটাই যে, মূল সত্তার তাজাল্লী ব্যতীত জাওয়ালে আইন (দূরদৃষ্টি) সম্ভব নয় এবং এটাও বর্ণনাকারী শুধুমাত্র বরকী তাজাল্লী (বিদ্যুৎবত আবির্ভাব)) অর্জন করেছে। এ জন্য এর নিদর্শন জীবনভর অবশিষ্ট থাকে। আমার জাওয়ালে আইন বলা মূল সত্তার তাজাল্লী ব্যতীত সম্ভব নয়। এর ব্যাখ্যা হচ্ছে, যখন কোনো এসেম (নাম) বা সিফাত (গুণ) কল্পনায় আরেফের আইয়্যানে সাবেতার (আসল অবস্থা বা নির্ধারিত ভাগ্যের) মাঝে পর্দা হিশেবে থাকে এবং আরেফের জাওয়ালে আইন (দূরদৃষ্টি) লাভ হয় না।

তারপর তিনি বললেন, ঘটনার বর্ণনাকারী ইবনে আরাবী কুদ্দিসা সিররুহু তো সাধারণ জাওয়ালে আইনের কথা বলেননি এবং তাজাল্লীয়ে যাতীর শুধুমাত্র সুরাতে মুতাজাল্লালাহু (অর্থাৎ যার প্রতি তাজাল্লির প্রতিবিম্ব পতিত হয়) এর কথা বলেছেন। তিনি তাঁর 'নস্‌সে শী শী' গ্রন্থে বলেছেন, তাজাল্লিয়ে যাতী শুধুমাত্র সুরতে মুজাল্লালাহুর জন্য হয়ে থাকে। অর্থাৎ এমন ব্যক্তি হকের আয়নার মধ্যে নিজেকে দর্শন করেন। ইবনে আরাবী র. এ কথাও বলেছেন যে, আইন (মূল) মা'লুমাতে ইলাহীর (ইলাহকে অনুধাবনের) অন্তর্ভুক্ত। যদি তা দূর হয়ে যায় তাহলে হক তায়ালার এলেম অজ্ঞতার দিকে ধাবিত হবে— যা অসম্ভব। এ ধরনের বিশ্বাসভ্রষ্টতার কথা এই বুর্জগ তো বলেননি। তিনি বলেছেন, যখন আইনে আওয়ালই নেই, তখন এর (তিরোহিতদর্শন) নিদর্শন কীভাবে হবে?

কিন্তু অন্যান্য দরবেশগণের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, আইন (দর্শন) তো জাওয়াল (দূর) হয়ে যায়, কিন্তু তার প্রভাব প্রস্থান করে না।

অতএব, আমাদের সঠিক অভিমত হচ্ছে, আইন (দর্শন) এবং আছার (প্রভাব) উভয়েই চলে যেতে পারে। যেমন, শায়েখ আবু সাঈদ আবুল খায়ের কুদ্দিসা সিররুহুর বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয়। যে ব্যক্তি জাওয়ালে আইন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, কিন্তু জাওয়ালে আছার সম্পর্কে আলোচনা করেননি তার কথার দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, তার জাওয়ালে আইনও যথাযথভাবে উপলব্ধি হয়নি। কেনোনা আছার তো অনুনয়ের বিধানভূত এবং আইন জাওহারের হুকুমের অন্তর্গত। এ জন্য যখন জাওহারই নেই, তখন আরজ (অনুনয়) কীভাবে থাকবে? আরজের ভিত্তি জাওহারের উপর এবং তার নিজস্ব কোনো পৃথক সত্তা নেই। সুতরাং মাথাই যখন নেই, তখন মাথাব্যাথা কীভাবে হবে? এরপর হজরত মোজাদ্দেদ র. হজরত আবু সাঈদ আবুল খায়ের কুদ্দিসা সিররুহুর যে কবিতা আছার জায়েল হওয়া বিষয়ক প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ লিখেছিলেন, তা পড়লেন। ওই কবিতার চতুর্থ চরণ ব্যাখ্যা করে বললেন, আমরা আইন এবং আছার দুটিই তিরোহিত হওয়ার ব্যাপারে শায়েখ ও বুজর্গদের সাথে ঐকমত্য পোষণকারী; কিন্তু এই কবিতার এই পঙ্‌ক্তিটির বিষয়ে একমত নই।

চুঁ মান হেমাহ মাশুক শুদাম আশেক কিসত্‌?

অর্থাৎ মাশুকই যদি না থাকে, তাহলে আশেক কে?

আমি শায়েখ আলাউদ্দৌলা সামনানী র. এর মতোই বলছি যে, সে নিজেই বিলীন হয়ে যায়, কিন্তু দুই-ই বিলীন হয় না। কিন্তু শায়েখ সামনানী এটাকে নিঃশ্বাস থাকা পর্যন্ত বলে থাকেন। আর আমরা এ অবস্থাকে চিরস্থায়ী বলে থাকি। কেনোনা আমাদের মতে তাজাল্লী সার্বক্ষণিক হয়, ক্ষণিকের (বরকী) জন্য হয় না।

হজরত মোজাদ্দেদ র. এ রকমও বর্ণনা করেছেন যে, আইন এবং আছারের জাওয়ালের জন্য দু'টিরই বিলীন হওয়া আবশ্যক নয়। প্রতিবিম্ব তো আসলেরই প্রমাণ। প্রতিবিম্ব তো নিজেকেই দেখছিলো এবং সে যখন মূলকে দেখে নিলো, তখন তার স্বীয় সত্তা যা মূল এরই প্রমাণ স্বরূপ ছিলো, তা বিলীন হয়ে গেলো।

কিন্তু দুইটিই বিদ্যমান থাকে। কেনোনা প্রতিবিম্ব তো মূল হতে পারে না (সুতরাং যে বুঝলো সেই বুঝলো)। এই মাকামের বিষয়ে তিনি এতো গভীর ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিবরণ ও বাস্তব ঘটনা বর্ণনা করলেন যে, আমাদের অনুভূতি সেগুলোকে পরিবেষ্টন করতে পারছিলো না।

তিনি আরো বললেন, 'ফতুহাত' গ্রন্থপ্রণেতা ইবনে আরাবী র. হককে একচ্ছত্র অস্তিত্ব বলে উল্লেখ করেছেন। এ কথার প্রেক্ষিতে শায়েখ আলাউদ্দৌলা সামনানী র. অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেছেন, সম্পূর্ণতা প্রকৃতপক্ষে শৃঙ্খলিত। নির্দিষ্ট ও একচ্ছত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বিশিষ্ট ও সাধারণ নির্বিশেষে তিনি এটাকে তৃতীয় কোনো প্রকার মনে করেন না। প্রকৃত সত্য তো এটাই। তর্কশাস্ত্রের বিধানও এরূপ। কিন্তু ইবনে আরাবী র. এটাকে স্বাধীন বলেছেন। আর এরূপ স্বাধীন যা ভাষায় আয়ত্ত করা অসম্ভব। আর তৃতীয় প্রকার যা ইবনে আরাবী র. এর একান্ত ব্যক্তিগত অভিমত— এরকম অভিমত সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ থেকেই যায়।

মালফুজ ৪

যেমন 'যাত' আমাদের ধারণা ও অনুভূতিবহির্ভূত, তেমনি 'সিফাত'ও আমাদের ধারণায় আসতে পারে না। কেনোনা সিফাতের মধ্য থেকে সালেকের মাঝে যা কিছু অনুভূতিতে আসতে পারে, তা হচ্ছে সিফাতের প্রতিবিম্ব। আমাদের মাসআলা পবিত্র কোরআনের এই আয়াত অনুযায়ী যে, 'উজকুরুনী' (সর্বাবস্থায় আমার স্মরণের মধ্যে ডুবে থাকো) যেনো মহান আল্লাহ্ তাঁর মেহরবানী দ্বারা এই আয়াতের আহবান 'আজকুরকুম' (আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করবো), যেমন তিনি স্মরণ করার অঙ্গীকার করেছেন। আল্লাহ্র জিকির হাল অর্জন ও কাশফের উদ্দেশ্যে করবে না। পার্থিব চিন্তাকে প্রশ্রয় দিবে না। একনিষ্ঠভাবে জিকির ও ইবাদতে লিপ্ত থাকবে। তিনি যদি কবুল করতে চান, যে কোনোভাবে কবুল করে নিতে পারেন। আহলে সুন্নত জামাতের বিশ্বাস অনুযায়ী শাকারাল্লাহু সুবহানাহু সা'ইয়াহুম (মহান আল্লাহ্ তাদের পরিশ্রমের পূর্ণ বিনিময় প্রদান করবেন) একথার উপরেই পূর্ণ আস্থা রাখবে। আর কৃতজ্ঞচিত্ততাসহ বলতে থাকবে 'হাল্ মীম্ মাজীদ' (আর কী আছে)। যদি এরূপ অবস্থা সৃষ্টি না হয়, তা হলে তা হবে গ্রহণযোগ্য হওয়ার অনুপযোগী। এর পর তিনি বললেন, মহান আল্লাহ্র অপার অনুগ্রহ যে, কামালাতে যাতীয়া অর্জন না হওয়া সত্ত্বেও ওই পবিত্র সত্তার বিবেচনায় তাঁর সিফাতের ধ্যান ও চিন্তার মধ্যে ভয় ও পেরেশান হয়ে থাকে।

শোনা যায়, কোনো কোনো মাশায়েখ মুরিদগণকে সূচনালগ্নেই যাতের মোরাকাবা করতে বলেন। তাদেরকে আরো বলেন ওই নূর রঙহীন ও অননুমেয়— যা গোটা বিশ্বব্যাপী পরিব্যপ্ত। এ ধরনের মোরাকাবাকারীদের বর্ণনা থেকে অবগত হওয়া যায় যে, তাঁরা স্বীয় ধারণার মধ্যে ওই নূরকে অবিমিশ্র এবং প্রশান্ত বলে থাকেন । কিন্তু মহান আল্লাহ্ তাঁদের এমতো ধারণা থেকে পবিত্র। ওই বাসীতে হাকিকী (প্রকৃত অবিমিশ্র) এরূপ যে, তার মধ্যে ধারণাপ্রসূত অবিমিশ্রতা, দীর্ঘতা, প্রশস্ততা— এরকম কোনো প্রকার ধারণার অবকাশ নেই (তিনি যে রকমপ্রকারহীন, আনুরূপ্যবিহীন)।

মালফুজ ৫

হজরত মোজাদ্দেদ র. বলেছেন, যে দিন আমি হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ কুদ্দিসা সিররুহুর কাছে বায়াত গ্রহণ করেছি, সেদিন থেকেই আমার দৃঢ় আস্থা হয়ে গিয়েছে যে, খুব শীঘ্র মহান আল্লাহ্ আমাকে তাঁর অপার অনুগ্রহে চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে দেবেন। কখনো কখনো নিজের কিছু হাল ও অপূর্ণ আমলের কারণে এ আস্থা নষ্ট হয়ে যেতো, কিন্তু তা স্থায়ী হতো না। আমার জবানে অধিকাংশ সময় এই কবিতাটি উচ্চারিত হতো—

তেরে আনোয়ার সে দিল হ্যায় মুনাওয়ার
বেলা আখের তুঝকু পাউঁগা ইয়াকীনান।

তোমার নূরে অন্তর সদা জ্যোতির্ময়
অবশেষে পাবো তোমায়— এ বিশ্বাস আছে নিশ্চয়।

মালফুজ ৬

হজরত খাজা আহরার কুদ্দিসা সিররুহুর খাস নেসবতের মধ্যে এমন কোনো নেসবত (রূহানী সংযোগ) ছিলো না, যা হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ র. কে দান করা হয়নি। আর হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ র. এর বিশেষ নেসবতের মধ্যে এমন কোনো নেসবত ছিলো না, যা আমাকে দান করা হয়নি। কিন্তু একটি উচ্চ পর্যায়ের নেসবত, যা হজরত খাজা আহরার কুদ্দিসা সিররুহু থেকে প্রাপ্ত, তা তিনি প্রদান করতে পারেননি। আমার মোর্শেদ হজরত খাজা বাকী র. এর ইন্তেকালের পর, যখন তাঁর মাজার জিয়ারতের জন্য গেলাম, তখন তিনি অনুগ্রহ করে ওই উচ্চ মাকামের নেসবত আমাকে দান করলেন।

মালফুজ ৭

তিনি বর্ণনা করেন, আমার প্রশিক্ষণ পূর্ণতাপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ মুরিদগণকে বারংবার তরিকত বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতেন। যখন তিনি

আমার প্রশিক্ষণ শেষ করলেন, তখন বুঝতে পারলাম, তিনি নিজেই নিজেকে শায়েখের দায়িত্ব পালন থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিলেন। তাঁর মুরিদগণের দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত করলেন। আমার সম্পর্কে বললেন, এই বীজ আমি বোখারা এবং সমরখন্দ থেকে সংগ্রহ করেছি এবং হিন্দুস্তানের পবিত্র ভূমিতে বপন করেছি।

মালফুজ ৮

কলেমা তাইয়্যেবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ এর বরকত ও মাহাত্ম্য এর পাঠকারীর স্তরবিশেষে হয়ে থাকে। অর্থাৎ পাঠকারীর মাহাত্ম্য যতো ঊর্ধ্বে হবে, এর বরকত ও মাহাত্ম্যও ততো অধিক হবে। এর পর তিনি একটি কবিতা পাঠ করলেন—

হুসন ভী বাড়তা গেয়া জিত্না কেহ মায় দেখা কেয়া
যেমন আমি দেখেছি তাঁর সৌন্দর্য ক্রমশঃ বেড়েই চললো।

তিনি বলতেন, দুনিয়ার মধ্যে এই আকাঙ্ক্ষা থেকে আরো বড় কোনো আকাঙ্ক্ষা আছে কি না আমার জানা নেই— মানুষ নির্জনে বসে বারংবার কলেমা তাইয়্যেবা পড়ে এর স্বাদ আস্বাদন করতে থাকবে। কিন্তু কী করা যাবে, সকল আকাঙ্ক্ষা তো পূরণ হয় না।

মালফুজ ৯

ওই সকল বিষয়, যা আরেফকে ফেরেশতাস্বভাব থেকে মানুষের স্বভাবে পরিণত করে, সেগুলোর মধ্যে খাদ্যগ্রহণের কোনো ব্যাপার নেই। আরেফদের মধ্যে কখনো কখনো তাহাজ্জুদের সময়ও খাদ্যগ্রহণের ব্যাপারে বাহ্যিকভাবে অনীহা দেখা যায়।

মালফুজ ১০

আমাকে যা কিছু দান করা হয়েছে, তা নিতান্তই মহান আল্লাহ্র মেহেরবানী। আর এই অনুগ্রহ লাভের ভিত্তি কী, তা যদি বলতে বলা হয়, তবে বলা যায়, শুধু রসুলুল্লাহ স. এর অনুসরণ— যার উপর আমার আচরণিক ভিত্তি নির্ভরশীল। সুতরাং আমাকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে তা দেওয়া হয়েছে কেবল তাঁর পূর্ণ আনুগত্য ও দাসত্বের বিনিময়ে। আর যা আমাকে দেওয়া হয়নি, তা দেওয়া হয়নি শরীয়তের হুকুমের পূর্ণ অনুসরণ না করার কারণে।

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, একবার আমি ভুলক্রমে শৌচাগারে প্রথমে ডান পা রেখে প্রবেশ করলাম। ওই দিন আমার জন্য বন্ধুত্বের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হলো। আমি লজ্জিত হলাম। তওবা করলাম। তারপর হাল স্বাভাবিক হয়ে গেলো।

মালফুজ ১১

একদিন আমার পেশাবের তীব্র বেগ হলো। আমি ব্যস্ততার সাথে ইস্তেঞ্জাখানায় প্রবেশ করলাম। তখন একটি নখের উপর আমার দৃষ্টি পড়লো, দেখলাম কলমের কালির কালো বর্ণের একটি বিন্দু। ওই বিন্দুটি পবিত্র কোরআনের বর্ণের অংশ বিশেষ বা উপকরণ। এমতাবস্থায় এখানে বসে থাকা বেআদবী। দ্রুত বেরিয়ে এলাম। কালো বিন্দুটি ধৌত করলাম। তারপর পুনরায় প্রবেশ করলাম। আমার মধ্যে পেশাবের তীব্র বেগ ছিলো। আমি তার বেগ প্রশমনের জন্য কষ্ট পেয়েছি। তথাপিও আদব ত্যাগ করা পছন্দ করিনি।

মালফুজ ১২

একবার নফল রোজা রাখলাম। কে যেনো জিজ্ঞেস করলো, আপনি নফল রোজা রেখেছেন কেনো? বললাম, অধিক সাবধানতাবশতঃ কাযা রোজা রেখেছি। রমজান মাসের কোনো একদিন ইস্তেঞ্জার প্রয়োজন হয়েছিলো। আমি তখন পানি ব্যবহার করেছিলাম। এই পানি ব্যবহারের কারণে রোজার কোনো ত্রুটি হয়েছে কিনা, সেই চিন্তা করে সাবধানতাবশতঃ সেই রোজার কাযা রেখেছি।

মালফুজ ১৩

তিনি সর্বদাই মুরিদদেরকে অধিক জিকির, সার্বক্ষণিক খেয়াল এবং নিয়মিত মোরাকাবা করার প্রতি উৎসাহ দিতেন। বলতেন, এই দুনিয়া আমল করার স্থান। চাষাবাদ করা ও ফসল ফলানোর স্থান। এজন্য বাতেনী বিষয়ের প্রতি সার্বক্ষণিক খেয়াল রেখে প্রকাশ্যভাবে আদব রক্ষাপূর্বক নিয়মিত আমল করে যেতে হবে।

মালফুজ ১৪

কিছুসংখ্যক লোক খাজা নকশবন্দ কুদ্দিসা সিররুহুর গ্রন্থাবলী থেকে কম আমলের বিষয়টি উদঘাটন করেছেন। অথচ প্রকৃত বিষয় তা নয়। কেনোনা তিনি নবী করিম স. এর প্রতি পূর্ণ অনুসরণকেই তাঁর স্বভাব বানিয়ে নিয়েছিলেন। আর তাঁর উপরই পূর্ণ নির্ভরশীল ছিলেন। (অর্থাৎ অজীফা ও অন্যান্য বিষয়ের প্রতি কম গুরুত্ব দিয়েছেন)। রসুলুল্লাহ স. আল্লাহ্‌র অনুকম্পা ও ভালোবাসা অর্জন করেছিলেন। তথাপিও তিনি এতো দীর্ঘ সময় ধরে নফল নামাজ পড়তেন যে, তাঁর পবিত্র পদযুগল ফুলে যেতো। কিন্তু নকশবন্দিয়া তরিকায় শুরু এবং মধ্যবর্তী অবস্থায় জযবার (আকর্ষণ) সাথে সম্পর্ক হয়ে থাকে। তাই সালেক অধিক কৃতজ্ঞতা ও আল্লাহ্‌প্রেমে নিমজ্জিত থাকার কারণে অধিক নফল ইবাদাতের প্রতি আমল করে না। বরং সার্বক্ষণিক খেয়াল, ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নতে মোয়াক্কাদা আদায়ের প্রতি অভিনিবিষ্ট থাকে। এর উপরেই সুদৃঢ় থাকে। এমতো দৃঢ়তাকে সে

গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে এবং এটাকেই বলে শ্রেষ্ঠ রেয়াজত (সাধনা)। বিশেষ করে প্রথম ও মধ্যবর্তীগণ জযবার প্রাবল্যকেই ভাবে সর্বাধিক গুরুত্ববহ। পরে ওই সালেক অধিক আনুগত্যের মধ্যে লিপ্ত হয়। তখন তার উন্নতির বিষয়টি অধিক আমলের উপরেই নির্ভরশীল হয়ে যায়।

মালফুজ ১৫

লোকে মনে করে, রেয়াজত অর্থ খালি পেটে থাকা এবং রোজা রাখা। কিন্তু প্রকৃত রেয়াজত হচ্ছে— আহারে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা। ভারসাম্য রক্ষা করে চলা। ধারাবাহিকভাবে রোজা রাখাতে অনেক উপকার রয়েছে সত্য, কিন্তু সুস্বাদু খাবার সামনে থাকা সত্ত্বেও ক্ষুধা নিবারণের জন্য অল্প খাদ্য গ্রহণ করার পর হাত গুটিয়ে নিয়ে আসা আরো বড় রেয়াজত। এসকল ব্যক্তির রেয়াজত ওই সকল ব্যক্তির রেয়াজত থেকে উত্তম, যারা খাবার না পাওয়ার কারণে খাদ্যগ্রহণ থেকে বিরত থাকে। কেনোনা এরা সুস্বাদু খাবার সামনে পেয়েও অতিভোজনেচ্ছাকে সম্বরণ করে।

মালফুজ ১৬

এ বিষয়ে আমার লজ্জাবোধ হয় যে, একাকী নামাজ পাঠকালে শক্তি ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও রুকু ও সেজদাতে তসবিহ কম পাঠ করা হয়।

মালফুজ ১৭

মানুষ রেয়াজত ও মোজাহাদার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে; কিন্তু শরীয়তের আদব [১] রক্ষা ক'রে তার হুকুম প্রতিপালন করার তুল্য উত্তম রেয়াজত ও মোজাহাদা আর নেই। বিশেষ করে ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নত নামাজ আদায় করার যে পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে, তা যথাযথভাবে আদায় করা খুবই কঠিন। মহান আল্লাহ্ এরশাদ করেন— ওয়া ইন্নাহা লা কাবীরাতুন ইল্লা আলাল খশিয়ীন (নিশ্চয় নামাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কঠিন দায়িত্ব, কিন্তু আল্লাহ্‌ভীরুদের জন্য সহজ)।

মালফুজ ১৮

নামাজের মধ্যে তাশাহুদ পড়ার সময় শাহাদাত আঙুল উঁচু করা কোনো কোনো প্রকাশ্য হাদিসের অনুকূল আমল। হানাফী মাযহাবের মুজতাহিদগণ

১. জনাব ইরফান আহমদ আনসারীর অনুবাদে ১৬ নং এর পরে এই মালফুজও রয়েছে, যা ফারসি পাণ্ডুলিপিতে নেই। নামাজের মধ্যে সুন্নত মুস্তাহাব ও আদবের অনুসরণ হুজুরে কলবীর কাজ করে। কেনোনা এ সকল অনুসরণ সবই জিকিরের অন্তর্ভুক্ত। 'স্মরণ করো'— এ নির্দেশের প্রতি এ সকল কাজ বিশেষভাবে খেয়াল করিয়ে দেয়।

(গবেষকগণ) এটাকে জায়েয বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু পর্যালোচনার মাধ্যমে যা বুঝেছি, তা হচ্ছে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বনের জন্য ইশারা না করাই উত্তম। অনেক আলেম এটাকে হারাম ও মাকরূহও বলেছেন। আর যখন কোনো বিষয়কে কেন্দ্র করে হালাল না হারাম এ বিষয়ে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়, তখন তা পরিত্যাগ করাই শ্রেয়।

মালফুজ ১৯

হালসমূহ শরীয়তের অধীনস্থ। শরীয়ত হালসমূহের অনুগত নয়। কেনোনা শরীয়ত তো সম্পূর্ণ মহান আল্লাহ্‌র অকাট্য বাণী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। আর হাল হচ্ছে সম্পূর্ণ বাতেনী বিষয়, যা কাশফ ও ইলহাম দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

মালফুজ ২০

বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, কোনো কোনো অপূর্ণ দরবেশ নিজের কাশফের উপর নির্ভর করে প্রকাশ্য শরীয়তকে অস্বীকার ও বিরোধিতা [১] করার দুঃসাহস দেখায়। অথচ যদি মুসা আ.ও রসুলুল্লাহ স. এর জামানায় থাকতেন, তাহলে তাঁর জন্যও এই শরীয়তের পূর্ণ অনুকরণের কোনো বিকল্প থাকতো না। তা হলে এ ধরনের অহংকারী দরবেশের অবস্থান কোথায়?

মালফুজ ২১

মাতুরীদী [২] সম্প্রদায় সম্পর্কে তিনি বলতেন, তাঁরা দর্শন বিষয়ের গবেষণা থেকে অনেক দূরে এবং নবুওয়াতের নূর অর্জনের ক্ষেত্রে অধিক নিকটবর্তী।

মালফুজ ২২

হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ কুদ্দিসা সিররুহু বলতেন, আমার নেসবত সকল নেসবত (সম্পর্ক) থেকে ঊর্ধ্বে। সুন্নতের অনুসরণ ও তার প্রতি দৃঢ়তার দিক দিয়ে অন্যান্য তরিকা থেকে হজরত খাজা নকশবন্দের র. এর তরিকা সর্বাধিক শক্তিশালী ও ঊর্ধ্বে। এজন্য তাঁর নেসবত সকল নেসবত থেকে শ্রেষ্ঠ।

---

১. মাআরিফে লাদুন্নীয়া গ্রন্থেও (বিরুদ্ধবাদীদের ক্ষতি অধ্যায়ে) আলোচনা রয়েছে।

২. শায়েখ আবু মনসুর মোহাম্মদ বিন মোহাম্মদ মাহমুদুল হানাফিয়্যাল মুতাকাল্লিমুল মাতুরীদী সমরখন্দী র. থেকে এই মাতুরীদী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে। এই সম্প্রদায় গভীর আকীদাগত বিষয়ে সুন্নী। তাঁরা মুতাজিলা ও অন্যান্য স্বেচ্ছাচারী দলের প্রতিবাদে আবির্ভূত হয়েছিলেন। শায়েখ আবু মনসুর ৩৩৪ হিজরী সমরখন্দে ইন্তেকাল করেছেন।

মালফুজ ২৩

নেক আমলের অহংকার আমলকে এমনভাবে ধ্বংস করে দেয়, যেমন আগুন কাঠকে জ্বালিয়ে নিঃশেষ করে দেয়। অহংকারের স্বরূপ এমনই হয় যে, আমলকারীর দৃষ্টিতে তার আমলকে খুবই ভালো মনে হয়। অথচ তার উচিত নিজের গোপন দোষ ও অপূর্ণতাকে স্মরণ করা। নিজের ভালো কাজের উপর পর্দা ফেলে দিয়ে স্বীয় ইবাদতের ত্রুটির জন্য লজ্জিত হওয়া ।

মালফুজ ২৪

যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি জাহেরী এলেমে (শরীয়তসম্পর্কিত জ্ঞানে) পূর্ণ দক্ষতা অর্জন না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে সুফীদের সূক্ষ্ম তত্ত্বপূর্ণ আলোচনা থেকে পূর্ণরূপে উপকৃত হতে পারে না।

মালফুজ ২৫

ধারণা এবং অস্তিত্বের মধ্যে পার্থক্য করা এক বিষয় এবং পৃথক হয়ে যাওয়া ভিন্ন বিষয়।

মালফুজ ২৬

'না' এবং 'কখনোই না' এর মধ্যে পার্থক্য [১] অসংখ্য। 'না' অর্থাৎ 'নফী'র সম্পর্ক সূচনালগ্নে অথবা মধ্যবর্তী অবস্থায় এবং ইনতেফা (কখনোই না) এর সম্পর্ক নিতান্তই শেষ অবস্থার সাথে।

মালফুজ ২৭

হজরত খাজেগানে নকশবন্দিয়া কাদ্দাসাল্লাহু আছরারাহুমের তরিকায় এসমে যাত এবং নফী ইসবাতের জিকির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। অর্থাৎ দুটিই পথ এবং যা আমাকে কাশফের মাধ্যমে অবগত করানো হয়েছে, তা হচ্ছে, এসমে যাত জযবা (আকর্ষণ) এর সাথে অধিক সম্পর্কযুক্ত এবং নফী ইসবাতের সম্পর্ক সুলুকের (অগ্রসর হওয়া) সাথে। এই তরিকার সূচনাতে প্রথমেই জযবা হওয়া মুরিদদের জন্য অধিক প্রয়োজনীয় বা যুক্তিসিদ্ধ। তাই প্রথমেই এসমে যাতের জিকির মুরিদের জন্য অধিক উত্তম। অতঃপর সুলুকের পথে পদচারণা শুরু হয়। তখন তার হাল অনুযায়ী নফী ইসবাতের জিকির প্রদান করা হয়।

মালফুজ ২৮

হজরত মোজাদ্দেদ র. এর কাছে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, এ বিষয়ে কী রহস্য রয়েছে যে, আমি মহফিলে, মজলিসে, বাজারে, বিশিষ্ট গুনীজনদের সাহচর্যের

১. মকতুবাত ৬৭/৩ (নফী ও ইনতেফা)— (খেয়াল ও অস্তিত্ব)

মধ্যে নেসবতের বিকাশ এবং হুজুর (মনোনিবেশ) অধিক মাত্রায় পেয়ে থাকি। আর নির্জনে হুজরার মধ্যে, নিজের সাথীদের সাহচর্যে নেসবত কম পেয়ে থাকি। তিনি উত্তরে বললেন, একবার হজরত খাজা আহরার কুদ্দিসা সিররুহুর নিকট এক ব্যক্তি এই প্রশ্ন করেছিলো। তিনি বলেছিলেন, আমাদের বুজর্গদের নেসবত মাহবুব (প্রিয়জন) তুল্য, তাই যখন মাহবুবকে নির্জনে আনা হয়, তখন তাঁর লজ্জাবোধ হয়। কিন্তু হজরত খাজা আহরার র. এর উত্তর ছিলো অতীব উত্তম এবং অতীব সূক্ষ্ম। এ সম্পর্কে খোলামেলা কথা হচ্ছে— জাহের (বাহ্যিক) এর সঙ্গে বাতেন (অভ্যন্তরীণ) এর ভালোবাসা এমনই হয় যে, একই সঙ্গে ওঠাবসা করে এবং জাহের এবং বাতেনের মধ্যে নিজ নিজ কর্মে লিপ্ত থাকে। কিন্তু সালেকের জাহের (বাহ্যিক অবস্থা) যখন মহফিল ও মজলিসে মানুষের সাহচর্যের কারণে বাতেনের সাহচর্য ছিন্ন করে দেয়, তখন ওই বাতেন তার জাহের ব্যতীত স্বীয় কর্মে লিপ্ত হয়ে যায়। তাই তখন হালাওয়াত (স্বাদ) এবং হুজুর (মনোনিবেশ) অধিক হয়ে যায়। কিন্তু সালেক যখন নির্জনে গমন করে, তখন তার জাহের (বাহ্যিক অবস্থা) মহফিলের প্রতি মনোনিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাতেনের সাহচর্য ও ভালোবাসার প্রতি মনোযোগী হয়। তখন তার বাতেনও জাহেরের সঙ্গে একত্রিত হয়। হুজুরের বা মনোনিবেশের মধ্যে স্বল্পতা দেখা দেয়। কিন্তু কোনো কোনো লোক এমনও আছেন, যাঁদের নির্জনতায় হুজুরাতে-মহফিল এবং সমবেত অবস্থার তুলনায় অধিক মনোনিবেশ হয়। এর কারণ, তাঁর বাতেন শক্তি অর্জন করে জাহেরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। তিনি তাঁর জাহেরকে বাতেনের অধীনস্থ্ করে নিজের রঙে রঞ্জিত করে দেন। এভাবে জাহের এবং বাতেনের সমন্বয়ের কারণে তাঁর নেসবত বৃদ্ধি পায়।

মালফুজ ২৯

একদিন তিনি বললেন, সুফিয়ানে কেরামের দ্বারা দ্বীনে মোহাম্মদীর অনেক উন্নতি হয়েছে। অসংখ্য গোনাহ্গার উম্মত ওই বুজর্গদের ফয়েজ বরকতের অসিলায় কামালাতের স্তরে পৌঁছেছে। তাঁদের জ্যোতির্ময় সাহচর্যে তাদের পাপের অন্ধকার ও কুসংস্কার দূর হয়ে গিয়েছে। কোরআন-সুন্নাহর অসংখ্য গুপ্তরহস্য তাঁদের কাশফের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু তাঁদের মত্ততার কারণে দ্বীনের কিছু ক্ষতিও হয়েছিলো। নির্বোধ লোকেরা দুঃসাহস প্রদর্শন করেছিলো। তাই তারা মানুষের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁদের মত্ততাপূর্ণ আকর্ষণীয় শরীয়তের অননুকূল কথাবার্তায় অনেকে পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু মহান আল্লাহ্ তাঁর এই বাক্যের বহিঃপ্রকাশের মাধ্যমে বিশেষ জ্ঞান ও উপদেশ রেখেছেন— বরং (সত্য হচ্ছে) এই যে, “তাখাল্লাকু বি আখলাকিল্লাহ” (আল্লাহ্র চরিত্রে চরিত্রায়িত

হও) এই হুকুম অনুযায়ী ওই বুজর্গগণ আল্লাহ্র আদর্শের প্রবক্তা ছিলেন। কোরআনপাকেও মুতাশাবিহাত (রহস্যাচ্ছন্ন) শব্দ এসেছে। যেমন— ইয়াদ (হাত), ইস্তাওয়া আ'লাল আরশ (আরশের উপরে সমাসীন), সাক (রান) ইত্যাদি। একদল তো আল্লাহ্তায়ালাকে আকৃতিপূর্ণ বা আকারধারী মনে করে পথভ্রষ্টতাকেই আলিঙ্গন করেছে। এ সকল শব্দ দ্বারা তাদের বিভ্রান্ত হওয়ার বিষয়ে আল্লাহ্পাকই অধিক জ্ঞাত। তারা রসুলুল্লাহ স. এর হাদিসেরও অনুসরণ করেছে এভাবে— যেমন ১. আল্লাহ্ হেসেছেন ২. আল্লাহ্ আদমকে তার নিজস্ব আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন ৩. আমি আমার প্রভুকে যুবকের আকৃতিতে মদীনার গলিতে ঘুরতে ফিরতে দেখেছি ৪. আল্লাহ্ তাঁর হাত আমার কাঁধে রাখলেন, আর আমি তাঁর স্পর্শ অনুভব করতে পারলাম— এ ধরনের বাক্য প্রকাশিত হয়েছে। অথচ আম্বিয়া কেরাম আ. বিশেষ করে রসুলুল্লাহ স. ছিলেন পরিপূর্ণভাবে জ্ঞানবান, স্বাভাবিক ও হুঁশসম্পন্ন। সুতরাং সুফিয়ানে কেরামদের মত্ততার মধ্যে এ ধরনের শরীয়তপরিপন্থী কথা বলার জন্য তারা তিরস্কার বা অভিসম্পাতের পাত্র হতে পারেন না।

এরপর হজরত মোজাদ্দেদ র. বললেন, আমি নিজেকে শরীয়তের মধ্যে নিক্ষেপ করেছি এবং রসুলুল্লাহ স. এর সুন্নতের উপর যথাযথভাবে দণ্ডায়মান আছি। এখন যদি আমার কলমের ভাষায় কিছু মত্ততাপূর্ণ বাক্য প্রকাশিত হয়ে থাকে, তবে বাহ্যিক অবস্থা পর্যবেক্ষণকারী লোকেরা এ থেকে কী-ই বা পেতে পারে?

নবম হাজ্‌রাত

হজরত মোজাদ্দেদ র. এর হুলিয়া (দৈহিক গঠন), তাসাররুফাত (আধ্যাত্মিক ক্ষমতা) এবং কারামত (অলৌকিক ঘটনা)

হজরত মোজাদ্দেদ র. এর হুলিয়া মোবারক (পবিত্র অবয়ব) সম্পর্কে বর্ণনা করা হচ্ছে এ কারণে যে, এই তরিকার সালেকবৃন্দ ও হকিকতের মনজিলে ভ্রমণকারীগণ তাঁদের মূল লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য এটাকে অবলম্বন মনে করে যাতে পবিত্র অবয়বধারীর প্রতি অধিক আকর্ষণবোধ করেন এবং অনুপ্রাণিত হন। আর আত্মিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে ফয়েজ বরকত লাভ করতে পারেন।

পথপ্রদর্শকের ছায়াকে আল্লাহ্‌র জিকির থেকে উত্তম মনে করবে, যদিও মহান আল্লাহ্‌র জিকির এবং তার মধ্যে লিপ্ত থাকা উন্নতির কারণ। কিন্তু শায়েখের সঙ্গে সংযোগ অক্ষুণ্ন রাখা সকল তরিকায়ই অধিক নৈকট্য লাভের শ্রেষ্ঠ পন্থা।

নকশবন্দিয়া বুজর্গগণ এক আজব সৈনিক দল, যাঁরা এই কাফেলাভূতদেরকে পরিত্রাণের পথপ্রদর্শন করে হারাম শরীফ পর্যন্ত পৌঁছে দেন।

হজরত মোজাদ্দেদের দেহের রঙ ছিলো গৌরবর্ণ ও শাদাটে। তিনি ছিলেন প্রশস্ত ললাটের অধিকারী। ছিলেন শ্রেষ্ঠদের অধিনায়ক। তাঁর ললাট ও অবয়ব থেকে এমন এক ধরনের নূর বিচ্ছুরিত হতো, যার প্রতি সরাসরি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যেতো না। চক্ষু আপনাআপনি বুঁজে আসতো। ভ্রুযুগল ছিলো বাঁকা ধনুকের মতো সুদৃশ্য প্রশস্ত দীর্ঘ, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ও সুমসৃণ। চক্ষুযুগল ছিলো বৃহদাকৃতির ও সুন্দর— কালো অংশ ছিলো খুবই কালো এবং শাদা অংশ ছিলো খুবই শাদা। নাক ছিলো উঁচু ও জ্যোতির্ময়। ওষ্ঠাধর ছিলো লোহিতাভ ও মসৃণ। মুখ না লম্বা, না গোল। দাঁত একটি অন্যটির সাথে মিলিত ও দৃষ্টিমনোহর, মুক্তার মতো উজ্জ্বল। পবিত্র শ্মশ্রু ছিলো খুব ঘন, ভক্তি উদ্রেককারী লম্বা এবং ভরাট। মুখমণ্ডলের মূল পরিসরকে আচ্ছন্ন করতো না। তিনি ছিলেন দীর্ঘ ও সুঠামদেহী। তাঁর শরীরে কখনো মাছি বসতো না। তাঁর পায়ের গোড়ালী এমন পরিষ্কার ও চকচকে ছিলো যে, মনে হতো পা দুটো যেনো চীন দেশীয়। তাঁর শরীরের ঘামে কোনো দুর্গন্ধ ছিলো না। তাঁর দৈহিক সৌন্দর্য হজরত ইউসুফ আ. এর সৌন্দর্যকে স্মরণ করিয়ে দিতো। হজরত ইব্রাহীম আ. এর চেহারার সৌন্দর্যের কথাও মনে হতো। কখনো কখনো তাঁকে দেখলে মনে হতো ইনি তো মানুষ নন, সম্মানিত ফেরেশতা। স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুখে উচ্চারিত হতো 'সুবহানাল্লাহ'! ইনিতো আল্লাহ্‌র ওলী। হাদিসের বাণী— আল্লাহ্‌র ওলীদের দেখার সাথে সাথে আল্লাহ্‌র কথা মনে পড়ে যায়। তিনি ছিলেন এই হাদিসের প্রতিভূ।

ইসলামের ক্রান্তিলগ্নে এবং কুফরি শক্তির আধিপত্য থাকা সত্ত্বেও অসংখ্য মানুষ তাঁর হাতে হাত রেখে ইসলাম গ্রহণ করেছিলো। ফাসেক (পাপাচারী)

ফাজের (বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী) অসংখ্য লোক দলে দলে তাঁর চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে তওবা করেছিলো। গ্রহণ করেছিলো আত্মশুদ্ধি, আল্লাহ্‌ভীতি ও আল্লাহ্‌র আনুগত্যের পথ। তাঁর ঘটনাবলীর কথা শুনে ও তাঁকে স্বপ্নে দেখে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ তাঁর সান্নিধ্যপ্রাপ্তির আশায় তাঁর কাছে ছুটে আসতো। তাঁরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করতো তাঁর স্বপ্নের ও বাস্তবের চেহারা অবিকল এক। অসংখ্য আলেম, পুণ্যবান ব্যক্তি, দরবেশ, বাদশাহ্ স্বপ্ন দেখে তাঁর কাছ থেকে জিকির ও রেয়াজতের পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষালাভ করেছিলো। তাদের অন্তর হয়ে গিয়েছিলো জিকিরময়।

তাঁর কারামতের মধ্যে অন্যতম কারামত ছিলো এই যে, বহুসংখ্যক মুরিদ তাঁর দরবারে হাজির হতো। তিনি প্রত্যেককে পৃথক পৃথকভাবে তাওয়াজ্জোহ প্রদান করতেন। বিভিন্ন জনের বিভিন্ন হাল (অবস্থা) ও স্বরূপ বর্ণনা করতেন। বলতেন, বিবর্তিত হালের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কেও। প্রত্যেকের সাথে তাঁর আচরণ ছিলো ভিন্ন। কারণ তাদের গোপন তত্ত্বও ছিলো পৃথক প্রকৃতির। পর্যবেক্ষণের সূক্ষ্ম দিকটি এই যে, সকল মুরিদ ও কর্মচারী মনে করতেন, তিনি আমার প্রতি যে মহানুভবতা ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন, অন্য কারো প্রতি সেরূপ করেননি। মুরিদগণকে বায়াত করার দিন থেকে বেলায়েতের স্তরে পৌঁছানো পর্যন্ত প্রত্যেকদিন তিনি ব্যক্তিগতভাবে সকলের খোঁজ খবর নিতেন।

এই ফকির (বদরুদ্দীন সেরহিন্দী) বলেন, হজরত মোজাদ্দেদ র. প্রত্যেক দিন কমপক্ষে দশবার আমার হালের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। আমি যে অবস্থার কথা বলতাম, তাঁর তাওয়াজ্জোহের ফলে তা দূর হয়ে যেতো। শুরু হতো উন্নততর অবস্থা। কখনো কখনো দুই ধরনের অবস্থার মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হতো। পরক্ষণেই তাঁর তাওয়াজ্জোহের কারণে আবির্ভাব ঘটতো নতুন হালের।

তিনি কখনো কখনো বলতেন, তোমার অবস্থা এখন এরকম। এরপর ভিন্ন অবস্থার প্রকাশ ঘটবে। তিনি যেমন বলতেন, তেমনই হতো। যে সকল মুরিদ বেলায়েত অথবা খেলাফতপ্রাপ্ত হয়ে দূরে চলে যেতেন, তাঁদের প্রতিও তিনি অদৃশ্যভাবে তাওয়াজ্জোহ্ প্রদান করতেন। খলিফাগণের মধ্যে যারা বেলায়েতের নিম্নস্তরে অবস্থান করতেন, তাঁদেরকে তাওয়াজ্জোহের মাধ্যমে কামালাতে নবুওয়াতের স্তরে পৌঁছে দিতেন। এভাবে তিনি যাঁকে বেলায়েতে মূসাবী থেকে বেলায়েতে মোহাম্মদী পর্যন্ত পৌঁছানোর ইচ্ছা করতেন, তাঁর প্রতি দিতেন বিশেষ তাওয়াজ্জোহ্। রূহানি শক্তি সম্পর্কে অভিজ্ঞ সালেকগণ তা নিজের মধ্যে অনুভব করতেন। বুঝতে পারতেন, তিনি কোথা থেকে কোথায় এসে উপনীত হয়েছেন। মখদুমজাদা হজরত মোহাম্মদ সাদেক র. এবং হজরত মীর মোহাম্মদ নোমান র. এর বিবরণীতে এ বিষয়ে অবগত করা যেতে পারে। মুরিদগণের বর্তমান ও ভবিষ্যতের সম্ভাব্য হাল সম্পর্কে তিনি থাকতেন সদাসতর্ক। তাঁর মুরিদ ছিলো

লক্ষাধিক। তাঁদের প্রত্যেকের জন্য যদি একটি করে কারামত হিসাব করা হয়, তাহলে তাঁর কারামতের সংখ্যাও এক লক্ষ ছাড়িয়ে যাবে।

আমি (লেখক) সতেরো বছর পর্যন্ত তাঁর খেদমতে ছিলাম। ওই সময় যদি তাঁর কাশফ, কারামাত এবং তাঁর মাকামসমূহ ও উচ্চমর্যাদার কথা লিখতে চাইতাম, আর প্রতিদিন যদি একটি করে ঘটনা লিখে রাখতাম তাহলে কমপক্ষে তিন হাজার কারামাত লিপিবদ্ধ করতে পারতাম। তাঁর ইন্তেকালের পর কয়েক বছর যাবত এ বিষয়ে প্রণোদনা পাচ্ছি। তাঁর খলিফাবৃন্দ সত্যপথ প্রদর্শন ও হেদায়েতের কাজে শহর থেকে দূরে গিয়েছেন। অনেক মুরিদ অবস্থান করছেন দূর দেশে। এমতাবস্থায় আমার স্মরণে যেগুলো আছে সেগুলোই লিপিবদ্ধ করে চলেছি। কিছু বিষয় লিখছি অন্যদের কাছে শুনে। এছাড়া আর কী-ই বা করতে পারি আমি!

এই নগণ্য ফকির হজরত মোজাদ্দেদ র. এর পৃথিবীবাসের সময়ে তাঁর জীবন-বৃত্তান্ত সম্পর্কে একটি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেছিলো। পুস্তকটির নাম দেওয়া হয়েছিলো 'সিয়ারে আহমদ'। পাণ্ডুলিপিটি তাঁর সামনে উপস্থাপন করলাম। তিনি ওই ঘটনাটি পাঠ করলেন— হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ কুদ্দিসা সিররুহু মাওলানা খাজা আমকাংগী কুদ্দিসা সিররুহুর নির্দেশে ইস্তেখারা করলেন। দেখলেন, একটি তোতা পাখি বৃক্ষশাখা থেকে উড়ে এসে তাঁর হাতের উপর বসলো....শেষ পর্যন্ত। এই ফকির ওই তোতা পাখিকে হিন্দুস্তানের পাখি লিখেছিলো। হজরত মোজাদ্দেদ র. হিন্দুস্তানের পাখি শব্দটি কেটে দিয়ে শুধু তোতা শব্দটি লিখে দিলেন। আনন্দিত হয়ে বললেন, সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। এটি আমার জীবন-বৃত্তান্ত সম্পর্কে তোমার লিখিত প্রথম পুস্তক। তিনি কাশফের মাধ্যমে এই বিষয়টি অবগত হয়েছিলেন যে, এটি প্রথম পাণ্ডুলিপি। অর্থাৎ পরবর্তী পাণ্ডুলিপিগুলোও বাস্তবে পরিণত হবে ইনশাআল্লাহ্। সেরকমই হলো। তাঁর মহাতিরোধানের পর লিখলাম ১. কারামাতে আউলিয়া (ওলীদের কারামত) ২. গাউছুল আজম হজরত আবদুল কাদের জীলানী কুদ্দিসা সিররুহু কর্তৃক লিখিত 'ফতহুল গয়ব' গ্রন্থের ফার্সী অনুবাদ ৩. রওয়ায়েহ্ সুফীয়া কেরামদের অবস্থা এবং কাদেরিয়া ও নকশবন্দিয়া তরিকার সাধনাবিষয়ক বিবরণ ৪. সুনাওয়াতুল আতকিয়া— হজরত আদম আ. থেকে শুরু করে তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের জীবনবৃত্তান্ত। আসল কথা হলো— প্রতিটি কাজ তার নির্ধারিত সময়েই হয়ে থাকে। আমার লিখিত পাণ্ডুলিপি সিয়ারে আহমদ, যা ছিলো হজরত মোজাদ্দেদ র. এর জীবনবৃত্তান্ত, তা আমার অন্যান্য সামগ্রীর সাথে চুরি হয়ে যায়। আমি খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও হতাশ হয়ে যাই। ১০৩৯ হিজরীতে তাঁর সম্পর্কে পুনরায় লিখতে শুরু করি। কিছু অংশ লেখার পর হতাশা দূর হয়। এ পাণ্ডুলিপিটি সম্পন্ন করি ১০৪৩ হিজরীতে। পাণ্ডুলিপিটি

'দরজাতুল আবরার' নামে প্রকাশিত হয়। এক শিয়া, যিনি দশ বছর পর্যন্ত সেরহিন্দে তহশীলদারের চাকুরী করতেন, তিনি আমাকে আউলিয়া কেরামদের হালের উপর একটি গ্রন্থ রচনা করার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। ১০৪৪ হিজরীর শেষ দিকে আমি আর একটি গ্রন্থ রচনার কাজ শেষ করলাম। গ্রন্থটির নাম রাখলাম 'মাজমাউল আউলিয়া'।[১] এর মধ্যে দেড় হাজার আউলিয়া কেরামের বিবরণ রয়েছে। এর আর একটি নাম 'মানাসিলে শুয়ূখ'। এরপর আমি হজরত মোজাদ্দেদ র. এর মাকামাত সম্পর্কে লিখতে উদ্বুদ্ধ হলাম। অল্পদিনের মধ্যে কিছু অংশ সংকলনও হয়ে গেলো। এমন সময় ওই তহশীলদার ১০৪৪ হিজরী পুনরায় 'মাজমাউল আউলিয়া' গ্রন্থখানি সংশোধনের ও পরিমার্জনার জন্য অনুরোধ করলেন। কিছুসংখ্যক ধর্মবিদ্বেষী ওই তহশীলদারকে খুশি করার জন্য সাহাবা কেরামের জীবনচরিত ওই পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করিয়ে দিয়ে তাকে লক্ষচ্যুত করে দিলো। ১০৪৭ হিজরী আমি 'মাজমাউল আওলিয়া' সংশোধন ও পরিমার্জনা থেকে অবকাশ গ্রহণের পর মোজাদ্দেদ র. এর জীবনবৃত্তান্তসম্বলিত গ্রন্থ রচনায় সময় দিতে শুরু করলাম। কিন্তু এই মর্মে ভয় হতে লাগলো যে, হঠাৎ বাধাগ্রস্ত হই কি না। কেনোনা পরিস্থিতি ছিলো প্রতিকূল। হজরত আলী কাররামুল্লাহ ওয়াজহাহু এরশাদ করেন – 'আরাফতু রব্বী বি ফিসখিল আজায়িমি' (আমি আমার প্রভুকে আমার ইচ্ছা চূর্ণ হয়ে যাওয়া দেখে চিনেছি)। ঘটনা এ রকমই ঘটলো। ওই যুগের ওলী শাহজাদা সুলতান মোহাম্মদ দারাশিকো হজরত গাউছুল আজম শায়েখ মহিউদ্দীন আবদুল কাদের জীলানী কুদ্দিসা সিররুহু কর্তৃক আরবী ভাষায় লিখিত 'বাহজাতুল আছরার' গ্রন্থখানি ফারসী ভাষায় অনুবাদ করার দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত করলেন। তাঁর আদেশ পালন করলাম। অনুদিত গ্রন্থের নাম রাখা হলো 'মাকামাতে গাউছুছ্ ছাকালাইন'। শাহজাদা প্রীত হলেন। এরপর তিনি 'রওজাতুন্ নাওয়াজের' নামক গ্রন্থখানি অনুবাদের জন্য আমার কাছে পাঠালেন। আমি সেটিরও অনুবাদ করলাম। ওটি ছিলো গাউছুল আজম কুদ্দিসা সিররুহুর জীবনী।

তারপর তিনি আমাকে তাফসীর 'আরাইসুল বয়ান' অনুবাদের জন্য পাঠালেন। তাফসীরকারের নাম শায়েখ রোজবাহান বাকলী র.। আমি এর চতুর্থ খণ্ড অনুবাদ করলাম। ইনশাল্লাহ্ 'হাজ্‌রাতুল কুদুস' গ্রন্থখানি লেখার কাজ শেষ করে অবশিষ্ট খণ্ডগুলোর অনুবাদ করবো। মহান আল্লাহ্‌র প্রতি জানাই কৃতজ্ঞতা। তাঁর করুণা অপার।

---

১. 'মাজমাউল আউলিয়া' গ্রন্থের পরিচিতি নং ৬৪৫। লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিসে সংরক্ষিত আছে। শাহজাহানের নাম এর সাথে সংযুক্ত হয়েছে। হজরত সাহাবা কেরামদের ঘটনাও এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গ্রন্থটি আলী আকবর হুসায়নী উরদুস্তানীর লিখিত গ্রন্থ বলা হয়েছে। ১০৪৩ হিজরী ২রা রবিউল আউয়াল পুস্তকটির লেখার কাজ সম্পন্ন হয়।

কথা কোথা থেকে কোথায় চলে গেলো। 'হাজ্‌রাতুল কুদুস' দ্বিতীয় খণ্ড সম্পন্ন করতে বিলম্বের হেতু বর্ণনা করা আমার উদ্দেশ্য ছিলো না। বরং উদ্দেশ্য ছিলো হজরত মোজাদ্দেদ র. এর পবিত্র স্বভাব-চরিত্র ও কারামত বিষয়ক আলোচনাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। আমার কলম আমাকে প্রধান লক্ষ্য বস্তু থেকে বিচ্যুৎ করতে পারেনি— কখনোই পারেনি। বরং আমার কলম আমাকে মূল লক্ষ্যের দিকেই পদচারণারত রেখেছে। উন্মুক্ত তরবারীর মতোই মূল লক্ষ্যের দিকেই ধাবিত হয়েছে। আসল উদ্দেশ্য তো এটাই বর্ণনা করা যে, হজরত মোজাদ্দেদ র. 'সিয়ারে আহমদ' পাঠ করে আনন্দিত হয়ে বলেছিলেন, বিহামদিল্লাহ্। আমার বৃত্তান্ত সম্পর্কে প্রথম পর্বের লেখা তোমার দ্বারা সুবিন্যস্ত হয়েছে। তাঁর একথার দ্বারা এ বিষয়ে ইঙ্গিত ছিলো যে, তাঁর সম্পর্কে দ্বিতীয় পর্বের লেখাও প্রকাশিত হবে। এ গ্রন্থ সম্পর্কে লেখনী আমার যাদুর কলমের মতো সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। আল্লাহু আকবর। এখন এই দীর্ঘ কথা থেকে বিরত থেকে হজরত মোজাদ্দেদ র. এর স্বভাব-চরিত্র ও কারামত সম্পর্কে আলোচনা করবো। তাঁর সকল বিষয় আমার ক্ষুদ্রজ্ঞানবহির্ভূত। এ ছাড়া গ্রন্থের পৃষ্ঠাসংখ্যা কতোই বা বাড়ানো যায়? যা হোক, বিজ্ঞজনেরা যেভাবে অতীত খ্যাতনামা বুজর্গদের বৃত্তান্ত ও মাকাম সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, তাঁদের রীতির অনুকরণে আমি হজরত মোজাদ্দেদ র. এর জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ও কারামতের অংশবিশেষ যথাসাধ্য লিপিবদ্ধ করে যাবো।

তিনি ছিলেন 'কুতুবে আওতাদ'। হেদায়েতের পথে তাঁর প্রদর্শিত নীতিমালা গ্রামে-গঞ্জে-শহরে-বন্দরে, সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি তাঁর আল্লাহ্‌ভীতির সফলতার দ্বারা সকল মানুষকে পরিবেষ্টিত করেছিলেন। তাঁর মারেফাতের সূক্ষ্ম বিষয়াবলী যেভাবে বিকশিত হয়, তার সম্যক বিবরণ কোনো ওলিআল্লাহ্‌র লেখনীতে সংকুলান হয় না। সকল আউলিয়া তাঁর প্রতি অনুরক্ত। সকল মুরিদান তাঁর বৈষম্যহীন আচরণের অন্তর্ভূত। এ সকল কিছু তাঁর উত্তম স্বভাবাবলীর বৈশিষ্ট্য। তিনি তাঁর ২৯৩ নং মকতুবে লিখেছেন—

কুদসিয়্যাহ্ (পবিত্র বাণী)

অলৌকিক বা স্বভাবের বিপরীত কার্যাবলী দুই প্রকার— প্রথম প্রকার ওই এলমে মারেফাত, যা আল্লাহ্‌পাকের যাত ও সিফাতসমূহের এবং কার্যাবলীর সাথে সম্বন্ধযুক্ত। এ বিষয়টি চিন্তা-জ্ঞানের অতীত এবং প্রচলিত স্বভাব ও অভ্যাসের বিপরীত। আল্লাহ্‌তায়ালার বিশিষ্ট বান্দাগণই এটা পেয়ে থাকেন।

দ্বিতীয় প্রকার সৃষ্টবস্তুসমূহের বিকাশ ও অদৃশ্য বস্তুর সংবাদ প্রাপ্তি— যা এ জড় জগতের সাথে সম্পর্কিত। প্রথম প্রকার সত্যবাদী দল ও আল্লাহ্‌র মারেফাত বা পরিচয়প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের জন্য নির্ধারিত। দ্বিতীয় প্রকারের মধ্যে সত্যাসত্য ও

ভালো-মন্দ সকলেই অন্তর্ভুক্ত। সাধনাকারী কাফের-ফাসেকদেরও এগুলো লাভ হয়ে থাকে। প্রথম প্রকার আল্লাহ্‌র কাছে সম্মানার্হ ও মূল্যবান। তাই তিনি তাঁর ওলীগণকেই এই নেয়ামত প্রদান করে থাকেন। তাঁর দুশমনদেরকে এতে শামিল করেন না। দ্বিতীয় প্রকারটি সাধারণ লোকের কাছে মূল্যবান। কাফের ফাসেকের দ্বারাও যদি উক্ত রূপ কাজ সংঘটিত হয়, তবে সর্বসাধারণ তাকেই পূজা করার জন্য প্রস্তুত থাকে। ভালো-মন্দ যে যাই বলুক, তা-ই আনুগত্যের সাথে পালন করার চেষ্টা করে। বরং সর্বসাধারণ প্রথম প্রকারটিকে যেনো কারামত বা অলৌকিক কার্যাবলী বলে গণ্যই করে না। দ্বিতীয় প্রকারটিই তাদের কাছে প্রকৃত কারামত। সৃষ্ট পদার্থের আকৃতির বিকাশ ও অদৃশ্য বস্তুর সংবাদ প্রদানকেই ওই বঞ্চিত ব্যক্তিরা একমাত্র কাশফ–কারামত বলে ধারণা করে। এরা আশ্চর্য ধরনের নির্বোধ। দৃশ্য ও অদৃশ্য সৃষ্ট পদার্থের অবস্থার অবগতির কী-ই বা মূল্য থাকতে পারে? আর এতে করে কী-ই বা বুজর্গী হাসিল হয়? এর তো কোনো মূল্যই নেই।

আবৃত করিছে পরী আপন বদন,
ক্রীড়ায় প্রমত্ত দেও, আনন্দে মগন।
এতদৃষ্টে জ্ঞানশূন্য হলো সর্বজন
কী সে আচরণ ইহা, কী যে বিচরণ। [১]

এ কারণেই শীর্ষস্থানীয়দের মধ্য হতে যেমন হজরত জুনায়েদ বাগদাদী কুদ্দিসা সিররুহুর মাত্র দশটি কারামত সংকলিত হয়েছে। মহান আল্লাহ্ কালীমে মূসা আলাইহিস্ সালামের হাল সম্পর্কে বলেছেন— 'ওয়ালাক্বদ আ-তাইনা মূসা তিসআ' আয়াতিন বাইয়্যেনাত' [২] (আমি মূসাকে নয়টি প্রকাশ্য নিদর্শন দিয়েছিলাম)। সুতরাং বুঝতে হবে কারামতের আধিক্য বুজর্গী বৃদ্ধি করে না। তেমনি কম কারামতের জন্য বুজর্গীর ন্যূনতা প্রমাণিত হয় না। আর কারামত তো বেলায়েত প্রকাশের মূল বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। আবশ্যকও নয়। অনেক সময় তো এমন হয় যে, কোনো বুজর্গ থেকে কারামত প্রকাশ হয় অথচ তিনি তা নিজে জানতেই পারেন না। হজরত মোজাদ্দেদ র. আরো উল্লেখ করেছেন—

কুদসিয়্যাহ্

ইলহামপ্রাপ্ত এলেম ও মারেফাত অনেক বড় নিদর্শন ও উচ্চস্তরের কারামত, যেমন পবিত্র কোরআনের মোজেযা সকল মোজেযা থেকে অধিক শক্তিমান ও সুপ্রতিষ্ঠিত।

১. এ বিষয়ে মকতুবাত শরীফ প্রথম খণ্ডের ২০৭ নং মকতুবে আলোচনা করা হয়েছে।
২. এখানে এ বর্ণনাগুলোও প্রথম খণ্ড ১০৭ নং মকতুব থেকে নেওয়া হয়েছে।

কুদসিয়্যাহ্

হেদায়েত প্রদর্শনের ক্ষেত্রে কারামত একটি অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়। বিশেষ করে মুরিদগণকে এক মাকাম থেকে অন্য মাকামে নিয়ে যাওয়া। এক হাল থেকে অন্য হালের দিকে পরিচালিত করা। সৌভাগ্যবান (নেককার) মুরিদদের জন্য অত্যাবশ্যক যে, সে সব সময় নিজের মোর্শেদের কারামত-স্বভাব পর্যবেক্ষণ করবে। আল্লাহ্‌র ওলীদের জন্য সাধারণ মানুষের কাছে তাঁর নিজের স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটানো আবশ্যিক নয়। কারণ বেলায়েতের বিষয়টি গোপন রাখাই শোভনীয়। হাদিসে কুদসীতে উল্লেখ করা হয়েছে— 'আউলিয়ায়ী তাহতা কাবায়ী লা ইয়ারিফুহুম গয়রী' (আমার আউলিয়াগণ আমার পোশাকের নিচে গুপ্ত অবস্থায় রয়েছে। আমি ব্যতীত তাদেরকে কেউ জানতে পারে না)। আরো বলা হয়েছে, আম্বিয়া কেরামের শেষ পরিণতি হচ্ছে ওহী অবতরণ বন্ধ হয়ে যাওয়া। আউলিয়া কেরামদের শেষ পরিণতি হচ্ছে— কারামত প্রকাশিত হওয়া। আর মুমিনদের শেষ পরিণতি হচ্ছে— তার ইবাদতের পরিমাণ কমে আসা।

কুদসিয়্যাহ্

কিয়ামত যতো নিকটবর্তী হবে, দ্বীন-ধর্মের মধ্যে দুর্বলতা ততোই বৃদ্ধি পাবে। তাই যে কারামত দ্বীনকে সুবিন্যস্ত করার জন্য প্রকাশিত হতো, তার বিকাশ কম হয়ে গিয়েছে।

আউলিয়াগণও এ বিষয়গুলো প্রকাশের জন্য আদিষ্ট নন। রসুলুল্লাহ স. এর মহাতিরোধানের পর হাজার বছর অতীত হয়েছে। এতো দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হওয়াই দ্বীনের নির্দেশাবলীতে বিবর্তন এবং এই প্রতিষ্ঠিত জাতির দুর্বলতার অন্যতম কারণ। এ কারণেই নির্জনবাসকৃত আউলিয়াগণের মতো সংসারী আউলিয়াগণকে সমাজে মিশে থাকতে হয়। কারামত প্রকাশ থেকে বিরত রাখা হয়। কারামত মাখলুকের হেদায়েতের সরল পথ প্রদর্শনের সাথে সম্পর্কিত। আর শেষ জামানা তো ভ্রান্তির প্রতি সতত ধাবমান। বেদাতে ভরপুর। রসুলুল্লাহ স. এরশাদ করেছেন— কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে ফিত্‌না এমনই হবে, যেমন ঘন আঁধার রাতের অংশ। সকালে যে ইমানদার হবে, সন্ধ্যায় সে হবে কাফের। আর সন্ধ্যার মুমিন সকালে হবে কাফের।

কুদসিয়্যাহ্

হজরত মোজাদ্দেদ র. এক মকতুবে উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ্‌র ওলীগণ পূর্ববর্তী হোক অথবা পরবর্তী সকলেই কারামতসম্পন্ন— ভিন্ন মতাবলম্বীরা জানুক আর না জানুক। অন্ধজন সূর্য সম্পর্কে কী-ই বা ধারণা করতে পারে?

মাশায়েখদের অধিকাংশ কারামত তাঁর বিশেষ মুরিদ ও বিশেষ ব্যক্তিগণ অবলোকন করেন। পরবর্তীকালে লোকমুখে বা লেখনীর মাধ্যমে সেগুলো বিখ্যাত হয়ে যায়।

কুদসিয়্যাহ্

তিনি বলতেন, মুরিদগণের অন্তরে শুরুতেই জিকির জারি হওয়া এবং জযবা (আল্লাহ্‌প্রেমের আকর্ষণ) লাভ করা আমাদের হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ কুদ্দিসা সিররুহুর বরকতময় ইলহামের ফয়েজের প্রতিফল। পূর্ববর্তী শ্রেষ্ঠ ওলীদের মধ্যেও এরূপ অবস্থা ছিলো, কিন্তু শুরুতেই ছিলো না।

একবার আমি এর রহস্য সম্পর্কে হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ র. কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি জবাব দিলেন, আল্লাহ্‌প্রেমিকগণের পূর্ববর্তী যুগের তুলনায় বর্তমান সময়ের মুরিদদের মধ্যে আল্লাহ্‌প্রাপ্তির আকুতি ও বাসনা কম। তাদের মধ্যে উৎসাহ-অনুপ্রেরণা জাগিয়ে তোলা প্রয়োজন। তাই মহানুভবতার নিদর্শন এটাই যে, তাদেরকে সুকঠিন সাধনা ও পরিশ্রম ব্যতীতই লক্ষ্যস্থলের দিকে এগিয়ে দিতে হবে, যেনো তাদের অনীহা, অনাগ্রহ দূর হয়ে যায়। মহান আল্লাহ্ আমাদের সকলের পক্ষ থেকে হজরত মোজাদ্দেদ র. কে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন। আমিন।

কুদসিয়্যাহ্

তিনি বলেছেন, হক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এ নগণ্যের উপরে মহান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ এরূপই ছিলো যে, এই পথের কোনো অলিগলি এমন ছিলো না, যেখানে আমাকে বিচরণ করানো হয়নি। যে মুরিদ তার স্বীয় যোগ্যতা অনুযায়ী যে পথে চলতে ইচ্ছা করতো, সে অনুযায়ী ওই পথকে তার সামনে উন্মুক্ত করে দেওয়া হতো। সেই পথেই তাকে পরিপূর্ণতা পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া হতো।

কুদসিয়্যাহ্

তিনি বলতেন, মহান আল্লাহ্ তাঁর অপার অনুগ্রহে এই ফকীরকে এমন শক্তি দান করেছেন যে, সে যদি কোনো শুষ্ক কাঠের প্রতি তাওয়াজ্জোহ্ দেয়, তাহলে তার দ্বারা একটি জগত নূরে নূরান্বিত হয়ে যাবে। কিন্তু শেষ জামানায় এই ধরনের কারামতের বহিঃপ্রকাশ মহান আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় নয়।

কারামত ১ ঃ মাওলানা মোহাম্মদ ইউসুফ [১] তাঁর সময়ের একজন শ্রেষ্ঠ আলেম ছিলেন। হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ কুদ্দিসা সিররুহু তাঁর তরিকত প্রশিক্ষণের দায়িত্ব হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. এর উপর ন্যস্ত করেছিলেন। তরিকতের কাজে অগ্রসরমান অবস্থায় তাঁর মৃত্যুর সময় সমাগত হলো। এসে গেলো জান কবজ করার মুহূর্ত। হজরত মোজাদ্দেদ র. তাঁর শিয়রে বসে তাঁর সুলুককে পূর্ণতা দানের জন্য তাওয়াজ্জোহ্ দিলেন। বিষয়টি তাঁকেও

১. মাওলানা মোহাম্মদ ইউসুফ সমরখন্দের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর ইনতেকালের তারিখ জানা যায়নি।

জানানো হলো। তিনি প্রতিটি মুহূর্তের অবস্থা বর্ণনা করে যাচ্ছিলেন। এভাবে একসময় তিনি পূর্ণতার স্তরে উপনীত হলেন। এমন সময় তাঁর প্রাণপাখি পৃথিবী থেকে চলে গেলো।

'কৃপাপ্রাপ্তদের জন্য কোনো কাজই কষ্টসাধ্য নয়'

হাজার বছরের তসবীহ ও নফল ইবাদত— এর থেকে উত্তম এক মুহূর্তের করুণা তোমার।

কারামত ২ ঃ মত্ততাপূর্ণ হালবিশিষ্ট এক দরবেশ বর্ণনা করেছেন, যখন হজরত মোজাদ্দেদ র. এর আধ্যাত্মিক অবস্থার খ্যাতি বিশ্বময় প্রসার লাভ করলো, তখন আমি তাঁর ফয়েজ লাভ করার জন্য সেরহিন্দে উপনীত হলাম। তখন রাতের এক চতুর্থাংশ অতীত হয়েছে। আমি শহরের একটি মসজিদে গেলাম। মসজিদের নিকটের এক প্রতিবেশী সমাদর করে আমাকে তার বাসায় নিয়ে গেলো। আমি তার কাছে হজরত মোজাদ্দেদ র. সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। সে বিরূপ মন্তব্য করতে লাগলো। আমি বিব্রতবোধ করলাম। হঠাৎ আত্মিক দৃষ্টিতে দেখলাম হজরত মোজাদ্দেদ র. একটি খোলা তরবারীসহ প্রবেশ করলেন। লোকটিকে দ্বিখণ্ডিত করে বের হয়ে গেলেন। আমি এ দৃশ্য অবলোকন করে বিস্মিত ও বিমূঢ় হয়ে গেলাম। বাতেনী মত্ততা অবস্থাতেই তাঁর পিছু নিলাম। কিন্তু তাঁকে আর দেখতে পেলাম না। প্রত্যুষে যখন আমি তাঁর দরবারে উপস্থিত হলাম, তখন আমি ছিলাম ভীত ও আতংকিত। তিনি মৃদু হাসলেন। আমাকে জড়িয়ে ধরে কানে কানে বললেন, রাতের ঘটনা কাউকে বোলো না। পরে এক সময় আমি যখন ওই মহল্লায় গেলাম, তখন শুনতে পেলাম লোকেরা বলাবলি করছে, এই লোকটিকে অজ্ঞাত কেউ হত্যা করে চলে গিয়েছে।

কারামত ৩ ঃ জযবাবিশিষ্ট এক দরবেশ বর্ণনা করেছেন, আমি আগ্রার অধিবাসী। হজরত মোজাদ্দেদ র. যখন আগ্রায় ছিলেন, তখন আমি তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়ে জিকির প্রশিক্ষণ দানের জন্য অনুরোধ করলাম। তিনি সম্মত হলেন। কিন্তু আমি হয়ে পড়লাম অতি আবেগাপ্লুত। ওই রাতেই আমি পাগলপ্রায় হয়ে উন্মুক্ত ময়দানের দিকে চলে গেলাম। কিছুকাল অবিয়াবা পাহাড়ে ঘুরে বেড়ালাম। আহার নিদ্রার কোনো খেয়াল ছিলো না। ওই সময়ের কথা আমি আর কী বলবো? তখন আমি কী যে করেছি, কী যে দেখেছি, আর কী-ই বা পেয়েছি!

কারামত ৪ ঃ জাগ্রত হৃদয়বিশিষ্ট এক সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী বর্ণনা করেছেন, আমি অসংখ্য মাশায়েখের দরবারে হাজির হয়ে জিকির ও তরিকত বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেছি। কিন্তু যখন আমি সেরহিন্দে পৌঁছলাম এবং এশা নামাজের সময় তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁর কাছে জিকির শিক্ষাগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করলাম,

তখন তিনি বললেন, তোমাকে তরিকত সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ্। আমি অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে বললাম, আমি অসংখ্য মাশায়েখের নিকট থেকে জিকির শিক্ষা করেছি। কিন্তু এর প্রতিফল আমি আপনার বরকতে পাবো বলে আশা রাখি। তিনি মোরাকাবায় বসে আমার প্রতি তাওয়াজ্জোহ্ দিলেন। আমার মধ্যে ইস্তেগ্রাকের (আল্লাহ্র মহব্বতের মধ্যে ডুবে যাওয়ার) হাল প্রাধান্য বিস্তার করলো। সকাল পর্যন্ত আমি বেহুঁশ হয়ে রইলাম। যখন চেতনা ফিরে পেলাম তখন আমি তাঁর কাছে দুনিয়া ত্যাগ ও তাজয়ীদ প্রাপ্তির জন্য অনুরোধ করলাম। তিনি বললেন, পারিবারিক ব্যয়নির্বাহের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য একটি মাধ্যম। এটাকে ত্যাগ কোরো না। তোমার অর্জনকে দৃঢ়তার সাথে ধরে রাখো। অতঃপর তিনি এই আয়াত পড়লেন 'রিজালুল্ লা তুলহিহিম তিজারাতুন ওয়ালা বায়উন আন্ জিকরিল্লাহ্' (আল্লাহ্র নেকবান্দাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও বেচা-কেনা আল্লাহ্র জিকির থেকে বিরত রাখতে পারে না)।

কারামত ৫ ঃ একবার সম্ভ্রান্ত ও পুণ্যবান এক সাইয়্যেদ সাহেব হজরত মোজাদ্দেদ র. এর দরবারে এলেন। তাঁর হাল এমন হলো যে, আসমানের সকল স্তর তাঁর জন্য উন্মুক্ত হয়ে গেলো। বিভিন্ন ধরনের আশ্চর্যজনক হাল হতে লাগলো তাঁর। তিনি বর্ণনা করেছেন, একদিন আমার খেয়াল হলো, আজ তো হজরত মোজাদ্দেদ র. থেকে কোনো কারামত প্রকাশ পেলো না। একথা মনে হতেই আমার হাল সংকুচিত হয়ে গেলো। আমি বুঝতে পারলাম, এর কারণ অপধারণা। আমি গলায় পাগড়ী বেঁধে ক্ষমাপ্রার্থনা করলাম। তাঁর পবিত্র পদযুগলে পতিত হয়ে কাঁদতে শুরু করলাম। কিন্তু অপধারণার কথা ব্যক্ত করলাম না। হজরত র. তাঁর পবিত্র মস্তক উপরে উঠিয়ে বললেন, সাইয়্যেদ সাহেব কারামত খুঁজছেন। আর খারাপ ধারণা হয়েছে ওই লোকটির সঙ্গ লাভের জন্য। তিনি লোকটির নামও বলে দিলেন। আরো বললেন, তার সাথে ওঠাবসার কারণে আপনার মনে এরকম অপধারণার সৃষ্টি হয়েছে।

কারামত ৬ ঃ একবার হজরত মোজাদ্দেদ র. অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তিনি মুনাক্কা খাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। খাদেম সাহেব মোনাক্কা নিয়ে এলেন। কিন্তু এই ফল খাওয়া ভালো হবে, না মন্দ হবে তা জানার জন্য তিনি মোরাকাবা করলেন। কিছুক্ষণ পর মাথা উঠিয়ে বললেন, এক আশ্চর্য বিষয় প্রকাশিত হলো। মুনাক্কা দানা আল্লাহ্র দরবারে দোয়া করছে, হে আল্লাহ্! তোমার বন্ধু আমাকে ভক্ষণের জন্য এনেছে। তুমি আমার মধ্যে উপকার ও সুস্থতার বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে দাও। এখন আমার এই খাদ্যদানা থেকে যদি কেউ খায়, তাহলে তার সকল অসুস্থতা দূর হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ্ খাদ্যদানার দোয়া কবুল করলেন। আমি এ বিষয়টি অনুভবও করেছি এবং দেখেছি। এর মধ্যে সন্দেহের কোনো অবকাশই নেই। তিনি কয়েকটি খাদ্যদানা গ্রহণ করলেন। হঠাৎ তাঁর শরীরের কষ্ট দূর হয়ে

গেলো। এরপর থেকে কোনো রোগী ওই খাদ্য দানা থেকে একটি দানা খেলে তার রোগ ভালো হয়ে যেতো। তিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেন, যদি এই খাদ্যদানা আরো বেশি হতো তাহলে আরো অধিকসংখ্যক লোক রোগ থেকে মুক্তিলাভ করতে পারতো।

কারামত ৭ ঃ এক সম্ভ্রান্ত বংশীয় সাইয়্যেদ সাহেব, যিনি হজরত মোজাদ্দেদ র. এর প্রবীণ মুরিদদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তিনি বর্ণনা করেছেন— হজরত মোজাদ্দেদ র. এর সহোদর ভ্রাতা ছরওয়ানজ (মালুহ) নামক স্থানে ছিলেন। তাঁকে ডেকে আনার জন্য একটি চিঠিসহ তাঁর কাছে আমাকে প্রেরণ করলেন। বিদায়ের সময় দোয়া করে বললেন, পথিমধ্যে বেশি বেশি সূরা কুরাইশ পাঠ কোরো, তাহলে বিপদ থেকে রক্ষা পাবে। কোনো কিছুর অভাবও বোধ করবে না। কোনো সমস্যা দেখা দিলে আমাকে স্মরণ কোরো। আমি যাত্রা করলাম। ঘটনাক্রমে এক সফরকারীদল আমার সাথী হলো। ছরওয়ানজ নামক স্থানের দু' তিন মনজিল পূর্বে এক ভয়ংকর গভীর জঙ্গল পড়লো। ওই স্থানের ঘাস খুব লম্বা ছিলো। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য ঘাসের জঙ্গলে প্রবেশ করলাম। সঙ্গীরা দাঁড়িয়ে রইলো। প্রয়োজন শেষে পবিত্রতা অর্জনপূর্বক ওজু করে দু'রাকাত তাহিয়্যাতুল ওজুর নামাজ আদায় করলাম। এমন সময় ঘাসের জঙ্গল ভেদ করে সামনে এসে দাঁড়ালো একটি ডোরাকাটা বাঘ। হজরত মোজাদ্দেদ র. এর কথা আমার স্মরণপটে উদিত হলো। মনে পড়লো তিনি বলেছিলেন, কোনো বিপদ হলে আমার কথা মনে কোরো। হঠাৎ দেখলাম তিনি হাজির। তিনি বাঘটিকে বললেন, চলে যাও এখান থেকে। সঙ্গে সঙ্গে বাঘটি পালিয়ে গেলো। পরক্ষণেই তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমার সাথীরাও ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করলেন। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, বুজর্গ ব্যক্তিটি কে? আমি হজরতের নাম বললাম।

কারামত ৮ ঃ এক শ্রদ্ধেয় সাইয়্যেদ সাহেব আলাইহির রহমত বর্ণনা করেছেন, হজরত মোজাদ্দেদ র. বলেছেন, মূর্তি এবং মূর্তিপূজারীদেরকে অপদস্থ করা উচিত। এরকম আমল আল্লাহ্র পথে জেহাদকারী গাজীদের মতো ।

আমি একবার দু'তিন জন দরবেশের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের পার্শ্ববর্তী এক উন্মুক্ত স্থানে গিয়ে সেখানে একটি পূজার ঘর দেখলাম। আশে পাশে লোকজন ছিলো না। আমি হজরতের উপদেশ অনুযায়ী পূজাঘর ভেঙে ফেলার ইচ্ছা করলাম। প্রথমে ভেঙে ফেললাম মূর্তিগুলো। পূজা ঘরটি ভাঙতে যাবো এমন সময় দেখলাম, প্রায় এক হাজার মানুষ লাঠি, পাথর ও তীর ধনুক নিয়ে আক্রমণের জন্য এগিয়ে আসছে। আমার সাথীরা ভড়কে গেলো। পালিয়ে যাবার কোনো উপায়ও দেখতে পেলো না। এমন সময় হজরত মোজাদ্দেদ র. এর কথা স্মরণ হলো। আমি হঠাৎ শুনতে পেলাম, হজরত মোজাদ্দেদ র. বলছেন, তোমরা শান্ত থাকো। তোমাদেরকে সাহায্য করার জন্য মুসলমানদের একটি সেনাদল আসছে।

সাথীদের এ খবর দিলাম। মূর্তিপূজকেরা এক তীর সমপরিমাণ দূরত্বের মধ্যে এসে গেলো। হঠাৎ সেখানে আবির্ভূত হলো চল্লিশ জন অশ্বারোহী সৈন্য। তারা মূর্তিপূজকদেরকে আক্রমণ করলো। আমরাও তাদের সহযোগী হলাম। শত্রুরা পালিয়ে গেলো। পরক্ষণে উধাও হয়ে গেলো অশ্বারোহণকারীরাও ।

কারামত ৯ ঃ একবার হজরত মোজাদ্দেদ র. মরুভূমি অঞ্চলে সফর করলেন। পথিমধ্যে আবহাওয়া ছিলো অতি উত্তপ্ত। হজরতের সাথীগণ প্রচণ্ড গরমে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। তৃষ্ণার্ত হলেন। হজরত মোজাদ্দেদ র. মাওলানা ইউসুফ সমরখন্দীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, সূর্যের প্রখর তাপ ও অধিক ধূলাবালির কারণে সাথীদের কষ্ট হচ্ছে। মাওলানা বললেন, হজরত এ বিষয়ে অধিক জ্ঞাত। তিনি মৃদু হেসে আকাশের দিকে তাকালেন। অনুচ্চস্বরে কী যেনো পাঠ করলেন। কিছুদূর অগ্রসর হতেই একখণ্ড মেঘ দেখা গেলো। শুরু হলো বৃষ্টি।

কারামত ১০ ঃ এক সাইয়্যেদ সাহেব বর্ণনা করেন, হজরত আলী রা. এর বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন, তাদের প্রতি বিশেষ করে হজরত আমীর মোয়াবিয়ার রা. এর প্রতি আমার সুধারণা ছিলো না। এক রাত্রে আমি হজরত মোজাদ্দেদ র. এর মকতুবাত অধ্যয়নরত অবস্থায় দেখলাম একস্থানে তিনি লিখেছেন, ইমাম মালেক র. বলেছেন, হজরত আমীর মোয়াবিয়া রা. সম্পর্কে খারাপ ধারণা করা হজরত আবু বকর রা. এবং হজরত ওমর ফারুক রা. এর প্রতি খারাপ ধারণা করার মতো। আমি বিব্রতবোধ করলাম। কিছুক্ষণ পর মকতুবাত শরীফ মাটিতে রেখে নিদ্রাভিভূত হলাম। স্বপ্নে দেখলাম, হজরত মোজাদ্দেদ র. অত্যন্ত ক্রুদ্ধ অবস্থায় দু'হাতে আমার কান ধরে বলছেন, হে আমার মূর্খ সন্তান! তুমি আমার লেখায় আপত্তি করছো। আমার মকতুবাতকে মাটিতে ফেলে রেখেছো। যদি আমার কথায় আস্থা না থাকে তা হলে চলো, তোমাকে হজরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর কাছে নিয়ে যাই। তিনি আমাকে এক বাগানে নিয়ে গেলেন। আমি দেখলাম, এক জ্যোতির্ময় বুজর্গ বাগানের মধ্যে একটি ভবনে অবস্থান করছেন। হজরত মোজাদ্দেদ র. ওই বুজর্গের প্রতি প্রথমে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। তিনি খুবই খুশি হলেন। তাঁকে আমার সকল কথা বললেন। শেষে আমাকে বললেন, ইনিই হজরত আলী রা.। শোনো, তিনি কী বলেন। আমি সালাম নিবেদন করলাম। হজরত আলী রা. বললেন, সাবধান! হাজার বার সাবধান! রসুলুল্লাহ স. এর সাহাবীদের সম্পর্কে অন্তরে খারাপ ধারণা রেখো না। তাঁদের দোষ বর্ণনা কোরো না। কেনোনা আমি এবং আমার সাথীরাই (সাহাবীগণ) অধিক জ্ঞাত যে, কোন বিষয়কে হক মনে করে আমরা পরস্পরের প্রতি আপত্তি উত্থাপন করেছিলাম। তারপর হজরত মোজাদ্দেদ র. এর প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, তার কথা কখনো অস্বীকার বা অবিশ্বাস কোরো না। সাইয়্যেদ সাহেব বলেন, হজরত আলী রা. এর উপদেশ শোনার পরও আমার অন্তর থেকে ভুল

ধারণা দূর হলো না। হজরত আলী রা. হজরত মোজাদ্দেদ র. কে বললেন, এ লোক এখনও ভুল ধারণার বশীভূত। ওকে পাথর দিয়ে আঘাত করো। হজরত মোজাদ্দেদ র. সজোরে পাথর দিয়ে আমার গণ্ডদেশে আঘাত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমার অন্তর থেকে সকল খারাপ ধারণা দূর হয়ে গেলো। হজরত মোজাদ্দেদ র. এর কথার প্রতি আমার পূর্ণ আস্থা ও ভালোবাসা এসে গেলো।

কারামত ১১ ঃ হাজী শায়েখ আবদুল হক দেহলভী র. (আল্লাহ্‌পাক তাঁকে ক্ষমা [১] করুন) যিনি ছিলেন ভারতবর্ষের একজন খ্যাতনামা আলেম, অনেক গ্রন্থের রচয়িতা, তিনি বর্ণনা করেছেন— একবার আমি আলেমদের মজলিসে বসে ছিলাম। এমন সময় হজরত মোজাদ্দেদ র. প্রসঙ্গে আলোচনা শুরু হলো। এক আলেম তাঁর নিন্দা করলেন। আমি বললাম, আমি নিজে তাঁর সান্নিধ্যলাভ করেছি। অন্য মাশায়েখদের দরবারেও বসেছি। কিন্তু আত্মশুদ্ধি ও সুন্নতের অনুসরণ তাঁর দরবারে যেমন দেখেছি অন্য কোনো দরবারে তেমন দেখিনি। শুনিওনি। ওই আলেম তখন অসংলগ্ন মন্তব্য করলেন। আমি বললাম, আসুন আমরা দুজন নতুন করে ওজু করি। তারপর পবিত্র কোরআন মাজীদ খুলি। যে আয়াত বের হবে সেটার ভিত্তিতে আমরা ফলাফলের সিদ্ধান্ত নিতে পারবো। তিনি সম্মত হলেন। আমরা দু'জনে ওজু করে দুই রাকাত নামাজ আদায় করলাম। তারপর তিনি অত্যন্ত আদবের সাথে কোরআন মাজীদ হাতে নিয়ে খুললেন। উদ্ভাসিত হলো এই আয়াতখানি— 'রিজালুল লা তুলহিহিম তিজারাতুন ওয়ালা বায়উন আন যিকরিল্লাহ' (আল্লাহ্‌র নেক বান্দাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্‌র জিকির থেকে বিরত রাখতে পারে না)। ওই আলেম অত্যন্ত বিচলিত হলেন। অপউক্তির জন্য অনুতপ্ত হলেন। আমি মহান আল্লাহ্‌র প্রতি শুকরিয়া আদায় করলাম।

কারামত ১২ ঃ এক আমীর হজরত মোজাদ্দেদ র. এর মুরিদ ছিলেন। তিনি শুনলেন, হজরত মোজাদ্দেদ বাদশাহ্‌র এক মন্ত্রীর বাড়িতে এসেছেন। বললেন, দুনিয়াদার লোকের বাড়িতে আগমন করা তাঁর জন্য শোভনীয় নয়। পাশেই বসেছিলেন এক পুণ্যবান ব্যক্তি। তিনি বললেন, মুসলমানদের প্রয়োজনপূরণের উদ্দেশ্যে অথবা দ্বীনপ্রচারের নিমিত্তে এরকম করা যায়। আল্লাহ্‌র ওলীদের প্রতি বিরূপ মনোভাবের পরিণাম ভালো হয় না। আমীর রাতেই স্বপ্নে দেখলেন, একদল অপরিচিত লোক এসে তাঁকে অপরাধীদের মতো টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে । একজন ছুরি বের করে তার জিহ্বা কেটে দিতে চাইলো। বললো, কেনো তুমি তাঁর প্রতি বিরূপ মন্তব্য করেছো? তিনি ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন। তারা তাকে ছেড়ে

১. ফারসী পাণ্ডুলিপিতে মাওলানা আবদুল হক দেহলভী র. কে গুফরানপানাহ বলা হয়েছে। তাঁর ইন্তেকাল হয় ১০ই রবিউল আখের ১০৩৫ হিজরীতে। 'হাজ্‌রাতুল কুদুস' রচিত হয়েছে তার পরে। 'রাকেমুল হুরুফ' গ্রন্থের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

চলে গেলো। এর পর থেকে ওই আমীরের বিরূপ ধারণা দূর হয়ে গেলো। হজরত মোজাদ্দেদ র. এর প্রতি তার বিশ্বাস ও ভালোবাসা অনেক গুণ বেড়ে গেলো।

কারামত ১৩ ঃ হজরতের প্রাথমিক অবস্থার একটি ঘটনা— তখন তিনি খ্যাতিমান হননি। নিকটবর্তী কোনো এক স্থানে চুরি সংঘটিত হলো। পুলিশ কর্মকর্তা আশেপাশের লোকদেরকে গ্রেফতার করতে বললেন। এক দুষ্ট লোক হজরতের কাছে এসে বললো, আপনাকে পুলিশ কর্মকর্তা ডেকেছেন। হজরত বাইরে কোথাও যাচিছলেন। সহচরগণও সঙ্গে ছিলেন না। তিনি একাই পায়ে হেঁটে পুলিশ কর্মকর্তার কাছে গেলেন। তাঁকে দেখে পুলিশের কর্মকর্তা কাঁপতে শুরু করলো। কিছুদিন পর শহরবাসীদের সাথে পুলিশ কর্মকর্তার যুদ্ধ বেধে গেলো। হঠাৎ অদৃশ্য থেকে এক অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এসে বারুদে আগুন ধরিয়ে দিলো। ওই আগুনে পুড়ে ভস্ম হয়ে গেলো পুলিশ কর্মকর্তা, তার ভাই ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা।

কারামত ১৪ ঃ বাদশাহ্ এক আমীরজাদার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তাকে লাহোরে ডেকে পাঠালেন। হুকুম দিলেন সে এলেই তাকে হাতীর পায়ের নিচে পিষ্ট করা হবে। কেনোনা সে জঘন্য অপরাধ করেছে। আমীরজাদা হজরতের দরবারে হাজির হলেন। খুবই অনুনয়বিনয়ের সাথে তার বিপদের কথা জানালেন। হজরত মোজাদ্দেদ র. কিছুক্ষণ মোরাকাবায় অতিবাহিত করলেন। তারপর বললেন, তুমি আমাদের প্রতি অধিক মহব্বত রেখো। ইনশাআল্লাহ্ বাদশাহ্ তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। বরং তোমাকে শাহী পুরস্কারে ভূষিত করা হবে। আমীরজাদা অধিক আতংকিত থাকার কারণে বললেন, হজরত! আপনি একটি চিঠি লিখে দিন, যাতে আমার চিন্তাক্লিষ্ট মনে স্বস্তি ফিরে আসে। তিনি তাঁকে সান্ত্বনা দানের উদ্দেশ্যে লিখলেন, এই ব্যক্তি বাদশাহ্‌র ক্রোধের ভয়ে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এ ফকিরের কাছে এসেছে। এই ফকির তাকে নিজ দায়িত্বে নিয়ে নিয়েছে। তাকে মুসিবত থেকে মুক্ত করে দেওয়া হোক। কয়েকদিন পর এক লোকের মাধ্যমে খবর এলো, বাদশাহ্ ওই আমীরজাদার প্রতি নির্দয় আচরণ করেছেন। হজরত মোজাদ্দেদ র. বললেন, সংবাদদাতার সংবাদ ঠিক নয়। আমীরজাদার অবস্থা আমার কাছে দিবালোকের মতো স্পষ্ট। বাদশাহ্ আমীরজাদাকে অনুকম্পা করেছেন। উপঢৌকন দিয়েছেন। ওই ব্যক্তির খবর ঠিক নয়। দুই তিন দিন পর খবর এলো, বাদশাহ্ আমীরজাদাকে দেখে মৃদু হাসলেন। উপদেশস্বরূপ কিছু কথা বললেন। তাঁকে বিশেষ সম্মানের পোশাক পরিধান করিয়ে নির্ধারিত দায়িত্ব দিয়ে বিদায় দিলেন।

কারামত ১৫ ঃ মুলতান থেকে এক দরবেশ হজরতের দরবারে হাজির হয়ে বললেন, আমার স্ত্রী আপনার মুরিদ। সে রোগে জর্জরিত। চিকিৎসকগণ ব্যর্থ

হয়েছেন। এখন সে আপনার তাওয়াজ্জোহ্প্রার্থী। হজরত বললেন, আমি তার জন্য দোয়া করবো। দোয়াও করলেন। বললেন, আমি তাকে আমার দায়িত্বে নিয়ে নিয়েছি। আরো বললেন, এতে কষ্ট নেয়ার কোনো কারণ নেই। দরবেশ নিজ দেশে চলে গেলেন। সেখান থেকে চিঠি লিখলেন, আমার স্ত্রী ওই দিনই সুস্থ হয়ে গিয়েছেন, যেদিন আপনি তাকে আপনার দায়িত্বে নিয়ে নিয়েছিলেন। হজরত চিঠিখানি পাঠ করে বললেন, আলহামদুলিল্লাহি আলা যালিক।

কারামত ১৬ ঃ এক ধনাঢ্য ব্যক্তি যিনি ছিলেন তাঁর বংশেরই এক বুজর্গের সন্তান। তাঁর মায়ের দিক থেকে ছিলেন শাহী বংশের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তিনি একবার শুলবেদনা রোগে আক্রান্ত হলেন। বিজ্ঞ চিকিৎসকের চিকিৎসায় কোনো সুফল দেখা গেলো না। তিনি জীবনের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেলেন। হজরত মোজাদ্দেদ র. তাঁর বিষয়ে অবগত হলেন তাঁর এক মুখলিস মুরিদের মাধ্যমে। ফজরের নামাজের সময় তিনি তাঁর প্রতি তাওয়াজ্জোহ্ দিলেন। নামাজের পর ওই মুখলিস মুরিদকে বললেন, যাও। তোমার বন্ধুকে সুসংবাদ জানিয়ে দাও। নির্দেশ অনুযায়ী মুরিদ গিয়ে দেখলেন, লোকটি তখনও শয্যাশায়ী। বললেন, তুমি তো সুস্থ। শুয়ে আছো কেনো? সে বললো, ব্যাপার কী? তিনি বললেন, হজরত মোজাদ্দেদ র. তোমার সুস্থতার সুসংবাদ দিয়েছেন। লোকটি উঠে দাঁড়ালো। তার মধ্যে রোগের কোনো চিহ্ন দেখা গেলো না।

কারামত ১৭ ঃ মাওলানা মোহাম্মদ আমিন পূর্বে খাজা দিওয়ানা ছিওয়াতী র. এর মুরিদ ছিলেন। পরে হজরত মোজাদ্দেদ র. এর মুরিদ হন। তিনি একবার কঠিন রোগে আক্রান্ত হলেন। দোয়া এবং ঔষধ কোনোকিছুতেই কাজ হলো না। তিনি এক ব্যক্তিকে দোয়াপ্রার্থনার উদ্দেশ্যে হজরত মোজাদ্দেদ র. এর কাছে পাঠালেন। হজরতের ব্যবহৃত বস্ত্রের টুকরা বরকতস্বরূপ চাইলেন। হজরত মোজাদ্দেদ র. এর দয়া হলো। তিনি প্রত্যুত্তরে লিখে পাঠালেন, চিন্তিত হবেন না। ইনশাআল্লাহ্ সুস্থ হয়ে যাবেন। কাপড়ের টুকরা চেয়েছেন তা-ও পাঠানো হলো।

ঘটনা তো ঘটনাই যদি তাওয়াজ্জোহ না হতো
আহলে দ্বীনের জন্য রয়েছে এর মধ্যে উপদেশ কতো।

তিনি হজরত র. প্রদত্ত বস্ত্রখণ্ড পরিধান করলেন। সঙ্গে সঙ্গে রোগমুক্ত হলেন। তার পরে তিনি হজরতের দরবারে হাজির হয়ে অবশিষ্ট জীবন সেখানেই কাটিয়ে দেন। তাঁর ফয়েজ বরকত লাভে ধন্য হন এবং হয়ে যান তাঁর বিশেষ সাথী। আমার ধারণা, তিনি তরিকতের তা'লীম ও তরবিয়তের জন্য অনুমতিপ্রাপ্তও হয়েছিলেন।

কারামত ১৮ ঃ হজরত মোজাদ্দেদ র. এর এক বিত্তবান মুরিদ বর্ণনা করেন, আমি একবার গুরুত্বপূর্ণ কাজে লাহোর থেকে আকবারাবাদ (আগ্রা) রওয়ানা হলাম। পথিমধ্যে সেরহিন্দে হজরতের দরবারে হাজির হলাম। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লাম।

ভাবলাম, সুস্থ হওয়া পর্যন্ত এখানেই থেকে যাই। তিনি বললেন, যাও সুস্থ হয়ে যাবে। তোমার কাজ অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সাথে সাথে আমি সুস্থ হয়ে গেলাম। যাত্রা করলাম আগ্রার উদ্দেশ্যে। তিন দিন পর্যন্ত ভালোই ছিলাম। চতুর্থ দিন পুনরায় অসুস্থ হয়ে গেলাম। জ্বর এসে গেলো। মনে পড়লো হজরত মোজাদ্দেদ র. এর কথা— যাও, সুস্থ হয়ে যাবে। একটু পরেই হজরত মোজাদ্দেদ র. রূহানী ভাবে উপস্থিত হলেন। বললেন, যাও, দৃঢ় মহব্বত রেখো। তোমার অসুখ আমি উঠিয়ে নিলাম। আমি সুস্থতা বোধ করলাম। পুনরায় যাত্রা শুরু করলাম।

কারামত ১৯ ঃ মরহুম নবাব আবদুর রহীম [১] খানে খানান দাক্ষিণাত্যের গভর্নর ছিলেন। তিনি এই মর্মে আদিষ্ট ছিলেন যে, দাক্ষিণাত্যের আশপাশের এলাকা দখল করে তার উপর আধিপত্য বিস্তার করতে হবে। নির্দেশপালন করতে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলো। বাদশাহ্র কাছের লোকেরা তাঁর কান ভারি করতে লাগলো। বলাবলি করলো, খানে খানান শত্রুদের সাথে গোপনে আপোষ করেছেন। লোক দেখানোর জন্য প্রকাশ্য যুদ্ধ করে যাচ্ছেন। বাদশাহ্ ক্ষিপ্ত হলেন। তাঁকে বরখাস্ত করলেন। এটাও ভাবতে লাগলেন যে, তাঁকে হত্যা করতে হবে। খানে খানান হজরত মোজাদ্দেদ র. এর খলিফা মীর মোহাম্মদ নোমানের সাথে বোরহানপুরে গিয়ে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে অনুনয় বিনয় করে হজরতের কাছে খানে খানানের বিষয়ে লিখলেন। হজরত মোজাদ্দেদ র. প্রত্যুত্তরে লিখলেন, তোমার চিঠি পড়ার সময় খানে খানানকে বড়ই উচ্চ মর্যাদার অধিকারী দেখলাম। এ বিষয়ে বিশেষভাবে খেয়াল রেখো। মীর মোহাম্মদ নোমান র. হজরত মোজাদ্দেদ র. এর মকতুব সরাসরি খানে খানানের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। বলে দিলেন, বুজর্গগণের দ্বীনের উচ্চমর্তবা ও তাঁদের তাওয়াজ্জোহের সামনে এ সকল ঘটনা নিতান্তই তুচ্ছ। হজরত মোজাদ্দেদ র. এর চিঠি প্রেরণের দশ বারো দিন যেতে না যেতেই বাদশাহ্র ক্রোধ প্রশমিত হলো। পুনরায় তাঁকে দাক্ষিণাত্যের গভর্নর নিযুক্ত করা হলো।

কারামত ২০ ঃ এক দরেবেশ, যিনি মোজাদ্দেদ র. এর দরবারে কখনো আসেননি— তিনি এক চিঠিতে লিখলেন, সাহাবা কেরাম রসুলুল্লাহ স. এর সোহবতের কারণে বড় বড় আউলিয়া কেরাম থেকেও অধিক সম্মানের অধিকারী— এর কারণ কী? সম্ভবতঃ প্রথম সোহবতেই তাঁদেরকে সব কিছু দিয়ে

১. আবদুর রহীম খানে খানান এর জন্ম ৯৬৪ হিজরীতে লাহোরে। ১০৩৬ হিজরীতে দিল্লীতে ইন্তেকাল করেন। ১০১৭ হিজরীতে তিনি দাক্ষিণাত্যের গভর্নরের পদ থেকে পদচ্যুত হন। তারপর মীর মোহাম্মদ নোমানের মধ্যস্থতায় ১০৫৮ হিজরীতে হজরত মোজাদ্দেদ র. এর দোয়া লাভ করেন। হজরত মোজাদ্দেদ র. মীর নোমানের নামে অনেক মকতুব লিখেছিলেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে প্রথম খণ্ড ২৩, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ১৯১, ১৯৮, ১২৪, ২৩৬, ২৬৮। দ্বিতীয় খণ্ড ৮, ৬২, ৬৬। এগুলো লেখা হয়েছে ১০১৭ হিজরীর পরে ।

দেওয়া হয়, যা সকল আউলিয়াদের মাকাম থেকে উৎকৃষ্ট। হজরত মোজাদ্দেদ র. উত্তরে লিখলেন, এই জটিলতার অবসান সোহবতের উপর নির্ভরশীল। দরবেশ কালক্ষেপণ না করে হজরতের খেদমতে উপস্থিত হলেন। প্রথম সোহবতেই তাঁর উপর আশ্চর্যজনক হাল জারি হলো। তিনি তাঁকে নির্জনে ডেকে নিয়ে বললেন, আজই তোমার অবস্থা পরিবর্তন করে দিয়েছি। তোমার হাল বদলে গিয়েছে। তুমি কি বুঝতে পেরেছো? ওই দরবেশ তাঁর পায়ের উপরে পড়লেন। যা উপলব্ধি করেছিলেন তা বর্ণনা করলেন এবং সোহবতের ফযীলত সম্পর্কে ধারণা লাভ করলেন।

কারামত ২১ ঃ এক দরবেশ হজরতের দরবারে উপস্থিত হলেন। তাঁর অন্তরে এমনভাবে জিকির হতো যে, পাশের লোকেরা তা শুনতে পেতো। যখন তিনি নিদ্রা যেতেন, তখন দূর থেকেও জিকির শোনা যেতো। ওই বুজর্গ কয়েকজন মাশায়েখ থেকেও খেলাফত লাভ করেছিলেন। হজরত মোজাদ্দেদ র. থেকেও তিনি খেলাফত পেয়েছিলেন। তিনি বললেন, এই দরবেশ খুবই যোগ্যতাসম্পন্ন। কিন্তু জিকিরের প্রাবল্য ও মাশায়েখগণ কর্তৃক প্রদত্ত খেলাফত তাকে প্রতারণা ও স্বেচ্ছাচারিতার মধ্যে লিপ্ত করে দিয়েছে। তাই তার উন্নতি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এর চিকিৎসা হচ্ছে এই যে— তার হাল ছিনিয়ে নিতে হবে। দু'দিনের মধ্যে তাকে হালশূন্য করা হলো। তিনি পেরেশান হয়ে গেলেন। তাঁর চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে লাগলো। হজরত মোজাদ্দেদ র. কয়েকদিন পর্যন্ত তাঁকে তাওয়াজ্জোহ বিহীন অবস্থায় রাখলেন। তারপর একদিন তাঁকে নির্জনে ডেকে তাঁর অবস্থা ও মাকামের প্রতি খেয়াল করলেন। তখন তিনি তাঁর পূর্বের জিকিরের অবস্থা এবং বর্তমানের উন্নতি সম্পর্কে অবহিত হলেন।

কারামত ২২ ঃ হজরত মোজাদ্দেদ র. একবার বর্ষার মওসুমে আজমীর শরীফে আগমন করলেন। দিনরাত বৃষ্টি হতে লাগলো। তিনি মসজিদে তারাবী নামাজে কোরআন পাক তেলাওয়াত করতেন। প্রতিকূল আবহাওয়ায় তাঁর এবং তাঁর সাথীদের খুবই কষ্ট হতে লাগলো। এক রাতে তারাবী নামাজ শেষে বাইরে বের হওয়ার সময় আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, তিন খতম কোরআন তেলাওয়াত করা আমার চিরাচরিত নিয়ম। রাতে যদি বৃষ্টি না হয় তাহলে মসজিদের চত্বরে নামাজ আদায় করা যাবে। আল্লাহ্‌র কী শান! এরূপই হলো। সাতাশে রমজান দিনে বৃষ্টি হলো। রাতে বৃষ্টি হলো না। তারপর পুনরায় খুব বৃষ্টি হলো। যেনো একটি বিশাল মশকভর্তি পানি একবার মুখ বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। আবার খুলে দেওয়া হচ্ছে।

কারামত ২৩ ঃ কথিত আছে— আজমীর শরীফের মসজিদের উত্তর পার্শ্বের দেয়াল দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। এর স্তম্ভও বাঁকা হয়ে গিয়েছিলো। মনে হতে লাগলো, আজ কালের মধ্যে দেয়ালটি পড়ে যাবে। দেয়ালের পাশে চলতে থাকলে

ভীতসন্ত্রস্ত হতে হতো। তাঁর সাথীরাও দেয়াল ভেঙে পড়ার আশংকা করলেন। একদিন তিনি অত্যন্ত প্রফুল্ল মনে বললেন, আমি ও আমার ফকিরের দল যতক্ষণ এখানে অবস্থান করবে, ততক্ষণ দেয়াল ভেঙে পড়বে না ইনশাআল্লাহ্। তাই হলো। দেয়ালটি ভেঙে পড়লো তাঁর আজমীর থেকে প্রস্থানের পর।

কারামত ২৪ ঃ খাজা জামালুদ্দীন হুসাইন ছিলেন খাজা হুছামুদ্দীন [১] র. এর পুত্র। তিনি পিতার নির্দেশ অনুযায়ী দিল্লী থেকে সেরহিন্দে এলেন। হজরত মোজাদ্দেদ র. এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললেন, অনুগ্রহ করে আমার প্রতি তাওয়াজ্জোহ প্রদান করুন। জিকিরের শিক্ষা দিন। হজরত বললেন, আমি দেখছি তোমার অন্তরে এক নারীর প্রতি এমন আসক্তি রয়েছে, যেমন মাটির মধ্যে প্রবিষ্ট করে পাথর। যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রণয়াসক্তি দূর হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি উপকৃত হতে পারবে না। আমি বললাম, আমার ফুফাতো বোনের প্রতি আমি আসক্ত। তিনি আমার প্রতি তাওয়াজ্জোহ দিলেন। আমার অন্তর থেকে ওই আসক্তি চিরদিনের জন্য দূর হয়ে গেলো।

কারামত ২৫ ঃ হজরতের এক প্রবীণ মুরিদ মহামারীর সময় তাঁর দরবারে এসে আবেদন করলেন, আমার এলাকায় মারাত্মক আকারে মহামারী ছড়িয়ে পড়েছে। আপনি একটু খেয়াল করুন। আপনার খেয়ালের বরকতে আপনার অনেক মুরিদ এবং ভক্তবৃন্দ জীবনে বেঁচে যেতে পারবে। মহামারীর অবস্থা এমনই ছিলো যে, যে এলাকায় ছড়িয়ে পড়তো এবং যে ঘরের লোকদের আক্রমণ করতো, ওই পরিবারের সকলকে শেষ করে দিতো। কেউই রেহাই পেতো না। হজরত মোজাদ্দেদ র. কিছুক্ষণ মোরাকাবা করে বললেন, অধিক মহব্বত রেখো। তোমার পরিবারে একজন ব্যতীত সকলেই নিরাপদে থাকবে ইনশাআল্লাহ্। তাই হলো। আমার মামা ওই মহামারীতে মারা গেলেন। অন্য সবাই রইলেন নিরাপদে।

কারামত ২৬ ঃ হজরত মোজাদ্দেদ র. এর মহান দরবারের প্রতি অধিক আস্থাবান এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে তার পুত্রের সুস্থতার জন্য দোয়া চাইলো এবং কিছু হাদিয়া দিতে চাইলো। তিনি তা কবুল করলেন না। অনেক অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি রাজী হলেন না। অথচ হাদিয়া কবুল করা ছিলো তাঁর সাধারণ নিয়ম। তাঁর এমতো আচরণের কারণে সকলে ভাবলেন, ছেলেটি মনে হয় মারা যাবে। তাই হলো। সন্ধ্যার দিকে ওই ছেলেটির মৃত্যু হলো।

---

১. হজরত খাজা হুছামুদ্দীন হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ র. এর বিশিষ্ট খলিফা ছিলেন। তিনি ৯৭৭ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ইন্তেকাল করেন ১০৪৩ হিজরীতে। তাঁকে তাঁর পীরের মাজারের কাছেই দাফন করা হয়। আবুল ফজলের ভগ্নিপতি ছিলেন তিনি। সে তাঁর দ্বীনদারীর জন্য তাঁকে কষ্ট দিতো।

কারামত ২৭ ঃ তাঁর একজন আলেম মুরিদ বর্ণনা করেছেন, আমার একজন অতীব প্রিয়ভাজন ব্যক্তি কঠিন রোগে আক্রান্ত হলেন। প্রিয়জনদের দোয়া এবং অভিজ্ঞ ডাক্তারের চিকিৎসায় কোনো কাজ হলো না। নিরুপায় হয়ে আমি হজরতের দরবারে উপস্থিত হয়ে তাওয়াজ্জোহ্প্রার্থী হলাম। তিনি দোয়া করলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন, আমি তার আত্মার মাগফেরাতের জন্য দোয়া করে দিয়েছি। আমি বিস্মিত ও দুঃখিত হলাম। লোকটির বাড়ি ছিলো সেরহিন্দ থেকে কয়েক মাইল দূরে। আমি তার বাড়ির দিকে চললাম। সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখলাম, লোকেরা তার দাফনের কাজ শেষ করে ফেলেছে।

কারামত ২৮ ঃ এক বৃদ্ধ সূফী দরবেশ বর্ণনা করেন, একবার আমি সান্নিপাত রোগে আক্রান্ত হলাম। এমনকি আমার নড়াচড়ারও শক্তি রইলো না। সুস্থতার আশা ছেড়ে দিলাম। এ সময় কী মনে করে হজরত মোজাদ্দেদ র. এর রূহের প্রতি মনোনিবেশ করলাম। অল্পক্ষণের মধ্যে আমি নিজেই নিজের মধ্যে হারিয়ে গেলাম। হজরত মোজাদ্দেদ র. উপস্থিত হয়ে আমার হাত ধরে বললেন, ওঠো। নবী ইসা আ. ফুঁ দিতেই যেমন লোকে সুস্থ হয়ে যেতো আমার অবস্থাও হলো সেরকম। আমি সুস্থ হয়ে ওই মহান ব্যক্তিত্বকে দেখলাম। তিনি বললেন, কী উপঢৌকন দিতে চাও? আমি বললাম, এখলাস। তিনি বললেন, বেশ তুমি তো সব কিছুই দিলে। একথা বলে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

কারামত ২৯ ঃ হজরত মোজাদ্দেদ র. এর ভাই শায়েখ মাসউদ র. কান্দাহারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। একদিন সকালে তিনি তাঁর নিকটস্থ সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে উদ্দেশ্য করে বললেন, শায়েখ মাসউদকে আমি কান্দাহারে গমনকারী কাফেলায় খুঁজলাম। পেলাম না। কান্দাহারে খুঁজলাম। কিন্তু পেলাম না। কান্দাহার থেকে সেরহিন্দ পর্যন্ত সকল মনজিলে খুঁজে দেখলাম, তবুও পেলাম না। এরপর সমগ্র পৃথিবীতে অনুসন্ধান করলাম। কোথাও তাঁর সন্ধান পাওয়া গেলো না। সম্ভবত তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। কিছুদিন পর কাফেলা ফিরে এলো। জানতে পারা গেলো, শায়েখ মাসউদ অমুক তারিখে অমুক সময় ইন্তেকাল করেছেন। কান্দাহারের কাছে এক স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়েছে।

কারামত ৩০ ঃ এক সূফী বর্ণনা করেন, একবার আমার হজ্ব করার প্রবল বাসনা হলো। আমি হজরত র. এর কাছে অনুমতি চাইলাম। তিনি কিছু সময় নিরব থেকে বললেন, আমি তোমাকে হজ্বের ময়দানে দেখলাম না। বর্ণনাকারী বললেন, এর পরে আরো ত্রিশ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলো, আমার হজ্ব করা আর হলোই না।

কারামত ৩১ ঃ আমার চাচা শায়েখ মোহাম্মদ নোমান বর্ণনা করেন, ইস্পাহানের সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে ঘোড়ার উপরের জিন কোথায় যেনো পড়ে গেলো। আমি ঘোড়া থেকে নেমে এদিক ওদিক খুঁজতে লাগলাম। এতে অনেক সময় ব্যয় হলো। কাফেলা চলে গেলো অনেক দূরে। দেখলাম, আশে পাশে কেবল জঙ্গল আর পাহাড়। আমি কেঁদে ফেললাম। এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি

করেও বুঝতে পারলাম না, কাফেলা কোন দিকে কতো দূরে। জীবনের আশা ছেড়ে দিলাম। নিকটেই দেখতে পেলাম একটি ঝর্ণা। ওই ঝর্ণার পানিতে ওজু করলাম। হজরতের কথা মনে হলো। অকস্মাৎ দেখলাম, হজরত একটি ইরাকী ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে এলেন। বললেন, হাত এগিয়ে দাও। আমি হাত বাড়াতেই তিনি আমার হাত ধরে ফেললেন। আমাকে তাঁর ঘোড়ার পিছনে উঠিয়ে নিলেন। ঘোড়াটিকে দ্রুতগামী করে অল্প সময়ের মধ্যে আমাকে কাফেলার সাথে মিলিয়ে দিলেন। পরক্ষণেই হলেন আমার দৃষ্টিসীমা থেকে অন্তর্হিত।

কারামত ৩২ ঃ সেরহিন্দের এক কাযীর সন্তান ছিলেন তাঁর মুরিদ। একবার তিনি কঠিন রোগে আক্রান্ত হলেন। হেকিম বলে দিলেন, এ রোগের নিরাময়ের আশা নেই। তিনি বলেন, উপায়ন্তর না দেখে আমি হজরতের দরবারে তাঁর শুভদৃষ্টি ও দোয়া কামনা করে চিঠি লিখলাম। উত্তরে তিনি লিখলেন, আমি তোমাকে আমার নিজ দায়িত্বে নিয়ে নিলাম। ইনশাআল্লাহ্ তুমি সুস্থ হয়ে যাবে। গভীর মহব্বত রেখো। মহান আল্লাহ্র এমন কৃপা হলো যে, হজরতের তাওয়াজ্জোহের বদৌলতে আমি সুস্থ হয়ে উঠলাম। তাঁর ওই পবিত্র চিঠিটি এখনও আমি ভক্তিভরে তাবারক হিশেবে সংরক্ষণ করে চলেছি।

কারামত ৩৩ ঃ মরহুম নবাব মুরতাজা খান [১] ছিলেন দানবীর। হজরত মোজাদ্দেদ র. এর মুরিদ ছিলেন তিনি। তিনি নাগড়াহ দূর্গ বিজয়ের জন্য নির্দেশপ্রাপ্ত হলেন। দূর্গটি ছিলো সুদৃঢ়।

তিনি হজরতের খেদমতে আবেদন করলেন, এই অধম আপনার সাহায্যপ্রার্থী। তাওয়াজ্জোহ ও দোয়ার মুখাপেক্ষী। তাঁর এই চিঠি পাবার পরদিন হজরত মোজাদ্দেদ র. তাঁর সাথীদের বললেন, তাহাজ্জুদের পর আমি জানতে পারলাম, নবাব মুরতাজা খানের হাতে দূর্গের পতন হবে না। একথা জানিয়ে তিনি চিঠির জবাব দিলেন। কয়েকদিন পরে নবাব সাহেবের মৃত্যুর খবর এলো।

কারামত ৩৪ ঃ নবাব মুরতাজা খানের ইন্তেকালের পর অন্য এক সেনাপতিকে ওই দূর্গ দখলের দায়িত্ব দেওয়া হলো। তিনি সেরহিন্দে পৌঁছলেন। হজরতের সামনে বিনীতভাবে দাঁড়ালেন। বললেন, বাতেনীভাবে আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। হজরত বললেন, অন্তরে ইসলাম আর বাইরে কুফরী কাফের হওয়ার আলামত। সেনাপতি বললেন, বাদশাহ্ আমাকে নাগড়াহ দূর্গ জয়ের দায়িত্ব দিয়েছেন। কাজটি সত্যিই দুঃসাধ্য। ভাবছি, কাফের অধ্যুষিত ওই দূর্গে আমি

১. নবাব মুরতাজা খান ছিলেন শায়েখ ফরিদের তরবিয়তপ্রাপ্ত। শায়েখজি উপাধিতে মকতুবাত শরীফে তাঁকে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম খণ্ডে ১৯ নং মকতুবে নবাব শায়েখ, আবার শায়েখজি নামে ৪১-৪৫, ৬৩, ৬৪, ১০৩, ১৫২, ১৬৩, ১৬৫, ১৯৩, ২১৩, ২৩৩ নং মকতুবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ২৬৯ নং মকতুবে তাঁকে মুরতাজা খান বলা হয়েছে। সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁকে এই উপাধি দিয়েছিলেন। তিনি প্রথম ক্ষমতাধিষ্ঠিত হন ১০১৪ হিজরীতে। ১০৪৫ হিজরীতে তিনি পরলোকগমন করেন।

আক্রমণ পরিচালনা করবো। হজরত মোজাদ্দেদ র. তাকে বিজয়ের সংবাদ দিলেন। বললেন, বিদ্রোহী কাফেরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সকল মুসলমানের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। সেনাপতি নিশ্চিন্ত হতে পারলো না। তিনি বললেন, দূর্গ জয়ের সুসংবাদ না পাওয়া পর্যন্ত আমি এই স্থান ত্যাগ করবো না। একথার পরেও সেনাপতিকে দ্বিধান্বিত দেখে হজরত মোজাদ্দেদ র. অল্প সময়ের জন্য মোরাকাবায় মগ্ন হলেন। তারপর বললেন, ইনশাআল্লাহ্ তোমারই বিজয় হবে। মহব্বতের বন্ধন সুদৃঢ় রেখো। তাই হলো। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই এসে পড়লো বিজয়ের [১] সংবাদ।

কারামত ৩৫ ঃ এক সম্ভ্রান্ত সাইয়্যেদ যিনি হজরতের প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত ছিলেন, তিনি বর্ণনা করেন— আমি তখন দাক্ষিণাত্যের উজ্জাইন শহরের সৈন্যদের মধ্যে ছিলাম। একদিন ক্লান্তি দূর করার জন্য তাঁবুর বাইরে বের হলাম। একটি দোকানে গিয়ে বসলাম। এমন সময় সেখানে এক দরবেশ উপস্থিত হলো। তাঁর চেহারার মধ্যে রেয়াজত ও জয্বার নিদর্শন প্রকাশ পাচ্ছিলো। তিনি আমার দিকে লক্ষ্য করে সালাম দিলেন। আমি উত্তর দিলাম। তিনি আমার নিকটবর্তী হয়ে বললেন, আমি কাছের একটি পাহাড়ের গুহায় বাস করি। জনসমক্ষে কম থাকি। আমি হজরত মোজাদ্দেদ র. এর একজন মুরিদ। আমি হজরতের পবিত্র নামের সুরভিতে আকুল হই। ওই সুরভিতে আকুল হয়েই এখানে এসেছি। বুঝতে পারছি তোমার কাছ থেকেই ওই সুগন্ধ বিচ্ছুরিত হচ্ছে। আমি বললাম, ঠিকই বলেছেন। আমিও হজরতের মুরিদ। আর এ রূহানী সম্পর্কই আমাদেরকে এখানে একত্র করেছে। আমরা দু'জন দীর্ঘক্ষণ ধরে কথা বলতে লাগলাম। তিনি বললেন, আমি দীর্ঘ সময় হজরতের খেদমতে ছিলাম। এক রাতে তিনি এশার নামাজের পর তাঁর নির্জন কক্ষে প্রবেশ করলেন। সেখানে উপস্থিত এক লোক আমাকে বললো, আমার ঘরে খাবার প্রস্তুত। চলো, খেয়ে নেই। আমি রাজি হলাম। তাঁকে অনুসরণ করলাম। পথিমধ্যেই সে হজরতের বিরুদ্ধে সমালোচনা শুরু করে দিলো। আমি বিব্রত হলাম। কিন্তু ধৈর্য ধারণ করে তার ঘরে পৌঁছলাম। খাবার পাত্র আমার সামনে রেখে সে আমার পাশেই বসে পড়লো। হঠাৎ দেখলাম, তার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অদৃশ্য তরবারীর আঘাতে খণ্ড খণ্ড হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। আমি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ভয়ে পালিয়ে এলাম। দরবারে ফিরতেই দেখলাম, হজরত মোজাদ্দেদ র. দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। অথচ এরকম করা তাঁর স্বভাব নয়। হজরত আমার প্রতি তাওয়াজ্জোহ দিলেন। আমার হাত ধরে ভিতরে নিয়ে গেলেন। হজরত তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেন। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে রইলাম। কিছুক্ষণ পর তিনি বেরিয়ে এলেন। দেখলাম, ওই লোকটি তাঁর

১. ওই দূর্গ ১০২৯ হিজরীতে বিজিত হয়েছিলো।

পশ্চাতে সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। একটু পরেই লোকটি প্রস্থান করলো। আমি বিস্মিত হলাম। একটু আগে যাকে খণ্ড-বিখণ্ডিত অবস্থায় দেখে এলাম, এখন তাকেই দেখছি জীবিত ও সুস্থ। হজরত র. বললেন, তুমি যা কিছু দেখেছো, তা যারা শোনার যোগ্যতা রাখে না, তাদের কারো কাছে বোলো না।

কারামত ৩৬ ঃ এক সূফী বর্ণনা করেন, আমি এলমে মারেফাত লাভের পথে সূচনাতেই কামালিয়াত অন্বেষণের আবেগে নিজে নিজেই আত্মভোলা অবস্থার মধ্যে পড়ে যেতাম। আমার ব্যর্থতার জন্য নিজের উপরই অতুষ্ট ছিলাম আমি। ছিলাম বিরাম-বিক্রমহীন, পাগলপ্রায়। পেরেশানী থেকে অব্যাহতি লাভার্থে কখনো জঙ্গলে চলে যেতাম। কিন্তু অপ্রকৃতিস্থ অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি পেতাম না। অবশেষে আমি হজরত মোজাদ্দেদ র. এর খানকায় গমন করলাম। ঘটনাক্রমে তিনি দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর সাথীগণ গোলাকৃতি হয়ে বসে মাথা নিচু করে মোরাকাবায় বসে ছিলেন। তিনি এমন ভাবে দাঁড়িয়েছিলেন যে, মনে হলো তাঁর দেহ প্রাণহীন। হঠাৎ তিনি একটু অগ্রসর হয়ে ইশারায় বললেন, এসো। তাড়াতাড়ি এসো। তাঁর নিকটবর্তী হলাম। তাঁর পবিত্র হাত আমার ঘাড়ের উপরে রাখলেন। তারপর আমার মাথা তাঁর বগলের মধ্যে নিয়ে বললেন, তুমি যে নেয়ামত পেয়েছো, তোমার সঙ্গী-সাথীদের কেউ তা পায়নি। হজরতের এই বাণী ছিলো যেনো অগ্নিনির্বাপক পানি। আমার অস্থিরতার আগুন নির্বাপিত হলো। এলো অনাবিল প্রশান্তি।

কারামত ৩৭ ঃ এক হাফেজ সাহেব ছিলেন হজরত মোজাদ্দেদ র. এর প্রবীণ মুরিদদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি নিয়মিত তারাবী নামাজে পবিত্র কোরআন খতম করতেন। তিনি বর্ণনা করেন, শায়েখের দায়িত্ব পালনের প্রথম দিকে হজরত মোজাদ্দেদ র. এক ভ্রমণের জন্য বের হয়ে সকরে মাসনিগান এলাকায় পৌঁছলেন। সেখান থেকে হজরত শাহ্ কামাল র. এর সাথে সাক্ষাতের জন্য কায়থল উপস্থিত হলেন। ফেরার পথে গেলেন আজরাডার নামক স্থানে শায়েখ আহসাদ আজরাডার এর সাথে সাক্ষাৎ করতে। শেষে এলেন আবাসান এলাকায় । আমি তাঁর সকল সফরের সঙ্গী ছিলাম। কখনো দৌড়ে দৌড়েও তাঁর সঙ্গী হয়েছি। তাই আমার শরীর উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিলো। আবহাওয়া ছিলো শুষ্ক। প্রচণ্ড রোদে দেহের রঙ বিবর্ণ হয়ে গেলো। শরীর হয়ে গেলো দুর্বল ও কৃশকায়। আমার দুরবস্থা দেখে সাথীরা শংকিত হলো। এমন সময় হজরত মোজাদ্দেদ র. তাঁর অবস্থানস্থল থেকে বের হয়ে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছো? আমি বললাম, প্রচণ্ড গরমে অতিষ্ঠ হয়ে অতিরিক্ত পানি পান করেছি। ফলে দুর্বল হয়ে পড়েছি। এখন মনে হচ্ছে জীবনটাই বের হয়ে যাবে। তিনি লোকদেরকে বললেন, ওকে আমার পালকিতে বসিয়ে দাও। আমি ঘোড়ায় সওয়ার হবো। জীবননাশের সম্ভাবনা

সমুপস্থিত। আমি ওকে আমার দায়িত্বে নিয়ে নিলাম। এখন সে দ্রুত সুস্থ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ্। হাফেজ সাহেব বলেন, এরপর অল্প কিছু পথ অতিক্রম করতে না করতেই আমি সুস্থতা বোধ করলাম। পালকি থেকে নেমে এলাম। তাঁর বাহনের পিছনে পায়ে হেঁটে গন্তব্যে পৌঁছলাম।

কারামত ৩৮ ঃ হাফেজ সাহেব আরো বর্ণনা করেন, আমি খুব অল্প বয়সে পবিত্র কোরআন হেফজ (মুখস্থ) করেছিলাম। এরপর যখন আমি এলাহাবাদে গেলাম, তখন অনিয়মিত তেলাওয়াতের কারণে আমার হেফজের মধ্যে উদাসীনতা দেখা দিলো। কয়েক বছর এ ভাবেই কেটে গেলো। দীর্ঘদিন পর আমি আমার জন্মভূমি সেরহিন্দে ফিরে এলাম। তখন হজরত মোজাদ্দেদ র. স্বীয় মোর্শেদ হজরত বাকী বিল্লাহ কুদ্দিসা সিররুহুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এসেছিলেন, তিনি নিজ বাড়ির সামনে একটি মসজিদ নির্মাণ করলেন। তখন রমজান মাস। আমি তাঁর দরবারে হাজির হলাম। তিনি বললেন, হাফেজ সাহেব! তারাবী নামাজে আজ আপনি আমাদেরকে কোরআন তেলাওয়াত শোনাবেন। আমি বললাম, হেফজ ভুলে গিয়েছি। তিনি বললেন, না না। আপনি অবশ্যই আমাদেরকে পবিত্র কোরআন শোনাবেন। আমি দুই তিনবার একই কথা বললাম। কিন্তু তিনি ভ্রূক্ষেপ করলেন না। বাধ্য হয়ে তাঁর নির্দেশ পালনার্থে তারাবীর নামাজে কোরআন তেলাওয়াত শুরু করলাম। তাঁর শুভদৃষ্টির বরকতে দু'রাকাত নামাজে আমি একুশ পারা কোরআন পাঠ করলাম। তিনি ব্যতীত আর কেউ দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না। তারপর আমি পরের রাতে কোরআন পাঠ খতম করে দিলাম। পড়ার মধ্যে ভুল খুব কমই হলো। বলা বাহুল্য, তাঁর খাস তাওয়াজ্জোহের কারণেই এরকম হয়েছিলো। নতুবা আমি তো কোরআন ভুলেই গিয়েছিলাম।

কারামত ৩৯ ঃ ওই হাফেজ সাহেব আরো বর্ণনা করেছেন, একবার হজরতের উপস্থিতিতে আমি তারাবী নামাজে কোরআন তেলাওয়াত করছিলাম। যখন আমি ছয় পারা তেলাওয়াত শেষ করলাম, তখন হঠাৎ জ্বর এসে গেলো। আমি হুঁশ হারিয়ে ফেললাম। এ অবস্থা এতো দীর্ঘ হলো যে, আমার পরের দিনের আসরের নামাজও কাযা হয়ে গেলো। সন্ধ্যায় হুঁশ ফিরে এলো। ইফতারীর পরে অত্যন্ত নাজুক অবস্থায় আমি হজরতের দরবারে উপস্থিত হলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছো? আমি বললাম, প্রচণ্ড জ্বর। তিনি আমার হাত ধরে বললেন, জ্বর তো খুব বেশী। তুমি কি কোরআন তেলাওয়াত করতে পারবে? আমি বললাম, হজরতের তাওয়াজ্জোহ যদি আমার সহায় হয়, তাহলে পারবো। তিনি বললেন, তাহলে তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে এসো। একটু পরেই আমি তারাবী নামাজের জন্য তৈরী হয়ে এলাম। শরীর ঘর্মাক্ত হলো। পরক্ষণেই জ্বর চলে গেলো। তাঁর খাস্ তাওয়াজ্জোহের বরকতে সুস্থ হয়ে পবিত্র কালাম শেষ পর্যন্ত পাঠ করতে পারলাম।

কারামত ৪০ ঃ খাজা কাসেম কলিজ [১] খানের উপাধি ছিলো আকীদাত খান। তিনি হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ কুদ্দিসা সিররুহুর প্রিয়ভাজন ছিলেন। হজরত মোজাদ্দেদ র.কে তিনি গভীরভাবে ভালোবাসতেন। একবার তিনি হজরতের খেদমতে আবেদন করলেন, অনুগ্রহ করে আমাকে তাওয়াজ্জোহ দিন, যেনো আমি উচ্চ মাকামে উপনীত হতে পারি। তিনি কিছুক্ষণ তাওয়াজ্জোহ্ দিলেন। তারপর বললেন, তোমার মর্যাদা হাজারে এক বলে প্রতীয়মান হলো।

কারামত ৪১ ঃ মোহাম্মদ তোরাব ছিলেন তালেকানদের প্রিয়ভাজন। হজরতের প্রতি দৃঢ় মহব্বত রাখতেন। তিনি বর্ণনা করেন, আমার ভাই দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত ছিলো। সবাই তার জীবনের আশা ছেড়ে দিলো। তার জন্য কাফনের কাপড়ও আনা হলো।

এমন অবস্থায় তিনি হজরতের দরবারে একটি গাভী ও দশটি মুদ্রা হাদিয়াস্বরূপ প্রেরণ করলেন। ভোর রাতে স্বপ্নে দেখলেন, তিনি তাঁর হাত ধরে দাঁড় করিয়ে দিলেন। বললেন, তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে। ভীত হয়ো না। তিনি জাগ্রত হয়ে নিজের মধ্যে বেশ শক্তি অনুভব করলেন। নিজে নিজে দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন, আমি খুব ক্ষুধার্ত। যাঁরা পাশে ছিলেন তাঁরা বললেন, এ যে দেখছি প্রলাপ বকছে। তিনি বললেন, না, না প্রলাপ নয়। অতঃপর তিনি মোজাদ্দেদ র.কে স্বপ্নে দেখার কথা বললেন। তাঁকে সুরুয়া খেতে দেওয়া হলো।

কারামত ৪২ ঃ হজরত মোজাদ্দেদ র. এর এক বিশিষ্ট ও প্রবীন মুরিদ বর্ণনা করেন, আমার এলাকার প্রশাসক আমার এক খণ্ড ভূমি জোরপূর্বক দখল করে নিলো। কিছুদিন পর একবার ফিরিয়েও দিলো। আবার দখল করে নিলো। ভূমিখণ্ডটি ছিলো আমার জীবিকার মাধ্যম।

একদিন আমি হজরতের কাছে বিষয়টি খুলে বললাম। আরো বললাম, আশংকা হচ্ছে বার্ষিক বন্দোবস্তের সময় আমাকে না আবার অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ করতে হয়। হজরত অল্প সময়ের জন্য মোরাকাবা করে বললেন, না। ওরকম হবে না। ওই প্রশাসক অপদস্থ হবে। আমি ওই জমি উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম। ইত্যবসরে খবর পেলাম, ওই প্রশাসকের প্রতি গ্রেপ্তারী পরওয়ানা জারী করা হয়েছে। তাকে আঠারো বছরের জন্য কারাগারে বন্দী করার হুকুম দেওয়া হয়েছে।

---

১. এ কলিজ খান ছিলেন হজরত বাকী বিল্লাহ র. এর স্ত্রীর ভাই। তিনি এবং তাঁর পুত্রগণ পদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি ১০২৩ সালে ইন্তেকাল করেন।

কারামত ৪৩ ঃ একদা হজরত র. এর জবান থেকে এলহামের মাধ্যমে এই কথাগুলো বের হয়ে এলো— শায়েখ মোজাম্মেল [১] এক বিপদজনক স্থানে একটি গর্তের মধ্যে পড়ে গিয়েছেন। সেখান থেকে বের হওয়ার জন্য হাত পা ছোঁড়াছুড়িও করছেন। কিছুদিন পর জানা গেলো, শায়েখ মোজাম্মেল সেরহিন্দের নিকট কোনো এক স্থানে ভ্রমণের জন্য বের হয়েছিলেন। হঠাৎ হোঁচট খেয়ে একটি গর্তের মধ্যে পড়ে গেলেন। চেষ্টা করেও সেখান থেকে বের হতে পারলেন না। বের হওয়ার জন্য হাত পা ছুঁড়তে লাগলেন। দূর থেকে দৃশ্যটি দেখতে পেয়েছিলেন এক পল্লীবাসী। তিনি লোকজন ডেকে নিয়ে গর্তের কাছে পৌঁছলেন। তাকে বাঁশ দিয়ে টেনে গর্ত থেকে উদ্ধার করলেন। উল্লেখ্য, শায়েখ মোজাম্মেল ছিলেন হজরত মোজাদ্দেদ র. এর প্রবীণ খলিফাদের একজন।

কারামত ৪৪ ঃ আল্লামা মিরাক [২] ছিলেন শাহ্জাদা শাহজাহানের শিক্ষক। বাদশাহ্ তাঁকে খুব ভালোবাসতেন। তিনি বলেন, হজরত মোজাদ্দেদ র. সম্পর্কে আমার খারাপ ধারণা ছিলো। কেনোনা শুনেছিলাম, তিনি তাঁর এক পত্রে লিখেছেন, 'আমার মর্যাদা হজরত সিদ্দীক আকবর রা. এর মর্যাদা থেকে অধিক।' ওই সময়ে আমি সবে হিন্দুস্তানে এসেছি। সেরহিন্দেও কিছুদিন ছিলাম। ঘটনাক্রমে আমার এক পুরানো বন্ধুর সংগে দেখা হয়ে গেলো। তিনি নিতান্তই স্বাধীনচেতা ছিলেন। আত্মশুদ্ধি ও তাকওয়া অর্জনের সাথে তাঁর কোনো সম্পর্কই ছিলো না। কিন্তু দেখলাম বর্তমানে তিনি পূর্ণ শরীয়তের অনুসারী ও তাকওয়ার পোশাকে সজ্জিত। সত্যের সাধনার নূরে তাঁর চেহারা সমুজ্জ্বল। আমি তাঁর এই পরিবর্তনের কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমি মোজাদ্দেদ র. এর মুরিদ হয়েছি এবং তাঁর খেদমত করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। তাঁর সোহবতের বরকতে মহান আল্লাহ্ আমাকে এই সম্পদ দান করেছেন। আমি বললাম, তিনি তো এরূপ এরূপ লিখেছেন। তাঁর সোহবতে কী-ই বা অর্জিত হবে? তিনি বললেন, সাবধান! হাজার বার সাবধান! না বুঝে অস্বীকার করবেন না। তিনি তো এই সময়ের কুতুবে আলম (কুতুবে মাদার)। তাঁকে স্বচক্ষে দেখলে আপনি নিজেই বাস্তব অবস্থা উপলব্ধি করতে পারবেন। আমি তাঁর সাক্ষাতের প্রতি তেমন কোনো আগ্রহ ও আকর্ষণ অনুভব করলাম না। তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে বললেন, কালক্ষেপণ না করে তাঁকে দেখে আপনি আপনার ভ্রান্ত ধারণা দূর করুন। আমি মনে মনে বললাম, যদি আমার তিনটি কথার উত্তর তিনি দিতে পারেন (যা আমার মনের মধ্যে রয়েছে) তাহলে আমি তাঁর প্রতি আস্থা স্থাপন করবো।

---

১. শায়েখ মোজাম্মেল হজরত মোজাদ্দেদ র. এর খলিফাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মকতুবাত শরীফ ১ম খণ্ডে ১৫৩ থেকে ১৫৬ পর্যন্ত তার নামে মকতুব লিপিবদ্ধ রয়েছে। তিনি ২৬ শে রবিউল আখের ১০২৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেছেন।

২. আল্লামা মিরাক ১০৩২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেছিলেন। মোহাম্মদ হাশেম কাশেমী র. 'হুয়া সাইয়্যেদুশ্ শুয়ুখ' নামক গ্রন্থ থেকে তাঁর মৃত্যুর তারিখ বের করেছেন।

প্রথমতঃ তিনি নিজ থেকেই হজরত আবু বকর রা. প্রসঙ্গে আলোচনা করে আমার অন্তরের ভ্রান্ত ধারণা দূর করবেন।

দ্বিতীয়ঃ আমার পূর্বপুরুষদের ধারাবাহিকতা এবং তাঁদের অবস্থা বর্ণনা করবেন।

তৃতীয়ঃ খাজা মোহাম্মদ মাহমুদের অবস্থা বর্ণনা করবেন। অবশেষে আমার ওই বন্ধুর সাথে আমি হজরতের দরবারে উপস্থিত হলাম। যখনই তাঁকে দূর থেকে দেখলাম, তখনই আমার অন্তর আলোড়িত হলো এবং মনে উদিত হলো ভীতি ও সমীহবোধ। আমি কম্পিত অবস্থায় তাঁর সম্মুখে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে বসতে বললেন। তাক থেকে একটি কিতাব বের করে নিলেন। কিতাবে ওই লেখাটিই ছিলো যা পড়ে মানুষের মনে এই অপধারণার সৃষ্টি হয়েছিলো যে, তিনি নিজেকে হজরত আবু বকর রা. থেকে শ্রেষ্ঠ বলেন। তিনি কথাটির এমন হৃদয়গ্রাহী ব্যাখ্যা দিলেন যে, আমার অন্তরে আর কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব রইলো না। তারপর বললেন, হে মাওলানা! তোমার পিতার নাম এই, তোমার দাদার নাম এরকম। তোমার পরদাদা ছিলেন এরূপ। প্রত্যেকের নাম ও বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কে তিনি পৃথক পৃথক বর্ণনা দিলেন। এরপর তিনি গাত্রোত্থানের উদ্যোগ নিলেন। আমি মনে মনে বললাম, তিনি খাজা মাহমুদ সম্পর্কে তো কিছু বললেন না। চলে যাচ্ছিলেন। একটু বসে থেকে বললেন, খাজা মাহমুদ ছিলেন আমাদের পীরজাদা। বিশেষ এক রূহানী জযবার অধিকারী ছিলেন তিনি। বর্ণনাকারী শায়েখ মীরাক বলেন, আমি একই বৈঠকে তিনটি কারামত প্রত্যক্ষ করলাম।

কারামত ৪৫ ঃ হজরত মোজাদ্দেদ র. এর লাহোর অবস্থানের সময় বিশিষ্ট আলেম মাওলানা জামাল তালবী [১] তাঁর দরবারে উপস্থিত হলেন। অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বললেন, সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র। আপনি বর্তমান সময়ের জাহেরী এবং বাতেনী কামালতের সমষ্টি। আপনার সমকক্ষ বর্তমানে অন্য কেউ নেই। আপনি ‘অহদাতুল অজুদ’ সম্পর্কে কিছু বলুন। বিষয়টি তো প্রকাশ্যে শরীয়তপরিপন্থী। আবার অসংখ্য আলেম এর পক্ষে। আপনি বিষয়টিকে কীভাবে দেখেন?

তিনি তাওয়াজ্জোহ্‌ ও কারামতের মাধ্যমে মাওলানা সাহেবকে এ বিষয়ে স্পষ্ট সমাধান দিলেন। কানে কানেও কিছু কথা বলে দিলেন। মাওলানা আশ্চর্যান্বিত হলেন। তাঁর চক্ষু থেকে বৃষ্টির মতো অবিরাম ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগলো। বিস্ময়কর পরিবর্তন দেখা গেলো তাঁর মধ্যে। মাওলানা সাহেব আর নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে হজরতের পদচুম্বন করে অশেষ বিনয়প্রদর্শনপূর্বক বিদায় নিলেন। উল্লেখ্য, মাওলানা জামালুদ্দীনকে পবিত্র কোরআন হাদিসের দলিল দ্বারা

---

১. মাওলানা জামালুদ্দীন লাহোরী একজন বড় আলেম ছিলেন, ফয়জী ‘সাওয়াতি ইলহাম’ গ্রন্থের ব্যাপারে তাঁর কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছিলেন। মকতুবাত প্রথম খণ্ড ১৩০ নং মকতুবে তাঁর নামের উল্লেখ রয়েছে।

বুঝানো যথেষ্ট কষ্টকর ছিলো। হজরত মোজাদ্দেদ র. বলেন, তাকে আমি এক মুহূর্তের মধ্যে এমন এক অবস্থায় নিয়ে গেলাম, যেখানে তার প্রশ্নের প্রত্যক্ষ জবাব বিদ্যমান। ওই মাকামে পৌঁছানোর ফলে তাঁর সন্দেহ অবলুপ্ত হয়ে গেলো।

কারামত ৪৬ ঃ হজরতের খাদেমদের একজন যিনি গোয়ালিয়র দূর্গে হজরতের খেদমতে ছিলেন তিনি বলেছেন, এক বুজর্গ ওইখান থেকে যাবার সময় খুব দুঃখ করে বলে পাঠালেন, এ স্থান থেকে আপনার মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। কেনোনা এর অধিকর্তা রাফেজী। এই দূর্গের কার্যক্রম ওই মতবাদে বিশ্বাসীদের সাথে সম্পর্কিত। ওই বুজর্গ আরো বলেছিলেন, যদি আপনাকে দূর্গের উপর থেকে নিচে নিক্ষেপ করা হয়, তবে বাধা দেবে কে? তিনি প্রতি উত্তরে বললেন, ইনশাআল্লাহ্ আমি খুব শীঘ্রই মুক্তি পাবো। কিছুসংখ্যক মানুষ আমার কাছে কিছু পাবে। তাদের প্রাপ্তি এখনও বাকী। আমার মুক্ত হওয়া ব্যতীত ওই অবশিষ্ট কাজ সম্পাদন সম্ভব নয়। তাই হলো। অল্পদিনের মধ্যে তিনি মুক্ত হলেন। হজরতের বাণী অতি দ্রুত বাস্তবে পরিণত হলো।

কারামত ৪৭ ঃ হজরতের একনিষ্ঠ ভক্তদের একজন বর্ণনা করেন, হজরতের স্বভাব ছিলো ছোট-বড়, চেনা-অচেনা, যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলকে প্রথমেই সালাম বলা। একদিন আমার খেয়াল হলো, আমি হঠাৎ করে তাঁর সামনে গিয়ে আগেই সালাম দিবো। আমি এই উদ্দেশ্য নিয়ে হজরতের দরবারে রওয়ানা দিলাম। তখন ছিলো আহারের সময়। আহার তখন শুরু হয়নি। তিনি আমাকে না দেখেই আহার গ্রহণকারীদের সারি থেকে বলে উঠলেন, হে ওমুক! আস্সালামু আলাইকুম। আমি চমকে উঠলাম। সামনে অগ্রসর হয়ে বললাম, ওয়া আলাইকুমুস্ সালাম। আমি তো আপনাকে আগে সালাম দিতে চেয়েছিলাম। তিনি মৃদু হাসলেন।

কারামত ৪৮ ঃ একদিন এক মুরিদ হজরতের কাছে কাদেরিয়া তরিকার নেসবতের প্রার্থী হলেন। তিনি তাকে ওই মহান সিলসিলার ফয়েজ দান করলেন। বললেন, বেশি বেশি সোহবতে থাকার চেষ্টা কোরো। তিনি দু'তিন দিন পর্যন্ত কাদেরিয়া তরিকার সাথে সম্পৃক্ত রইলেন। ওই দুই তিন দিন নকশবন্দিয়া তরিকার সালেকবৃন্দের নূরপ্রবাহ বন্ধ রইলো। তাঁরা রইলেন কবজ (আত্মিক সংকোচন) অবস্থায়। তাঁরা দেখতে থাকলেন, আসল ব্যাপার সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। হজরতের কাছে নিজেদের অবস্থার কথা বললেন। হজরত মৃদু হেসে বললেন, আমি এই 'ক'দিন ওই লোকের জন্য কাদেরিয়ার নেসবতের সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম। তিনি তাদের প্রতি বিশেষ তাওয়াজ্জোহ দিলেন। তাদের কবজ অবস্থা কেটে গেলো। তারা এমন হাল লাভ করলেন, যা চল্লিশ দিনে, এমন কি এক বছরেও অর্জন করা সম্ভব ছিলো না। সুবহানাল্লাহ্!

কারামত ৪৯ ঃ সম্ভ্রান্ত বংশীয় এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন, আমি উজ্জাইন নগরে ছিলাম। সওদাগরের একটি দল আমার প্রতিবেশী ছিলো। ওই দলের মধ্যে জান মোহাম্মদ জলন্ধরী নামে এক ব্যক্তি ছিলেন, যিনি আমার সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক রাখতেন। ঘটনাক্রমে একদিন খবর পেলাম, বাদশাহ্ মোজাদ্দেদ র. কে গোয়ালিয়র দূর্গে বন্দী করে রেখেছে। দুঃসংবাদটি শুনে আমি খুবই চিন্তাযুক্ত ও মর্মাহত হলাম। জান মোহাম্মদ আমার কাছে এসে দুশ্চিন্তার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। আমি বিষয়টি খুলে বললাম। তিনি বললেন, আমি নিজেও হজরত মোজাদ্দেদ র. এর মুরিদ। আজ আমি তাঁকে একটু যাচাই করে দেখি। তিনি চলে গেলেন এবং মোজাদ্দেদ র. এর প্রতি খেয়াল করলেন। হজরত মোজাদ্দেদ র. মোরাকাবার মধ্যে আগমন করে বললেন, শ্রুত সংবাদ সত্য। কিন্তু কোনো কোনো স্থান জালালী তরবিয়াতের উপর নির্ভরশীল। যদি এরূপ না হতো তা হলে উচ্চতর প্রাপ্তি বা অর্জন সম্ভব হতো না। বন্ধু মহলে বলে দিয়ো, এ ক্ষেত্রে যেনো বিশেষ মহব্বতের সম্পর্ক অটুট রাখে। এ বিষয়ের ভেদ বা গোপন তত্ত্ব এটাই।

কারামত ৫০ ঃ একজন সৎ ব্যবসায়ী বর্ণনা করেন, আমি হজরতের খেদমতে বহু সময় অবস্থান করেছি। কিন্তু যখনই আমি হজরতের দিকে তাকাতাম, তখনই তাঁর কপাল এবং চিবুকে 'আল্লাহ্' শব্দ লেখা দেখতে পেতাম।

কারামত ৫১ ঃ ওই ব্যক্তিই বর্ণনা করেছেন, একদিন হজরত মোজাদ্দেদ র. সন্ধ্যার পূর্বে আমাকে বললেন, তোমাকে একটি কাজ দেবো। করতে পারবে? আমি বললাম, আমার পিতামাতা আপনার প্রতি কোরবান হোক— কেনো পারবো না? অতঃপর তিনি আমার হাতে একটি আখরোট দিয়ে বললেন, বাগে হাফেজরুখনাহ এর মধ্যে কয়েকজন দরবেশ অবস্থান করছেন। তাদের কাছে যাও। তাদের মধ্যে একজন দরবেশ পৃথক হয়ে বসে আছে। সে বসন্ত রোগে আক্রান্ত । তুমি তার কাছে গিয়ে আমার দোয়ার কথা বোলো এবং এই আখরোটটি তাকে দিয়ো। আর তাকে আমার কাছে ডেকে এনো। আমি তাঁর নির্দেশ পালনার্থে সেখানে গেলাম। দেখলাম, কলন্দরের এক দল দরবেশ বসে আছে। বসন্ত আক্রান্ত দরবেশ একটু দূরে বসে আছেন। তিনি আমাকে দেখলেন। বললেন, হজরত কি তোমাকে পাঠিয়েছেন? বললাম, জী। আমি তাঁকে আখরোটটি দিলাম এবং হজরতের দোয়ার কথা বললাম। তিনি আমাকে ডাকলেন, কিন্তু নিজে এলেন না। একথা বলে তিনি উঠে আমার সাথে রওয়ানা হলেন। হজরত মোজাদ্দেদ র. মেহরাবে বসে ছিলেন। তিনি পাশে এসে বসলেন। হজরত আমাকে বললেন, কাহ্ওয়া দাও। আমি যেখানে কাহ্ওয়া প্রস্তুত হচ্ছে, সেখানে দ্রুত চলে গেলাম। একটু পরেই পাত্রভর্তি কাহ্ওয়া নিয়ে হজরতের কাছে ফিরে এলাম। তিনি বললেন, ওর সামনে দাও। আমি তার দিকে ফিরলাম। দেখলাম,

ওই দরবেশ অবিকল হজরত মোজাদ্দেদ র.। দরবেশ বললেন, ওঁর কাছে নিয়ে যাও। যখন আমি তাঁর দিকে ফিরলাম, দেখলাম ওখানেও হজরত মোজাদ্দেদ র.।

কারামত ৫২ ঃ ওই দরবেশ হজরত মোজাদ্দেদ র. এর কাছে আমার পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। হজরত বললেন, সে জলন্ধরের অধিবাসী। তার নাম জান মোহাম্মদ। তার পিতার নাম ওমুক। দরবেশ বললেন, তার পিতা আমার পরিচিত। তাঁকে আপনি কোন সিলসিলায় বায়াত করেছেন? তিনি বললেন, কাদেরিয়া সিলসিলায়। আমি বললাম, আমি সুপারিশ করছি আপনি তাকে শায়েখ মহিউদ্দীন আবদুল কাদের জীলানী র. পর্যন্ত পৌঁছে দিন। এমন সময় হজরত ইস্তেঞ্জার জন্য উঠলেন। আমার কাছে তিনটি ঢিলা চাইলেন। আমি নির্দেশ পালন করলাম। তিনি শৌচাগারে প্রবেশ করলেন। তিনি সেখান থেকে শুদ্ধ হয়ে বের হয়ে এলেন। বললেন, জান মোহাম্মদ! তুমি কি কুতুব তারকা সম্পর্কে কিছু জানো? একথা বলে তিনি কুতুব তারকার দিকে ইশারা করে বললেন, দ্যাখো। ভালো করে দ্যাখো। আমি দেখলাম, কুতুব তারকার ভিতর থেকে কালো পোশাক পরিহিত এক বুজর্গ বেরিয়ে এলেন এবং তীরবেগে এক মুহূর্তের মধ্যে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। হজরত মোজাদ্দেদ র. বললেন, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করো। ইনিই হজরত গাওছুছ্ ছাকালাইন। তাঁর নির্দেশ পালনার্থে আমি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলাম। একটু পরেই গাওছুছ্ ছাকালাইন র. বিদায় নিলেন এবং কুতুব তারকার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। যখন তিনি মসজিদে প্রবেশ করলেন, তখন দরবেশ জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি গাওছুছ্ ছাকালাইনকে দেখেছো? আমি বললাম, জী হ্যাঁ দেখেছি।

কারামত ৫৩ ঃ ওই সম্ভ্রান্ত সাইয়্যেদ বলেন, আমি তখন জান মোহাম্মদকে বললাম, এমন একটি অলৌকিক দৃশ্য দেখার পরেও তুমি কীভাবে সওদাগরিতে পড়ে আছো? সে বললো, এটি এক আজব ঘটনা। একবার আমার নিকটবর্তীদের একজন হজরতের কাছে এসে আবেদন করলেন, জান মোহাম্মদকে আমার কাছে দিন। তাকে বিবাহ দিবো। হজরত বললেন, যাও বিবাহ করে নাও। কিন্তু আমি গেলাম না। ওই আত্মীয় পুনরায় এলেন এবং হজরতের কাছে বার বার আমার ব্যাপারে অনুরোধ করতে লাগলেন। হজরত র.ও আমাকে আগের নির্দেশই দিলেন। কিন্তু আমি যাইনি। ফলে আমার প্রতি হজরতের শুভদৃষ্টি সংকুচিত হলো। একবার তিনি পান খাচ্ছিলেন। তাঁর পবিত্র মুখ থেকে কিছু পান আমাকে খেতে দিলেন। আমি নির্দেশ পালন করলাম। সাথে সাথেই আমার হাল সলব (ছিনিয়ে নেয়া) হয়ে গেলো। প্রথমে আমি আল্লাহ্‌র পাগল ছিলাম। আর এখন দুনিয়াদারির কাজে লেগে গিয়েছি। এরপর আমি ওই আত্মীয়ের অনুগ্রহ অবলম্বন করেছি এবং আমার বিবাহ হয়ে গিয়েছে। এখন ব্যবসা করছি কিন্তু হজরতের প্রতি মহব্বতের সম্পর্ক পূর্বের মতোই রয়েছে। যখনই আমি তাঁর প্রতি খেয়াল করি, তখন তাঁকে দেখতে পাই।

কারামত ৫৪ ঃ মাওলানা আবদুল হাকীম [১] শিয়ালকোটি বর্ণনা করেছেন, আমি হজরতের মুরিদ ছিলাম। হজরতের কারামতের বৈশিষ্ট্য এরূপ ছিলো যে, এক রাতে আমি তাঁকে স্বপ্নে দেখলাম। তিনি আমাকে এই আয়াত শোনালেন—

'কুলিল্লাহু [২] ছুম্মাযারহুম' এবং তেলাওয়াতের মাধ্যম আমাকে তাওয়াজ্জোহ দিলেন। আমার অন্তরকে তাঁর দিকে আকর্ষণ করলেন। সুতরাং আমিও আমার অন্তরকে জিকিরময় পেলাম। তিনি বহু দিন ধরে হজরত র. এর খেদমতে থেকে বাতেনীভাবে উপকৃত হয়েছিলেন। তিনি বলতেন, আমি শায়েখ আহমদের আশেক।

কারামত ৫৫ ঃ হজরতের একনিষ্ঠ ভক্তদের একজন বর্ণনা করেছেন, একদিন হজরত বললেন, তোমার এবং ওমুক ব্যক্তির দুজনেরই বেলায়েতে ইব্রাহীমি অর্জিত হয়েছে। আমার ধারণা হলো হজরত বলেছেন তো ঠিকই আছে, কিন্তু এ বিষয়ে আমি যদি জানতে পারতাম তাহলে ভালো হতো। ওই রাতে আমি হজরত ইব্রাহীম আ. কে অত্যন্ত শানশওকাতের সাথে দেখলাম। তাঁর সাথে হজরত মোজাদ্দেদ র.ও উপস্থিত ছিলেন। আমি এবং ওই ব্যক্তি যার বেলায়েতে ইব্রাহীমি অর্জিত হয়েছিলো, আমরা দুজনেই দাঁড়িয়েছিলাম। হজরত মোজাদ্দেদ র. আমাদের দুজনের হাত ধরে হজরত ইব্রাহীম আ. এর কদমের কাছে এনে দিলেন। আমরা দুজন তাঁর পদচুম্বন করলাম।

বর্ণনাকারী বলেন, আমি এই ঘটনার পরে হজরত মোজাদ্দেদ র. এর দরবারে গেলাম। আমি ঘটনা বর্ণনার পূর্বেই তিনি বললেন, আমি যা বলেছি, তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। তোমরা এ বিষয়ে অবগত নও যে, সকল সালেকদের হালের বিবরণ এবং এলমে মারেফাতের শরাব পান করার যোগ্যতার খবর সকলকে দেওয়া হয় না। বরং ওই যুগের কোনো এক বিশিষ্ট বুজর্গকে এই উচ্চ মর্যাদার নেয়ামত ও অমূল্য সম্পদ দান করা হয়। শায়েখ নিজামুদ্দীন কুবরা র. যুগের একজন কুতুব ছিলেন। তিনি জানতেন না, তিনি কোন নবীর কদমের নিচে। বিষয়টি পরীক্ষা করার জন্য এক মুরিদকে এক বুজর্গের কাছে পাঠানো হলো। তিনি এ বিষয়ে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। ওই বুজর্গ তাঁকে দেখার সাথে সাথেই বললেন, ওই যে, ইহুদী তাওয়াজ্জোহ দিচ্ছে। ওই মুরিদ সেখান থেকে ফিরে এলো। শায়েখের কাছে ঘটনার বিবরণ পেশ করলো। তিনি খুব খুশি হলেন এবং চক্ষু বন্ধ করে বললেন, তুমি নবী মুসার কদমের নিচে রয়েছো।

---

১. আবদুল হাকীম শিয়ালকোটি যুগশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বহু পুস্তক লিখেছেন। তিনিই সর্বপ্রথম হজরত র. কে মোজাদ্দেদে আলফেসানি বলেন। তিনি ১০৬৮ সালে ইন্তেকাল করেছেন।

২. 'বলো আল্লাহ্, তারপর ওই লোকদেরকে পরিত্যাগ করো' (সূরা আনআম ৯২)।

কারামত ৫৬ ঃ একদিন তাঁর এক একনিষ্ঠ ভক্তের খেয়াল হলো, তিনিই সর্বদা ইমামতি করেন— কারণ কী? এই ধারণা নিয়ে তিনি হজরতের দরবারে গেলেন। হজরত র. বললেন, শাফেয়ী ও মালেকীর অভিমত এই যে, ইমাম-মোকতাদী সবাইকে সূরা ফাতেহা পড়তে হবে। তাই ওই দুই মাযহাবের অনুসারী ইমাম ও মুকতাদী সকলে সূরা ফাতিহা পাঠ করে থাকেন। বিশুদ্ধ হাদিসেও এর প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু ইমাম আজম র. বলেছেন, ইমামের ক্বেরাতই মুকতাদীর ক্বেরাত। মুক্তাদীর সূরা ফাতেহা পড়তে হবে না এবং হানাফী মাযহাবের ফিকাহশাস্ত্রবিদগণ এই অভিমতটিই মেনে চলেন। কোনো কোনো দুর্বল বর্ণনায় মুকতাদীর সূরা ফাতেহা পড়াকে জায়েয বলা হয়েছে। আমি যতদূর সম্ভব সকল ইমামের মাযহাবকে সমন্বয় করার চেষ্টা করি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সমন্বয় সম্ভব হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি নিজে ইমামতি করি।

কারামত ৫৭ ঃ প্লেগ রোগ যখন মহামারীরূপ ধারণ করেছিলো, তখন এক লোক ভয়ানক এক দুঃস্বপ্ন দেখলেন। হজরতের কাছে সে কথা জানালেন। তিনি বললেন, 'হিসনে হাসীন' খতম করো। ওই লোক নির্দেশ পালন করলেন। তারপর হজরতের দোয়াপ্রার্থী হলেন। তিনি যথারীতি দোয়া করার পর বললেন, দোয়া করার সময় দেখলাম, তোমাদের পাশে একটি দূর্গ স্থাপন করা হয়েছে, যার প্রাচীর মজবুত নয়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, খতমের মধ্যে কোনো ত্রুটি হয়েছে। লোকটি বললো, জী হ্যাঁ। 'হিসনে হাসীনের' অনুলিপিটি পুরাতন ছিলো। তাই কোনো কোনো পৃষ্ঠা পাঠ করা সম্ভব হয়নি। আবার কোনো কোনো পৃষ্ঠা ভুল পড়া হয়েছে। ওই লোক পুনরায় খতম পড়ালেন। এর পর পুনরায় এসে খতম পড়ার কথা জানালেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ। এবার সঠিক হয়েছে। লোকটি কঠিন প্লেগ ব্যাধিগ্রস্ত ছিলো। চিকিৎসকরাও তার সুস্থতার ব্যাপারে হতাশ হয়েছিলো। এই ঘটনার পর সে দ্রুত সুস্থ হয়ে গেলো।

কারামত ৫৮ ঃ এক সফরে হজরত র. এক পল্লীতে অবস্থান গ্রহণ করলেন। তিনি বললেন, আমাকে দেখানো হয়েছে, আজ এই পল্লীতে আগুন লেগে আসবাবপত্রসহ ঘর পুড়ে যাবে। বন্ধু মহলে পরস্পরের মধ্যে প্রচার করে দাও, তারা সকলে যেনো বার বার এই দোয়া পড়তে থাকে। তাহলে তারা আগুন থেকে নিরাপদে থাকবে। দোয়াটি হচ্ছে— 'আউযু বিকালিমাতিল্লাহিত্ ত্বম্মাতি মিন শার্‌রি মা খলাক্ব"।

কিছুক্ষণ পরেই ওই পল্লীতে আগুন লেগে গেলো। ক্রমে ক্রমে আগুন ভয়াল আকার ধারণ করলো। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ক্রমশঃ এতো ঊর্ধ্বগামী হলো যে, চেষ্টা করেও নেভানো সম্ভব হলো না। লোকজন খুব ছুটাছুটি করলো। কিন্তু কোনো লাভ হলো না। অনেক ঘর এবং মালামাল পুড়ে ভস্ম হয়ে গেলো। কিন্তু নিরাপদ রইলেন

হজরতের প্রিয়জনেরা। মাওলানা আবদুল মুমিন যিনি অত্যন্ত বিজ্ঞ ব্যক্তি ও হজরতের মুরিদ ছিলেন, কেবল তাঁর আসবাব পত্র পুড়ে গেলো। এর কারণ হজরত যে দোয়া পড়ার কথা বলেছিলেন, তা তাঁকে কেউ জানাননি। তিনি সেখানে পৌঁছেছিলেন কিছু বিলম্বে।

কারামত ৫৯ ঃ হজরত র. লাহোর আগমন করলেন। এশা নামাজের পরে এক ঘরের নিকটবর্তী স্থানে দাঁড়িয়ে বললেন, তোমরা কেউই এই দেয়ালটির কাছে আসবে না। এখানে কেউ শয়ন করবে না। অথচ অন্যান্য দেয়াল থেকে এই দেয়ালটি ছিলো বেশী মজবুত। তখন বর্ষার মওসুমও ছিলো না। তাই সবাই একটু আশ্চর্যই হলো। অবশেষে ঘটনা ঘটলো সেরকমই। রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হতে না হতেই দেয়ালটি ধসে পড়লো। এক ক্রীতদাসী দেয়ালটির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো। তার উপরে পতিত হলো কয়েক খণ্ড পাথর।

কারামত ৬০ ঃ মির্জা মোজাফ্ফর সেরহিন্দের সেনাপতি ছিলেন। তখন ছিলেন জিতপুর প্রদেশে। তিনি সরকাশ পাহাড়বাসীদের প্রতি আক্রমণের ইচ্ছা করলেন। আক্রমণের আগে এক দরবেশের কাছে গিয়ে এ ব্যাপারে সুসংবাদ পাওয়ার ইচ্ছা করলেন। দরবেশ বিজয়ের সুসংবাদ দিলেন। কিন্তু তাঁর অন্তরে এ বিষয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হলো। তাই তিনি হজরত মোজাদ্দেদ র. এর কাছে চিঠি লিখলেন। হজরত উত্তরে লিখলেন, এ আক্রমণে সেনাপতির দলের পরাজয় ঘটবে। সুসংবাদ দেওয়ার ব্যাপারে ব্যস্ততা অবলম্বন করা হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো বিষয় দিবালোকের মতো স্পষ্ট না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো মন্তব্য করা ঠিক নয়। তিন চার দিন পর সেনাপতি ও তার সেনারা পাহাড়বাসীদের প্রতি আক্রমণ করলো। পরাজিত হলো। পতাকা ও সমরসম্ভার হারিয়ে বিপর্যস্ত ও চিন্তিত অবস্থায় পশ্চাদপসরণ করলো।

কারামত ৬১ঃ হজরতের এক মুরিদ বর্ণনা করেন, আমি অসুস্থ ছিলাম। শরীর ছিলো অত্যুপ্ত। দুর্বলতা এতোই বৃদ্ধি পেয়েছিলো যে, জীবনের আশা ছেড়ে দিলাম। আত্মীয়-স্বজনেরা রাত জেগে আমার সেবা-যত্ন করে চললো। আমি রোগযন্ত্রণার মধ্যেও হজরত র. এর প্রতি মনোনিবদ্ধ করলাম। দেখলাম, এক লোক একটি বড় শাদা চাদরে আপাদমস্তক আবৃত অবস্থায় বের হলো। লোকটি বললো, এই চাদরটি সরওয়ারে কায়েনাত সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া আসহাবিহী ওয়া সাল্লাম কুতুবিয়াত দানের সময় শায়েখ আহমদ ফারুকী নকশবন্দির জন্য পাঠিয়েছিলেন। এখন এটা তোমাকে দেওয়া হলো। আমি এই চাদর দিয়ে তোমাকে ঢেকে দিচ্ছি। ইনশাআল্লাহ্ তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে। একথা বলে তিনি ওই চাদর দিয়ে আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢেকে দিলেন। আমি চাদরখানি স্পর্শ করতে চাইলাম। কিন্তু পারলাম না। আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত

শীতল হয়ে গেলো। আমার বোন এরূপ অবস্থা দেখে ভাবলো আমার সময় শেষ। সে আমাকে তার কোলে তুলে নিয়ে চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করলো। আমি তার চিৎকারে জেগে উঠলাম। বললাম, আমি সুস্থ হয়ে যাবো। চিন্তা করো না। আমি শুরবা খেতে চাইলাম। শুরবা হাজির করা হলো। আমি তা পান করলাম। অতঃপর সুস্থ হয়ে গেলাম।

কারামত ৬২ ঃ এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন, আমি এবং আমার বন্ধু যিনি হজরতের মুরিদ ছিলেন— আমরা দু'জন আমাদের ঘরে দাওয়া (মাদক মিশ্রিত পানীয়) তৈরী করলাম। তার মধ্যে আফিম মেশানো হলো। বিষয়টি আমরা দু'জন ছাড়া আর কেউ জানে না। আমরা দু'জন জোহরের নামাজ পড়ে হজরতের মজলিসে উপস্থিত হলাম। পরিকল্পনা ছিলো সেখান থেকে ফিরে এসে আমরা দাওয়া পান করবো। হজরত মোজাদ্দেদ র. স্বীয় কক্ষে প্রবেশ করছিলেন। হঠাৎ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আমাদের দু'জনকে ডেকে বললেন, বেহেশতের হুরগণ তোমাদের অপরাধের সমালোচনা শুরু করে দিয়েছে। পার্থিব বিলাসিতাকে পরিত্যাগ করে পরকালের শান্তি অন্বেষণের প্রতি ধাবিত হও। দাওয়া কখনোই পান কোরো না। আমরা অত্যন্ত চিন্তিত হলাম এবং যথারীতি হজরতের আদেশ পালন করলাম।

কারামত ৬৩ ঃ ওই ব্যক্তি বর্ণনা করেন, আমার মা খুবই অসুস্থ ছিলো। আমি হজরত বাহাউদ্দীন নকশবন্দ কুদ্দিসা সিররুহুর আত্মার সওয়াব প্রেরণের জন্য হজরত র. এর দরবারে কিছু সামগ্রী প্রেরণ করলাম এবং মায়ের সুস্থতার জন্য দোয়া করার নিবেদন জানালাম। হজরত র. বললেন, হাদিয়া তোমার কাছে রেখে দাও। আমি মনোক্ষুণ্ন হয়ে ফিরে এলাম। রাতে স্বপ্নে দেখলাম, তিনি আমাকে বললেন, ওহে ওঠো। তোমার মায়ের শেষ সময় উপস্থিত। তার কাছে যাও। আমি জেগে অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় হজরতের দরবারে উপস্থিত হলাম। দেখলাম, তিনি সবে তাহাজ্জুদ নামাজ শেষ করেছেন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম এবং স্বপ্নের কথা বললাম। তিনি কিছু সময় ধ্যানমগ্ন থেকে বললেন— তুমি দ্রুত তোমার মায়ের কাছে যাও। তাঁর বিদায়ের সময় নিকটবর্তী। আমি ক্রন্দনরত অবস্থায় ঘরে ফিরে এলাম। তাঁর শয্যাপাশে দাঁড়ালাম। একটু পরেই তিনি ইন্তেকাল করলেন।

কারামত ৬৪ ঃ হজরতের এক মুরিদ বর্ণনা করেন, যে সময় আমি দ্বীনের দুশমনদের চোগলখুরীর কারণে বাদশাহ্‌র হাতে নির্যাতিত হয়েছিলাম, সেই সময় এক মন্ত্রবিশেষজ্ঞ বললো, আমি হিন্দী ভাষায় এমন কিছু এসেম জানি, যদি কেউ ওই এসেম জোহর থেকে নিয়ে আসর পর্যন্ত পড়ে তাহলে শত্রু বিনাশ হয়ে যাবে। এটি পরীক্ষিত। ওই ব্যক্তি এসেমগুলো কাগজে লিখে দিয়ে বললো, তোমার বাড়ীর ছাদে কাঠের মধ্যে এগুলো রাখবে। আমি তার কাছ থেকে এ এসেম শিখে

নিলাম। আর ওই কাগজ বাড়ির ছাদে রেখে দিলাম। মনে মনে ঠিক করলাম, মঙ্গলবার ওই এসেম পড়বো। ওই রাতে স্বপ্ন দেখলাম, হজরত মোজাদ্দেদ র. তাঁর শাহাদাত আঙ্গুল কামড়ে ধরে বলছেন, আমার মুরিদ হয়ে তুমি এমন কাজ করবে এটা বড়ই আশ্চর্যের বিষয়। ওটা তো যাদু। বাধ্য হয়ে আমি তা পরিত্যাগ করলাম। উল্লেখ্য, হজরত মোজাদ্দেদ র. তখন গোয়ালিয়র দূর্গে বন্দী অবস্থায় ছিলেন। এরপর বাদশাহ্ তাঁকে কষ্ট দেওয়ার জন্য লজ্জিত হন। তাঁকে সসম্মানে মুক্তি দিয়ে সেরহিন্দ শরীফে পৌঁছে দেন। আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভের উদ্দেশ্যে সেরহিন্দ উপস্থিত হলাম। ভাবলাম, তিনি যদি নিজে থেকে আমাকে ওই এসেম থেকে বিরত থাকতে না বলেন, তাহলে আমি তা অন্তত একবার শত্রুর প্রতি অবশ্যই প্রয়োগ করবো। আর যদি নিষেধ করেন তাহলে বিরত থাকবো। আমি তিন দিন পর্যন্ত সেরহিন্দে অবস্থান করলাম। তিন দিনই তাঁর দরবারে উপস্থিত হলাম। শেষ দিন সমাবেশ শেষে স্বীয় কক্ষে প্রবেশের প্রাক্কালে দরজার কাছে দাঁড়ালেন। বললেন, ওমুক ব্যক্তিকে ডেকে আনো। আমি উপস্থিত হলে বললেন, ওই হিন্দী এসেম হচ্ছে যাদু। যাদুর চিন্তা মন থেকে মুছে ফেলো। আমি লজ্জাবশতঃ যাদুর কথা অস্বীকার করলাম। তিনি বললেন, অস্বীকার করো কেনো? তুমি তো ওই এসেম অমুক যাদুকরের কাছ থেকে শিখেছো। তিনি যাদুকরের নামও বলে দিলেন। আরো বললেন, এসেম লেখা কাগজ তো তুমি তোমার বাড়ির ছাদে কাঠের মধ্যে রেখে দিয়েছো। এ এসেমের প্রতিক্রিয়া ওই রকমই, যেরকম যাদুকর তোমাকে বলেছে। কিন্তু যাদু তো হারাম। যাও! ওটাকে ছিঁড়ে ফেলো। আমি সম্মত হলাম। তিনি বললেন, ওয়াদা করো বাড়ি গিয়ে প্রথমেই ওই কাগজ ছিঁড়ে ফেলবে। তিনি অঙ্গীকার করানোর জন্য তাঁর পবিত্র হাত আমার হাতের উপর রাখলেন, আমি তাঁর কারামত দেখে বিস্মিত হলাম।

কারামত ৬৫ ঃ হজরত র. এর এক মুরিদ বর্ণনা করেছেন, এক মৌলভী সাহেব খাজা সাহেবের শিশু সন্তানকে পড়াতেন। খাজা সাহেব পড়ালেখা করানোর জন্য তাঁর বাড়ির প্রবেশদ্বারের পাশে একটি ঘর দিয়েছিলেন। কখনো কখনো শিশুর অবস্থা দেখার জন্য তার মা সেখানে এসে দাঁড়াতেন। কখনো কখনো তার প্রতি মৌলভী সাহেবের দৃষ্টি পতিত হতো। মৌলভী সাহেব তাঁর প্রেমে পড়ে গেলেন। তাঁর আচরণ হতে লাগলো অস্বাভাবিক।

আল্লামা বদরুদ্দীন সেরহিন্দী বলেন, মৌলভী সাহেব ছিলো আমার পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে বলো? তোমার এই সদাবিষণ্নতার কারণ কী? তিনি বললেন, সম্রাজ্ঞীর প্রেম এই তৃষ্ণার্ত হৃদয়ে পতিত হয়ে হৃদয়কে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে। বিবেকের প্রাচীর হয়েছে সমূলে উৎপাটিত। তার স্থলে এখন কেবলই প্রেমাসক্তি। আপনার পক্ষে যদি সম্ভব হয়, তাহলে হজরতের কাছে গিয়ে আমার দুরাবস্থার কথা বলতে পারেন। আমি

বললাম, তুমি লিখে দাও। তোমার পত্র আমি হজরতের কাছে পৌঁছে দেবো। তিনি তার প্রকৃত অবস্থা হুবহু লিখে দিলেন। আমি এশা নামাজের সময় হজরতকে একাকী পেয়ে চিঠিটি দিলাম। বললাম, ওই মহিলা খাজা ওবায়দুল্লাহ আহরার র. এর বংশধর। হজরতের তাওয়াজ্জোহ একান্ত প্রয়োজন। হজরত বললেন, ওকে বলে দাও, আগামীকাল ফজর নামাজের পরে জিকিরের মজলিসে সে যেনো আমার সামনাসামনি বসে। আমি একথা তাকে বললাম। তিনি নির্দেশ পালন করলেন। ফজর নামাজের পর সামনে বসলেন। তিনি তার উপর তাওয়াজ্জোহ দিয়ে ওই প্রতারণামূলক ভালোবাসা অপসারিত করলেন। জিকিরের মজলিস থেকে বের হলে আমি মৌলভী সাহেবের সামনে দাঁড়ালাম। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমার অন্তরে ওই মহিলার আসক্তি আর নেই।

কারামত ৬৬ ঃ হজরতের একনিষ্ঠ ভক্তদের মধ্যে একজন আমীর ছিলেন। তিনি হজরতের নিকটবর্তী মালিকে আহমদ এলাকায় বসবাস করতেন। একদিন হজরত তাকে জানালেন, তুমি এ স্থান ছেড়ে চলে যাও। নয়তো তোমার প্রতি বড় ধরনের বিপদ আপতিত হবে। ঘটনাক্রমে ওই আমীরের পক্ষে ওই এলাকা ত্যাগ করা সম্ভব হলো না। যথাসময়ে তিনি বাদশাহের রোষানলে পড়লেন। বিভিন্ন বিপদমুসিবতের সম্মুখীন হলেন।

কারামত ৬৭ ঃ হজরতের এক একনিষ্ঠ ভক্ত ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি একদিন হজরত র. এর কাছে আবেদন জানালেন, আমি বৃদ্ধ হয়েছি, আমার কোনো সন্তান-সন্ততি নেই। হজরত র. তাঁকে তাওয়াজ্জোহ দিলেন। কিছুক্ষণ মোরাকাবায় থেকে বললেন, তোমার বর্তমান বিবির গর্ভে লওহে মাহফুজে কোনো সন্তান লেখা নেই, যদি তুমি দ্বিতীয় বিবাহ করো তাহলে অবশ্যই তোমার সন্তান হবে। ঘটনাক্রমে তাঁর প্রথম স্ত্রী মৃত্যুবরণ করলো। তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করলেন। পেলেন একটি পুত্র সন্তান।

কারামত ৬৮ ঃ হজরত র. এর এক আত্মীয় বর্ণনা করেন, আমি সবসময় ভাবতাম, হজরত র. এর নিকট থেকে তরিকত শিক্ষা গ্রহণ করবো। কিন্তু নানাবিধ প্রতিবন্ধকতায় সিদ্ধান্তটি নিতে বিলম্ব হয়ে গেলো। একরাতে আমি দৃঢ়সংকল্প গ্রহণ করলাম। ওই রাতেই স্বপ্নে দেখলাম, এক গভীর সমুদ্রের এক উপকূলে দাঁড়িয়ে আছি। অপরপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন হজরত মোজাদ্দেদ র.। আমি অপর প্রান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করলাম। ইত্যবসরে হজরতের করুণার দৃষ্টি আমার প্রতি পতিত হলো। বললেন, তাড়াতাড়ি এসো। তুমি অনেক দেরি করে ফেলেছো।

তাঁর এ কথা শোনার সাথে সাথে আমার কলবে জিকির জারী হয়ে গেলো। যখন জাগ্রত হলাম, তখনও জিকির জারি আছে বুঝলাম। সকালে হজরতের দরবারে পৌঁছে বিগত রাতের স্বপ্ন, কারামত ও জিকিরের কথা জানালাম। তিনি বললেন, এটাই আমার তরিকা। এটাকে ধরে রেখো।

কারামত ৬৯ ঃ হজরত মোজাদ্দেদ র. এর একনিষ্ঠ অনুরক্ত নায়েব মাওলানা মোরতজা বলেন, একবার আমি সেনাবাহিনীতে গিয়েছিলাম। আমার বদলীর ব্যাপারে আমি প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিলাম। ওই সময়ে বিষয়টি ছিলো খুবই জটিল। কারণ অনেক দূরবর্তী এলাকার সৈন্যরাও সেখানে অবস্থান করছিলো। তাদের বদলীর প্রচেষ্টাও বারবার ব্যর্থ হচ্ছিলো। আমি হতাশ হলাম। এক রাতে হজরতের প্রতি বাতেনীভাবে খেয়াল করলাম। তাঁর সাহায্য কামনা করলাম। স্বপ্নে তিনি এলেন, আমার হাতে একটি কাগজ ছিলো। কাগজটি নিয়ে তিনি নিজের কলম দিয়ে সেখানে কিছু লিখলেন। তারপর আমার কাছে ফেরত দিলেন। সকালে আমি আমার কাজের জন্য দপ্তরে গেলাম। ওই দিনই আমার আবেদন মঞ্জুর হলো। সৈন্যরা বিস্মিত হলো। তারা বললো, দু'তিন দিনের মধ্যে তোমার কাজ কী করে হলো? আমরা তো বছর ধরে চেষ্টা করে যাচ্ছি। আমি তখন এই ঘটনা বর্ণনা করলাম। সকলে এই কারামত বিশ্বাস করলো।

কারামত ৭০ ঃ উপর্যুক্ত ব্যক্তি বর্ণনা করেন, আমার পিতা মৃত্যুর পূর্বে এই মর্মে অসিয়ত করে গিয়েছিলেন যে, আমার মৃত্যুর পর আমার মরদেহ হজরত র. এর খেদমতে নিয়ে যাবে। আর আমাকে তার তরিকার অন্তর্ভুক্ত করার আবেদন জানাবে। হজরতের তরিকা এরূপও ছিলো যে, তিনি মৃত ব্যক্তিকেও তাঁর তরিকার নেসবত দান করতেন। আমার পিতার মৃত্যুর পর তাঁর জানাযা হজরতের দরবারে নিয়ে গেলাম। তাঁর বাসনার কথা প্রকাশ করলাম। তিনি বললেন, আগামীকাল জিকিরের মজলিসে আমাকে বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিয়ো। পরদিন জিকিরের মজলিসে বসলে আমার ফানার হাল দেখলাম। হজরত র. বসে আছেন, আর আমার পিতা ওই মজলিসে একজন লোকের পরেই বসে জিকিরে লিপ্ত রয়েছেন। আমি আল্লাহ্‌র শোকরিয়া আদায় করলাম।

কারামত ৭১ ঃ ওই একই ব্যক্তি বর্ণনা করেন, যখন হজরত র. গোয়ালিয়র দূর্গে নবী ইউসুফ আ. এর মতো কারারুদ্ধ ছিলেন, তখন সেরহিন্দে হজরতের ইন্তেকালের গুজব ছড়িয়ে পড়লো। আমি খুবই চিন্তিত ও মর্মাহত হলাম। দোয়া করলাম। ওই রাতে স্বপ্নে দেখলাম, আমি শোকার্ত অবস্থায় উপবিষ্ট। সেখানে হজরত র. কয়েকজন দরবেশের সাথে বসে আছেন। তিনি বললেন, আমার ইন্তে কালের সংবাদটি মিথ্যা। আমি জাগ্রত হয়ে বিভিন্ন দিক থেকে খবর নিলাম। সব দিক থেকে একের পর এক হজরতের নিরাপদ অবস্থার সংবাদই শুনতে পেলাম।

কারামত ৭২ ঃ মাওলানা মোহাম্মদ আমিন যার সম্পর্কে ইতোপূর্বে আলোচনা হয়েছে— তিনি বর্ণনা করেন, নবাব শেরে খাজা পিতৃকুলের দিক দিয়ে সাইয়্যেদ বংশের এবং মাতৃকুলের দিক দিয়ে খাজা বংশের। তাঁর পূর্বপুরুষগণ সকলেই সম্ভ্রান্ত ছিলেন। আমি হজরত মোজাদ্দেদ র. কে বললাম, ওই ব্যক্তি মদ্য পান এবং পাপাচারে লিপ্ত রয়েছে। আপনি তাকে উদ্ধার করুন। সে শ্রেষ্ঠ আমীরদের

অন্যতম। সে যদি রক্ষা পায়, তবে অনেক সৈন্য পাপাচার থেকে রক্ষা পাবে। হজরত মোজাদ্দেদ র. নিশ্চুপ রইলেন। মাওলানা সাহেব পুনঃ পুনঃ অনুরোধ জানাতে লাগলেন। শেষে তিনি তাওয়াজ্জোহ্ দিলেন এবং বললেন, মাওলানা সাহেব! আমি শেরে খাজার হালের প্রতি তাওয়াজ্জোহ্ দিলাম। সেতো বহুবিধ পাপাচারে নিমজ্জিত। আমি অনেক তাওয়াজ্জোহ দিলাম। কিন্তু কাজ হলো না। কিন্তু ইনশাল্লাহ্ অবশেষে আমি তাকে আমার দিকে টেনে আনতে সক্ষম হবো। এই আশ্বাস ঘোষণার পর বহুকাল অতিবাহিত হলো। যখন দ্বীনদার বাদশাহ্ হাফেজ শাহজাহান সাল্লামাহুর রহমানের শাসনকাল এলো (সম্রাট শাহজাহানের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার তারিখ ১০৩৭ হিজরী 'জিনাতে শরা'), তখন শেরে খাজা সকল প্রকার পাপাচার থেকে তওবা করে আত্মসংশোধনে সক্ষম হলেন। তিনি নিজে নিজেই আল্লাহ্র আনুগত্য ও ইবাদতে মশগুল হয়ে গেলেন। ইতোমধ্যে তাকে ঠাটঠা প্রদেশের প্রশাসক করে পাঠানো হলো। কিন্তু যখন তিনি সেরহিন্দের নিকটবর্তী হলেন, তখন অসুস্থ হয়ে সেরহিন্দের পাশ্ববর্তী এক স্থানে ইন্তেকাল করলেন। তাঁর পুত্র তাঁর লাশ সেরহিন্দে হজরত মোজাদ্দেদ র. এর রওজার কাছে নিয়ে এলেন। সেখানেই দাফন করা হলো। হজরত মোজাদ্দেদ র. বলেছিলেন, অবশেষে আমি তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবো। সে কথার সত্যতা প্রমাণিত হলো।

কারামত ৭৩ ঃ বাদশাহ্ আকবরের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীরের [১] ক্ষমতাসীন হওয়ার সময় মীর্জা শাহরুখের পুত্র মীর্জা ফতেহপুরী বিদ্রোহ করলো। ঘটনা প্রসঙ্গে খাজা কেলান আবদুর রহমান খানকে তার বিদ্রোহের বিষয়টি অবহিত করলেন। খাজা মওসুফ খান তার প্রতি আক্রমণ পরিচালনা করে তাকে বন্দী করলেন। তাকে সম্রাট জাহাঙ্গীরের কাছে আনা হলো। সম্রাট তাকে দীর্ঘকাল বন্দী করে রাখলেন। তার মুক্তির ব্যাপারে কেউ কথা তুললে তিনি বলতেন, তার জামিনদার কে হবে? সে বিদ্রোহী থাকায় কেউ তার জামিনদার হতে রাজি হতো না। ক্রমে ক্রমে বিষয়টি গুরুত্বহীন হয়ে পড়লো। ইতোমধ্যে হজরত মোজাদ্দেদ র. কে আগ্রা পর্যন্ত সফর করতে হলো। তিনি কাঠ্ঠা মোজাফফার খান এলাকায় অবস্থান গ্রহণ করলেন। মীর্জা ফতেহপুরী হজরত মোজাদ্দেদ র. এর আগমনের খবর জানতে পেরে তাঁর একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করলেন এবং তাঁর মুক্তির সুপারিশের জন্য আবেদন করলেন। হজরত বললেন, যাও, মীর্জা ফতেহপুরী মুক্ত হবে। লোকটি বললো, কবে? তিনি বললেন, আগামী কাল। পর দিন সম্রাট নিজেই তাঁকে স্মরণ করলেন। লোক মারফত তাঁকে কাছে ডেকে এনে মুক্ত করে দিলেন। বললেন, যাও আমি নিজেই তোমার জামিনদার হলাম।

---

১. সম্রাট জাহাঙ্গীর ১০১৪ হিজরীতে ক্ষমতাসীন হন এবং ইন্তেকাল করেন ১০৩৭ হিজরীর ২৮শে সফরে।

কারামত ৭৪ ঃ হজরত খাজা হুছামুদ্দীন আহমদ দেহলভী র. হজরত মোজাদ্দেদ র. এর প্রতি প্রেরিত এক চিঠিতে লিখলেন, আমি হারামাইন শরীফ জিয়ারতের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমার ইচ্ছা আমার অনুগামীদের নিয়ে এই মোবারক সফর করবো। এক সাথে থাকবো, মৃত্যু হলে একত্রে দাফন হয়ে যাবো। আপনি তাওয়াজ্জোহের মাধ্যমে বিষয়টি অবহিত করবেন যে, আমার এমতো আশা পূরণ হবে কি না। হজরত মোজাদ্দেদ র. উত্তরে লিখলেন, আপনার ও আপনার অনুগামীদের এই সফর দৃষ্টিগোচর হলো না। বরং প্রতিবন্ধকতা দেখতে পাচ্ছি। তবে হ্যাঁ, যদি একাকী সফর করেন, তাহলে উত্তম হবে। আশা করি নিরাপদে পৌঁছে যাবেন। খাজা হুছামুদ্দীন আহমদ বিষয়টি সম্পর্কে সন্দিহান হলেন। তিনি পরিবারবর্গসহ একত্রে হজ্ব করার জন্য চেষ্টা করলেন। এমনকি সম্রাট শাহজাহানকেও বিষয়টি অবহিত করলেন। কিন্তু অনুমতি পেলেন না। হজরত র. এর ভবিষ্যদ্বাণীই সত্য প্রমাণিত হলো। তিনি হিন্দুস্তানে [১] ১০৪৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

কারামত ৭৫ ঃ মাওলানা মোহাম্মদ হানীফ কাবেলী [২] যিনি হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম সাল্লামাল্লাহুর সম্মানিত খলিফা ছিলেন, কাবুলে তরিকত প্রচার, প্রসার ও প্রশিক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন— হজরত শায়েখ মোহাম্মদ সিদ্দীক (শায়েখ বাদশাহ্‌র পুত্র) যিনি কান্দাহারের নিকটবর্তী কাওলাব এলাকার অধিবাসী, বর্তমানে কাবুলে অবস্থান করছেন। তিনি বলেছেন, আমার অবকাশকালীন সময়ে আমি বোরহানপুরের দিকে যাত্রা করলাম। সেরহিন্দের পথ ধরলাম। পথিমধ্যে হজরত মোজাদ্দেদ র. এর অনেক প্রশংসা শুনলাম। লোকেরা বলাবলি করলো, হজরত মোজাদ্দেদ র. এর নিকট থেকে যা পাওয়া যায় সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করেও এর বিন্দু পরিমাণও কোথাও পাওয়া যায় না। এ সকল কথা শুনে আমি খুবই খুশি হলাম। নীরবে তাঁর কাছে পৌঁছে গেলাম। খানকাতে উপস্থিত হয়ে দেখলাম, জোহর নামাজ শেষে তিনি সাথীদের নিয়ে মোরাকাবা করছেন। আমি এক কোণে বসে গেলাম। মোরাকাবা শেষে সালাম দিলাম এবং তাঁর কদমবুছি করলাম। তিনি আমার বাতেনী অবস্থা জিজ্ঞেস করে বললেন, 'হে দরবেশ! তোমার মনে যা কিছু আছে খুলে বলো, কোনোকিছু গোপন কোরো না'। আমি আমার প্রকৃত অবস্থা গোপন করলাম। বললাম, আমার

---

১. খাজা হুছামুদ্দীন আহমদ দেহলভী র. আবুল ফজলের ভগ্নিপতি এবং হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ র. এর প্রিয় খলিফা ছিলেন। পরবর্তীতে হজরত মোজাদ্দেদ র. এর প্রতি ফিরে এসেছিলেন। তিনি ১০৪৩ হিজরী ১লা সফর আগ্রায় ইন্তেকাল করেন। পরে হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ র. এর রওজার নিকট দিল্লীতে দাফন করা হয়।

২. মাওলানা মোহাম্মদ হানীফকে মীর মহোম্মদ নো'মান ১০৩৭ হিজরীতে খাজা মোহাম্মদ মাসুমের কাছে বায়াত করিয়েছিলেন। তিনি ১০৭৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

তো কোনো হালই নেই। তিনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমার পদস্খলনের অবস্থা হুবহু বর্ণনা করলেন। সবকিছু শুনে আমি বিমর্ষ হলাম। এরপর তিনি নির্জনে গমনের সময় আমাকে বললেন, আগামী কাল ইশরাকের পরে এসো। পরবর্তী দিনে নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলাম। ঘটনা এই ঘটলো যে, তিনি ইশরাক নামাজের পরেই নির্জন কক্ষে চলে গেলেন। আমি কিছু সময় দাঁড়িয়ে রইলাম। দেখলাম, এক সূফী সাহেব মসজিদের এক কোণে বসে আছেন। তাঁকে বললাম, হজরত যখন বাইরে আসবেন তখন বলবেন, এক লোক আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে এসেছিলেন। আপনার কাছে দোয়া চেয়ে বোরহানপুর রওয়ানা হয়ে গেলেন।

সূফী সাহেব বললেন, তিনি তো আপনার জন্যই আমাকে এখানে বসিয়ে রেখে গিয়েছেন। বলেছেন, মোহাম্মদ সিদ্দীক নামে এক ব্যক্তি এলে আমাকে খবর দিবেন। বিস্মিত হলাম। আমার নাম আমি তো তাঁকে বলিনি। সূফী সাহেব হজরত র. এর নির্জন প্রকোষ্ঠে পৌঁছে আমার দোয়ার দরখাস্ত জানালেন। তিনি আমাকে ভিতরে ডাকলেন। নিজে ওজু করলেন। তাহিয়্যাতুল ওজুর নামাজ আদায় করলেন। অতঃপর মোরাকাবায় মগ্ন হলেন। একটু পর বললেন, সামনে এসো। আমি এগিয়ে গেলাম। অতঃপর তিনি পুনরায় মোরাকাবায় বসলেন। এরপর আমার কৃলবে জিকির জারি করলেন। আমার অবস্থা মুহূর্তেই পরিবর্তন হতে লাগলো। তিনি এক ঘণ্টার মধ্যে আমাকে যে মারেফাত দান করলেন, এক বছর কাল রেয়াজত করেও তার একবিন্দু পরিমাণও অর্জন করা সম্ভব নয়। আর আমার প্রতি যে সকল হাল হতে লাগলো, তিনি সেগুলোর বিবরণ সাথে সাথে দিতে লাগলেন। এভাবে আমার অভ্যন্তরের সকল হালের কথাই বলে দিলেন। তিনি শেষে আমাকে বোরহানপুরের উদ্দেশ্যে বিদায় করে দিলেন ।

কারামত ৭৬ ঃ মাওলানা মোহাম্মদ হানীফ কাবেলী র. বর্ণনা করেন, এক প্রবীণ দরবেশ আমাকে বলেছেন, আমি হারামাইন সফরের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলাম। যখন সেরহিন্দ পৌঁছে হজরতের মহান দরবারে হাজির হলাম তখন তিনি এশার নামাজ শেষ করে তাঁর নিজস্ব কক্ষে যাবার উদ্যোগ নিচ্ছিলেন। আমি সালাম দিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে বললেন, হে দরবেশ! সময় বড়ই উত্তম, এই রুটি তোমার মোর্শেদের পক্ষ থেকে তরিকতপ্রশিক্ষণের জন্য যথেষ্ট। আমি হজরত র. থেকে বিদায় নিলাম। প্রতি মুহূর্তে আমার হাল বৃদ্ধি পেতে লাগলো।

কারামত ৭৭ ঃ হজরত মোজাদ্দেদ র. এর এক বিশ্বস্ত ভক্ত বর্ণনা করেন, একদা এক দুশ্চরিত্রার সাথে যোগাযোগের কারণে আমার মধ্যে প্রণয়াসক্তি তৈরী হলো। নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললাম। একদিন আমি তাকে আমার

নির্জন কক্ষে ডেকে আনলাম। উন্মাদনা চরিতার্থ করতে উদ্যত হলাম। হঠাৎ হজরত উপস্থিত হলেন। আমার মুখে চপেটাঘাত করে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমার সমস্ত শরীর ঘেমে গেলো। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলাম। শেষে লজ্জিত হয়ে তওবা করলাম।

কারামত ৭৮ ঃ হজরত মোজাদ্দেদ র. এর প্রবীণ মুরিদ ও খলিফা শায়েখ নূর মোহাম্মদ তিহারী [১] তাঁর জীবদ্দশায় আটবার রসুলুল্লাহ স. এর দর্শন লাভ করেছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন, এক ঘরে এক জ্বিন থাকতো। সে সর্বদাই আমার ভাইয়ের ক্ষতি করতো। তার অত্যাচারের কারণে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আমিও ওই ঘরে থাকতাম। ভাইয়ের মৃত্যুর পর সে আমাকে তার বীভৎস আকৃতি দেখাতে লাগলো। কখনো ফুলের সুবাস আমার মস্তক পর্যন্ত উঠে যেতো। আমার ভাইয়ের যেমন অবস্থা হয়েছিলো, আমারও তেমন অবস্থা হতে লাগলো। তখন আত্মীয় ও হিতাকাঙ্ক্ষীগণ আমার জীবনের ব্যাপারেও হতাশ হয়ে গেলেন। এক রাতের ঘটনা— আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে ছিলাম। তখনও ঘুম আসেনি। হঠাৎ ওই জিন এসে আমাদের দু'জনের উপর চড়াও হলো। এমনভাবে চেপে ধরলো যে, আমরা নড়াচড়া করতে পারলাম না। সহসা উপস্থিত হলেন হজরত মোজাদ্দেদ র.। উচ্চস্বরে বললেন, নুর মোহাম্মদ! ভয় কোরো না। এই জ্বিন এখনই পালিয়ে যাবে। 'ইন্না কাইদাশ্ শাইত্বনা কানা জয়ীফা' (নিঃসন্দেহে শয়তানের চক্রান্ত অত্যন্ত দুর্বল)। জ্বিনটি পালিয়ে গেলো। আমি হজরতকে দেখতে চেষ্টা করলাম। পারলাম না। তখন থেকেই জ্বিনের অত্যাচার বন্ধ হলো। আমি দেখলাম, তারা তাদের আসবাবপত্র গুটিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে। বলছে, হজরত র. আমাদেরকে দেশ ছাড়া করে ছাড়লেন। আমরা শাদীদাল (সুডিডাল) চলে যাচ্ছি।

কারামত ৭৯ ঃ মীর শরফুদ্দীন হুসাইন [২] হাসানীর উপাধি ছিলো হিম্মত খান। তিনি বর্ণনা করেন— একবার আমার খেয়াল হলো কিছু উত্তম মানের মূল্যবান সেলাইকৃত বস্ত্র এবং রান্না করার কিছু মসলা হজরতের দরবারে প্রেরণ করবো। ঘটনাক্রমে আমার শ্বশুরকুলের এক নিকটাত্মীয়া আমার বাড়ির মেহমান হয়েছিলেন। তিনি বললেন, এ ধরনের বস্ত্র দিয়ে দরবেশ ব্যক্তি কী করবেন—

১. শায়েখ নূর মোহাম্মদ তিহারী এবং নূর মোহাম্মদ আম্বলুবী একই ব্যক্তি। মকতুবাতে তাঁর নাম রয়েছে। প্রথম খণ্ডের মধ্যে ৭, ১৪, ১৮,১৭০ এবং দ্বিতীয় খণ্ডের মধ্যে ১৮, ৩৪, ৫০, ৮৫, এবং তৃতীয় খণ্ডের মধ্যে ১১১, ১২৩ নং মকতুব দেখুন। তাঁকে নূর মোহাম্মদ পাটনীও বলা হয়। পাটনাতে তাঁকে হেদায়েতের কাজ পরিচালনার জন্য প্রেরণ করা হয়েছিলো।

২. শরফুদ্দীন হুসাইন বদখশানের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর নামে অনেকগুলো মকতুব রয়েছে। প্রথম খণ্ডে ১৪৬, ১৫৯, ১৮৯, দ্বিতীয় খণ্ডে ২৫, ৩১, ২৮, ৮২ এবং তৃতীয় খণ্ডে ৫৯ নং মকতুব।

তিনি তো নিজে ব্যবহার করবেন না। আমি তাকে বললাম, তিনি নিজে ব্যবহার না করলেও তাঁর পরিবারের কেউ তো ব্যবহার করবে। আমি মসলা ও বস্ত্রগুলো নিয়ে আমার দুধভাইয়ের সঙ্গে রওয়ানা হলাম। যখন আল্লাহ্ ইয়ার বস্ত্র ও মসলা সামগ্রী হজরতের সামনে রাখলেন, তখন তিনি বললেন, মসলাগুলো নিয়ে যাও। বস্ত্রগুলো দেখে বললেন, মীর শরফুদ্দীন হুসাইনকে বলো, বস্ত্রগুলো খুবই মূল্যবান। দরবেশদের জন্য এগুলোর প্রয়োজন নেই, বরং তোমার বাড়িতে যে মহিলা মেহমান রয়েছে, তাকে দাও। সেই এ বস্ত্র ব্যবহারের উপযুক্ত। তিনি বস্ত্রগুলো ফেরত দিলেন। এ কারামত প্রকাশের পর ওই মন্তব্যকারী খুবই লজ্জিত হয়ে তওবা করলেন। বললেন, আর কখনো আমি এ ধরনের কথা বলবো না।

কারামত ৮০ ঃ মীর শরফুদ্দীন হুসাইন আরো বর্ণনা করেছেন, আমার শিশুপুত্র মীর শামসুদ্দীন আহমদের বয়স যখন দুই বছর, তখন দিল্লীর এক পল্লীতে মারাত্মক আকারে মহামারী দেখা দিলো। সে-ও রোগাক্রান্ত হলো। দুই তিন দিন পর্যন্ত দুধ পান করলো না। তাঁর জীবননাশের চিহ্ন প্রকাশিত হলো। পা থেকে জান বেরিয়ে কোমর পর্যন্ত এবং কোমর থেকে বক্ষ পর্যন্ত পোঁছে গেলো। সকলে কাঁদতে শুরু করলো। আমি মহান আল্লাহ্র প্রতি পূর্ণ মনোযোগী হলাম। মানত করলাম, যখন এ শিশুর বয়স ৫/৬ বছর হবে, তখন ধাত্রীমাতাসহ তাকে হজরতের নিকটে প্রেরণ করবো। সে সেখানেই প্রতিপালিত হবে। খানকায় খেদমত করবে আর ইবাদতে লিপ্ত থাকবে। একটু পরেই দেখলাম, তার দেহে প্রাণ ফিরে এসেছে। সে নড়াচড়া করতে লাগলো। চোখ মেললো। দুধ পান করলো। সুস্থ হয়ে গেলো।

বড় কারামত এটাই দেখলাম যে, যেহেতু ওই শিশু মান্নতকৃত ছিলো, তাই কেউ তাকে দুনিয়ামুখী করতে পারলো না। তার দাদা নানা অনেক চেষ্টা করলো, সে যেনো দরবেশ না হয় এবং হজরতের গোলামীতে লিপ্ত না হয়। কিন্তু সফল হলো না। অল্পদিনের ব্যবধানে দু'জনই পৃথিবী থেকে প্রস্থান করলো। তার মা-ও একই প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিলো। কিন্তু সে নিহত হলো তার নিজের গোলামের হাতে।

কারামত ৮১ ঃ একদিন হজরত মোজাদ্দেদ র. একাকী বসে ছিলেন। তাঁর পাশে বসে ছিলেন নওমুসলিম আবদুল মুবিন। তিনি তাঁকে বললেন, বলো, তুমি কী চাও? তিনি বললেন, হুজুর আমার ভাই এবং পিতা উভয়েই আপনাকে অস্বীকার করার ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেও তাদেরকে ইসলামের পথে আনতে পারিনি। আপনি তাওয়াজ্জোহ দিন, তারা যেনো মুসলমান হয়ে যান। হজরত বললেন, অন্য কিছু চাও। তিনি বললেন, হজরতের তাওয়াজ্জোহ পেলে আমি সব কিছু পাবো। এখন আমার এটাই আকাঙ্ক্ষা, তারা যেনো মুসলমান হয়ে যান। তিনদিন পর তার ভাই এবং পিতা সামানা থেকে সেরহিন্দে আগমন করলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হলেন।

কারামত ৮২ ঃ কিছুসংখ্যক লোক বর্ণনা করেছেন, শায়েখ হুসাইন আন্দরজানী [১] নকশবন্দি একবার স্বপ্নে দেখলেন জাহাঙ্গীরের সাম্রাজ্যে চরম বিশৃঙ্খলা হয়েছে। তার পতন হবে। তারা এ স্বপ্নের [২] কথা খানে আজমের কাছে বললেন। হজরত মোজাদ্দেদ র. এর কানে কথাটি পৌঁছে গেলো। তিনি বললেন, হ্যাঁ। শায়েখ হুসাইনের স্বপ্ন সঠিক। কিন্তু আমি ওই বিশৃঙ্খলা প্রতিহত করেছি। কিছুদিন পর শাহাজাদা খুররম বিদ্রোহ করলেন। অনেক আমীর ও ধনাঢ্য ব্যক্তি তাঁর সহযোগী হলো। চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিলো। পিতা-পুত্রের সেনাবাহিনী যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো গুবন্দওয়ালের নিকটবর্তী একটি স্থানে। শাহ্জাদা পরাজিত হলেন।

কারামত ৮৩ ঃ কিছুসংখ্যক লোক বর্ণনা করেছেন, ওই বিদ্রোহের সময় কোনো কোনো আমীর বাদশাহ্কে বলেছিলেন, শাহজাদা মুরতাজা খানের পরামর্শে এরূপ করেছে। তিনি ছিলেন বাদশাহ্র একান্ত আস্থাভাজন।

বাদশাহ্ বললেন, মুরতাজা খানকে চরম পরিণতি ভোগ করতে হবে। তাকে বন্দী করা হবে অথবা সে নিজে আত্মহত্যা করবে। হজরত মোজাদ্দেদ র. একথা শুনে বললেন, মুরতাজা খান আমার অনুসারীদের মহব্বত করেন। আমার সিলসিলার প্রতি তার গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে। আমি তাকে সাহায্য করতে চাই। তিনি খেয়াল করলেন এবং বললেন, আমাকে জানানো হয়েছে যে, এই যুদ্ধে মুরতাজা খানের বিজয় অবশ্যম্ভাবী। ঘটনা সেরকমই ঘটেছিলো।

কারামত ৮৪ ঃ হজরত মোজাদ্দেদ র. এর এক স্নেহভাজনের পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করতো। কিন্তু শিশুকালে মারা যেতো। আর তিনি নিরুপায় হয়ে পুত্রশোক সহ্য করে যেতেন। একবার তিনি তাঁর সদ্যজাত এক পুত্রসন্তানকে নিয়ে হজরতের দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, আমি মান্নত করেছি যদি এ শিশুপুত্র বড় হয়, তবে তাকে আপনার দরবারের গোলামদের অন্তর্ভুক্ত করে দেবো। হজরত র. তাওয়াজ্জোহ্ দিলেন। বললেন, এ শিশুর নাম রাখো আবদুল হক। ইনশাআল্লাহ্ সে দীর্ঘায়ু হবে। কিন্তু প্রত্যেক মাসের পাঁচ তারিখে হজরত খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দ বোখারী কুদ্দিসা সিররুহুর নামে সওয়াব রেছানী কোরো। ওই শিশু দীর্ঘায়ু হয়েছিলো।

---

১. মূল গ্রন্থে তার নাম শায়েখ হুসাইন হানী নকশবন্দি উল্লেখ করেছেন। সম্ভবতঃ তিনিই এ শরফুদ্দীন হুসাইন বিন ইসামুদ্দীন মোহাম্মাদুল হাসানীস্ সরুবী আন্দরজানী। তাঁর সম্পর্কে ৭৯ নম্বর কারামত আলোচনা করা হয়েছে। তিনি ১০৭২ হিজরীতে মকতুবাতে মাসুমীয়া দ্বিতীয় খণ্ড সংকলন করেন।

২. খানে আজম মীর্জা আজিয ১০৩৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তিনি ছিলেন আকবরের সমবয়সী এবং তার দুধ ভাই। সম্রাট তাঁকে খুবই সম্মান করতেন।

কারামত ৮৫ ঃ হজরত মোজাদ্দেদ র. এর এক মুরিদ বর্ণনা করেন, আমি গোপনে গোপনে আফিম সেবন করতাম। একথা কেউই জানতো না। একদিন আমি হজরত মোজাদ্দেদ র. এর সঙ্গে কোথাও যাচ্ছিলাম। সহসা তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ওহে! আমি তোমার অন্তরে অন্ধকার দেখছি। কী ব্যাপার? আমি স্বীকার করলাম, আমি আফিম খাই। আর খাবো না।

কারামত ৮৬ ঃ হজরত মোজাদ্দেদ র. এর বয়স যখন পঞ্চাশ বছর হলো, তখন তিনি বললেন, পঞ্চাশ এবং ষাট বছর বয়সের মধ্যবর্তী সময়ে আমার উপর নতুন ধরনের পরিস্থিতির আবির্ভাব হবে। ওই সময় আমার অবস্থান সম্পর্কে বিশেষ ফয়সালা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। কিন্তু ষাট বছরের পর আমাকে এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে বলে অনুমিত হচ্ছে। তদ্রূপই হয়েছিলো। পঞ্চাশ এবং ষাট বছরের মধ্যবর্তী সময়ে তাঁকে বন্দী করে গোয়ালিয়র দূর্গে প্রেরণ করা হয়েছিলো। আর ৬৩ বছর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছিলেন তিনি।

কারামত ৮৭ ঃ ১০৩২ হিজরীতে মোজাদ্দেদ র. আজমীর আগমন করলেন। বললেন, আমার মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী। তিনি রসুলুল্লাহ স. থেকে সুসংবাদ এবং কারামতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। যেমন তিনি তাঁর পুত্রগণকে লিখেছিলেন, আল্লাহ্র রসুল আমাকে বলেছেন, তোমাকে দুনিয়ার এজাযতনামা ছাড়াও আখেরাতের এজাযতনামাও দেওয়া হলো। তোমাকে শাফাআতের মাকাম দান করা হলো। তিনি এরকমও লিখেছিলেন যে, উম্মতজননীগণও আমার জন্য অপেক্ষমাণ। তাঁরা বলেছেন, আমরা সকলে তোমার অপেক্ষায় রয়েছি। রসুলুল্লাহ ও তাঁর পরিবারবর্গ আমার অপরিচিত নন। এরপর থেকেই হজরত মোজাদ্দেদ র. পরিপূর্ণভাবে আখেরাতের কাজে লিপ্ত হয়ে গেলেন। তাযকিয়া (আত্মশুদ্ধি) ও তাকমিলের (পূর্ণতা প্রাপ্তির) কাজের দায়িত্ব থেকে অবসর করলেন। হাকীকী মাহবুবের সাথে মিলনের জন্য পূর্ণপ্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। পবিত্র মকতুবসমূহ একত্রিত করার পর সন্তানগণ তাঁর দরবারে উপস্থিত হওয়ার ইচ্ছা করলেন। তাঁরাও আজমীর শরীফ চলে গেলেন। তিনি তাঁদেরকে তাঁর নির্জনতা ভেঙে বললেন, আমার সাথে দুনিয়ার কোনো সম্পৃক্ততা আর নেই। আমি এখন প্রস্থানোদ্যত। এরপর তিনি মাতৃভূমি সেরহিন্দে উপনীত হলেন। অল্প কয়েকদিন পরেই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন।

কারামত ৮৮ ঃ হজরত মোজাদ্দেদ র. ১০৩৩ হিজরী শাবান মাসে আপন প্রকোষ্ঠে অবস্থানরত ছিলেন। ওই দিন শেষে এলো শবে বরাত। সারা রাত জেগে কাটালেন। রাতের দুই তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর ঘরে ফিরলেন। তাঁর সহধর্মিণী নামাজের বিছানায় বসে তসবিহ পাঠ করছিলেন। তাঁকে দেখে বললেন, এই রাত তো হায়াত-মউত-তকদীর নির্ধারণের রাত। আল্লাহ্ই ভালো জানেন। এই রাতে কার নাম যে হায়াতের তালিকা থেকে বাদ পড়লো। হজরত মোজাদ্দেদ র. বললেন, তুমি তো না জেনে এরকম বলছো। কিন্তু ওই ব্যক্তির অবস্থা তাহলে

কেমন, যিনি স্বয়ং দেখেছেন এবং জানতে পেরেছেন যে, তাঁর নাম হায়াতের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। একথা বলে নিজের দিকেই ইঙ্গিত করেছিলেন তিনি। সেরকমই হলো। এর ছয়মাস পর তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন।

কারামত ৮৯ ঃ একদিন তিনি স্বীয় কক্ষে বিশ্রাম করছিলেন। বললেন, আগামী শীতের মওসুমে আমি আর এ ঘরে ঘুমাবো না। উপস্থিত সকলে বললেন, এ ঘর তো আপনি আপনারই বিশ্রামের জন্য বানিয়েছেন। তিনি বললেন, 'এ স্থানে নয়।' তাঁরা বললেন, তাহলে কোথায়? তিনি বললেন, এখানকার কোনো স্থানে নয়। দ্যাখো কী ঘটে। শীতের মওসুম এলো। আমাদের মাথার উপর থেকে তাঁর ছায়া চিরদিনের জন্য সরে গেলো।

কারামত ৯০ ঃ একদিন তিনি বললেন, আমি ৬৩ বছরের বেশী হায়াত পাবো না। তা-ই হলো। ৬৩ বছর বয়সে তিনি পৃথিবী থেকে বিদায়গ্রহণ করলেন।

কারামত ৯১ ঃ একদিন তিনি তাঁর এক বিশ্বস্ত আমিরের বিশেষ অনুরোধে একটি চিঠি লিখলেন। একথাও লিখলেন, পরিলক্ষিত হচ্ছে, এ শহরে প্রায় প্রতি বছরই বালা-মুসিবত আসছে। আমার জানা নেই যে, এ বছরে আমার জীবনের উপর কী অবস্থা হবে। আশা রাখি আপনি ভালো থাকবেন। এভাবে তিনি তাঁর ইন্তেকালের পরোক্ষ সংবাদ দিলেন। ওই বছরেই তিনি পরলোকে চলে গেলেন।

কারামত ৯২ ঃ এক বন্ধু [১] বর্ণনা করেছেন, যখন হজরত মোজাদ্দেদ র. অসুস্থ ছিলেন, তখন আমার খেয়াল হলো আমি কিছুদিনের জন্য ছুটি নিয়ে দেশে যাবো। কিছুদিন পর আবার ফিরে আসবো। আমার ইচ্ছার কথা তাঁকে জানালাম। তিনি বললেন, কিছুদিন পরে যাও। আমি বললাম, বিশেষ অসুবিধা আছে। তিনি বললেন, কিছুদিন ধৈর্য ধরো। আমি বললাম, যতদ্রুত পারি আমি আপনার কাছে ফিরে আসবো। অবশেষে ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও অনুমতি দিলেন এবং কাসীদাখানি আবৃত্তি করলেন।

'কুজাতু কুজামা, কুজনও বাহার?

(কোথায় তুমি, কোথায় আমি, আর কোথায় নতুন বসন্ত) এই ঘটনার কয়েক দিন পরে তিনি মহান আল্লাহ্‌র একান্ত সন্নিধানে চলে গেলেন।

কারামত ৯৩ ঃ ১০৩৪ হিজরীর ১২ই মহররম তিনি বললেন, আমাকে বলা হয়েছে, চল্লিশ-পঞ্চাশ দিনের মধ্যে আমাকে তুলে নেওয়া হবে। তাই-ই হলো। তাঁকে তুলে নেওয়া হলো ২৮শে সফরে।

---

১. সম্ভবতঃ ওই বন্ধু ছিলেন মোহাম্মদ হাশেম কাশেমী, যিনি যুবদাতুল মাকামাত রচনা করেছিলেন। তিনি হজরতের ইন্তেকালের সময় বোরহানপুরের পথে ছিলেন।

কারামত ৯৪ ঃ তিনি অসুস্থ হওয়ার পূর্বে বললেন, আগুন জ্বালানোর জন্য দুই টাকার কয়লা নিয়ে এসো। এরপর বললেন, এক টাকার কয়লাই যথেষ্ট। কেনোনা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আমার অন্তরে বলে দেওয়া হয়েছে যে, দুই টাকার কয়লা জ্বালানোর সময় কোথায়? বলা হলো, শীতের মওসুম। প্রয়োজন হতে পারে। তিনি বললেন, আমার প্রিয়জনেরা দীর্ঘ সময়ের আশা করে। কিন্তু সময় কোথায়? যখন দুই টাকার কয়লা আনা হলো, তখন তিনি তাঁর জন্য অর্ধেক রাখলেন। অবশিষ্ট কয়লা ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। যতটুকু কয়লা তিনি নিজের জন্য পৃথক করে নিয়েছিলেন, ওইটুকু শেষ হওয়ার সময়েই তাঁর মহাতিরোধান সংঘটিত হলো।

কারামত ৯৫ ঃ তাঁর ইন্তেকালের অনেক পূর্বে তিনি তাঁর স্ত্রীকে বলেছিলেন, আমাকে জানানো হয়েছে, তোমার পূর্বে আমার ইন্তেকাল হবে। তুমি তোমার সামর্থ্য অনুযায়ী সম্পূর্ণ বৈধ পন্থায় আমার কাফনের ব্যবস্থা কোরো। তাঁর বাণীই সত্য প্রমাণিত হলো। তাঁর মুহতারিমার (স্ত্রীর) পূর্বে তিনিই ইন্তেকাল করলেন। পরকালযাত্রা সম্পন্ন হলো তাঁর পুণ্যবতী সহধর্মিণীর পৃথিবীবাসের সময়ে।

ইন্তেকালের পরের কারামত

কারামত ৯৬ ঃ [১] হজরত মোজাদ্দেদ র. মঙ্গলবার ফজরের সময়, এক প্রহর সূর্য উদিত হওয়ার পর ২৮ শে সফর ১০৩৪ হিজরীতে ইহজগত ত্যাগ করলেন। এই নগণ্য ফকির (হাজ্‌রাতুল কুদুসের লেখক) হজরত মোজাদ্দেদ র. এর গোসলের স্থানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর ভাতিজা গোসল করাচ্ছিলেন। আর আমি তাঁকে পানি সরবরাহের কাজে সহযোগিতা করেছিলাম।

আমি তাঁর পবিত্র পদযুগল চুম্বন করেছি। লোকেরা গোসলের জন্য তাঁর বস্ত্র উন্মুক্ত করলে আমি দেখলাম, তাঁর দু'হাত নাভির উপর বাঁধা। বাম হাতের কব্জিকে ঘিরে তাঁর ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল কনিষ্ঠ আঙ্গুলের সঙ্গে লেগে আছে। যেভাবে নামাজের সময় তকবীরে তাহরীমা বাঁধা হয়। ইন্তেকালের সময় তাঁর হাত, পা সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী সোজা করে দেওয়া হয়েছিলো। উপস্থিত সকলে একমত হয়ে হাতের বন্ধন খুলে দিলেন। একটু পরে হাত আপনাআপনি আগের মতো বাঁধা হয়ে গেলো। লোকেরা বুঝলেন, তিনি ইচ্ছাকৃতভাবেই হাত বেঁধে নিয়েছেন। তাই তারা বিষয়টি আলোচনা করলো। তারপর চুপ হয়ে গেলো।

১. আল্লামা বদরুদ্দীন সেরহিন্দী র. হজরতের ইন্তেকালের পরের কারামতসম্বলিত 'বেসালে আহমদ' নামক একটি পুস্তক লিখেছেন। পুস্তকখানা ইসলামী কুতুবখানার মাধ্যমে মুদ্রিত হয়েছে। মোহাম্মদ হাশেম কাশেমী র. তাঁর লিখিত 'যুবদাতুল মাকামাত' নামক গ্রন্থের ২৭৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, তখন দক্ষিণ বোরহানপুরে খুব গোলযোগ চলছিলো। আমার ইচ্ছা ছিলো, সেখান থেকে তাঁর অনুসারীদেরকে সেরহিন্দে নিয়ে আসবো। তাই মোজাদ্দেদ র. এর কাছে সেখানে যাবার অনুমতি চেয়েছিলাম। সেখানে আমাকে সাত মাস অবস্থান করতে হয়েছিলো।

গোসলের সময় পবিত্র মস্তক থেকে পাগড়ি সরানো হলো। গোসলের খাটে যখন শুইয়ে দেওয়া হলো, তখন আমি দেখলাম, তিনি মৃদু হাসছেন। যেমন জীবদ্দশায় হাসতেন। মৃদু হাসির রেখা তাঁর ঠোঁটের কোণে লেগেই রইলো। উপস্থিত সকলে বিস্ময়ে বিমোহিত হলো। এরপর তাঁকে ওজু করানো হলো। দুই হাত খুলে দিয়ে বাম পাশে শোয়ানো হলো। এমন সময় তিনি পুনরায় আগের মতো ডান হাত বাম হাতের উপরে বেঁধে নিলেন। পুনরায় হাতের বন্ধন খুলে দিয়ে খাটের উপর রাখা হলো। উপস্থিত সকলে দেখলো, ডান হাত ডানদিক থেকে এবং বাম হাত বাম দিকে থেকে ধীর গতিতে এসে পূর্বের মতো মিলিত হলো। ডান হাত দিয়ে বাম হাত আঁকড়ে ধরলেন। ডান হাতেই বৃদ্ধাঙ্গুল ও কনিষ্ঠ আঙ্গুল দিয়ে বাম হাতের কব্জিকে আবদ্ধ করে নিলেন। এই অলৌকিক দৃশ্য দেখে উপস্থিত সকলে আত্মহারা হয়ে বলে উঠলেন, সুবহানাল্লাহ! শেষে দেখলাম, তিনি হাতের বাঁধন ছেড়ে দিলেন। কিন্তু এক হাত থেকে অন্য হাত বিচ্ছিন্ন কিংবা প্রসারিত কোনোটাই করলেন না।

'যালিকা ফাজ্‌লুল্লাহি ইউ'তিহী মাইঁয়্যাশাউ ওয়াল্লহু যুল ফাজ্‌লিল আজীম' (এটি আল্লাহ্‌র মহাঅনুগ্রহ। তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। মহান আল্লাহ্ বড়ই অনুগ্রহকারী)

এরপর তাঁকে একটি কক্ষে রাখা হলো, সে কক্ষটি নির্মাণ করা হয়েছিলো তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র খাজা মোহাম্মদ সাদেক আলাইহির রহমতের জন্য।

কারামত ৯৭ ঃ হজরত মোজাদ্দেদ র. এর ইন্তেকালের দিন আকাশের রঙ হয়েছিলো লাল। বলা হয়ে থাকে, আকাশের লাল বর্ণ হচ্ছে আকাশের কান্না, যা হয়ে থাকে আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদের জন্য। 'শরহে সদর' [১] গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে— "আকাশ এবং পৃথিবী মুমিন বান্দার জন্য ক্রন্দন করতে থাকে।' আরো বলা হয়েছে— 'আকাশের ক্রন্দন হচ্ছে আকাশের রক্তিমবর্ণ ধারণ করা।' সুফিয়ান সওরী বর্ণনা করেন, আকাশের রক্তিম বর্ণ হচ্ছে মুমিনের জন্য আকাশের কান্নাস্বরূপ।

কারামত ৯৮ ঃ হজরত মোজাদ্দেদ র. এর ইন্তেকালের তিন চার দিনের মধ্যে এক মুখলিস ব্যক্তি বর্ণনা করেন, জোহরের সময় আমি হজরতের মসজিদে নামাজ আদায়ের জন্য উপস্থিত হলাম। মুয়াজ্জিন ইকামত দিলেন এবং মুসল্লীরা জামাআতের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। আমি ইমামের পিছনে দাঁড়িয়েছিলাম। স্বচক্ষে দেখলাম, হজরত মোজাদ্দেদ র. আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। আমার হাত ধরে আরো নিকটবর্তী করে নিলেন, যেনো মাঝে কোনো ফাঁক না থাকে। তার

১. প্রকৃতপক্ষে 'শরহে সুদূর' হবে। ভুলবশতঃ 'ওয়াও' অক্ষরটি বাদ পড়েছে। এই গ্রন্থটি রচনা করেছেন আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূ্যতী র.। মৃত্যু এবং কবরবাসীদের উপর লেখাটি একটি চমৎকার গ্রন্থ।

তিনি এমনই করতেন। নামাজের শেষ পর্যন্ত আমি হজরতকে দেখলাম। একটি পায়জামা এবং একটি শাদা চাদর পরিহিত ছিলেন তিনি। পায়ে ছিলো চামড়ার মোজা। সালাম ফিরাবার পর তিনি আর দৃষ্টিগোচর হলেন না।

কারামত ৯৯ ঃ হজরত র. এর সন্তান খাজা মোহাম্মদ সাইদ সাল্লামাল্লাহুল মাজীদ হজরতের ইন্তেকালের পর শোকার্ত সময়ের এক পর্যায়ে বললেন, আজ আমি হজরতের রওজা মোবারকের চত্বরে হুজরার মধ্যে ছিলাম। বস্ত্র আবৃত অবস্থায় তাঁর বিয়োগব্যথা নিয়ে শুয়েছিলাম। মনে হলো চত্বরে হজরত বিচরণ করছেন। আমি জাগ্রত হলাম। দেখলাম, তিনি হুজরার দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে আমার শয্যায় এসে বসলেন। আমাকে কোলে তুলে নিলেন। দীর্ঘক্ষণ এভাবে রাখলেন। যেমন মাশায়েখগণ বাতেনী নেয়ামত প্রদানের জন্য তাঁর মুরিদগণের প্রতি করে থাকেন। আমি আতংকিত হলাম। শরীরে কম্পন তৈরী হলো। একটু পরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমি যতক্ষণ পর্যন্ত হুজরার মধ্যে ছিলাম দেখলাম, সারা রাত তিনি চত্বরে পদচারণা করলেন।

কারামত ১০০ ঃ হজরত মোজাদ্দেদ র. এর এক একনিষ্ঠ ভক্ত বর্ণনা করেন, আমার ছেলে অসুস্থ হলো। অসুস্থতাবস্থায় সে ভয়ানক আকৃতির প্রাণী দেখতো। ভয়ে কাঁপতে থাকতো। আমি বললাম, বৎস! তুমি তো একদিন হজরত মোজাদ্দেদ র. কে আহারের স্থানে দেখেছিলে। তাঁর চেহারা কি তোমার মনে পড়ে? সে বললো, হজরতের দাড়ি এবং গোঁফের কথা মনে আছে। আমি বললাম, ঠিক আছে, তুমি এতোটুকু স্মরণ রাখবে। তোমার কাছে শয়তানী কুমন্ত্রণা আসতে পারবে না। সুস্থতাও নসীব হবে। আমার নির্দেশ পালন করলো। হঠাৎ তার মধ্যে ইস্‌তেগরাক (নিমগ্নতা) এসে গেলো। স্বাভাবিক হওয়ার পর বললো, আমি হজরত র.কে দেখলাম। তিনি বললেন, আমি আল্লাহ্‌র সাথে মিলিত হয়েছি। জান্নাতে প্রবেশ করে মহান আল্লাহ্‌র বেমেছাল কুদরতি কদম আঁকড়ে ধরেছি। আমি বললাম, হজরত! আমাকেও আল্লাহ্‌র সাথে মিলিত করে দিন। আমিও মহান আল্লাহ্‌র কুদরতি কদম আঁকড়ে ধরবো। তিনি বললেন, এখনো তোমার এবং আমার সন্তানদের সময় আসেনি। যখন আমার সন্তান জাগ্রত হলো, তখন পরিপূর্ণভাবে সুস্থ হয়ে গেলো। দুর্বলতার কোনো চিহ্নই আর খুঁজে পাওয়া গেলো না। শয়তানী প্রভাবও সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে গেলো।

হজরত মোজাদ্দেদ র. এর কারামত ও আশ্চর্যজনক ঘটনা অসংখ্য। এতো স্বল্প পরিসরে সকল ঘটনা বর্ণনার অবকাশ নেই। তাই মাত্র কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করে এখানেই থেমে যেতে হলো।

হজরতের মহাপ্রস্থানের পূর্বের ও পরের অবস্থাসমূহ, বাণী ও কারামত সম্পর্কে আমি একটি পৃথক পুস্তক রচনা করেছি। পুস্তকখানির নাম 'বেসালে আহমদ'।

দশম হাজ্‌রাত

হজরত মোজাদ্দেদ র. এর সন্তানগণ এবং তাঁর প্রখ্যাত খলিফাবৃন্দ

হজরত খাজা মোহাম্মদ সাদেক কুদ্দিসা সিররুহু

তিনি হজরত মোজাদ্দেদ র. এর জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ওলি ছিলেন। তিনি ১০০০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যবেলাতেই তাঁর মধ্যে হজরতের মতো সৎপথপ্রাপ্তি ও হেদায়েতের দায়িত্ব পালনের উচ্চ যোগ্যতার নিদর্শন তাঁর ললাটদেশে সমুদ্ভাসিত হতো। শিশুকালে তাঁর বুজর্গ পিতামহ শায়েখ আবদুল আহাদ আলাইহির রহমত তাঁকে শিক্ষা দিতেন। তিনি হজরত মোজাদ্দেদ র. কে বলতেন, তোমার এই শিশুপুত্রটি এখনই আমার নিকট বস্তুসমূহের বাস্তবতা এবং তার সৃষ্টির স্বরূপ সম্পর্কে এমন আশ্চর্যজনক ও অভাবনীয় প্রশ্ন করে যে, আমি তার উত্তর দিতে হিমশিম খেয়ে যাই। হজরত মোজাদ্দেদ র. এর শ্রদ্ধেয় পিতা ১০০৭ হিজরীতে ইন্তেকালের এক বছর পর ১০০৮ হিজরীর জমাদিয়াল উখরা মাসে তিনি হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ কুদ্দিসা সিররুহুর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত হন। ওই সময় খাজা মোহাম্মদ সাদেক তাঁর বুজর্গ পিতার সাথে ছিলেন। হজরত খাজা র. এর নিকট থেকে তিনি তরিকত শিখতে লাগলেন। তাঁর সর্বোৎকৃষ্ট তাওয়াজ্জোহের বরকতে আট বছরের বালক খাজা মোহাম্মদ সাদেকের প্রতি বিস্ময়কর ও অকল্পনীয় হালের আবির্ভাব হতে লাগলো। বিভিন্ন রকম কাশফ, মারেফাত তত্ত্ব এবং ফানার উচ্চ মাকাম তাঁর উপরে প্রকাশ পেলো। কিন্তু হালপ্রাবল্যের কারণে তাঁর মাথা ও পা অনাবৃত হয়ে যেতো। পাঠ্য পুস্তকাদি রয়ে যেতো তাকের উপরে। আল্লাহ্‌প্রেমের আধিক্য এবং মগ্নতার প্রাবল্যের ধারাবাহিকতা এতো অধিক বৃদ্ধি পেতো যে, হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ র. বলতেন, মোহাম্মদ সাদেককে বাজারের খাদ্য এনে খাওয়াও যেনো (বাজারের সন্দেহযুক্ত খাদ্যভক্ষণের ফলে) তার হালের তীব্রতা স্তিমিত হয়ে যায়। কখনো দরবারের লোকদেরকে বলতেন, আমার মাজযুব (আল্লাহ্‌র প্রেমমগ্ন)কে দ্যাখো। দ্যাখো তার অবস্থা কী রকম!

একবার এক ব্যক্তি হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ র. সকাশে উপস্থিত হয়ে তার নিজের হালের আধিক্যের বর্ণনা দিলেন। বললেন, আপনার সঙ্গলাভ করে যদি এরূপ হাল হয় তাহলে আপনাকে আর কষ্ট দেবো না। এর চেয়ে অধিক হালপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা যদি পাই, তাহলে আমি আপনার দরবারেই থেকে যাবো। আরো অধিক উপকৃত হতে চেষ্টা করবো। হজরত বাকী বিল্লাহ বললেন, মোহাম্মদ সাদেককে ডাকো। তাঁকে ডেকে আনা হলো। তিনি বললেন, এই লোকটি আমার

মেহমান। তুমি তার কাছে তোমার হালের বিবরণ দাও। তোমার মুখেই সে শুনুক। মোহাম্মদ সাদেক তাঁর হাল ও তাঁর উপর আপতিত অবস্থার বিবরণ দিতে থাকলেন, যা ওই ব্যক্তির হালের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলো। এমনকি ওই লোক দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর রেয়াজত করে যা কিছু অর্জন করেছেন, তার থেকে বেশী ছিলো। তাঁর তরিকা গ্রহণের বয়স তখন মাত্র দুই মাসের কিছু অধিক। লোকটি তাঁর অবস্থার কথা শুনে বিস্মিত হলেন। লোকটির নিজের ভিতরে আত্মপ্রসাদের যে ভাব ছিলো তা চিরতরে বিলীন হয়ে গেলো।

হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ্ র. মোহাম্মদ সাদেকের প্রতি কীরূপ অনুকম্পা ও মহানুভবতা প্রকাশ করতেন, আর খাজা সাহেবের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও আস্থা কীরকম গভীর ছিলো তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই ঘটনাটিতে— খাজা বাকী বিল্লাহ্ কঠিন জ্বরে আক্রান্ত হলেন। মোহাম্মদ সাদেকও পড়লেন কঠিন জ্বরে। জ্বর ছাড়ার কোনো লক্ষণ দেখা গেলো না। অবশেষে একদিন হজরত মোজাদ্দেদ র.কে বললেন, আমাদের জ্বর একে অপরের আকর্ষণকারী। মোহাম্মদ সাদেককে এখান থেকে সরিয়ে না নেওয়া পর্যন্ত জ্বর কমবে না। সুস্থতাও আসবে না। খাজা সাহেব হজরত মোজাদ্দেদ র.কে বললেন, আপনি ওকে সেরহিন্দে নিয়ে যান। তাহলে আমাদের উভয়েরই জ্বর সেরে যাবে। হজরত মোজাদ্দেদ র. তা-ই করলেন। যাত্রা পথে যতোই অগ্রসর হতে লাগলেন, দেখা গেলো, মোহাম্মদ সাদেকের দেহের তাপমাত্রা ততোই কমে যাচ্ছে। ওদিক থেকেও সংবাদ এলো, হজরত খাজার শরীরের তাপমাত্রাও ক্রমশঃ কমে আসছে।

মহান নকশবন্দিয়া সিলসিলায় এরকম অনেক ঘটনাই ঘটে। একদা এক বুজর্গ যিনি হজরতের মুরিদ ছিলেন, মারাত্মকভাবে ঠাণ্ডায় আক্রান্ত হলেন। কাঁপতে লাগলেন এবং হাঁচি দিতে থাকলেন ঘন ঘন। অনেক শীতবস্ত্র দিয়ে আবৃত করা হলো তাকে। কিন্তু তিনি স্বস্তি পেলেন না। হঠাৎ এক খাদেম, যাকে চক্কী নামক স্থানে প্রেরণ করা হয়েছিলো, সে দরবারে ফিরে এলো। বিভিন্ন স্থানে তাকে পানিতে নামতে হয়েছিলো তাই সেও হয়েছিলো শীতাক্রান্ত। সে কাঁপছিলো এবং ঘন ঘন হাঁচি দিচ্ছিলো। হজরত র. বললেন, খাদেম দরবেশকেও শীতবস্ত্র ও চাদর দ্বারা আবৃত করো। কারণ আমার ঠাণ্ডা তার আকর্ষণকারী। যখন তাকে বস্ত্রাবৃত করা হলো, তখন উভয়ের ঠাণ্ডাজনিত কম্পন ও হাঁচি দূর হয়ে গেলো।

হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ্ অনেক সময় মোহাম্মদ সাদেককে নির্জনে ডেকে নিয়ে বিভিন্ন মাকাম, কবরবাসীদের চলমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। উচ্চ মর্তবাধারী মোহাম্মদ সাদেক স্বল্প সময়ের জন্য মোরাকাবা করে সকল অবস্থার বিস্তারিত বিবরণ দিতেন। তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী কাশফও প্রকাশিত হতো। বহু দরবেশ ও সাধারণ ব্যক্তিগণও তাঁর নিকটে অনেক

গোপন রহস্য জানতে চাইতেন এবং তাঁর উত্তর শ্রবণ করতেন। সবিস্ময়ে দেখতেন, তাঁর কাশফের অনুকূলে সকল বিষয় বাস্তবে পরিণত হয়েছে। উচ্চ মর্তবাধারী মখদুমজাদার (মোহাম্মদ সাদেকের) বিস্তারিত বর্ণনা দিতে গেলে অনেক কিছু লিখতে হবে। কিন্তু এ বক্ষমান গ্রন্থে এমতো সুযোগ নেই।

হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ মোহাম্মদ সাদেকের বিদায়গ্রহণের পর তাঁর সম্পর্কে লিখেছিলেন— আমার নয়নের প্রশান্তি মোহাম্মদ সাদেককে মহান আল্লাহ্ জাহের ও বাতেনের পূর্ণতা দান করেছেন। তাঁর প্রকাশিত হালসমূহ আল্লাহ্পাকের শোকরগুজারীর অনুকূলে। এই অবস্থার উপরেই সে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং তাঁর অদৃশ্যের বর্ণনাবলী, দর্শন এবং নিমগ্নতার (ফানার) মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই। ইনশাআল্লাহ্ সে অতিনিমগ্নতা থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় এসে যাবে। অর্জিত হবে জনপ্রিয়তার শিরোপা।

হজরত মোজাদ্দেদ র. কে লিখিত আর একটি চিঠির উত্তরে খাজা বাকী বিল্লাহ র. লিখেছিলেন, মোহাম্মদ সাদেকের হাল খুবই সঠিক।

হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ র. হজরত মোজাদ্দেদ র. কে খেলাফত দান করে তাঁর মুরিদগণের তালিম তরবিয়তের ভার তাঁরই উপর ন্যস্ত করেছিলেন। ওই সময় মোহাম্মদ সাদেকের দায়িত্বও হজরত মোজাদ্দেদ র. এর স্কন্ধে অর্পিত হয়। মারেফতের পুষ্পোদ্যানের ওই নতুন কুঁড়ি স্বীয় বুজর্গ পিতার সান্নিধ্যে পূর্ণত্বে পৌঁছে যায়। তিনি কামালতের অতি উচ্চস্তর অর্জন করেন।

হজরত মোজাদ্দেদ র. তাঁর বালক বয়সের কামালতের অবস্থা সম্পর্কে লিখেছেন—

মোহাম্মদ সাদেক মাকামে হায়রাতে (আক্ষেপের মাকামে) নিমজ্জমান হয়েছেন। এ মাকামেও সে এই ফকিরের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখে।

হজরত মোজাদ্দেদ র. তাঁকে মাত্র একুশ বছর বয়সে খেলাফত দান করেছিলেন। ১০২১ হিজরী জমাদিউস্ সানি শুক্রবারে হজরত মোজাদ্দেদ তাঁকে তাঁর বিশেষ পোশাক দান করেছিলেন। ওই দিন এক বিশাল জনসমাবেশের সাথে করমর্দন করতে হয়েছিলো তাঁকে। ওই সময় আল্লাহ্র প্রেমে পরিতৃপ্ত ওই প্রেমিকের ললাট থেকে এমন নূর বিচ্ছুরিত হয়েছিলো যে, মনে হচ্ছিলো সূর্যকিরণও অনুজ্জ্বল হয়ে যাবে। তাঁর পবিত্র অবয়বে বিনয়, লজ্জা, নম্রতা ও মহানুভবতা এতো বেশী প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছিলো যে, তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তাঁকে দেখে জ্ঞানী-গুণী আরেফগণ নির্বাক হয়ে গিয়েছিলেন।

একদিন তাঁর এক একনিষ্ঠ ভক্ত তাঁকে অন্য লোকদের দ্বারা নিগৃহীত হওয়ার কথা শুনিয়ে বললেন, আপনি তাদেরকে একটু ধমক দিয়ে সতর্ক করে দিন। তিনি বললেন, আমরাও যদি পাল্টা ঝগড়ায় লিপ্ত হই, তাহলে ফকির ও আমীরদের

মধ্যে পার্থক্য রইলো কই? ওই ব্যক্তি বললেন, আমি খেয়ালের বশবর্তী হয়ে কথাগুলো বলেছিলাম। আমি নিজের কথায় লজ্জিত হলাম এবং এখন তওবা করছি। অত্যাচারীর প্রতি বিদ্বেষভাব অন্তর থেকে দূর হয়ে গেলো। তাঁর সোহবতে উপস্থিত ব্যক্তির অন্তর থেকে পৃথিবীপ্রসক্তি চিরতরে দূর হয়ে যেতো।

হজরত মোহাম্মদ সাদেক ছিলেন আকলী ও নকলী জ্ঞানের সমষ্টি। অধিকাংশ এলেম তিনি হজরত মোজাদ্দেদ র. থেকে শিখেছিলেন। আরবী ভাষার কিছু পাঠ নিয়েছিলেন মাওলানা তাহেরের [১] নিকট থেকে এবং বিজ্ঞানবিষয়ক কিছু জ্ঞান আহরণ করেছিলেন মাওলানা মাসুম কাবেলী [২] থেকে। মাত্র আঠারো বছর বয়সে তিনি জাহেরী এলেম শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তারপর অর্জিত এলেমের মৌলিক বিষয়গুলো গভীর মনোযোগের সাথে পাঠ দানে রত হয়ে যান।

এ নগণ্য লেখক 'মুতাওয়াল মা'আ হাশিয়া মীর শরহে আকায়েদ মা'আ হাশিয়া খিয়ালি, তাহরীরে আকলীদস, শরহে মোতালে মা'আ হাশিয়া মোজাদ্দেদ র. সহ বহু গ্রন্থ এই মখদুমজাদার নিকটে অধ্যয়ন করেছি। ১০২৫ হিজরীতে তাঁর ইন্তেকালের পর শরহে মায়কিফ, তাফসীরে বায়যাবী, হাশিয়া আসনদী নামক গ্রন্থসমূহ হজরত মোজাদ্দেদ র. এর নিকট অধ্যয়ন করেছি। মখদুমজাদা পাঠ্য বিষয়ের ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে করতেন এবং সেগুলোর বহুমুখী উদ্দেশ্য বর্ণনা করতেন। তাঁর মার্জিত ও জ্ঞান-গরিমাপূর্ণ স্বভাব থেকে অনেক সূক্ষ্মতত্ত্ব বেরিয়ে আসতো। কখনো কখনো তিনি কিতাবের হাশিয়া (টিকা)ও লিখতেন।

একদিন এক বড় আলেম সিরাজ নামক স্থান থেকে হিন্দুস্তান এলেন। জ্ঞানের গভীরতায় তিনি দৃষ্টান্তহীন ছিলেন। তাঁর সাথে মখদুমজাদার এলমে আকলিয়াহ বিষয়ে গভীর তত্ত্বগত মতবিনিময় হলো। তিনি অভিভূত হলেন। বললেন, আমার জানা ছিলো না যে, হিন্দুস্তানে এলমে আকলিয়ার গভীরতা সম্পর্কে কেউ এতো অধিক দক্ষতা রাখেন। অবশ্য আমি প্রথম দেখাতেই বুঝেছিলাম, মখদুমজাদা একজন অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব।

হজরত মোজাদ্দেদ র. তাঁর এক চিঠিতে মখদুমজাদাকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন—

তোমার চিঠিতে হালের যে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে তা পাঠ করে বুঝতে পারছি, তোমার খাস বেলায়েতে মোহাম্মাদিয়ার (আলা সাহিবিহাস্ সলাতু ওয়াস্

---

১. মাওলানা মোহাম্মদ তাহের লাহোরী র. হজরত মোজাদ্দেদ র. এর শ্রেষ্ঠ খলিফাদের অন্যতম ছিলেন। তিনি ২০ শে মহররম ১০৪০ হিজরীতে লাহোরে ইন্তেকাল করেন।

২. মাওলানা মোহাম্মদ মাসুম কাবেলী ছিলেন বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ আলেম। তিনি ১০২৬ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

সালাম) এর সাথে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। আমার দীর্ঘদিনের বাসনা ছিলো যেনো এ অমূল্য সম্পদ তোমার হস্তগত হয়। ইতোপূর্বে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে, এই অমূল্য সম্পদের প্রতি তোমাকে আকর্ষণ করবো। তখন আমি তোমাকে বেলায়েতে মুসাবীতে (আলানাবীয়্যিনা ওয়া আলাইহিস্ সালাম) পেলাম। আমি সেখান থেকে টেনে নিয়ে তোমাকে খাস্ বেলায়েতে মোহাম্মদীর মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিলাম। এজন্য মহান আল্লাহ্র প্রতি জানাই অসংখ্য কৃতজ্ঞতা।

হজরত মোজাদ্দেদ র. একথাও উল্লেখ করেছেন যে, আমার স্নেহাস্পদ সন্তান এই ফকিরের সকল মারেফাতের সমষ্টি এবং জযবা (আকর্ষণ) ও সুলুকের মাকামসমূহের গুপ্ত ভাণ্ডার।

একস্থানে তিনি এরকমও বলেছেন যে, আমার সন্তান গুপ্তরহস্যের ধারকদের অন্তর্ভুক্ত। (সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য) এবং সে পাপ থেকে সুরক্ষিত। তিনি আরো বর্ণনা করেছেন, এই মাকাম আল্লাহ্পাক আমার সঠিক পথপ্রাপ্ত এই সন্তানকে দান করেছেন এবং তাকে তাঁর বেলায়েতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এ ফকির মুসাফিরের ন্যায় ওই বেলায়েতের মধ্যে স্থায়ীভাবে অবস্থান করছে। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন যে, এ ফকির বেলায়েতে মুসাবী থেকে সংক্ষিপ্তভাবে উপকৃত হয়েছেন। কিন্তু আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র বেলায়েতে মুসাবী থেকে উপকৃত হয়েছেন বিস্তারিতভাবে। এ ফকিরের বেলায়েতে মুসাবীর ফযীলত ওই মুমিনদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, যাঁরা ছিলেন ফেরাউনের বংশভূত। আর আমার এই সন্তানের বেলায়েত ফেরাউনের যাদুকরদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, যারা ইমান এনেছিলেন যাদুযুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর।

তিনি আরো বলেছেন, আমার মরহুম সন্তান মোহাম্মদ সাদেক ছিলো মহান আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর মধ্যে অন্যতম একটি নিদর্শন। আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের রহমতসমূহের মধ্যে অন্যতম এক রহমত। সে চব্বিশ বছর বয়সে যা অর্জন করেছে, তা খুব কম লোকেরই অর্জিত হয়। তার বেলায়েতের মাকাম এবং এলমে আকলিয়াহ এবং নকলিয়াহ্ বিষয়ক জ্ঞান চূড়ান্ত পূর্ণতায় পৌঁছেছিলো। এমনকি তার ছাত্ররাও বায়যাবী শরীফ, শরহে মাআরেফ ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ গ্রন্থ দক্ষতার সাথে প্রশিক্ষণ দেয়। তার মারেফাত এবং আল্লাহ্পরিচিতির ঘটনাবলী, প্রত্যক্ষদর্শন ও কাশফের (অন্তর্দৃষ্টির) কথা বর্ণনাতীত। আট বছর বয়সে তার হালের আধিক্য এমন ছিলো যে, আমার মোর্শেদ খাজা বাকী বিল্লাহ কুদ্দিসা সিররুহু তাঁর হালের স্বাভাবিকতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে প্রতিষেধক হিসেবে বাজারের সন্দেহযুক্ত খাদ্য ভক্ষণ করাতেন এবং বলতেন— মোহাম্মদ সাদেকের প্রতি আমার যেরূপ ভালোবাসা রয়েছে, তদ্রূপ অন্য কারো প্রতি নেই। আবার আমার প্রতি তার যে ভালোবাসা রয়েছে তা অন্য কারো প্রতি নেই। এ কথার

দ্বারাই তাঁর বুজর্গীর স্তর অতি সহজে পরিমাপ করা যায়। সে বেলায়েতে মুসাবীর শেষ বিন্দু পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলো। সে এই বেলায়েতের বিস্ময়কর বিষয়াবলীর বিবরণ দিতো। আর সব সময় থাকতো খুজু, খুশু, বিনীত, ভঙ্গুরহৃদয় ও অসহায় অবস্থায়। বলতো প্রত্যেক ওলী মহান আল্লাহ্‌র কাছে কিছু না কিছু চেয়েছেন। আর আমি তাঁর কাছে অনুনয় ও বিনয় প্রার্থনা করেছি।

পরিশেষে মোহাম্মদ সাদেক র. হজরত মোজাদ্দেদ র এর উদ্দেশ্যে যে চিঠি লিখেছিলেন, সেগুলোর উল্লেখ করা হলো।

কুদসিয়্যাহ্‌ ঃ শ্রদ্ধেয় আব্বাজান, এখন শুধু এ মিনতিটুকুই রাখছি, যেনো আমার একটি মুহূর্তও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির পরিপন্থী অতিবাহিত না হয়। আর এই বিষয়টি তখনই সম্ভব ও সহজসাধ্য হতে পারে, যখন হজরতের তাওয়াজ্জোহ্‌ আমার প্রতি সাহায্যকারী ও অনুকম্পাকারী হবে।

আল্লাহ্‌র ওলীদের জন্য কোনো কাজই দুঃসাধ্য নয়। মহান আল্লাহ্‌র প্রতি সীমাহীন শোকর ও এহসান যে, হজরত যে প্রক্রিয়ায় তাওয়াজ্জোহ দিয়েছিলেন, তার বরকতে পরিপূর্ণভাবে ওই তাওয়াজ্জোহের উপরেই সুদৃঢ় থাকতে পেরেছি। এর মধ্যে কোনো শিথিলতা আসেনি। বরং দিনের পর দিন ওই হাল বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। ফজর, জোহর, আসর নামাজের পরে হালকায়ে জিকিরের মজলিসে বসি এবং হাফেজ সাহেবদের কণ্ঠে পবিত্র কোরআন শুনি। কোনো কোনো সময় হালের আরোহ ও অবরোহ (উরুয-নুযুল) হয়। সংকোচন-প্রসরণ, স্বাদ, আনন্দ ও অন্যান্য অবস্থা দেহের সাথে সম্পর্ক রাখে। অতিরঞ্জিত হয় না। লতিফাসমূহ অতিরিক্ত জিকিরপ্রবণ নয়, আবার গাফেলও নয়। যখন আপনি লতিফাসমূহের প্রতি খেয়াল করেন, তখন আপনার তাওয়াজ্জোহের ফলে এলমে হুজুরীর মতো অবস্থা হয়। বরং পরিপূর্ণরূপে তাই-ই হয়। তাওয়াজ্জোহের আস্বাদ সবই প্রতিবিম্বের অন্তর্ভুক্ত। প্রতিবিম্ব থেকে অতিরিক্ত কিছু নয়। লতিফাসমূহ তো প্রাথমিক অবস্থায় দেহের সাথে সম্পর্কিত থাকে, আবার বাসীরাতের ক্ষেত্রে দেহ থেকে বিচ্যুৎ হয়ে বোধগম্যহীন হয়ে যায়। আমি একবার হজরতের খেদমতে এই হালের কথা প্রকাশ করেছিলাম। কিন্তু এখন লতিফাসমূহ দেহের মধ্যে বিশেষভাবে দৃশ্যমান হয়। আমি এই মাকামকে ‘বাকা’ এর মাকাম বলে জানি। ‘বাকা’ অবস্থার পরে পুনরায় লতিফাসমূহ ফানা হওয়ার আর এক প্রক্রিয়া প্রকাশিত হলো। তখন বুঝলাম, ফানার পরে এই প্রকারের ফানা ব্যতীত কাজ পরিপূর্ণরূপে সম্পাদন করা সম্ভব হয় না। এমতাবস্থায় হালের মধ্যে সংকোচন (কবজ) দেখা দেয়। কিন্তু এখন পর্যন্ত দুনিয়ার দিকে খেয়াল যায়নি। হালসমূহের বর্ণনা প্রদান অত্যাবশ্যক ছিলো। তাই কিছু কথা বলতে সাহস করলাম।

কুদসিয়্যাহ্‌ ঃ নগণ্য বান্দা মোহাম্মদ সাদেক আপনার দরবারে বিনীতভাবে কিছু কথা প্রকাশ করছে যে, এই ফকির দীর্ঘকাল পর্যন্ত মাকবুজ (সংকুচিত) এবং

মাহমুম (খেয়ালেনিমগ্ন) ছিলো। অবশেষে মহান আল্লাহ্‌র পবিত্র তাওয়াজ্জোহ লাভ করলাম। তখন এক আজীম বসতের (মহাপ্রশস্ততার) হাল প্রকাশিত হলো। ফলে বুঝতে পারলাম, পূর্বে আমি যে স্মরণ ও তাওয়াজ্জোহ আপনার পক্ষ থেকে পেতাম, এখন তা মহান আল্লাহ্‌ থেকে পাচ্ছি। এখন আমার নিজের মধ্যে কবুল হওয়ার যোগ্যতার অতিরিক্ত কিছুই নেই। বিষয়টি ওই দর্পণতুল্য, যার উপর সূর্য উদিত হয়। তাই এই কষ্ট থেকে দেহ এবং লতিফাসমূহের সকল অন্ধকার এবং ময়লা জ্বলে শেষ হয়ে গিয়েছে। যতদূর সম্ভব অন্তরের চাহিদা অনুযায়ী পরিপূর্ণভাবে নূর হাসিল হয়েছে এবং বরকতও পেয়েছি। সুতরাং বক্ষে উন্মুক্ততা এবং অন্তরে প্রশস্ততা সৃষ্টি হয়েছে এবং সমস্ত দেহ হয়ে গিয়েছে নূরময়, যেনো এখন তা পূর্ববর্তী রূহ এবং সির থেকেও অধিক সূক্ষ্ম লতিফাসমূহের মধ্যে লতিফা ক্বলবে পরিপূর্ণভাবে তাজাল্লী পেয়েছি। যখন আমি ক্বলবের ক্বলবে দৃষ্টিপাত করলাম, তখন দেখলাম, তার মধ্যে আরেকটি ক্বলব রয়েছে, যার উপর তাজাল্লী রয়েছে। শেষে দেখলাম, এর কোনো শেষ নেই এবং ক্বলবে বসীত (কলবের প্রশস্ততা) তো ইতোপূর্বে প্রকাশ পায়নি। বরং তার মধ্যে আরো একটি ক্বলব ছিলো। কিন্তু আমার ধারণা এই সিলসিলা ক্বলবে বসীতে সমাপ্ত হয়েছে। এ-ও অনুধাবন করলাম, ওই অবস্থা যা ইতোপূর্বে ছিলো, তা বর্তমান অবস্থার সামনে যথার্থই অনুষ্ঠানসর্বস্ব। এই মাকামের নামও আমার হৃদয়পটে ছিলো। কিন্তু আদবের পরিপন্থী হওয়ার আশংকায় তা লিপিবদ্ধ করিনি।

কুদসিয়্যাহ্‌ ঃ হজরত দীর্ঘজীবী হোন। এক রাতে তারাবী নামাজে কোরআন পাঠ শুনছিলাম। তখন এক জ্যোতির্ময় মাকাম দৃশ্যমান হলো। প্রকৃতপক্ষে ওই মাকাম ছিলো হকিকতে কোরআনের মাকাম। আমার কোনো কথা বলার সাহস ছিলো না। কিন্তু অনুধাবন করলাম, হকিকতে মোহাম্মদী (আলা সাহিবিহাস্‌ সলাতু ওয়াস্‌ সালাম) এই মাকামের কেন্দ্র। যেনো এক মহাসমুদ্রকে একটি সংকীর্ণ পাত্রে ভরে দেওয়া হয়েছে। ওই মাকামই হচ্ছে হকিকতে মোহাম্মাদীর বিস্তৃতি। নবী আলাইহিস্‌ সলাতু ওয়াস্‌ সালামগণ এবং অধিকাংশ কামেল আউলিয়া নিজেদের যোগ্যতা অনুযায়ী ওই মাকাম থেকে সৌভাগ্যবান হন। কেবল আমাদের পয়গম্বরই স. এই মাকাম পরিপূর্ণরূপে পেয়েছেন। অন্য কারো ক্ষেত্রে এমন হয়েছে কি-না জানতে পারিনি। এই নগণ্যকেও ওই মাকাম থেকে কিছু অনুগ্রহ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্‌ তাঁর তাওয়াজ্জোহের মাধ্যমে পরিপূর্ণভাবে আমাকে এই নেয়ামতের অংশ দান করেছেন। তবে এখনো পর্যন্ত ওই মাকাম খুব বেশি স্পষ্ট হয়নি। এই মহিমান্বিত মাস (রমজান) খুবই বরকতপূর্ণ মনে হচ্ছে (হজরত মোহাম্মদ সাদেক র. এর সকল বক্তব্য হজরত মোজাদ্দেদ র. এর মকতুবাত শরীফ প্রথম খণ্ডের শেষে লিপিবদ্ধ রয়েছে)।

হজরত মোজাদ্দেদ র. তাঁর পুত্রের এই দুর্লভ মর্যাদা যা তিনি মকতুবাতের মধ্যে উল্লেখ করেছেন, তার বিবরণ অনেক দীর্ঘ হয়ে যাওয়ার আশংকায় এখানেই শেষ করা হলো। বিস্তারিত জানতে গেলে মকতুবাত শরীফ পাঠ করতে হবে।

কাশফ ১ ঃ তাঁর অজদ (মত্ততা) এবং হাল (আল্লাহ্প্রেমের অভ্যন্তরীণ অবস্থা) এর সুনামের কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। একবার শায়েখ ওয়াজিউদ্দীন [১] (আহমদাবাদী) গুজরাটির বিখ্যাত মুরিদ শায়েখ বায়েজীদ খিরাওয়াল অত্যন্ত আগ্রহ ও মহব্বত নিয়ে তাঁর সাথে দেখা করতে এলেন। দূরে কোথাও যাওয়া তাঁর স্বভাব ছিলো না। তিনি সেরহিন্দ শরীফে উপস্থিত হয়ে দেখলেন, মখদুম মোহাম্মদ সাদেক তাঁর বুজর্গ পিতার সঙ্গে বসে আছেন। তিনি নিবেদন করলেন, আপনার মাথার টুপিটি আমাকে দান করুন। আমি বরকতস্বরূপ আমার কাছে রেখে দেবো। তিনি মোরাকাবার উদ্দেশ্যে মাথা নিচু করলেন। একটু পরে মাথা উঠিয়ে বললেন, হজরত বাহাউদ্দীন নকশবন্দ নিষেধ করছেন। হজরত মোজাদ্দেদ র. বললেন, আমি বলছি, টুপিটি তাঁকে দিয়ে দাও। তিনি পিতার নির্দেশ পালন করলেন।

কারামত ২ ঃ তিনি তখন বালক। তাঁর চাচা শায়েখ মাসউদ কান্দাহার সফরের জন্য যাত্রা করলেন। হজরত মোজাদ্দেদ র. তাঁকে বিদায়দানের উদ্দেশ্যে শহরের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত গেলেন। মোহাম্মদ সাদেকও সাথে ছিলেন। তিনি পিতাকে বললেন, দাদাজান এসে বললেন, মাসউদকে সফরে যেতে নিষেধ করো। কিন্তু সফর স্থগিত হলো না। শায়েখ মাসউদ চলেই গেলেন। অবশেষে মখদুমজাদার বক্তব্যই সত্যপ্রমাণিত হলো। ওই সফরেই শায়েখ মাসউদ ইন্তেকাল করলেন।

কারামত ৩ ঃ প্লেগ মহামারী চলছিলো। হজরত মোজাদ্দেদ র. চাশতের নামাজের ওজু করার পর বললেন, আমার কাছে একথাটি প্রকাশ করা হলো যে, ১২ই রবিউল আউয়ালের পর মহামারী চলে যাবে। সবাই বিস্মিত হলো। তারা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলো না যে, ওরকম এতো তাড়াতাড়ি শেষ হবে কীভাবে! পরদিন এই নগণ্য লেখক (বদরুদ্দীন সেরহিন্দী) মখদুমজাদার নিকট হাশিয়া-খেয়ালীর পাঠ নিচ্ছিলেন। তাঁকে হজরত মোজাদ্দেদ র. এর কথাটির তাৎপর্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, হজরতের এমতো মন্তব্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে, এই মহামারী বারো দিনের মধ্যে হজরতের বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে যাবে। তাই হলো। ওই মাসের ৯ তারিখে মখদুমজাদা মোহাম্মদ সাদেক র.

---

১. হজরত শায়েখ ওয়াজিউদ্দীন আহমদাবাদে (গুজরাট) ৯০২ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং সেখানেই ৯৯৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। ৯৫০ সালে আজমগড়ে তাঁর মালফুজাতের উপর ডাঃ গোলাম মোস্তফা খানের লিখিত পুস্তক 'মাআরিফ' দেখুন।

ইন্তেকাল করলেন। তাঁর একদিন পূর্বে একই দিনে তাঁর দুই ভাই মোহাম্মদ ফররুখ এবং মোহাম্মদ ইসা এবং তাঁর বোন উম্মে কুলসুম পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। এ সকল ঘটনা এ বারো দিনের মধ্যেই ঘটলো।

কারামত ৪ ঃ প্লেগ মহামারীর পর অনেকে স্বপ্নে দেখলেন, মখদুমজাদা আগমন করেছেন এবং রুগীদেরকে মহামারীর দায়িত্ব থেকে মুক্ত করে দিচ্ছেন এবং বলছেন, এই মহামারীর সকল বিপদ আমি আমার উপর নিয়ে নিয়েছি।

কারামত ৫ ঃ এক পুণ্যবান লোক স্বপ্নে দেখলেন, কে যেনো বলছেন, যে ব্যক্তি মখদুমজাদার নাম লিখে কাছে রাখবে, সে এ মহামারী থেকে নিরাপদ থাকবে। লোকেরা তাঁর মাজার শরীফের নিকটে জড়ো হলো এবং অনেকে তাঁর নাম লিখতে শুরু করলো। সেখানে জনসমাগম এতোই বেশি ছিলো যে, ফাতেহা বখশিসের কোনো পরিবেশই পাওয়া গেলো না। যারা তাঁর নাম লিখে সাথে রাখলো, তারা সকলেই সুস্থ হয়ে গেলো।

হজরত মোজাদ্দেদ র এক বুজর্গকে লিখেছেন, একমাসের মতো হয়ে গেলো সেরহিন্দ প্লেগ মহামারীতে আক্রান্ত। শহরবাসীর বদআমলের কারণে এই মহামারী এসেছে। কিছুসংখ্যক লোক মৃত্যুবরণ করেছে। কিছু পালিয়ে গিয়েছে এবং কিছু লোক রয়েছে মুমুর্ষু অবস্থায়। সকলেই আতংকগ্রস্ত। পবিত্র কোরআনের আয়াত— 'ওয়ামা আসাবাকুম মিম্ মুসীবাতিন ফীমা কাসাবাত আইদীকুম ওয়া ইয়া'ফুআন কাছীর' (তোমাদের উপর যে বিপদ আপতিত হয়েছে তা তোমাদের স্বহস্তে অর্জিত। আল্লাহ্ অধিক ক্ষমাশীল) এটাই হলো অবস্থা। (প্রথম খণ্ড ২৯৯ নং মকতুব)।

রবিউল আউয়াল মাসের নয় তারিখে সোমবার ১০২৫ হিজরীতে মখদুমজাদা খাজা মোহাম্মদ সাদেক তাঁর পরম প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। নিজেকে তিনি সাধারণ মানুষের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিঊন। তাঁর ইন্তেকালের সাথে সাথে মহামারীর প্রকোপ স্তিমিত হয়ে গেলো। শহরবাসীরা স্বপ্নে দেখলো মিঞা মোহাম্মদ সাদেক বলছেন, এই মহামারী আমি আমার নিজ দায়িত্বে নিয়ে নিয়েছি। দু' দিনের মধ্যে শহরে স্বস্তি ফিরে এলো। লোকেরা তাঁর কবরের কাছে এমনভাবে ভীড় জমাতে শুরু করলো যে, সেখানে ফাতেহা বখশিস করাই কঠিন হয়ে গেলো।

মোহাম্মদ ফররুখের কথা আর কী লিখবো। এগারো বছর বয়সে সে 'কাফিয়া' কিতাব পড়তো। পরকালের আযাবের ভয়ে সর্বদা ভীতসন্ত্রস্ত থাকতো। দোয়া করতো, বাল্যকালেই যেনো আমার মৃত্যু হয়, যেনো পরকালের শাস্তি থেকে রেহাই পেতে পারি। তার বন্ধুরা তার মধ্যে বিস্ময়কর অলৌকিক ঘটনা অবলোকন করতো। মোহাম্মদ ইসার বয়স হয়েছিলো মাত্র আট বছর। ওই বয়সে তারও

অনেক কারামত প্রকাশ পেয়েছিলো। সে ছিলো এক দুর্লভ রত্ন। আমানতস্বরূপ তাকে দেওয়া হয়েছিলো। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি। আমানতকে অক্ষত অবস্থায় মহান আল্লাহ্‌র দরবারে ন্যস্ত করতে হয়েছে। আল্লাহুম্মা লা তাহ্‌রিমনা আজ্‌রাহুম ওয়ালা তুফ্‌তিনা বা'দাহুম বিহুরমাতি সাইয়্যেদিল্‌ মুরসালীনা আলাইহি ওয়া আলাইহিমুস্‌ সলাতা ওয়াত্‌ তাসলীমাত।

হজরত মখদুমজাদা মোহাম্মদ সাদেক, মোহাম্মদ ঈসার জানাজার সাথে পায়ে হেঁটে জঙ্গলে তাঁর দাদার কবর পর্যন্ত গিয়েছিলেন। ফিরে আসার পর তাঁর উরুতে প্লেগের চিহ্ন দেখা গেলো। তাঁকে বাড়ির বাইরে হজরত মোজাদ্দেদ র. এর হুজরার মধ্যে শোয়ানো হলো। তাঁর পিতামাতা তাঁকে দেখার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। তিনি অতি কষ্টে দু'জনের কাঁধে ভর করে অন্দর মহলে প্রবেশ করলেন। তাঁর বুজর্গ মাতা দোয়া করলেন। পরম স্নেহ ও মমতার সাথে তাঁকে শেষ বিদায় জানালেন। তিনি ফিরে এসে হুজরায় শুয়ে পড়লেন। নিজেকে সম্বোধন করে বললেন, দুলহা যেভাবে শয়ন করে, সেভাবে শয়ন করো। পরদিন পূর্ণ হুজুরী এবং ফানা অবস্থায় তিনি পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিলেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিঊন। হজরত মোজাদ্দেদ র. তাঁর কাফনের জন্য তিনটি কাপড় (লেফাফা, কামিস ও ইজার) প্রস্তুত করলেন। দাফনের স্থাননির্ণয় বিষয়ে একটু চিন্তান্বিত হলেন। ভাবলেন তাঁকে শহরের বাইরে তাঁর পিতামহের কবরের পাশে দাফন করবেন, না অন্য কোথাও। তিনি ইসতেখারা করলেন। নির্দেশ হলো, এই প্রাঙ্গণে যেখানে মখদুমজাদা অবস্থান করতেন, সেখানেই দাফন করা হোক। স্থানও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হলো। এক বিশেষ সময় পর্যন্ত তাঁর কবর কাঁচা রাখা হলো। অনুচ্চ বেষ্টনি দেওয়া হলো। এরপর হজরত মোজাদ্দেদ র. এর মনে হলো, উপরে একটা গম্বুজ দেওয়াই উত্তম। এতে করে আম্বিয়া আ. দের অনুসরণ করা হবে। কুররাতুল আইনের (নয়নমণির) কবরের উপর গম্বুজ নির্মাণ করা হলো। সেই থেকে তাঁর কবর আল্লাহ্‌প্রেমিকগণের জিয়ারত গাহ্‌।

কারামত ৬ ঃ যখন হজরত মোজাদ্দেদ র. ইন্তেকাল করলেন, তখন তাঁর কবর শরীফ মখদুমজাদা মোহাম্মদ সাদেকের কবরের পাশেই খনন করা হলো। সেখানেই তাঁকে গুপ্ত সম্পদের মতোই পবিত্র মাটিতে ঢেকে দেওয়া হলো। হঠাৎ আমি দেখলাম, মখদুমজাদার কবর শরীফ তাঁর বুজর্গ পিতার প্রতি সম্মানার্থে পায়ের দিকে কিছুটা পিছনে ও পূর্ব দিকে সরে গেল। গম্বুজও এসে গেলো মধ্যবর্তী স্থানে। এ দৃশ্য অনেকেই প্রত্যক্ষ করলেন। বিস্মিত হলেন। এটাও ছিলো মখদুমজাদার একটি কারামত।

এরকম কারামত অতীতকালের বুজর্গদের দ্বারাও সংঘটিত হয়েছে। যেমন হজরত কাজী হামীদুদ্দীন নাগুরীর মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলো। তখন বখতিয়ার-উদ্দিন কাকী উশী র. এর প্রতি মহব্বতের প্রাবল্য হেতু অসিয়ত করলেন, আমাকে

হজরত খাজা কুতুবুদ্দীন র. এর কদমের কাছে দাফন কোরো। তাঁর অসিয়ত অনুসারে খাজা কুতুবুদ্দীন সাহেবের কদমের কাছে তাঁর কবর বানানো হলো। দেখা গেলো হজরত খাজা সাহেবের কবর কাজী সাহেবের সম্মানার্থে (কেনোনা তিনি উস্তাদ ছিলেন) সিঁড়ি স্বরূপ হয়ে গেলো। আর কবরের পায়ের দিকের অংশ অন্য দিকে সরে গেলো। উপস্থিত সবাই দৃশ্যটি প্রত্যক্ষ করলেন। এখনো দেখা যায়, এ নগণ্য ফকিরও দেখেছে।

এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত শায়েখ আহমদ জামীর র. বংশের এক সন্তান ইন্তেকাল করলেন। তখন শায়েখ এক দরবেশকে স্বপ্নের মধ্যে বললেন, ওকে আমার শিয়রের কাছে দাফন করো। কারণ সে আমার মাথার টুপিস্বরূপ। তাঁর নির্দেশ অনুসারে তাঁকে হজরত শায়েখের মাথার কাছে দাফন করা হচ্ছিলো। কিন্তু যখন তাঁকে কবরে নামানো হলো তখন তিনি তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতামহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক নিজের দু' পা দ্রুত টেনে নিলেন। হাঁটু বক্ষের সাথে লেগে গেলো। উপস্থিত সকলেই এ ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করলেন।

হজরত মোজাদ্দেদ র. এক মকতুবে খাজা মোহাম্মদ সাদেক যেখানে শায়িত আছেন, সেই ভূখণ্ডখানির মর্যাদা সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন—

আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহে এবং হজরত নবী করিম স. এর তোফায়েলে সেরহিন্দ নগর, যা আমার জন্মভূমি, তা যেনো এক গভীর অন্ধকূপ ছিল— আল্লাহ্তায়ালা আমার জন্য এই ভূমিকে পরিপূর্ণ করে উচ্চ প্রাসাদতুল্য করেছেন। অধিকাংশ নগর ও প্রদেশ হতে এ স্থানকে মাহাত্ম্যদান করেছেন। এ ভূমিতে এরূপ একটি নূর গচ্ছিত রেখেছেন, যা অনির্ণেয় ও প্রকারবিহীন নূর হতে সমাগত। এটা ওই প্রকারের নূর, যা কাবা শরীফের পবিত্রভূমি হতে প্রজ্জ্বলিত ও বিচ্ছুরিত হয়। প্রিয় বৎস খাজা মোহাম্মদ সাদেকের পরলোকগমনের কয়েক মাস পূর্বে ওই নূর এ দরবেশের প্রতি প্রকাশিত হয়েছিলো। এই ফকির সেটি স্বীয় বসত বাড়ির এক প্রান্তে চিহ্নিত করেছিলেন। এটা এমন একটি প্রদীপ্ত 'নূর' যার প্রতি সিফাত ও শানের ধূলিকণা নিক্ষিপ্ত হয়নি এবং এটা আনুরূপ্যবিহীন। আমার মনে এই আকাঙ্ক্ষাটির জন্ম হলো যে, এই ভূখণ্ডটি যেনো আমার সমাধিস্থল হয়। আর ওই নূর যেনো আমার সমাধির শিরোদেশে সদাপ্রোজ্জ্বল থাকে। আমি বিষয়টি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র হজরত খাজা মোহাম্মদ সাদেক, যে আমার গুপ্তরহস্যাধার ছিলো, তার নিকটে ব্যক্ত করলাম। ওই নূর ও আমার মনোভাবের কথা তাকে জানালাম। ঘটনাক্রমে প্রিয় বৎস স্বয়ং এই সৌভাগ্যের প্রতি অগ্রগামী হলেন এবং উক্ত নূরের নিকটস্থ ভূখণ্ডে নূরের সাগরে নিমজ্জিত হলেন।

সুখীদের জন্য সুখ অতি সুখকর,
আশেক-মিসকিন তরে সবই দুঃখকর।

এ মহান সেরহিন্দ নগরীর এটাও একটি শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষত্ব যে, ওলিকুল শিরোমণি প্রিয় বৎস মোহাম্মদ সাদেক এই নগরীতে শেষবিশ্রাম গ্রহণ করেছেন। কিছুকাল পর প্রকাশ পেলো যে, ওই গচ্ছিত নূর এই ফকিরের কলবস্থিত নূরের একটি জ্যোতি ও শিখা, যা আমার বক্ষ থেকে চয়িত হয়ে এই ভূমিখণ্ডে প্রজ্জ্বলিত করা হয়েছে। যেমন মশাল থেকে প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করা হয়। 'কুল্লুম মিন ইনদিল্লাহ্' (আপনি বলুন, সবকিছুই আল্লাহ্ থেকে হয়)।

আল্লাহু নুরুস্ সামাওয়াতি ওয়াল্ আরদ্ব (আল্লাহ্ আকাশ এবং পৃথিবীর নূর) — আল কোরআন।

এই ওলিকুল শিরোমনি ৯ই রবিউল আউয়াল সোমবার ১০২৫ হিজরী সালে ইন্তেকাল করেন।

হজরত মোজাদ্দেদ র. তাঁর বন্ধু দরবেশদের নিয়ে স্বীয় পুত্রের মাজারের পাশে শুক্রবার দিন হালকায় বসলেন। দেখতে পেলেন, তাঁর পবিত্র মাজার রূহশূন্য। তখন তিনি সোমবার সকালে হালকার জন্য নির্ধারণ করলেন। এভাবে তাঁর নয়নমণির প্রশান্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য তাওয়াজ্জোহ দিলেন। হৃদয়ের টুকরাকে চূড়ান্ত মর্যাদায় পৌঁছে দিলেন। তিনি তাঁর কবর জীবনের বিস্ময়কর অবস্থা এবং দর্শন বিষয়ে যা কিছু অবগত হতেন, সে সম্পর্কে বর্ণনাও করতেন। বলতেন, বৎস মোহাম্মদ সাদেক প্রতিটি মুহূর্ত বিস্ময়কর নূর ও নিদর্শনের মধ্যে নিমজ্জিত। মহান আল্লাহ্ তাঁকে তাঁর বিশেষ রহমত দ্বারা পরিবেষ্টিত করুন। আমাদেরকে তাঁর বরকত দ্বারা উপকৃত হওয়ার তওফিক দান করুন। আমিন। [১]

হজরত খাজা সাঈদ [২] সাল্লামাহুল্ মাজীদ

তিনি হজরত খাজা মোজাদ্দেদ র. এর দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন। তাঁর শুভজন্ম হয়েছিলো ১০০৫ হিজরীতে। শৈশবকাল থেকেই তাঁর ললাটে হেদায়েত ও কারামতের নিদর্শন প্রস্ফুটিত হতো। তাঁর পবিত্র অবয়বে প্রকাশ পেতো আভিজাত্য ও বেলায়েতের নূর। হজরত মোজাদ্দেদ র. বলেন, মোহাম্মদ সাঈদ চার অথবা পাঁচ বছর বয়সে অসুস্থ হলে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কী চাও? অনিচ্ছাকৃতভাবেই তার জবান থেকে বেরিয়ে এলো, আমি খাজা বাকী বিল্লাহকে চাই। আমি তার বিষয়টি হজরত খাজা সাহেবের দরবারে উপস্থাপন করলাম। তিনি বললেন, তোমার সাঈদ অত্যন্ত সঙ্গোপনে অদৃশ্যভাবে আমার সাথে নেসবত (সম্পর্ক) প্রতিষ্ঠা করেছে।

---

১. মকতুবাত শরীফ প্রথম খণ্ডে তাঁর নামে পাঁচটি মকতুব আছে যথা— ১৮১, ২০৮, ২৩৪, ২৩৬ এবং ২৬০।

২. খাজা মোহাম্মদ সাঈদের উপাধি ছিল 'খাজেনুর রহমত' (রহমতের ভাণ্ডার)। তাঁর লিখিত গ্রন্থ 'তাহকীকাত' মদীনা মুনাওয়ারার পাঠাগারে রয়েছে— যার মধ্যে মোহাম্মদ ইউসূফের নামে মকতুব রয়েছে।

হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ যখন হজরত মোজাদ্দেদ র. এর কাছে চিঠি লিখতেন, তখন অত্যন্ত মহানুভবতা ও অনুগ্রহের সঙ্গে মখদুমজাদার প্রতি দোয়ার কথা উল্লেখ করতেন। হজরত খাজা তাঁর এক বিশেষ মুরিদের কাছে লিখেছিলেন, শায়েখ আহমদের সন্তান এখনো বালক। তথাপিও সে মহান আল্লাহ্‌র গুপ্তরহস্য বিষয়ে যথেষ্ট প্রাজ্ঞ। সংক্ষেপে বলা যায়, সে হচ্ছে 'শাজারাতুন্ তাইয়্যেবাহ' (মারেফাতের পবিত্র বৃক্ষ)। মহান আল্লাহ্ তাঁকে চিরসুন্দর রাখুন। যখন তিনি প্রাপ্তবয়স্ক হলেন, তখন তিনি বাহ্যিক এলেম আহরণের জন্য নিয়োজিত হলেন। অধিকাংশ বিদ্যা অর্জন করলেন হজরত মোজাদ্দেদ র. এর কাছে। কিছু বিষয়ে জ্ঞানার্জন করলেন মাওলানা মোহাম্মদ তাহের লাহোরী থেকে। কোনো কোনো বিষয় তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা খাজা মোহাম্মদ সাদেক থেকে। মাত্র সতের বছর বয়সে সকল প্রকার আকলী ও নকলী জ্ঞান আয়ত্ত করেন তিনি। এরপর তিনি শরহে হিকমাতুল আইন, আজদী, বায়যাবী ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে লাগলেন। কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থও সম্পাদন করলেন। 'মেশকাত' গ্রন্থের হাশিয়া লিখলেন। হানাফী মাযহাবের পক্ষে অতি সূক্ষ্ম প্রমাণ উপস্থাপন করলেন। হাশিয়া খেয়ালী নামক গ্রন্থেরও টিকা-টিপ্পনী লিখলেন, যা অতীব চমকপ্রদ। ওগুলোর মধ্যে তাঁর নিজের বিশেষ গবেষণা বা দর্শনও উল্লেখ করলেন তিনি। তাঁর গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন ও অনুশীলন পূর্বক সে যুগের আলেমগণ তাঁর জ্ঞানের গভীরতার ও নির্ভরযোগ্যতার অভূতপূর্ব পরিচয় লাভ করেছিলেন। এক বিবরণীতে তিনি তাশাহুদের মধ্যে আঙ্গুল উঠানোর নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে অনেক প্রমাণাদি উপস্থাপন করেছেন। তর্কশাস্ত্র বিষয়ে তিনি ছিলেন সুবিজ্ঞ। হিন্দুস্তানের শ্রেষ্ঠ আলেমদের সাথে তাঁর বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। তিনি তাতে বিজয়ী হয়েছিলেন। তাঁদেরকে নিরুত্তর করে দিয়েছিলেন। সকল আলেম তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। তাঁদের দুর্বলতা ও অক্ষমতাকে প্রশংসার অন্তরালে লুকিয়ে রেখেছিলেন। আল্লামা আসিফ জাহ্ ছিলেন এলমে আকলিয়াতে বিশেষ পারদর্শী। তিনি অনেক কঠিন ও দুর্বোধ্য প্রশ্ন খাজা মোহাম্মদ সাঈদের সমীপে উপস্থাপন করেন। আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহে তিনি সেগুলোর সঠিক ও সুন্দর সমাধান দিয়ে দেন। একবার তিনি সম্রাট শাহজাহানের দরবারে গেলে সম্রাট তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেন। বলেন, খাজা মোহাম্মদ সাঈদ তাঁর পিতার মতোই জ্ঞানী ও পণ্ডিত।

হজরত মখদুমজাদা (সাঈদ) তাঁর পিতার মতো শরীয়ত ও তাকওয়ার পূর্ণ অনুসারী ছিলেন। সুন্নতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়েরও অনুসরণ করতেন তিনি। বিনয়ী, নিরহংকার, মিষ্ট ভাষণ, দান-ধ্যান এসকল কিছু তাঁর সাধারণ বৈশিষ্ট্য। তিনি তাজবীদসহ কোরআন পাক শিক্ষা করেছিলেন। হাদিসে নববী স. এর বিষয়ে

তিনি ছিলেন একাধিক সনদের ধারক। ফিকাহ্শাস্ত্রেও তিনি গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। হজরত মোজাদ্দেদ কোনো মাসআলা জানার প্রয়োজন হলে এবং কিতাব অনুশীলনের সময় না পেলে সরাসরি তাঁর কাছেই বিষয়টির বিস্তারিত বিবরণ জানতে চাইতেন।

বাহ্যিক এলেম শিক্ষা করার সাথে সাথে নবুওয়াতের কামালত বিষয়েও তিনি তাঁর পিতার নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। এভাবে নিজের পূর্ণতাকে পৌঁছে দিয়েছিলেন অধিকতর পূর্ণতায়। বরং মোজাদ্দেদ র. এর উপস্থিতিতেই তিনি তাঁর খেলাফতসূত্রে তরিকত বিষয়েও শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং মুরিদগণের প্রশিক্ষণ ও সঠিক পথপ্রদর্শন করেছিলেন। হজরত মোজাদ্দেদ র. তাঁর জীবনের শেষ সময়ে তরিকত বিষয়ে খুব কমই প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। মুরিদদেরকে তাঁর উপর এবং তাঁর অপর ভ্রাতা খাজা মোহাম্মদ মাসুমের উপর ন্যস্ত করেছিলেন। এই দুই মখদুমজাদা সম্পর্কে তিনি বলেছেন, প্রত্যেক কুতুবের দু'জন ইমাম থাকে, আর তোমরা দু'জন সেই ইমাম। মোহাম্মদ সাঈদ অত্যন্ত বিনয়ের সাথে এই সুসংবাদকে প্রধানত মোহাম্মদ মাসুমের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে নিজেকে তাঁর বাম হাত [১] বলতেন।

হজরত মোজাদ্দেদ র. আরো বর্ণনা করেন, আমি উরুজ ও নুজুলের (ঊর্ধ্বারোহণ ও অবতরণ) কোনো মাকাম মোহাম্মদ সাঈদ ব্যতীত অতিক্রম করিনি। তিনি একথাও বলেছেন যে, যখন আমার নুযুল হজরত আবদুল কাদের জ্বিলানী কুদ্দিসা সিররুহুর মাকাম পর্যন্ত পৌঁছলো, তখন দেখলাম মোহাম্মদ সাঈদ আমার সাথে আছে।

তিনি আরো বর্ণনা করেন— আমি তোমাদের দু'জনকে (মোহাম্মদ সাঈদ ও মোহাম্মদ মাসুম) বেলায়েতে আহমদীর মাকামে পেয়েছি।

মখদুমজাদা মোহাম্মদ সাদেক র. বর্ণনা করেন, আমি হজরত মোজাদ্দেদ র. থেকে মোহাম্মদ সাঈদ সম্পর্কে অনেক শুভসংবাদ শুনেছি।

সেগুলোর একটি এরকম— উলামায়ে রসেখীনদের কামালাত সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেছিলেন, মোহাম্মদ সাঈদ উলামায়ে রসেখীনদের অন্যতম এবং এ-ও বলেছিলেন, মোহাম্মদ সাঈদ অগ্রগামীদের অন্তর্ভুক্ত। মখদুমজাদা এই নেসবত অর্জন প্রসেঙ্গ স্বীয় মকতুবেও উল্লেখ করেছেন।

---

১. মূল ফার্সি কিতাবে রয়েছে এরকম— মোহাম্মদ সাঈদ বিনীত হও। মোহাম্মদ মাসুম হচ্ছে বাম হাত এবং তুমি ডান হাত। মাওলানা মাহবুব এলাহী টীকায় উল্লেখ করেছেন, বাম এবং ডান লেখার ক্ষেত্রে লেখক অগ্র-পশ্চাৎ করে ফেলেছেন। তিনি বর্ণ বিন্যাসের ক্ষেত্রে মাওলানা ইরফান আহমদ আনসারীর অনুবাদকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

হজরত মোজাদ্দেদ র. বলেছেন, একবার আমি দেখলাম মহাপুনরুত্থানের পর মুরিদগণসহ আমি পুলসিরাত পার হচ্ছিলাম। তখন দেখলাম, মোহাম্মদ সাঈদ আমার সামনে চলছে। তার ডান হাতে আমলনামা রয়েছে। এরপর আমরা সকলে একত্রে বেহেশতে প্রবেশ করলাম।

তিনি আরো বলেছেন, কিয়ামত দিবসে রহমতে রব্বানীর বণ্টনকর্ম আমার উপরে অর্পণ করা হবে। ওই বণ্টন মোহাম্মদ সাঈদের মাধ্যমেও হবে।

হজরত র. এর এই শুভসংবাদটি মোহাম্মদ সাঈদের ক্ষেত্রে হবে সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ। মখদুমজাদার একজন বিশেষ সহচর বলেছেন, আমার সনদ (সূত্র) ব্যতীত (এই তরিকার) কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। ইল্লা মা শাআল্লাহ্ (কিন্তু আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করেন)।

একদিন হজরত মোজাদ্দেদ র. বললেন, হে মোহাম্মদ সাঈদ! তুমি দায়েরায়ে নফীতে হজরত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছো। এখন অবস্থান করছো আমার সঙ্গে।

মখদুমজাদা মোহাম্মদ সাঈদ বর্ণনা করেন, হজরত মোজাদ্দেদ র. ইন্তেকালের আনুমানিক দুইমাস পূর্বে বলেছিলেন, এলমে মারেফাতের গূঢ় রহস্য অহরহ আমার উপর প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু আমি কার কাছে ব্যক্ত করবো। তোমরা তো সব সময় এখানে থাকো না। আমি ওই দিন থেকে পাঠদান ছেড়ে দিয়ে তাঁর দরবারে সার্বক্ষণিক উপস্থিত থেকে তাঁর খেদমতে নিজেকে নিয়োজিত রাখাকে আবশ্যিক করে নিলাম। সুতরাং মহান হজরতের মধ্যে সর্বদাই বিচিত্র অনুগ্রহদানের প্রতি আশান্বিত হয়ে রইলাম। তখন এতো অধিক পরিমাণ ফয়েজ ও মোশাহিদাত (দর্শন) লাভ হয়েছিলো যে, তার তুলনায় পূর্বের প্রাপ্তি ছিলো তুলনারই অনুপযোগী। তাঁর বিশেষ গূঢ় রহস্যের বেষ্টনীর মধ্যে আমার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিষয়েও এমন সুসংবাদ দেওয়া হলো, যা [১] বর্ণনার অতীত।

একদিন তিনি বললেন, তুমি আমার তালিকাভুক্ত হও। দ্বিমত পোষণ কোরো না। কেনোনা হজরত সিদ্দীক আকবর রা. রসুলে আনওয়ার সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তালিকাভুক্ত ছিলেন। মোহাম্মদ সাঈদ বলেন, হজরত মোজাদ্দেদ র. এর শেষ সময়ের অসুস্থতাকালে আমাকে ইমামতের দায়িত্ব দিলেন। ওই সময় নামাজ সম্পর্কে যে গভীর কামালত এবং বিভিন্ন মাকামের অবতারণা ঘটতো, যা

---

১. মূল ফার্সি গ্রন্থের পরিভাষা এরূপ— আওদর হরম মুহতারাম ইসরারে খাছদাহ খাবিশ নুবিয়াদে মুহরিমিয়্যাত দা উনাদ কেহ তাফসিল আনে গুনজাহিরা বয়ান নাহ অরিদ।

কিন্তু মাওলানা ইরফান আহমদ আনসারী কর্তৃক অনুবাদ এরূপ— মহান ব্যক্তিত্ব তাঁকে নিজের বিশেষ গূঢ়রহস্যের সম্মানিত ধারক বলে সুসংবাদ দিয়েছিলেন।

ছিলো এলমে মারেফাতের গভীর সূক্ষ্ম তত্ত্বসমৃদ্ধ এবং গোপনীয়, তা প্রকাশিত হতে লাগলো। হজরত র. বলতেন, সাঈদ! সকল কামালত হলো নামাজের ফসল এবং তুমি সেই নামাজের ইমামতি করছো। তাই মহানেয়ামত এবং এলমে মারেফাতের সূক্ষ্ম তত্ত্বে তোমাকেও পরিপূর্ণ করে দেওয়া হলো। আলহামদু লিল্লাহি আলা যালিকা হামদান্ কাছীরা।

সত্যের পথপ্রদর্শক মোহাম্মদ সাঈদ বলেছেন, প্লেগ মহামারীর সময় হজরত মোজাদ্দেদ র. এর উপর নানাবিধ সংকটের উদ্ভব হয়েছিলো। যেমন— তিন দিনের ব্যবধানে জ্যেষ্ঠভ্রাতা খাজা মোহাম্মদ সাদেকের ইন্তেকাল হলো। তাঁর ছোট ভাইয়ের মধ্যে মোহাম্মদ ফররুখ এবং ঈসা শেষ বিদায় গ্রহণ করলেন। মহামারীর ভয়াবহতা আমার জীবন সম্পর্কেও আশংকা সৃষ্টি করেছিলো। তাই হজরত র. সম্পর্কে আমি খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলাম। এমন সময় এক রাতে বিশেষ থেকে বিশেষতর তাজাল্লী এবং বিশেষ অবস্থার আবির্ভাব ঘটলো। মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এ রকম অবস্থার অবতারণা হয়েছিল কেবল তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যই। তিনি বলেছিলেন, মহান আল্লাহ্‌র কৃপায় তাঁর পক্ষ থেকে পবিত্র বার্তা এরূপ ছিলো যে, মোহাম্মদ সাঈদ এবং মোহাম্মদ মাসুমকে তোমার কোলে বসিয়ে দেওয়া হলো। দু'জনই ছিলো প্রবীণ ও শুভ্রকেশ বিশিষ্ট। আরো জানানো হলো, এই দু'জনকে দান করা হলো। দু'জনই দীর্ঘজীবি হবে। এমতো শুভবারতা শুনে হজরত মোজাদ্দেদ র. খুবই আনন্দিত হলেন। সকলকে এ শুভ সমাচার জানালেন। তখন উভয়ের বয়স ছিলো কুড়ি বছরেরও কম।

হজরত মোজাদ্দেদ র. এই দুইজন মখদুমজাদা সম্পর্কে এ-ও বলেছিলেন, তোমাদের জন্য দুনিয়াকে আখেরাত বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। মোটকথা হজরত মোজাদ্দদ র. মোহাম্মদ সাঈদের প্রতি ছিলেন বড়ই মহানুভব। ভালোবাসতেন অত্যধিক। নির্জনে ও জনসমক্ষে সর্বদাই তাঁকে নিজের সাথী বানিয়েছিলেন। বাতেনী সত্তায় ও মারেফাতের গোপন তত্ত্বে বানিয়েছিলেন তাঁর স্থলাভিষিক্ত। তিনি ছিলেন আমানতদার, উত্তম পরামর্শদাতা, উত্তম অভিভাবক এবং নিরবচ্ছিন্ন ইবাদত ও আনুগত্যময়, সকল প্রয়োজনীয় খেদমত এবং জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় কথা, কাজ যা কিছু ছিলো— সবই তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র খাজা মোহাম্মদ সাঈদের মাধ্যমে সম্পাদন করতেন। হজরত মোজাদ্দেদ র. সর্বদাই তাঁর জন্য দোয়া করতেন এবং তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকতেন। নানারকম সুসংবাদ দিয়ে যেতেন।

বাস্তব কথা হচ্ছে এই যে, এই মখুদমজাদা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয়দিক থেকে আল্লাহ্‌র প্রেম ও অনুরাগের প্রতি দৃঢ় পদক্ষেপে চলেন। নিজের মূল্যবান সময়কে সেভাবেই ব্যয় করেন।

ফজর নামাজ সম্পন্ন করার পর ওজিফা আদায় করেন। জিকিরের মজলিসে বসেন এবং ইশরাকের নামাজ আদায় করে গ্রীষ্মের গরমের ক্লান্তি দূর করার জন্য দুই তিন ঘন্টা নিদ্রা যান। জাগ্রত হয়ে চাশতের নামাজ আদায় করেন। তারপর পাঠদানের কাজে নিয়োজিত হন। সূর্য পশ্চিম দিগন্তে ঢলে পড়লে প্রথম ওয়াক্তেই জোহরের নামাজ আদায় করেন। এরপর মজলিসে বসেন। হাফেজদের কণ্ঠে কোরআন তেলাওয়াত শোনেন। পরে নিজে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন। কখনো কোরআন পাঠ করেন জোহরের নামাজের আগে এবং পুনরায় নিয়োজিত হন পাঠদানের কাজে। আসর নামাজের সময় হলে ওজু করে আসরের নামাজ আদায় করেন। নামাজ শেষে ওয়াজ-নসিহত করেন। কখনো কখনো আসরের নামাজের পর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নির্জনে বসে থাকেন। মাগরিবের নামাজ ওয়াক্তের শুরুতেই আদায় করেন। ফরজ আদায়ের পরক্ষণে সম্পন্ন করেন দুই রাকাত সুন্নত। অতঃপর মাগরিবের ওজিফা আদায় করে আওয়াবীন নামাজ দীর্ঘ ক্বেরাতসহ আদায় করেন। এভাবে ইমাম আবু হানীফা র. এর অভিমত অনুযায়ী এশা নামাজের ওয়াক্ত শুরু হয়ে যায়। অতঃপর এশা নামাজ সমাপনান্তে গ্রীষ্মকালে স্বীয় অন্দরমহলে প্রবেশ করেন। কিন্তু শীতকালে রাতের এক তৃতীয়াংশ হলে এশা ওয়াক্তের নামাজ আদায় করতেন এবং অধিকাংশ সময় অন্দরমহলের মহিলাদের উদ্দেশ্যে তিনি ওয়াজ করতেন। শেষ রাতে দীর্ঘ সূরাসহ উচ্চস্বরে তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করতেন। অধিকাংশ সময় তাহাজ্জুদ নামাজের ওজু দিয়ে ফজরের নামাজ আদায় করতেন এবং প্রত্যেক ওয়াক্তের ওজিফা ও সুন্নত দোয়াসমূহ নিয়মিত আদায় করতেন। নির্ধারিত ওয়াক্ত ব্যতীত অন্যান্য সময়ের দোয়াও নিয়মিত আদায় করতেন। এ ছাড়াও তিনি প্রতিদিন পাঁচ হাজার বার কলেমা তাইয়্যেবা পাঠ করতেন। মোট কথা, এ ধরনের ইবাদত ও সময়ানুবর্তিতা সাধারণ মানুষের দ্বারা সাধিত হতে পারে না। এর সঙ্গে মুরিদগণের তরিকতপ্রশিক্ষণ ও প্রিয়জনদের মাঝে ফয়েজপ্রদানে লিপ্ত থাকতেন এবং মুরিদগণের তরিকত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সঠিক পথপ্রদর্শনের নমুনা এবং ফয়েজ-বরকতপ্রাপ্তির নিদর্শন আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তাঁর মাধ্যমে সর্বক্ষণই সুসম্পাদিত হতো। দূর-দূরান্তের বহু লোক প্রতিদিন তরিকত শিক্ষার জন্য তাঁর দরবারে উপস্থিত হতো। তিনি তাঁদেরকে উচ্চতর কামালতে পৌঁছে দিতেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীতে যে মকতুবগুলো রয়েছে, সেগুলো এলমে মারেফাতের সমুদ্র ও সূক্ষ্মতত্ত্বের মণিমুক্তা সদৃশ। সে সকল পত্র থেকে নিম্নে কয়েকটির উল্লেখ করা হলো।

কুদসিয়্যাহ্ ঃ মহান আল্লাহ্ অধিক ধারণাপ্রসূতকে ওয়াহদাতে হকিকাহ (প্রকৃত একক) দর্শনের বাতায়ন বানিয়ে সকল প্রতিবন্ধকতা-আবর্জনাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে দেখার জন্য এক সরল পথ বানিয়েছেন, যেনো তার উজ্জ্বলতার কোনো

কিরণের প্রতিবিম্ব থেকে দর্শকের অন্তর্দৃষ্টির মধ্যে অপরিচিতির সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধ বা অবজ্ঞার কোনো নাম, নিদর্শন এবং দর্শন অবশিষ্ট না থাকে এবং 'ইন্নী ওয়াজ্‌জাহ্‌তু ওয়াজ্‌হিয়া লিল্লাজী ফাত্বরস্‌ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বা হানীফাওঁ ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকীন (নিঃসন্দেহে আমি নিবিষ্ট করছি আমার মুখকে ওই প্রভুর প্রতি যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা যিনি একনিষ্ঠ এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই) একথা বলে ওই উদ্দেশ্যের সন্ধানী হয়েছি, যিনি সকল সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা এবং কল্পনা থেকে ঊর্ধ্বে। আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান তাঁর পূর্ণতার (কামালের) পর্দাকে বেষ্টন করতে অক্ষম। হতে পারে আসলুল উসূল (মূলের মূল) এর প্রতিবম্বি বা ছায়া সকল গভীরতা অতিক্রম করে নিজেই নিজেকে প্রকাশ করে এবং আমাদের কিছু প্রাপ্তি হয় এবং 'ওয়ামা যালিকা আল্লাল্লাহি বিআযিয' (এ বিষয়টি আল্লাহ্‌র জন্য কঠিন নয়) (মকতুবাতে সাঈদিয়া-১৩ নং)।

কুদসিয়্যাহ্‌ ঃ হে মোহাম্মদ! তুমি কি দেখোনি প্রভুত্বের বিকাশস্থল এবং অবশ্যম্ভাবী ও অস্তিত্বের সমষ্টিভূত প্রভুর নামই হচ্ছে আল্লাহ্‌, যিনি তাঁর যাত এবং অতিরিক্ত মাহাত্ম্যের দিকে চালিত করেন। তিনি কেমন করে তাঁর মাহাত্ম্যের ছায়াকে হাকায়েকে কাওনিয়ার (সৃষ্টিতত্ত্বের) প্রতি বিস্তৃত করেছেন এবং তাকে খিলাআতে অজুদ (অস্তিত্বের আবরণে) অস্তিত্ববান করে দিয়েছেন। অথচ তাঁর ওই উপস্থিতি বা বিদ্যমান থাকা যথার্থই অস্তিত্বহীনতা বা নাস্তি ছিলো। সুতরাং অস্তি ত্বহীনতা তাঁর ইচ্ছা ও কুদরতের পূর্ণতা দ্বারা আশ্চর্যান্বিত বা বিস্মিত হয়েছে যে, নাস্তি থেকে কেমন করে অস্তিত্ব রূপ লাভ করলো এবং এর উপর অস্তিত্বের বিধান (আহকাম) ও নিদর্শন (আছার) কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো। তিনি এমনই পবিত্র সত্তা, যিনি বরফের মধ্যে আগুন ও পানিকে একত্র করে দেখিয়েছেন। যদি তিনি ইচ্ছা করতেন, তাহলে ওই লোকদের ধারণা ভ্রান্ত হয়ে যেতো, যারা শুয়ুনাতে ইলাহী (আল্লাহ্‌র শান বা অবস্থা) বিকাশমান বলে থাকেন। তারপর এই ছায়াকে বিস্তৃত করার পর সূর্যকে তার প্রভুর মহান যাতের নিদর্শন বানিয়ে দিয়েছেন, যেনো তিনি দিনকে প্রকাশ্য করে দিয়েছেন এবং অস্তিত্বহীনতা বা নাস্তির অন্ধকারকে দূর করে দিয়েছেন।

সূর্যকে করেছেন তিনি তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ। অস্বীকার করার নেই কোনো উপায়। না মিলেছে পরিত্রাণ। পবিত্র ওই সত্তা, যিনি অতিবিকাশের কারণে গুপ্ত। তাঁর জ্যোতির্ময়তা দুই প্রকারের পর্দার মধ্যে নিহিত। এক্ষেত্রে সূর্য শব্দটি খুব সম্ভব এ বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত যে, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব-সম্মান এবং জালাল এই নিদর্শন দ্বারা অনুধাবন করা যায়। সূর্যের জ্যোতি বা কিরণ এরূপ যে, সে তার নিজস্ব সত্তা এবং বস্তুসামগ্রী বিকাশের প্রতি দিকনির্দেশ করে। তারপর সূর্য নিজেই তার নিজের জন্য প্রমাণ হয়ে যায় এবং সে রাস্তাও দেখায়। আমি এই ছায়াকে অতি সহজে নিজের দিকে টেনে দিয়েছি, যেনো সে উত্তরোত্তর ঊর্ধ্বারোহণ করে আরো জ্যোতির্ময় হয়।

কুদসিয়্যাহ্ ঃ 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' এই পবিত্র বাক্যটি পবিত্র কালাম মজীদের প্রত্যেক সূরার শুরুতে অবস্থিত। এর মধ্যে অসংখ্য গুপ্তরহস্য বিদ্যমান। সেগুলোর অন্যতম হচ্ছে— যোগ্যতাসম্পন্ন মুরিদদের জন্য তালিমে সুলুক (তরিকতের পথে) অগ্রসর হওয়ার প্রশিক্ষণ এবং চূড়ান্ত পর্বের আরেফদের জন্য সতর্কবাণী। যেমন 'বা' অক্ষরটি সুলুকের সূচনার ইঙ্গিতবাহক এবং এটাই সুলুকের ভিত্তি। বলা হয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত সালেক তার স্বেচ্ছাচারিতা থেকে পূর্ণরূপে বেরিয়ে আসতে না পারবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে তার কাঙ্ক্ষিত সত্তার (প্রধান প্রেমাস্পদের) মধ্যে ফানা হতে পারবে না এবং ওই বর্ণের মতো হবে না, যার নিজস্ব কোনো অর্থ নেই। শুধুমাত্র অন্য অর্থ প্রকাশের জন্য নিজের অস্তিত্ব এবং তার আবেদন থেকে বাইরে যায় না। যে আবেদন অস্তিত্বের পূর্বে নিজের অস্তিত্ব নিজের নৈপুণ্যের মধ্যে রাখে, তার কোনো কাজ হয় না।

যখন সালেক আল্লাহ্র কোনো সিফাতি (গুণবাচক) নামের প্রকাশস্থল হয়, তখন অবশ্যই সালেকের ছায়ার অস্তিত্বের ফানা ওই এসেম বা নামের মধ্যে পতিত হবে। এসেম নিজের মুসাম্মার (নামধারীর) বিপরীতে কোনো অস্তিত্বই রাখে না, এর প্রেক্ষিতে তার মুসাম্মার বিপরীতে প্রমাণ স্বরূপ হয়। সেজন্য তার কাজ মুসাম্মার মধ্যে সন্নিবদ্ধ হয়। সালেকের পারস্পরিক সম্পর্ক (মুআমালা) যা এই এসেমের সাথে সম্পর্কিত, সে তার মুসাম্মার সংগে সম্পর্ক স্থাপন করে নেয়। এ সময় সে সমষ্টির বিস্তৃতির মধ্যে, যার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্ আল্লাহ্র প্রেমে নিমজ্জিত হয়ে যায়। তাজাল্লিয়ে যাতের দ্বারা ধন্য হয়ে যায়। এ হাদিসই এ বিষয় সমর্থনকারী যে, 'মান তাওয়াজাআ লিল্লাহি রফাআল্লাহ্' (যে আল্লাহ্র জন্য বিনয়ী হয়, মহান আল্লাহ্ তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেন)। তার প্রতিটি মাকাম এই মাকামের সাথে সম্পর্কের কারণে একটি অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানেই সে বাকা (স্থায়ীত্ব) লাভ করে। সুতরাং এই মর্তবাও শানে ইলাহীর একটি সমষ্টিভূত রূপ। আর হজরতে এতলাক (আল্লাহ্র সাথে সংযোজনের) পূর্ণ সুনির্দিষ্ট অবস্থা। এই মাকামে উপনীত হওয়া আল্লাহ্র শান ব্যতীত সম্ভব নয়। কিছুকাল সে জাতের খেয়াল অনুধাবন করতে পারে এবং আধিক্যকে দূর করতে এবং একত্বকে হাকিকাতুল হাকায়েক (চরম সত্য) এর মধ্যে বিশ্বাসযোগ্য করতে পারে। এই আয়াত অনুসারে তাসীরুল উমূর (সকল কাজ আল্লাহ্র দিকে ফিরে যায়) এক রহস্যময় বিষয়, যা শুধু উপলব্ধি করা যায়। হতে পারে, তিন বরকত পূর্ণ নাম 'আল্লাহ্', 'রহমান' ও 'রহীম' এর অনুশীলন এই বিষয়টি প্রমাণ করে যে, যাত কখনো তার বিশ্বাসের বৃত্ত থেকে বহির্গত হয় না। বিশেষ করে 'রহীম' শব্দটি ব্যবহারের কারণে এই কথাটিই প্রমাণিত হয়। কেনোনা প্রারম্ভে দুটি এসেম 'আল্লাহ্' ও 'রহমান' এর জন্য স্বীকৃতি এই যে, দুটি এসেমই তাঁর । 'হা ' এরকমই কিছু সাধারণ অর্থে নয়। বরং এ দুটি এসেম যাত পাকের বিশেষ

নৈকট্যপূর্ণ এসেম। তবে অন্য এসেমের সাথেও সম্বন্ধ রাখেন। ‘কুলিদউল্লাহা আবিদউর রহমানা আইয়্যামান তাদউ ফালাহুল আসমাউল হুসনা’ (আপনি বলে দিন, তোমরা আল্লাহ্ বলে ডাকো অথবা রহমান বলে ডাকো এবং যে নামেই ডাকো সবই তাঁর সুন্দর নাম) এ পবিত্র আয়াত এই বিষয়েরই ইঙ্গিত দেয়।

জেনে নাও যে, এক আরেফ এই আসমাউল হুসনার হকিকতে উপনীত হয়ে এ ধারণা করেছিলো যে, তার বাসনা যথার্থই অর্জিত হয়েছে। কিন্তু আসলে তা নয়। বরং ওই কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিই তার নিজের ‘দায়েরায়ে আসমাহ’ (নাম বৃত্ত)ই যাতের ‘প্রমাণ স্বরূপ’ ওই অবস্থা থেকে সে এক কদমও বাইরে আসতে পারেনি। এটাই আমার প্রভুর প্রত্যাশা। সকল বিষয়ের হকিকত সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত (মকতুবাতে সাঈদিয়া ১৭ নং)।

কুদসিয়্যাহ্

যুলফাশ বাকাশী শবদর আস আয়াদে আজু
চুঁ বুগযারি জঙ্গল বাজ আয়াদে আজু
দরিকে গেরাহ আজ বিচে অখামশ বাকাশায়ী
আলামে আলামে মিশক তরাঝ আয়াদে আজু

বলা হয়ে থাকে, শায়েখ আবু সাঈদ আবুল খায়ের র. যিনি ৪৪০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেছিলেন, তিনি এই কবিতা ভাগ্যলিপি প্রসঙ্গে বলে থাকতে পারেন। তাই তার থেকে এই জটিল অবস্থার প্রকাশ ঘটেছে। আমার স্বল্পজ্ঞানে যে শূন্যতা ধরা পড়েছে তা হচ্ছে ‘যুলফ’ শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ওয়াহদাতে মতলক (মূল এককত্ব) যা দুর্বোধ্য জ্ঞানজগতের এক সৌন্দর্যমণ্ডিত বিষয়। অর্থাৎ যা ‘তাআইয়্যুন’ এর পর্দার বেষ্টনী, যা ‘যাত’ এর আহকাম ও নিদর্শন প্রত্যক্ষ করার সাথে দীপ্তিমান হয়। ওই সত্তাকে তিনি বাহ্যিক অবস্থার উপর ছেড়ে দিয়ে মূল উদ্দেশ্যকে গোপন করেছেন। তাহলে এ ক্ষেত্রে দীর্ঘ রাতের কথাই এসে যায়। কেনোনা এককত্বের পর্দার মধ্যে এককত্বের সূর্য শোভমান হওয়ার পর চক্ষুষ্মানদের দৃষ্টিতে নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হওয়া প্রয়োজন ছিলো। তিনি তা উপেক্ষা করেছেন এবং সাধারণ এককত্বকে সাধারণ একক হিশেবেই রেখেছেন এবং বেষ্টনিকে কেবল সংযোজনের অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছেন। তাহলে ‘হক’ এর যাত স্বাভাবিকভাবেই সুন্দর করে তুলবে। বায কা চঙ্গাল (চঙ্গালে বায) (অর্থাৎ হিংস্র মানুষ বা পশুর থাবা বা আক্রমণ থেকে ফিরে আসা) শব্দার্থ দ্বারা মহান প্রেমাষ্পদের প্রেমিকদের অন্তরকে শিকার করার কথা বলা হয়েছে।

যাত আমার, দীপ্তিও ‘যাত’ এর
মূল সত্তাই প্রতিরোধক সিফাতের।

সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, সকল আনফাস ও আফাক এবং আইয়ান ও আছার ও আফআলের প্রত্যাবর্তনস্থলে শুধু যাতের এককত্বকেই পাওয়া যায় এবং

'আলা ইলাল্লাহি তাসীরুল উমূর' থেকে স্বাদ গ্রহণ করে। তারপরই কাযা ও কদরের (ভাগ্যলিপির) ভেদ উন্মোচিত হয়। কেনোনা তার সকল কর্মকাণ্ড ওয়াহ্দাতুল অজুদ কেন্দ্রিক হয়ে থাকে। এবং প্রয়োগ বা সংযোজনের দিক দিয়ে বাসীতে হাকিকী (বিস্তৃত সত্তা)এবং তাজাল্লিয়ে সানী (দ্বিতীয় দীপ্তি) এর দিক দিয়ে সে নিজেরই আহবায়ক এবং তাজাল্লিয়ে ছালেছ (তৃতীয় দীপ্তি) এর দিক দিয়ে সে আহবায়ক, যেনো সে নিজে নিজেই সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে সৃষ্টিকে নিজের থেকে দূরে রেখেছেন। নতুবা কে কর্তা এবং কর্মই বা কার? সে তখন সূক্ষ্মমর্যাদাবোধকে স্মরণ করে এবং জ্ঞান-বুদ্ধিকে জাগ্রত করে।

নিজেকে গোপন রেখে নিজেকেই করেছেন বিকাশ
যে রহস্যের উদঘাটনে সকলেই রয়েছে পেরেশান।

উপরের কবিতার একটি পঙ্ক্তি দরয়েক গেরাহ আজ বিচে অখামশ বা কাশায়ী। অর্থাৎ তার স্বাধীন বা পরিপূর্ণ একচ্ছত্র হওয়ার ক্ষেত্রে যে অন্তরায় বা জটিলতা রয়েছে, তার থেকে একটি জটিলতা বা বাঁধনকে খুলে দাও বা উন্মুক্ত করো। তাহলে সমগ্র পৃথিবী মেশকের সুগন্ধে সুবাসিত হয়ে যাবে। অর্থাৎ আ'য়ান (দুস্প্রাপ্য বস্তুসমূহ) বিকাশের জন্য যে বিচিত্র রঙ হয়ে থাকে, তা দূর হয়ে যায়, তাই মেশকের সুবাস (যার দ্বারা ওই কালো বর্ণ উদ্দেশ্য যা 'যাত' এর রঙহীনতার সাথে সম্পর্কিত) বিকশিত হয়। অন্ধকারের মধ্যেই হয় আবে হায়াত (নতুন জীবন) এবং আনুরূপ্যবিহীন সৌন্দর্যের আতরের সুবাসে সকল উৎসাহী আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়। আল্লাহু ইয়াকুলুল হাক্কু ওয়া হুয়া ইয়াহ্দিস্ সাবীল (মহান আল্লাহ্ই সত্য কথা বলেন এবং তিনিই সরল পথ প্রদর্শনকারী)।

কুদসিয়্যাহ্ ঃ মহান আল্লাহ্ তাঁর আকর্ষণ আমার কাঁধের উপর ফেলে দিয়ে আমাকে আমার থেকে মুক্ত করেছেন এবং তাঁর হকিকতের (মূলতত্ত্বের) দিকে আমাকে পথপ্রদর্শন করেছেন, যেনো প্রকৃত প্রেমাস্পদের কাছে পৌঁছাতে বহুমুখী সম্পর্ক, বিবর্তন, নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা অন্তরায় না হয়ে যায়। সংকট ও স্বাচ্ছন্দ্য, বিলাসিতা এবং দারিদ্র, কঠোরতা ও নম্রতা, অনুগ্রহ ও নিগ্রহ, তাঁর জামাল ও জালাল (সৌন্দর্য ও মহত্ব) এর দর্পন তুল্য হয়ে যায়। সম্ভবত সমুদ্ভাসিত নূরের উজ্জ্বলতার মধ্য হতে একটি ঝলক মনুষ্যত্বের ছায়ার উপর চমকিত হয়। প্রবৃত্তির সূর্য প্রতিবিম্বের পাহাড়ের পিছন থেকে প্রকাশিত হয়। এজন্য এই অনুভূতিহীন সক্রিয়তা জড়বস্তুর নাম ও নিদর্শনাবলীকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে এমন মহান অস্তিত্ব দান করে, যার নিচে অস্তিত্বহীনতা অনুপস্থিত থাকে। সে জীবনের যেনো মৃত্যু না হয়। নূরের বিপরীতে যেনো কোনো অন্ধকার না আসে। তিনিই যে মীনাহ (বৃষ্টি) বর্ষণ করেন, যার দ্বারা মানুষ আশাহত হয়ে যায়। তিনিই নিজের রহমতের বিস্তৃতি ঘটান এবং তিনিই প্রশংসার মালিক হওয়ার উপযোগী।

কুদসিয়্যাহ্ ঃ কখনো ধারণা হয় যে, কোনো কোনো মুহাক্কিক সুফি 'আইনে যাওয়াল' এর কথা বলেন এবং আছার (চিহ্ন) এর কথা বলেন না। এর কারণ হচ্ছে— সমস্ত জগত আসমায়ে ইলাহীর (আল্লাহ্‌র নামসমূহের) বিকাশস্থল। তাই বলা হয়েছে, 'আলমে মাজমুআহ (জগতসমূহের সমষ্টি) কয়েকটি এ'রাজ (প্রতিবন্ধক) যা আইনে ওয়াহেদ (একক দৃষ্টিতে) এর মধ্যে একত্রিত হয়েছে। যখন যোগ্যতাসম্পন্ন সালেক মহান আল্লাহ্‌র রাস্তায় কদম রাখে এবং যখন তার প্রতি হেদায়েতের বাতায়ন উন্মুক্ত হয়, তখন এই রহস্যটি উন্মোচিত হয়ে যায় যে, প্রকৃতপক্ষে তাঁর অস্তিত্ব ব্যতীত কিছু নেই এবং যেমন সে আইনে তাসাউর (বাস্তবিক অনুধাবন) করে, সে নিছকই কল্পনাকারী ওই কামালাতে ইলাহীর, যা তার মধ্যে দীপ্তিমান হয়েছে এবং সেগুলোকে নিজের পক্ষ থেকে মনে করে। যখন সালেক মূলকে পেয়ে যাবে, তখন আইন (দর্শন) এর নামনিশানাও পাবে না। তখন সে সকল আছার বা নিদর্শনকে স্বীয় প্রভুর দিকে ন্যস্ত করে দিবে। অস্বীকার করার কোনো উপায়ই নেই। কেনোনা কামালতে ইলাহীকে অস্বীকার করা মারাত্মক ভুল। তার ওই সম্পর্ক ছিলো তার নিজের ধারণাপ্রসূত। এখন তা যথাযথ হয়েছে। এখন সে অস্তিত্বের রাজ্যে মহান আল্লাহ্‌র কামালত এবং শান ব্যতীত অন্য কিছু দেখবে না। শানসমূহ শানের মালিকের চক্ষু (আইন) স্বরূপ। এ সম্পর্কে ধারণা করা যেতে পারে মাত্র। এ জন্য সে একক সত্তার প্রত্যেক নেসবত ও সম্পর্কের দিক দিয়ে নিজেকে মুক্ত দেখতে পাবে।

ঘরের মালিক ঘরের মধ্যে রয়েছে
বেশ, এটাই যথেষ্ট—

সে এ কথা বলতে বলতে তওহীদসমুদ্রে নিজেকে উৎসর্গ করে নিমজ্জিত হয়ে যাবে। বহুত্বের মধ্যে একত্বের দর্শন এই অর্থে যে, সে জগতের সুনির্দিষ্ট রঙ বে-রঙের মিলন বা বিচ্ছুরণে ওয়াহ্‌দাতে হাকিকাহ'র (প্রকৃত এককের) বিস্তৃতি ও মিলন হয়ে যাবে। সকল বিন্দু ও অণুর মধ্য হতে প্রত্যেক বিন্দুর দর্পনে আনুরূপ্যবিহীন সৌন্দর্য্যদর্শনের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে। এ বিষয়টি সংঘটিত হবে এই প্রক্রিয়া থেকে দূরে সরে যাওয়ার পর। এই অবস্থা হজরত মোজাদ্দেদ র. এর ছিলো। তিনি বিষয়টির মধ্যে এভাবে পার্থক্য নিরূপণ করেছেন যে, তাদের আইন এবং আছার দু'য়ের মধ্যে যাওয়াল (পতনপ্রবণতা) বিদ্যমান। কেনোনা তাঁর নিকট যদিও আসমায়ে ইলাহীর জগত বিকাশস্থলের সমষ্টি— কিন্তু বিকাশস্থল বিকাশের আইন হতে পারে না। বরং ধারণা গ্রহণের জন্য এক সাদৃশ্যপূর্ণ উপমা দিয়ে অনুভূতিজগতে প্রতিষ্ঠিত করে অনুধাবনের চেষ্টা করা হয়েছে। তা নাহলে বহির্জগতে এর বাস্তবতা (হকিকত) নাম ও নমুনাবিহীন।

আরেফের উপর এমতো বাস্তবতা প্রকাশিত হওয়ার পর এবং প্রকৃত অস্তিত্বের প্রাধান্য অর্পিত হওয়ার শেষে যার বাস্তবতার শান প্রকাশিত হবে, তার দুর্বল অবস্থা এবং দুর্বলতার চিহ্নের নাম ও নিদর্শন এবং দর্শন ও প্রভাব কোনো কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। আয়াতে কারিমা— 'নারুল্লাহিল মুকুদাতুল্লাতী তাত্ত্বালিউ আ'লাল্ আফ্ইদাহ্' (আল্লাহ্র প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ড যা অন্তরের উপর চড়াও হয়), 'কানাল্লাহু লাম ইয়াকুন মাআহু শাইয়্যুন ওয়াল আনা কামাকানা' (আল্লাহ্ই ছিলেন তাঁর সাথে অন্যকিছু ছিল না। তিনি তদ্রূপই আছেন যেমন পূর্বে ছিলেন)। এমনি মুহূর্তে আল্লাহ্তায়ালার সাথে আলমের (জগতের) একত্রিত হয়ে যাওয়া এবং আইনে হক (সত্যদর্শন) হয়ে যাওয়ার কোনো অর্থ থাকবে না। এ সময় ফানা ও ইবাদতের বাস্তবতা, যা সকল আ'ইয়ান এবং আছার থেকে বহির্ভূত হওয়া এবং মূল অস্তিত্বের মধ্যে এ সবকিছুকে বিলীন করে দেওয়া থেকে বাক পদ্ধতি প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে। ' অন্বেষণ করো কোথায় সে পথ'— কিন্তু এটি হচ্ছে সেই অন্বেষিত পথ।

কুদসিয়্যাহ্ ঃ প্রশ্ন হচ্ছে, হজরত মোজাদ্দেদ র. মকতুবাত শরীফ ২য় খণ্ডের ১৫ নং মকতুবে উল্লেখ করেছেন, উরুজের (ঊর্ধ্বারোহণের) মর্তবাসমূহ যখন একটি অন্যটির থেকে স্বতন্ত্র তখন এক মাকামের মূল থেকে অন্য মাকামের মূল পর্যন্ত পৌঁছায়। এ সকল কামালাত দায়রায়ে বেলায়েতের অন্তর্ভুক্ত। যখন এই পার্থক্য দূর হতে থাকে, তখন এর তাফসিল (বিস্তৃতি) অবশিষ্ট থাকে না। 'মুআমালা' (ব্যবহারবিধি) হয় সংক্ষিপ্ত এবং শুধুই বিস্তৃতি অনুযায়ী হয়ে যায়, যা নবুওয়াতের মাকামের উৎস বা সূচনা।

'বেলায়েতে সোগরা' সিফাতের (গুণাবলীর) ছায়া বা প্রতিবিম্বের সাথে সম্পর্ক রাখে। এর মধ্যে এক ছায়া অন্য ছায়া থেকে স্বতন্ত্র হওয়ায় এর মধ্যে বিস্তৃতি বা ব্যাখ্যা বিদ্যমান। কিন্তু 'বেলায়েতে কোবরা'র সম্পর্ক উসূলে সিফাত (মূল গুণ) এর সাথে, যার সম্পর্কে বলা হয়েছে— এ মাকামে এলেম (জ্ঞান) আইনে কুদরত (মূল শক্তি) এবং কুদরতে আইন (শক্তির উৎস) হলো ইচ্ছা পোষণ করা। তাই এর মধ্যে ব্যাখ্যার অবকাশ নেই। কেনোনা এর মধ্যে অধিক আলোচনা শুধুমাত্র বিশ্লেষণস্বরূপ।

এভাবে 'বেলায়েতে উলইয়া'র মধ্যে যার সম্পর্ক যাতপাকের শানের সাথে, যা মূল সত্তা ব্যাখ্যা তো দূরের কথা, অসাবধানতাবশতঃও যদি বিস্তৃতি আসে, তাও যাত পাকের সাথে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। কেনোনা এরশাদ হচ্ছে— 'ইন্নাল্লাহা ওয়াসিউন আলীম' (নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বিশদভাবে জ্ঞাত) তাহলে এই পার্থক্য কেনো?

উত্তর ঃ সিফাত (গুণসমূহ) কে পৃথক না করা, যেমন ইবনে আরাবী র. এর মতবাদ। তিনি সিফাতের বৃদ্ধিকে সমর্থন করেন না। এটি একটি যুক্তিসঙ্গত বিষয়। কিন্তু এটি হজরত মোজাদ্দেদ র. এর মতবাদের পরিপন্থী। তাঁর মতবাদ হচ্ছে, যাত পাকের শান সম্পর্কে এটাই বুঝতে হবে যে, তাঁর শানসমূহ তাঁর মূল যাতস্বরূপ। কিন্তু ওই শান মূল গুণের অন্তর্ভুক্ত। তাই তার মধ্যে স্বাতন্ত্র্য বা পার্থক্য এবং ব্যাখ্যা বর্ণনা সম্পূর্ণ সম্ভব। কিন্তু মূল 'যাত' এর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ এর বিপরীত। তার ক্ষেত্রে পার্থক্য, সংখ্যা নির্ণয়— জ্ঞান, বিবেক থেকে পবিত্র। সুতরাং বুঝে নাও।

কুদসিয়্যাহ্ ঃ তিনি তাঁর এক প্রিয়জনক লিখেছিলেন, আমি মহান আল্লাহ্র নেয়ামত ও তাঁর কৃপার প্রতি কৃতজ্ঞতা পোষণ করি এবং দরূদ ও সালাম সাইয়্যেদুল আম্বিয়া এবং তাঁর বংশধর এবং সহচরবৃন্দের প্রতি কিয়ামত পর্যন্ত বর্ষিত হতে থাক। মহান আল্লাহ্ রসুলুল্লাহ স. এর সত্তাকে তাঁর অনুগ্রহ দ্বারা স্বীয় হুজুরীর মধ্যে এমনভাবে গোপন রেখেছেন যেনো গুপ্ত বিষয় কখনোই উদঘাটিত না হয়। আহাদিয়াতের (একত্বের) এমন শুহুদ (দর্শন) দান করেছেন, যেনো এর মধ্যে আধিক্যের ধারণা প্রতিবন্ধক না হয়। এমন নৈকট্য যা বিভিন্ন গুণ বা অবস্থার সাথে আবির্ভূত হয়, যেনো অন্যের অস্তিত্ব তাঁর প্রতিবন্ধক না হয়। এ জন্য আমাদের খাজাগণ (কাদ্দাসাল্লাহু আছরারাহুম) এর তরিকার মধ্যে ওই জযবা প্রারম্ভেই ঘটে যায়। এর মধ্যে সালেকের একপ্রকার উৎসর্গপ্রবণ তন্ময়তার হাল অর্জিত হয়। কখনো এই অবস্থা অর্জিত হওয়ার কারণ হয় সালেকের অতৃপ্তি, যা আলমে আমর ও আলমে খালকের অংশ বিশেষ। এর পূর্বে সে তার দৃঢ়তা সৃষ্টি করে এবং তার মালাকাহ (কর্তৃত্ব) অর্জিত হয়। এই তরিকায় এটাকে 'অজুদে আদম' (নাস্তির অস্তিত্ব) বলে বর্ণনা করা হয়। হজরত খাজা বুজর্গ বাহাউদ্দিন নকশবন্দ কুদ্দিসা সিররুহু এ সম্পর্কে বলেছেন, অজুদে [১] আদম অজুদে বাশারিয়াতের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয় (কিন্তু অজুদে ফানা অজুদে বাশারিয়াতের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয় না)। কেউ কেউ এটাকে তাজাল্লীয়ে সুরী বলে উল্লেখ করেছেন। এই মাকামেই তাওহীদে সুরী হয়ে থাকে যেনো সালেক একত্বের ধ্যানের মধ্যে আধিক্যকে দর্শন করে এবং এ সালেকের অজুদে কাওনী ওয়া মাকানী এখন তার মাকামের উপরে হয়ে থাকে, যদিও সে এই মাকামে 'আনাল হক্ব' এবং 'মা আ'জামু শানী ওয়া সুবহানী' বলতে থাকে।

---

১. মাওলানা ইরফান আহমদ আনসারীর অনুবাদে উল্লেখ করা হয়েছে, অজুদ বাশারিয়াতের দিকে প্রতাবর্তন করে না। কিন্তু মাওলানা মাহবুব ইলাহী তাঁর ফার্সী মূল কিতাবে উল্লেখ করেছেন, অজুদে আদম অজুদে বাশারিয়াতের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। অতঃপর পরবর্তী আলোচকগণ 'কাওসাইন' গ্রন্থের যে বাক্যগুলো সংযোজন করেছেন, তার অনুবাদ উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।

ঘরের মধ্যে ঘরের মালিক এ পর্যন্তই যথেষ্ট। এটাই তার বর্তমান অবস্থা। কিন্তু যেহেতু সালেক ফানায়ে হাকিকীতে উপনীত হয়ে ধন্য হতে পারেনি, তাই হাকিকাতে ওয়াহিদ (প্রকৃত একক) সম্পর্কে তার কোন খবরই হয়নি। সে অপূর্ণতার বৃত্ত থেকে বের হতে পারেনি। তার কণ্ঠনালীতেও এলমে মারেফাতের সুধা পতিত হয়নি। যদি মহান আল্লাহ্ অনুগ্রহ করে বিশেষ সাহায্য না করেন এবং কামেল মোর্শেদ যদি তাকে সে পর্যন্ত না পৌঁছে দেন (মোর্শেদের দৃষ্টি হচ্ছে ঔষধ এবং তাঁর তাওয়াজ্জোহ্ প্রতিষেধক তুল্য) তা হলে ক্ষতিগ্রস্ততাই তার নগদ প্রাপ্তি। সে আবর্তনের ঘুর্ণিপাকে পড়ে উপকূল পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি। প্রাথমিক অবস্থায় এক গভীর সাধককে দেখেছি, তিনি এই তওহীদে সুরীতেই পরিতৃপ্ত। উচ্চ পর্যায়ের আউলিয়া কেরামও তাদের যোগ্যতার পরিমাপে নিজেদেরকে কামালুল কামাল (পূর্ণতায় পরিপূর্ণ) মনে করেছেন। এই তাজাল্লীয়ে সুরী যার মধ্যে চিরস্থায়ী প্রভুর দর্শন আকৃতি ও প্রকৃতির মধ্যে হয়, এর থেকে আরো সাধারণ অবস্থা হয় ওই 'সুরেহাস্তি' এর পোশাকের মধ্যে এবং দর্শন বা বাস্তবতার মধ্যে। তিনি রঙসমূহের আবরণের উপর বিকাশিত হন, অথবা প্রকাশিত হন নূরসমূহের মধ্যে। সুতরাং তাজাল্লিয়ে নূরীকেও তাজাল্লীয়ে সুরীর অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয়। আর ইয়াকীনের তিনটি স্তরের মধ্যে (এলমুল ইয়াকীন, আইনুল ইয়াকীন এবং হক্কুল ইয়াকীন) ওই অবস্থাধারী ব্যক্তির শুধুমাত্র প্রথম স্তর (এলমুল ইয়াকীন) প্রাপ্ত হয়। তাঁর সায়ের সায়েরে আফাকী (বহির্জগতে ভ্রমণ) এর অন্তর্ভুক্ত, যা অনেক দূর বলা হয়েছে এবং একে সায়েরে মুস্তাতীল (দীর্ঘ ভ্রমণ) নাম দেওয়া হয়েছে।

ওই আদমে অজুদের সাথে সম্পর্কিত যে সকল মাকাম রয়েছে সেগুলো তাজাল্লীয়ে সূরী, তাজাল্লীয়ে আইনী (প্রকৃত তাজাল্লী) নয়। এ কারণেই বলা হয়েছে, আমাদের খাজেগান কাদ্দাসাল্লাহু আছরারাহুমের তরিকায় প্রারম্ভেই শেষপ্রাপ্তি অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং প্রাথমিক অবস্থাতেই তার দৃষ্টি, আহাদিয়াতে যাতীর (একক সত্তার) মধ্যে হয়ে থাকে। ওই বুজর্গদের প্রথম কদম যা অজুদে আদম দ্বারা বিশ্লেষণ করা যায়, তা অন্যদের নিহায়াতুন নিহায়াত (শেষের বস্তু শেষেই প্রাপ্তি) এর মাকামে হয়ে থাকে। তাজাল্লীয়ে মা'নুরী (মূল তাজাল্লী) এর স্বাদ বা নির্যাস, যা তাজাল্লীয়ে সিফাত এবং তাজাল্লীয়ে যাতের স্বাদ বা নির্যাস, তা-ই সর্বশেষ তাজাল্লী। ওই তাজাল্লী মুরিদগণের প্রাথমিক অবস্থায় আস্বাদন করিয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রতিপালন করা হয়।

"আমার ফুল বাগিচা থেকে ফুলের সৌন্দর্য উপলব্ধি কর"
দেখিয়ো ভাবিয়া তুমি উদ্যান আমার
বসন্তে আসিবে কতো পুষ্পের বাহার।

ওই বুজর্গগণ বলেন, এই হুজুর (নৈকট্য) যখন স্থায়ী হয় এবং পূর্ণশক্তি ধারণ করে, তখন তাকে মুশাহাদা (পর্যবেক্ষণ) বলে এবং অন্য লোকেরা এ ক্ষেত্রে যে

সকল শব্দ ব্যবহার করেন, তাতে হুলুল (অনুপ্রবেশ) এবং ইত্তেহাদে (একিভূতি) সন্দেহের অবতারণা হয়। সম্পর্কের পতন ঘটে ও ভর্ৎসনা আবশ্যিক হয়। সুস্পষ্ট শরীয়তের সাথে প্রকাশ্য বিরোধ সৃষ্টি করে। প্রকৃতপক্ষে মুশাহাদা আলোচিত ওই সকল বিষয়ের সম্পর্ককে স্থায়িত্ব দান করার সাথেই সংশ্লিষ্ট।

অন্যান্য মাকামের বর্ণনার ক্ষেত্রেও একই বিষয় প্রকৃতপক্ষে রসুল স. এর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অনুসরণ ও অনুকরণের অপর নাম। তিনি বর্ণনা করেন, যখন সিফাতে শাহেদী ও মাশহুদী থেকে ওই নৈকট্য পবিত্র বা মুক্ত হয়ে যায়, তখন তার নাম হয় ফানায়ে হাকিকী (প্রকৃত ফানা)। এ সময় সালেক 'কুল্লু শাইয়্যিন হালিকুন ইল্লা ওয়াজহাহু' (তাঁর সত্তা ব্যতীত সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে) এর গুপ্ত রহস্য দ্বারা ধন্য হয়ে যায়। এ সময় সে আক্ষেপ, অজ্ঞতা, মিলন, তৃষ্ণা এবং উৎসর্গ বা বিসর্জনতার সাথে সম্বোধিত হয়। কুফরে হাকিকী (প্রকৃত অস্বীকৃতি) এবং মাকামে জামাল (সমন্বয়ের স্থান) এখানেই বুঝতে সক্ষম হয় এবং এলমুল ইয়াকীন থেকে আইনুল ইয়াকীনে উপনীত হয়। তখন সে ইসলামের সৌন্দর্য ও কুফরের কদর্যতা পৃথকীকরণ থেকে বিরত থাকে এবং এরূপ বলতে থাকে—

যদি তুমি কুফর এবং ঈমানকে একত্রিত করো, তবে দেখবে দুটিই রয়েছে বিদ্যমান এক প্রেমিকের দফতরে।

ওই সায়েরে আফাকী (বহির্জগতভ্রমণ) থেকে সায়েরে আনফুসী (অভ্যন্তরীণ জগতভ্রমণ)তে এবং সুলুক (পথ) থেকে জযবা (আকর্ষণ) এ উপনীত হয়। কওন ও মাকান (প্রকৃতি ও বিশ্ব) এর বেষ্টন বা বৃত্ত ছিন্ন করে ইসমে ইলাহী (আল্লাহ্‌র নাম) এর সাথে মিলিত হয়ে যায়, যা তার মাবদায়ে তায়াইয়্যুন (উৎসমূল)। অতঃপর সে নানারকম প্রতিকূলতা, বিশৃঙ্খলা, বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি পায়। তার মুআমালা অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্বের সাথে বিজড়িত হয়ে যায়। সে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সন্দেহ থেকে বেঁচে যায়। বাশারিয়াত (মানুষের সাধারণ স্বভাব) এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হওয়া থেকে নিরাপদ হয়ে যায়। আমাদের খাজেগান কাদ্দাসাল্লাহু আসরারাহুমের তরিকায় মুরিদদের ক্ষেত্রে বিষয়টি আলিফ, বা, তা (প্রাথমিক) পর্যায়ভুক্ত এবং পীর মোর্শেদ থেকে জিকির শিক্ষা করা সুলুকের পথে কদম রাখা তুল্য। এর থেকেই প্রকাশিত হয় যে, এ সকল বুজর্গের অবস্থান কতোই না উচ্চমর্যাদাপূর্ণ। তাদের বেদায়েত (প্রারম্ভিক বিষয়) কেমন করে নেহায়েত (শেষ বস্তু) এর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছে।

অবশ্য আমার এই বর্ণনা থেকে কেউ যেনো এমন মনে না করে যে, ইসলামের সৌন্দর্য ও কুফরের কদর্যতার মধ্যে পার্থক্য না করতে পারার কারণে কুফরি অবশ্যম্ভাবী হয়ে যায়। এভাবেই তো শরীয়তের বৃত্তের বাইরে পদচারণা করা হয়।

মাশায়েখগণ বলেছেন, যে হকিকতকে শরীয়ত প্রত্যাখ্যান করেছে, তা কুফরি। কিন্তু কথা হচ্ছে, কুফরিরও দুটি দিক রয়েছে। একটি দিক হচ্ছে কুফরকে সৃষ্টি করা, যার সম্পর্ক সৃষ্টিকর্তার সাথে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে কুফরিকে অর্জন করা, যার সম্পর্ক বান্দার সঙ্গে। এই বিষয়টি সন্দেহমুক্ত যে, খলকে কুফর (কুফর সৃষ্টি) নিন্দনীয় বা খারাপ নয়। ফানা হালপ্রাপ্ত ব্যক্তি যিনি নানারকম প্রতিবন্ধকতা থেকে নিরাপত্তা পেয়ে জমায়ে হাকিকীতে (হকিকতের সমন্বিত স্থানে) উপনীত হয়, আমার বিশ্বাস এমতাবস্থায় তার দর্শন কুফরের ওই প্রথম প্রকার। সুতরাং সে এই কুফরকে খারাপ হওয়ার হুকুম কীভাবে দিবে। দ্বিতীয় প্রকারের কুফর তো তার কল্পনাতেই নেই। তাহলে এ ক্ষেত্রে সে কীভাবে এটাকে খারাপ বলে আখ্যা দেবে। তাকে পৃথকই বা করবে কীভাবে। এরপর সালেকের যদি হুঁশ ফিরে আসে এবং ওই হুজুর (নৈকট্য) যা সে তার নিজের অস্তিত্ব থেকে বের করে দিয়েছিলো, তাকে মহান আল্লাহ্র সাথে সন্ধিবদ্ধ করে দেয় এবং সে যখন জানতে পারে যে, মহান আল্লাহ্ নিজে নিজেই হাজের (উপস্থিত) তখন সে হাকিকী ফানা (প্রকৃত ফানা) দ্বারা ধন্য হয়ে যায় এবং আশ্চর্যান্বিত ও অজ্ঞানতার বেষ্টনী ভেদ করে জ্ঞানবৃত্তের মধ্যে এসে যায়। সে সমষ্টিভূতি থেকে স্বতন্ত্র ও সমষ্টিভূতির পরবর্তী স্তরে (জমা ফরক বা'দাল জমা) উপনীত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে। তার ফানা (বিলীনতা) তাকে বাকার (স্থায়িত্বের) সুফল দান করে। এলেম (জ্ঞান) ও আইন (দর্শন) এর মত্ততার সংকট থেকে তাকে হক্কুল ইয়াকীনের (প্রকৃত বিশ্বাসের) প্রশস্ততায় আনা হয়। সে তখন প্রকৃত ইসলাম দ্বারা সুসজ্জিত হয়। এরপরে কাউকে শুহুদে আহাদিয়াত (একত্বের দর্শন) থেকে আধিক্যের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া হয়। তওহীদে অজুদীর (একক অস্তিত্বের) মধ্যে সে মগ্ন থাকে। এমন লোকেরা বলে, যে সকল অরসাহ (উপাদান) অজুদের মধ্যে বিদ্যমান তা আল্লাহ্র অস্তিত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট তার মূল যাত এবং ওই যাত অবশ্যম্ভাবী। কেনোনা মহান আল্লাহ্র অস্তিত্ব যদি ওই যাত ব্যতীত হতো, তাহলে ওই যাত হতো ভিন্ন সত্তা। কেনোনা প্রত্যেক দুটি বস্তু একে অপরের বিপরীত হয়ে থাকে। এভাবে যাতে ইলাহী তো অন্যের মুখাপেক্ষী হতো। আর মুখাপেক্ষিতা সম্ভাব্য অস্তিত্বের প্রমাণস্বরূপ। এটা অসম্ভব। আর এটা সব ওয়াজিবুল অজুদের (অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্বের) বাতিল হওয়াকে অত্যাবশ্যক করে। সে জন্যই তাঁর অস্তিত্ব তাঁরই মূল যাত-উদ্ভূত। সম্ভাব্য এর অস্তিত্ব বা উৎস তাঁর যাত থেকে উৎসারিত নয়। তাই তার অস্তিত্ব তাঁকে ব্যতীতই হবে। (তাঁর মূল বাস্তবতার পরে বৃদ্ধি বা বেশি হবে) বেশি বা বৃদ্ধি হয় সম্ভাব্যের আরেজ (বিপত্তি) অথবা মা'রুজ।

আসহাবে যওক (স্বাদ আস্বাদনকারীগণ) যারা আল্লাহ্র প্রেমমত্ততার চাদর পরিহিত, তারা এ বিষয়ে এতোটুকুই জ্ঞাত হয়েছেন যে, হাকায়েকে মুমকিনাহ (সম্ভাব্য বাস্তবতা) আওয়ারেজ (বিপত্তিসমূহ) ওই অজুদ, যা অস্তিত্বস্বরূপ তা

মা'রুজ (প্রার্থিত)। কেনোনা তিনি নিজ সত্তায় প্রতিষ্ঠিত এবং তিনি ব্যতীত অন্য সব কিছু তাঁর সাথেই বিদ্যমান বা প্রতিষ্ঠিত। এজন্যই বলা হয়ে থাকে যে, আলম ই'রাজ স্বরূপ যা যাতের মধ্যে একত্রিত। তাই এটা স্পষ্ট যে, অজুদ যেহেতু মাবদায়ে আছার (উৎসের চিহ্ন) তাই অবশ্যই বিদ্যমান এবং যদি তা মমকিনের (সম্ভাব্যতার) মধ্যে আরেজ (প্রতিবন্ধক) হয়, তাহলে সে অজুদের সাথে বিদ্যমান হবে, যা অজুদের আরেজ (প্রতিবন্ধক)। এমনিভাবে ওয়াজুদুল অজুদ (অস্তিত্বের অস্তিত্ব) হবে। অর্থাৎ ওয়াজুদুল অজুদেরও একটি অজুদ (অস্তিত্ব) হবে। এভাবে পূর্ববৎ সম্পর্কের আবশ্যকতা এসে যাবে এবং এটা বাতিল বা ভুল। সুতরাং অজুদের প্রতিবন্ধকতাও বাতিল হবে। ওই অজুদ মা'রুজ (প্রার্থিত) হবে এবং অজুদের আরেজ (বিপত্তি) হওয়ার ক্ষেত্রে অথবা অজুদের আবিষ্কর্তার প্রভাব নফসে অজুদের (অস্তিত্বমূলের) মধ্যে হবে। অথবা মর্তবার প্রশংসা বর্ণনার মধ্যে হবে। দুটি অবস্থাই বাতিল বা ভ্রান্ত। যেমন কুতুবে মা কুলের (বিবেক বা আকলবিষয়ক গ্রন্থের) মধ্যে এর স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে (এর ভাল-মন্দ সহ)। যখন অজুদ মারুজ (প্রার্থিত) হলো, তখন এটাও প্রমাণিত হয়ে গেলো যে, সকল সৃষ্টিকুলের মধ্যে যাতের অস্তিত্ব একমাত্র মহান আল্লাহ্‌র জন্য। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো অস্তিত্ব নেই এবং যে সকল হুকুম বা কার্যাবলী রয়েছে তা একমাত্র আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের সাথেই সম্পর্কিত, যিনি মওজুদে হাকিকী (প্রকৃত অস্তি ত্ববান)এবং তাঁর অস্তিত্ব তাঁর যাতের সংগে। কেনোনা মমকিনাত (সম্ভাব্যতা) যদি মওজুদে হাকিকী হয় তাহলে তার অস্তিত্ব হবে আইনে যাত (মূলসত্তা) অথবা আরেজে যাত। এ দুটি অবস্থাই নিষিদ্ধ। সে জন্য মমকিনাত (সম্ভাব্যতার) অস্তিত্ব একমাত্র আল্লাহ্‌র যাতের সাথে সম্পর্কিত হবে এবং স্বীয় সত্তার মধ্যে অস্তিত্বহীন হবে। এজন্যই বলা হয়েছে যে, এই আওয়ারেজ এই অজুদে মুতলাক (একচ্ছত্র অস্তিত্ব) থেকে প্রকাশিত হয়েছে। যেহেতু ওই অস্তিত্ব থেকে ক্রমবিকাশিত হয়েছে, তাই তার কামালাতও তার অন্তর্ভুক্ত হবে। তা না হলে তা সত্য বলে প্রমাণিত হয় না। সুতরাং এই কামালত তার অন্তর্ভুক্ত। কেনোনা মর্তবা প্রয়োগ বা সংযোজনের ক্ষেত্রে তার স্বাতন্ত্র্য নেই। সে জ্ঞান অবতরণের মধ্যে নির্বাচিত হয়ে যদি হাকায়েকে মমকিনাতে (প্রকৃত সম্ভাব্যতা) হয় এবং এই হাকায়েক (তত্ত্ব) যা মুতামাইয়্যিজে ইলমিয়াহ (জ্ঞানগত নির্বাচন) মূল সত্তার অর্থাৎ অত্যাবশ্যক যাত থেকে এক অজ্ঞাত অবস্থার সম্পর্ক সৃষ্টি করে বাহ্যিক অজুদের আয়নার মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়েছে এবং মূল অস্তিত্বের দর্পনের মধ্যে বিকশিত হয়েছে। এই কামালত হাকায়েকে মমকিনাত পর্যায়ভুক্ত। মর্তবা সংযোজনের ক্ষেত্রেও আইনে মতলাকে (একচ্ছত্র) এবং ওই একচ্ছত্র মর্যাদার বেষ্টনীর মধ্যে তাঁরই সত্তা। তাই আইনিয়াত (সত্তাগত) এর হুকুম বা ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছে—

বতুঁ কে শেকেল মে জুরে হুজনে উশ্‌শাক হায় উহ হায়
নেহি বলকেহ ওহী জু মাখহারে আফাক হায় উহ হায়।
হর আক শেয় জু কেহ হুছ দুনিয়ামে হায় তাকাইয়াদ কীরোসে
হাকীকাত মে জু ছবকুছই ইজারাহ ইতলাক হেয় উহ হায়।

আর এক কবি বলেছেন—
মিট গেয়া গায়ের উছ কী গায়রাত সে
ইস লিয়ে উহ্ হর এক কা আইন হুয়া

অর্থঃ সব কিছু বিলীন হয়েছে তাঁরই অহমিকার আঘাতে। সে কারণেই তিনিই হয়েছেন সৃষ্টিকুলের মূল।

এখন এই বর্ণনা থেকে কেউ যেনো এরূপ ধারণা না করে যে, ওয়াহ্‌দাতের (এককত্বের) সাথে কাছরাত (আধিক্য বা বহুত্ববাদ) একত্রিত হয়ে গিয়েছে। অথবা ওয়াহদাত (এককত্ব) কাছরাত (আধিক্য বা বহুত্ববাদ) কে বরণ করে নিয়েছে— বিষয়টি এরূপ নয়। এরকম ধারণা তো কুফরী পর্যায়ভুক্ত। কেনোনা বৈধতা এবং একত্রতা দু'বিষয়ে ওই সময়েই অনুধাবিত হতে পারে, যখন অজুদ (অস্তিত্ব) অধিকসংখ্যক হয়। ওয়াহ্‌দাতে অজুদের (এককত্বের অস্তিত্বের) ক্ষেত্রে এরূপ অধিকতা স্পষ্টভাবে পরিত্যাজ্য হওয়া চাই।

কুদওয়াতুল আহরার শায়েখ ফরিদ উদ্দীন আত্তার কুদ্দিসা সিররুহু বলেন—

কুফর হী বেশক হুলুল ওয়া ইত্তেহাদ্
কেহ্ গো অহ্‌দাত সে হ্যায় তাকরার আশকার

সুতরাং যায়েদের আকৃতি যখন বিভিন্ন দর্পনে দর্শিত হয় তখন দর্পনের প্রকৃতি এবং রঙের ভিন্নতার কারণে তার আকৃতি ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্যমান হয়। অথচ যায়েদ একই ব্যক্তি, যার প্রতিচ্ছবি ও প্রকৃতি বিভিন্ন দর্পনে বিভিন্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে এবং যায়েদের আকৃতি নানাপ্রকার হওয়ার কারণে ব্যক্তি যায়েদের ক্ষেত্রে আধিক্য প্রমাণ করে না এবং বৈধতা বা একত্রতার সন্দেহ সৃষ্টি করে না। আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন— 'ওয়ালিল্লাহিল মাসালুল আ'লা (আল্লাহ্‌র শান (অবস্থা) সবার ঊর্ধ্বে)। আমাদের এ আলোচনার বাহ্যিক অস্তিত্ব শুধুমাত্র যাতে ওয়াহেদে হাকিকী (মূল একক সত্তা) সম্পর্কিত। এর মধ্যে আধিক্যের সংমিশ্রণের কোনো অবকাশ নেই এবং কোনো সংখ্যাও এর অন্তর্ভুক্ত নয়। মূল কথা হচ্ছে, দর্পনের মধ্যে যাতের বিকশিত অবস্থা থেকে অন্তর্নিহিত অবস্থায় অধিক্যের আহবান প্রকাশিত হয়েছে।

আরেফ জামী কুদ্দিসা সিররুহু বলেন—

মহান আল্লাহ্র যাতই সম্ভাব্যের যাতের আয়না সদৃশ হয়েছেন এবং মমকিনাত (সম্ভাব্যের) রহস্যই যাত ওয়াহেদ (এক সত্তার) কাহ্হার (কঠোর) এর প্রভাব বা চিহ্ন থেকে আকর্ষণ কবুল করেছেন।

প্রশ্নঃ যখন আধিক্য বা অতিরিক্ততা ধারণাপ্রসূত, তাহলে শরীয়ত যার ভিত্তি সেই আধিক্যের উপর তাহলে কেমন করে এটা প্রতিষ্ঠিত হবে?

উত্তরঃ এক্ষেত্রে আধিক্য প্রকৃত ধারণাপ্রসূত অর্থে ব্যবহার হয়নি যে, তা নিছকই মনগড়া এবং কাল্পনিক। ধারণা দূর হলে তা-ও দূরীভূত হবে— বরং এর উদ্দেশ্য এটাই যে মর্তবার প্রয়োগের বা সংযোজনের ক্ষেত্রে এর কোনো নাম বা নিদর্শন নেই এবং মারাতেবে তাকাইয়্যুদাত (ভর্ৎসনার স্তরে) এর মরতবা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনো নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু মারাতিবে তানায্যালিয়াহ (অবতরণের স্তরে) এর মধ্যে আল্লাহ্র কারিগরি বা আবিষ্কার থেকে ওই এলমে ইলাহীর সাথে সম্পৃক্ত। সে জন্য সে উদ্ভূত ধারণার পতন থেকে নিরাপদ। এ দিক দিয়ে এ জগতে সে মুকাল্লাফ (দায়িত্ববাহী) হওয়ার স্থান বা ক্ষেত্র হয়ে গিয়েছে। পরকালের জন্য হয়ে গিয়েছে স্বস্তি ও শাস্তির যোগ্য।

সংক্ষিপ্ত কথা হচ্ছে এই যে, আমাদের তরিকার বুজর্গদের নিকট, মহান আল্লাহ্ বিভিন্ন মরতবার মধ্যে বিপরীতমুখী আহকামের সাথে প্রকাশিত হয়েছেন। মরতবা ইতলাক (প্রয়োগ বা সংযোজনবিধান) এরূপ, যা মরতবা তাকাইয়্যুদ (ভর্ৎসনার স্ত র) এর মধ্যে যেনো যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত নেই। এমনিভাবে মরতবায়ে তাকাইয়্যুদের বিধানও আল্লাহ্র সাথে প্রয়োগ বা সংযোজন ভুল।

সকল অস্তিত্বের তরে রয়েছে বিধান পৃথক
কোন স্তর সংরক্ষণ না করলে হবে সে জিন্দিক।

উদাহরণস্বরূপ হকিকতে ইনসান (প্রকৃত মানব) যার মরতবা প্রয়োগের ক্ষেত্রে পৃথক বিধান রয়েছে, সে তার সত্তার মধ্যে বিধান থেকে পবিত্র। কিন্তু তাকাইয়্যুদ ও তাআইয়্যুনের (নির্দিষ্টতার) মর্তবার মধ্যে কুয়ুদে শক্সিয়াহ (ব্যক্তির ভর্ৎসনা) এর কারণে বিপরীতমুখী ও ভিন্ন ভিন্ন বিধান রয়েছে, যদিও হকিকতের (প্রকৃত অবস্থার) মধ্যে অস্তিত্ব ওই হকিকতের জন্যই। ব্যক্তির মধ্যে এই ভিন্নতা কেবল আওয়ারেজের (বিপত্তির) কারণে নয়, যা তার হকিকতের মধ্যে বিদ্যমান নয়। কিন্তু এমন এক হকিকত (বাস্তবতা) কে ভর্ৎসনা, চিন্তাশূন্য হকিকতের সংযোজনের অনেক ইঙ্গিত ও বিধান এমন রয়েছে, যা বহির্জগতের মানুষের জন্য ওই সকল ব্যক্তির ধারণা পোষণ ও মতপার্থক্যের কারণ হয়ে যায়। এর মধ্যে সন্দেহ নেই যে, যেমন ব্যক্তির মানবপ্রকৃতির মধ্যে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকে এবং প্রকৃতপক্ষে তা সম্মিলিত ও পৃথকভাবে প্রত্যেকটি প্রাণী ও পশুদের মধ্যে একে

অন্যের সাথে মিলিত। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে প্রকৃত অস্তিত্ব হচ্ছে ওই প্রাণী বা পশুরই হকিকত বা প্রকৃতি। ভিন্ন ভিন্ন প্রকারভেদ কেবল বিপত্তিগত কারণে। কেনোনা অজুদ (অস্তিত্ব) সে তো স্বাধীন বা একচ্ছত্র এবং তাকাইয়্যুদ শুধু বিশ্বাস বা গুণগত ব্যাপার যা বিশ্বাসযোগ্য।

প্রতিটি দেহের মধ্যে দেহের প্রকৃত অস্তিত্ব রয়েছে। দেহের ভিন্নতা শুধু ই'তিবারী (ধারণাগত)ব্যাপার। এর উদাহরণ মুক্তাসদৃশ। যার মধ্যে অজুদ তো হকিকতে বাসীত (প্রকৃতপক্ষে অবিমিশ্র বাস্তবতা) এবং মরতবাসমূহের অবতরণের জাওহার (মুক্তা) স্বরূপ। দেহ, প্রাণী, মানুষ এবং বিভিন্ন গোত্র, শ্রেণী, প্রকার শুধুমাত্র ধারণা বা কল্পনা। আর তাদের বিধান ও ইঙ্গিতের প্রতিবন্ধক। মরতবার ভিন্নতার কারণে এটি সম্পূর্ণ সঠিক। এর মধ্যে কোনো বিপত্তির সম্ভাবনা নেই এবং তার জন্য সাক্ষ্য এটাই যে, মওজুদ (বিদ্যমান)ই বিভিন্ন শ্রেণীর হকিকতে মতলাকাহ (সাধারণ বাস্তবতা) যা সকল মওজুদের (বিদ্যমান সমূহের) মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে এবং ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রকাশিত হয়েছে। তার এই নামের পরিচিতি হয়েছে তার গুণগত কারণে। এটা নয় যে, মানুষ দেহ স্বরূপ এবং সত্য বর্ণনাকারী। এর অর্থ এই যে, সে বোধসম্পন্ন ও বিভিন্ন আকৃতির যা মানুষের আকৃতি এবং দেহের আকৃতি বা গঠন স্বীয় বাহ্যিক অস্তিত্বের মধ্যে পরস্পরে এক। যখন মানুষ থেকে দেহ স্বীয় অস্তিত্বের মধ্যে একত্রিত হলো এবং অন্যকিছুর মুখাপেক্ষী হয়নি, তখন বাস্তবিকপক্ষে ওইটাই দেহের অস্তিত্ব হয়েছে এবং মনুষ্যত্বের মধ্যে আবদ্ধকরণও এর থেকে অতিরিক্ত কিছু নয়। যেমন দেহকে এই বর্ণনায় ইনসানের (মানুষের) সাথে একত্রিত করা হয়েছে এবং পাথরের বর্ণনায় দেহকে পাথরের সাথে একত্রিত হওয়ার সম্পর্ক ছিলো। তখন ইনসান (মানুষ)কেও পাথরের সাথে দেহের মরতবার মতো একত্রিত করা হয়েছে। এটা সম্পূর্ণ কাল্পনিক ব্যাপার। সুতরাং সকল আবদ্ধকরণ মতলাকের সাথে সম্মিলিত।

এভাবে মতলাকের মরতবার মধ্যেও পরস্পরে মিলিত হয়েছে। এভাবে হকিকতের (মূলের) মধ্যে অজুদ (অস্তিত্ব) ওই মতলাকের প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তার আবদ্ধকরণ বিশ্বাসযোগ্যতার বিষয় হয়েছে, যা তানায্যলের (অবতরণের) মরতবাসমূহের মধ্যে সংখ্যা ও আধিক্য সৃষ্টি করে উন্মুক্ত ময়দানে এসে গিয়েছে।

এই-ই হচ্ছে ওয়াহ্‌দাতুল অজুদ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। যা পরবর্তী যুগের সূফীগণের অভিমতের পরিপ্রেক্ষিতে— যার মূলে রয়েছে তাঁদের কাশফ এবং ধর্মীয় চিন্তার বিষয়টিকে অধিকতর সুস্পষ্ট করার জন্য এর স্বপক্ষে যথেষ্ট দলিল ও প্রমাণ উপস্থাপন করা যায়। কুতুবুল মোহাক্কেকীন হজরত মোজাদ্দেদ র. কর্তৃক এ বিষয়ের উপর পৃথক মকতুব রয়েছে। সেগুলো উচ্চপর্যায়ের পর্যালোচনা ও বিস্ময়কর গূঢ় রহস্যে ভরা, যা কোরআন ও সুন্নাহর অনুকূলে। আর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিশ্বাসসম্পৃক্ত।

তিনি বর্ণনা করেন, সায়ের এবং সুলুক দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ইবাদতের প্রয়োজনীয় উপাদান হাসিল করা। খোদায়ীত্ব অর্জন করা নয়। নফসের মারেফাত হচ্ছে নিজেকে নিকৃষ্ট ও মুখাপেক্ষী মনে করা। আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভ হচ্ছে তাঁকে স্বয়ংপূর্ণ, অমুখাপেক্ষী এবং সর্বশক্তিধর মনে করা। মাটি থেকে যে তৈরী, নিকৃষ্টতা যার উৎস, স্বভাবগতভাবে যে মুখাপেক্ষী সে কেমন করে যিনি শান জগতের সম্রাট তাঁর আইন হতে পারে। আইনিয়াতের হুকুম (বক্তব্য) কেমন করে সমর্থন করা যায়? একক এবং একত্রতার বর্ণনা কেমন করে পছন্দনীয় হয়? তবে মত্ততার ও হালের প্রাবল্যের অবস্থায় এরূপ হতে পারে। কেনোনা ছোকর (মত্ততা) সম্পন্ন ব্যক্তি মা'যুর বা ক্ষমার্হ। নতুবা স্বাভাবিক ও ভালো-মন্দের পার্থক্যকারী জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি নিকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠত্বের একত্রিকরণ, আসমান যমীনের সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে কখনোই সমন্বয় করতে পারে না। কেনোনা তাঁর যাতী গুণ কুদ্দুসী (পাক) এবং তার বহিঃপ্রকাশ সিফাতে সুব্বুহী (পবিত্রগুণ) তে এভাবে মারাতেবে তানাযিয়াহ (পবিত্রতার মর্তবাসমূহ) এবং মাকামাতে তাশবিয়াহ (উপমার স্থান সমূহে) এর মধ্যে গুণগত পার্থক্যের বিষয়ে যথেষ্ট মনে করতে পারে না। দাসত্ব ও প্রভুত্বের সাথে সংঘাত সৃষ্টি করে জ্ঞানসম্পদকে ধ্বংস করতে পারে না। ওয়াহ্‌দাতুল অজুদের পক্ষ অবলম্বনকারীগণ (যারা দর্শনের পক্ষে বক্তব্য দানকারী) বলেন, মহান আল্লাহ্‌র অবশ্যম্ভাবী হকিকত (মূল) এবং তাঁর পবিত্র অস্তিত্ব একচ্ছত্র বা স্বাধীন, অজুদে বাহাত (মূল অস্তিত্ব)। এই মতবাদের উপরেই তারা ওয়াহ্‌দাতুল অজুদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করেছেন (এর প্রতি অনেক আপত্তিও অনুর্ভুক্ত রয়েছে)। সুতরাং যখন একথা সর্বসম্মত যে, জাতে বারীতায়ালা স্বীয় অস্তিত্বের সাথে বিদ্যমান এবং স্বীয় সত্তার সাথে প্রতিষ্ঠিত, তখন কেমন করে বলা যায় যে, হাস্‌তী হক (অস্তিত্বই হক), আইনে যাত-ই হক?

কুতুবুল উরাফা শায়েখ আলাউদ্দৌলা সাম্‌নানী আলাইহির রহমত বর্ণনা করেছেন, আলমে অজুদের উপরে রয়েছে আলমে অদুদ। অর্থাৎ যেমন করে মাকামে ইতলাকে (সংযোজনের মাকামে) কোনো প্রকার ই'তিবারাত (গুণগ্রাহীতার) অবকাশ নেই। এভাবে অজুদকেও তার সকল যাতী কামালত (সত্তাগত পূর্ণতা) ব্যতীত ওই মহান দরবারে কোনো প্রবেশদ্বারই নেই। না আইনিয়াতের (দর্শনের) দিক দিয়ে, না অতিরিক্ততা বা প্রাবল্যের দিক দিয়ে। অথচ ওই বুজর্গগণের নিকট হায়াত (জীবন), এলেম (জ্ঞান), সামা (শ্রবণ), বাসার (দর্শন), কুদরত (শক্তি), এরাদাত (ইচ্ছা) এবং তাকবীন (সৃষ্টিকরণ)— সবই সিফাতে হাকিকী (মূলগুণ)। এ সকল সিফাত বা গুণসমূহের অস্তিত্ব মূল যাতের অস্তিত্বের উপর অতিরঞ্জিত নয়, তথাপিও একথা বলা যায় না যে, মৌল অত্যাবশ্যক মহান আল্লাহ্ এলেম (জ্ঞান) বা কুদরত। অর্থাৎ যখন মহান আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব তাঁর যাত ব্যতীত নয়, তখন সে কেমন করে হকিকতে ওয়াজেব (মূল

আবশ্যক) হবে? একথা স্পষ্ট যে, মূল যাত মহান আল্লাহ্ মাজহুলে মতলাক (অজ্ঞাত সত্তা)। আর এ কথা বলা যে, হকিকতে ইলাহী (আল্লাহ্‌র মূল), অজুদ (অস্তিত্ববান) এবং হাস্তি মতলক (সাধারণ অস্তিত্ব) এর না-সূচক নয়। সুতরাং আলোচ্য বিষয় অনুধাবনের হুকুম দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। যখন প্রমাণিত হয়ে গেলো যে, হকিকতে ওয়াজেব মহান আল্লাহ্ তাঁর অজুদ ব্যতীতই, সুতরাং তাঁর অস্তিত্ব তাঁর সৃষ্টিকুলের মধ্যে যা বিদ্যমান তা থেকেই প্রমাণিত হয়। সুতরাং এ অবস্থায় যখন ওই হাকায়েকে মুমকিনাত (সম্ভাব্যতার রহস্য) প্রার্থিত হলো এবং সৃষ্টিকুলের আবদ্ধকরণের জন্য যখন প্রকাশ ঘটানো হলো (আরেজ হলো) তখন এই সম্ভাব্যতা ও আবদ্ধকরণ এর গয়রিয়াত (অপরত্ব) কে অত্যাবশ্যকভাবে দর্শনের বিষয়টি কেমন করে অনুধাবিত হবে? অবশ্য এতোটুকু প্রয়োজন যে, যা কিছু উপাদান বা উপকরণ দৃশ্যমান রয়েছে, তা কামালাতে আনওয়ারের (পূর্ণ জ্যোতির্ময়তার) প্রতিবিম্ব বা ছায়াস্বরূপ। তাঁর শান এবং এতেবারে এই মুমকিনাত (সম্ভাব্যতা) যথার্থই তার জামাল (সৌন্দর্য) ও কামাল (পূর্ণতা) এর বহিঃপ্রকাশ। সুতরাং সার্বক্ষণিকভাবে অবিলীন জামালের দৃষ্টি এ জিলালে নুরুল আনওয়ার (জ্যোতিসমূহের জ্যোতির ছায়া) ব্যতীত আর অন্য কোথাও নেই এবং বিকাশের দর্পন তাদের শুহুদের (দর্শনের) ময়দান থেকে বিচ্যুত হয়েছে। তাঁর হকিকতের নূরের ছায়া ওই নূর থেকে, যা পূর্ব-পশ্চিম বা বিশেষ কোনো দিকের সাথে নির্ধারিত নয়। সুতরাং মাশহুদ (দর্শনীয়) এবং মাকসুদ (উদ্দেশ্য) আধিক্যের অন্তরালে মহান একক ব্যতীত অন্য কিছু নেই। সূফীগণের এক সম্প্রদায়কে এই দর্পনের রূপ ও শ্রী এবং মূলের সাথে ছায়ার পরিপূর্ণভাবে সম্মিলিত করার কারণে আইনিয়াত (দর্শনের) পক্ষ অবলম্বনে সাহসী করে তুলেছে এবং ওয়াহ্দাত (এককত্ব) ও ইত্তেহাদ (সম্মিলন) এর বক্তা বানিয়ে দিয়েছে। সে জন্য তারা বর্ণনা করেছেন, মাওলানা জামী বলেছেন—

নিসর্গ পুস্তকের সকল পৃষ্ঠা করেছি দর্শন
নেই তো কিছু হকের অংশ এবং হকের শান।

কিন্তু এসকল হজরত সাধারণ উপমার মিশ্রণ থেকে মুক্ত হতে পারেননি এবং আল্লাহ্‌র সাথে সম্মিলন পর্যন্ত পৌঁছানোর সাহস করেননি।

যদি এ সকল হজরত তানায্যুহে হাকিকীর (মূলের পবিত্রতার) পবিত্র উদ্যানে ভ্রমণ করতেন, তাহলে ওই সকল মণিমুক্তা যা কলংকিত তা থেকে অবশ্যই মুখ ফিরিয়ে নিতেন এবং আনুরূপ্যবিহীনতার দিকে অগ্রসর হতেন এবং তাশবীহ (উপমা)কে তান্‌যিয়াহর (পবিত্রতার) সাথে মিশ্রণ করতেন না। তাঁরা 'লা' শব্দ দ্বারা সবকিছুকে 'না' করতেন, এবং প্রারম্ভেই তাঁরা জানতে পারতেন যে, মুতলাক (মূল উদ্দেশ্য) এতলাক (সংযোজনের) উন্নতি থেকে অবতরণ করেনি। মুকাইয়্যেদ (আবদ্ধকারী) ও নিজের শেষ পর্যায়ের হীন আবদ্ধতা থেকে চূড়ান্ত

উন্নতি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না। প্রত্যেক বস্তু যার অবরোহণ হয় এবং তাআইয়্যুনের (পূর্ব নির্ধারিতের) অন্তর্ভুক্ত, তা মুতলাক থেকে শত শত যোজন দূরে। কোথায় মৃত্তিকা আর কোথায় মহান প্রভু! মহান আল্লাহ্ সকল জগত থেকে অমুখাপেক্ষী। মহান আল্লাহ্ সত্তাগত দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ। তিনি মুখাপেক্ষিতার দর্পননির্ভরশীল হতে পারেন না। আর এমন কোনো দর্পন নেই, যা তাঁর মুখোমুখি হতে পারে। কেনোনা 'ধ্বংসশীল' (হাদেছ) যখন কদীম (চিরস্থায়ী) এর সঙ্গে মেশানো হয়, তখন হাদেছের কোনো নিদর্শন বা চিহ্ন অবশিষ্ট থাকে না। সুতরাং অজুদ (অস্তিত্ব) যা কামালাতে ওয়াজেব (অবশ্যম্ভাবী পূর্ণতা) তার সর্বাধিক বিশেষ কামালের সাথে সম্পর্কিত এবং মাবদাখায়ের (শুভসূচনা)ও বটে। মুমকিনের (সম্ভাব্যতার) সাথে (যার জন্য সত্তার নাস্তি উপাদানের বা আবশ্যকতার অন্তর্ভুক্ত এবং তা মন্দের ঠিকানা বটে) তার যে যোগ্যতা এবং রূপক প্রক্রিয়া ব্যবহার ব্যতীত সাব্যস্ত করা দুষ্কর। সুতরাং আলমের (জগতের) অস্তিত্বের বাহ্যাড়ম্বর ধারণা বা কল্পনা থেকে অধিক কিছু নয়। এর দৃষ্টান্ত এরূপ যেমন দর্পনের মধ্যে কোনো আকৃতি প্রতিবিম্ব হয়ে যাওয়া। কিন্তু দু'এর মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রতিষ্ঠিত জগত যদিও মরতবা, অনুভূতি এবং দৃশ্যের মধ্যে রয়েছে, তবুও কাদেরে মুতলাক (মূল শক্তিধর) এর আবিষ্কার এই মর্তবার মধ্যে তার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হয়েছে। এজন্য জগতের পতন অনুভূতি এবং ধারণার পতন থেকে নিরাপদ হয়ে গিয়েছে এবং অর্পিত হুকুম (বিধান বা ফয়সালা) সত্য হয়ে গিয়েছে। যদিও অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্ব মহান আল্লাহ্র মরতবা বহির্জগতে বা বাস্তবে ছিলো এবং আলমের (জগতের) অস্তিত্বের মরতবা ছিলো অনুভূতির বাহ্যাড়ম্বরের মধ্যে। সে জন্য অজুদে আলমের (জগতের অস্তিত্বের) বাহ্যাড়ম্বর থেকে মহান আল্লাহ্র অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্বের নতুনত্ব আবশ্যক হয় না। কেনোনা তাজদীদ (নতুনত্ব) তো সম্মিলিত মরতবার অভিলাষী। এটি জানা কথা যে, যায়েদের যে প্রতিচ্ছবি দর্পনের মধ্যে রয়েছে, তা তার ওই অস্তিত্ব প্রমাণ করে না, যে অস্তিত্ব বাস্তবে বিদ্যমান। সুতরাং এই বর্ণনা থেকে ওয়াহ্দাতুল অজুদের বিষয়টি সমৃদ্ধ আলোচনা ও দৃঢ়তার সাথে স্পষ্ট হয়ে গেলো এবং তওহীদের বাস্তব স্বরূপ দীপ্তিময় হলো যে, আল্লাহ্ ব্যতীত সবকিছুই নাস্তি। ফানার বাস্তব স্বরূপ হচ্ছে এই যে, সালেকের নাম, নিশানা, যাত, সিফাত ও ক্রিয়ার সাথে কোনো সম্পর্ক অবশিষ্ট থাকবে না। এমন কি 'নফী' বা না-সূচকের সাথেও কোনো সম্পর্ক থাকবে না, যা প্রেম-সুধার প্রথম পর্বে প্রাপ্ত হয়েছিলো। এটাই ফানার প্রকৃতি।

প্রশ্নঃ ওয়াহদাতুল অজুদ সমর্থনকারী হজরতগণ তাশবীহ (সাদৃশ্য) এবং তানযিয়াহ (পবিত্রতা) এর মধ্যে সমন্বয়ের পক্ষে বক্তব্য দিয়েছেন। তাহলে তার শুহুদ (দর্শন) পরিপূর্ণভাবে হওয়া এবং তার ইমানও পূর্ণ হওয়া উচিত। কেনোনা এই হজরতগণ তানযিয়াহে হাকিকী (প্রকৃত পবিত্রতা) এর মরতবাকে সমর্থনপূর্বক

তাশবীহ (সাদৃশ্য) এর উপরও বিশ্বাস রাখেন। কেনোনা তা ইয়াকীনের (বিশ্বাসের) মরতবাসমূহের অন্তর্ভুক্ত এবং সেটাকেই তারা কামালে মুতলাক (সাধারণ পূর্ণতা) এর দর্পন মনে করেন।

উত্তরঃ আমি এ কথা সমর্থন করি না যে, আমাদের পর্যালোচনার মধ্যে তাশবীহ (সাদৃশ্য) দ্বারা অস্বীকৃতি এবং স্থায়ী বা সার্বক্ষণিক মোশাহাদায়ে কামাল (পূর্ণ দর্শন) তার প্রতিবিম্বের মধ্যে এ'রাজ (প্রতিবন্ধক)। প্রয়োগ বা সংযোজনের ধারাবাহিকতায় ভিন্নমতের কথা আইনিয়াত (দর্শন) এবং ইত্তেহাদ (সম্মিলন) শব্দ যা তাশবীহ ও তানযিয়াহ এর বিতর্ক পর্বে এসে যায়। আমাদের পর্যালোচনার মধ্যে আলম (জগত) কামালাতের (পূর্ণতার) বিকাশস্থল, বিকাশস্থল কিন্তু প্রকৃত বিকাশ নয়। কিন্তু ওয়াহদাতুল অজুদের সুধাপানকারীদের নিকট ইত্তেহাদ (সম্মিলন), আলম (জগত) এবং হক এর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। এই তাশবীহকে তানজিয়াহর (পবিত্রতার) সাথে মিলিয়ে দেওয়াতে তাদের সাহসের আঁচল এতলাকে হাকিকী (মূলের সংযোজন) পর্যন্ত পৌঁছাতে বাধা সৃষ্টি করেছে এবং সুলুকের কর্মকাণ্ডকে মারাতেবে তাআইয়্যুনাত (নির্ধারিত স্তর) বা ভাগ্য অকেজো বা বিফল করে দিয়েছে। সুতরাং আ'ইয়ান (বাস্তবতা), মুমকিনাত (সম্ভাব্যতা) বিষয়ে পর্যালোচনা অত্যন্ত দীর্ঘ হয়ে গিয়েছে। শ্রোতাবৃন্দের ধৈর্যচ্যুতির আশংকায় এর বিশদ ব্যাখ্যা অন্য সময়ের প্রতি নির্দিষ্ট করলাম। আল্লাহ্‌পাক যদি সাহায্য করেন, তাহলে তন্মধ্য হতে কিছু হালের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করবো ইনশাল্লাহ্‌। ওয়াস্‌সালাম।

কারামত ঃ হজরত মোহাম্মদ সাঈদ র. বর্ণনা করেছেন, যে সকল বিষয় আমাদের সামনে আলোচনা হতো, মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় হজরত মোজাদ্দেদ র. সেগুলো বাস্তবায়িত হওয়ার পূর্বে সে সকল বিষয়ের শুভ-অশুভ সংবাদ আমাদেরকে দিয়ে দিতেন। পরে সেগুলো সত্য প্রমাণিত হতো। হজরতের অলৌকিক ঘটনা ও কারামত আমি জীবনভর দেখেছি। সেগুলোর সংখ্যা নির্ণয় অসম্ভব। এখানে মাত্র কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা হলো।

যখন আমি সবেমাত্র বিবাহ করেছি, তখন আমি একটি প্রাসাদে অবস্থান করতাম। এক আঁধার রাতে আমি একাকী ছিলাম। কে যেনো সজোরে দরজায় এসে উচ্চ শব্দ করলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কে? উত্তর এলো না। আমি উঠে দরজার খিল খুললাম। দরজার পাল্লা আমার দিকে টেনে নিচ্ছিলাম, সে-ও তার দিকে টেনে নিচ্ছিলো। হজরত মোজাদ্দেদ র. অন্য স্থানে ছিলেন। সেখান থেকে চিৎকার করে বললেন, মোহাম্মদ সাঈদ! হজরতের আওয়াজ শুনতেই দরজা খুলে গেলো। আমি দেখলাম, কেউ নেই। পুনরায় দরজা বন্ধ করে শুয়ে গেলাম। প্রত্যুষে হজরতের দরবারে উপস্থিত হয়ে রাতের ঘটনা বর্ণনা করার পূর্বেই তিনি বললেন, ওটা ছিলো দুষ্ট জ্বিন। তোমার সাথে উপহাস করছিলো।

কারামতঃ হজরত মোহাম্মদ সাঈদ র. বর্ণনা করেন, আমার বিবাহের পর হজরত মোজাদ্দেদ র. বললেন, প্রথমে তোমার একটি পুত্র সন্তান হবে। সে প্রায় চার বছর হায়াত পাবে। তেমনই হয়েছিলো। আমাকে আল্লাহ্ পাঁচটি সন্তান দান করেছিলেন। আর প্রথম পুত্র সন্তান চার বছর বয়স হওয়ার পূর্বেই ইন্তেকাল করেছিলো।

কারামত ঃ হজরত মোহাম্মদ সাঈদ র. আরো বর্ণনা করেন, যে সময় সেরহিন্দ নগরীতে প্লেগ মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটলো, আমার তিন ভাই খাজা মোহাম্মদ সাদেক, মোহাম্মদ ফররুখ, মোহাম্মদ ঈসা এবং বোন উম্মে কুলসুম রোগাক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করলেন। একদিন হজরত মোজাদ্দেদ র. আমাকে ও আমার অনুজ স্নেহাস্পদ মোহাম্মদ মাসুমকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আজ ভোর রাতে অমুখাপেক্ষী দরবার থেকে জালালী অবস্থা অবতীর্ণ হয়ে তোমাদের দু'জনকে আমার কোলে বসিয়ে দিলো। মোহাম্মদ সাঈদকে ডান রানের উপর এবং মোহাম্মদ মাসুমকে বাম রানের উপরে। এলহাম হলো, এ দু'জনকে দান করলাম। এরা দীর্ঘজীবি হবে। বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকবে।

মহান আল্লাহ্ ওই দু'জনকে ফয়েজ ও উচ্চ মর্যাদার উৎস বানিয়েছিলেন। তাঁদেরকে প্লেগ মহামারী থেকে মুক্ত রেখে দীর্ঘজীবি করে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিলেন।

হজরত সাঈদ বর্ণনা করেন, যখন সম্রাট আকবরের আহবানে হজরত মোজাদ্দেদ র. আগ্রা গমন করলেন, তখন আমার স্ত্রী সন্তানসম্ভবা ছিলো। যাত্রার প্রাক্কালে তিনি আমাকে বললেন, মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এলহাম হলো, মোহাম্মদ সাঈদের এবার একটি কন্যাসন্তান জন্ম নিবে। তার নাম রাখতে হবে ফাতেমা। তারপর বললেন, কন্যাসন্তানের জন্য মনোক্ষুণ্ন হয়ো না। এটি একটি মহাদান। ঘটনা অনুরূপই ঘটেছিলো।

কারামত ঃ এলমে মারেফাতের অধিকারী এক হজরত বর্ণনা করেছেন, মখদুমজাদা হজরত খাজা মোহাম্মদ সাঈদ সাল্লামাল্লাহু তায়ালা একবার কঠিন রোগে আক্রান্ত হলেন। অসুস্থ অবস্থায় দীর্ঘ সময় কেটে গেলো। তিনি দুর্বল হয়ে পড়লেন। চিকিৎসকগণ হয়ে পড়লেন কিংকর্তব্যবিমূঢ়। একদিন হজরত মোজাদ্দেদ র. রাস্তায় একটি কাগজ পড়ে থাকতে দেখলেন। হাতে তুলে নিয়ে দেখলেন, কাগজটিতে আল্লাহ্পাকের নাম লেখা রয়েছে। তিনি কাগজটি চুম্বন করে একটি উঁচুস্থানে রেখে দিলেন। মহান আল্লাহ্র দরবার থেকে এলহাম হলো, তুমি আমার নামের প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করেছো, তার বিনিময়ে আমি তোমার সন্ত ানকে ফিরিয়ে দিলাম। তার অসুস্থতাকে আমি সুস্থতার দ্বারা পরিবর্তন করে দিলাম। এই ঘটনার পর মখদুমজাদা সহসাই সুস্থ হয়ে গেলেন।

কারামত ঃ এই নগণ্য (বদরুদ্দীন সেরহিন্দী) একবার স্বপ্নে দেখলেন, হজরত খাজা মোহাম্মদ সাঈদ যেনো বাদশাহ্। যে সকল আউলিয়া কেরাম বিদায় হয়ে গিয়েছেন তাঁরা তাঁর আত্মার সাথে এবং জীবিত আউলিয়াগণ তাঁর দেহের সাথে সম্পৃক্ত। তাঁরা সকাল-সন্ধ্যা তাঁর সাথে সালাম বিনিময়ের জন্য তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়ে থাকেন। এ ফকির দু'বার তাঁর দরবারে সালাম বিনিময়ের জন্য উপস্থিত হতে পেরেছিলো। একদিন যখন আমি সালাম বিনিময়ের জন্য উপস্থিত হলাম, তখন দেখলাম, তাঁর স্থানে এক বৃদ্ধ বস্ত্র পরিধান করে বসে আছেন। কেউই তাঁর সাথে সালাম বিনিময় করার জন্য আসছে না। আমি বিস্মিত হলাম। এমন সময় দেখলাম, ওই বৃদ্ধ নিচে নেমে এলেন। তিনি যে দিকে দৃষ্টিপাত করলেন, আমিও সেদিকে তাকালাম। দেখলাম, খাজা মোহাম্মদ সাঈদ বীর বিক্রমে আসছেন। বৃদ্ধ সামনে অগ্রসর হয়ে তাঁকে অভিবাদন জানালেন। খাজা মোহাম্মদ সাঈদ তাঁর নিজস্ব আসনে উপবেশন করলেন। তারপর লোকেরা তাঁর সাথে সালাম বিনিময়ের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হতে লাগলো।

হজরত খাজা মোহাম্মদ সাঈদ র. এর উচ্চমর্যাদা, কারামত ও অলৌকিক ঘটনা গণনার বাইরে। কাশফে সুদুর (অন্তর্দৃষ্টি) এবং কাশফে কুবুর (কবরের অবস্থা দর্শন) এর ক্ষেত্রে তিনি পূর্ণ দক্ষ ছিলেন। তিনি যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী করতেন, তা যথাযথভাবে বাস্তবে ফলে যেতো।

সোপান ঃ একটি ঘটনা যা এক আধ্যাত্মিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি প্রত্যক্ষ করে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তিনি বলেন, একবার আমি দেখলাম, এক বিশাল ময়দানে বহুসংখ্যক আউলিয়া ও পুণ্যবান মানুষ সমবেত হয়েছেন। হজরত খাজা মোহাম্মদ সাঈদ র. সেখানে বিশেষ আসনে উপবিষ্ট। সকলে তাঁর দিকে মনোযোগী হয়ে আছেন। তিনিই সকলের নেতা এবং সকলে তাঁকে অনুসরণ করছেন। এমন সময় এই নগণ্য হজরতের খেদমতে সালাম বিনিময়ের জন্য উপস্থিত হলো। তিনি বললেন, ওহে! আমি তো তোমার অপেক্ষায় আছি। তিনি আমাকে কারুকার্যখচিত একটি রূপার পাত্র দিলেন। বললেন, এটি জীবনীশক্তিবর্ধক। খুবই উচ্চমানসম্পন্ন ও শক্তিশালী ঔষধ। এটি বাদশাহ্ আমাকে দিয়েছিলেন। এখন আমি তোমাকে দিলাম। নিজে খাবে। অন্যদেরকেও দেবে। অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে গেলেন। আমি রৌপ্যপাত্রটি খুললাম। মখদুমজাদাদের মধ্যে শায়েখ লুত্ফুল্লাহ এবং মোহাম্মদ ফররুখ শাহ্ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা পাত্র থেকে একটি আঙ্গুল চুবিয়ে নিয়ে স্বাদ গ্রহণ করে পুনরায় হজরতের সাথে মিলিত হলেন। এরপর লোকেরা এই দরবেশের কাছে ওই ঔষধপ্রাপ্তির বাসনা করলো। আমি সকলের মধ্যে তা বণ্টন করে দিলাম। কিন্তু ওই পাত্র আগের মতোই পরিপূর্ণ রইলো।

সোপান ঃ হজরতের এক মুরিদ খাজা মোহাম্মদ জাহেদ বর্ণনা করেন, ১০৫০ হিজরীর রমজান মাসের শেষ দশকের কোনো একদিন আমি ইশরাক নামাজ পড়ে ঘুমিয়ে গেলাম। স্বপ্নে দেখলাম, একটি পুষ্পশোভিত সজ্জিত উদ্যান, একটি চমকপ্রদ চৌবাচ্চাও রয়েছে সেখানে। উদ্যানের এক পাশে রয়েছে একটি সুদৃশ্য প্রাসাদ। সেখানে বসে আছেন পীর মোর্শেদ হজরত খাজা মোহাম্মদ সাঈদ এবং তাঁর ভ্রাতা খাজা মোহাম্মদ মাসুম। আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকুলের আমলনামা তাঁদের সম্মুখে রাখা হয়েছে। একদল লোক তাঁর সিদ্ধান্তপ্রাপ্তির অপেক্ষায় দণ্ডায়মান। ওই উদ্যানের মধ্যে একটি মসজিদ পেলাম। সেখানেই তিনি এতেকাফে বসেছিলেন। চৌবাচ্চার উত্তর পাশে জমিন থেকে আকাশ পর্যন্ত সুবিস্তৃত একটি নূর। তাঁদের ইচ্ছানুযায়ী ওই নূর বিকাশমান। গুরুত্বপূর্ণ লোকেরা তাঁদের কাগজে কী যেনো লিখে ওই কাগজে হজরতের স্বাক্ষর করিয়ে নিচ্ছেন। মাফ পাবার যোগ্য যারা, তারা তাদের কাগজে সীল লাগিয়ে নিচ্ছেন। তারা হয়ে যাচ্ছেন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত। যারা গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না তাদের কাগজে স্বাক্ষর দেওয়া হচ্ছে না। এই দরবেশ নিবেদন করলো, আমাকেও ক্ষমাপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করে নিন। ব্যবস্থাপক ব্যক্তিগণ বললেন, তোমাকে, মোহাম্মদ হানীফকে এবং শায়েখ মোহাম্মদ ফয়েয— যারা তোমারই সমপর্যায়ের তাদেরকেও মাফ করে দেওয়া হয়েছে। এই নগণ্য জিজ্ঞেস করলো, এ সকল হজরতদের সন্তানগণ সম্পর্কে কী সিদ্ধান্ত হয়েছে? তাঁরা বললেন, তাঁদের সন্তান ও সংশ্লিষ্টদের সকলকেও ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন এরকমই দেখলাম। শেষদিন সেখানকার জনৈক ব্যবস্থাপক বললেন, তুমি ওই সকল লোকের পক্ষ থেকে আমার কাছে এই মর্মে আবেদন করো যে, আমরা আপনার এতো খেদমত করেছি কিন্তু প্রতিদান পাইনি। যখন আমি আমার পীরে দস্তগীরের প্রতি এরূপ আবেদন করলাম, তিনি বললেন, ওদের জন্য ফাতেহা শরীফ বিশেষ উপকারী। তারপর তিনি ফাতেহা পড়লেন। এর পরবর্তী দিন আমি হজরতের দরবারের মোরাকাবায় অংশগ্রহণ করলাম। তখন ওই লোকেরা উপস্থিত হয়ে বললো, আমরা আমাদের অংশ পেয়েছি।

কারামত ঃ মরহুম উজির খান লাহোরীর স্ত্রী, যিনি হজরত খাজা মোহাম্মদ সাঈদের বিশিষ্ট মুরিদ ছিলেন, তিনি একবার হজরতের কাছে চিঠি লিখলেন, আপনি আমার প্রতি তাওয়াজ্জোহ দিন। যেনো আল্লাহ্‌পাক আমাকে পুত্র সন্তান দান করেন। তিনি তাওয়াজ্জোহ দিলেন এবং লিখলেন, মহব্বত সুদৃঢ় রাখো। আশা করি মহান আল্লাহ্ তোমাকে একটি পুত্রসন্তান দান করবেন। নির্ধারিত সময়ে তাঁর একটি পুত্রসন্তান হলো। তিনি তৎক্ষণাৎ হজরতের দরবারে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সুসংবাদ দূত মারফত উপঢৌকনসহ প্রেরণ করলেন।

কারামত ঃ একবার হজরতের নিকট তাঁর এক খাদেম পানের একটি গুচ্ছ নিয়ে এলো। পানের গুচ্ছটি একটি বড় পাতা দ্বারা আবৃত ছিলো। তিনি সেটি খুলে পান বের করে দেখলেন এবং পাতা দ্বারা আবৃত করে আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। আমি ধারণা করলাম, পানের ওই গুচ্ছটি তিনি আমাকেই দান করেছেন। এ কথা মনে করে আমি তা খুলে ফেললাম। দেখলাম, সেখানে একটিও পান নেই। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা খাজা মোহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া সাল্লামাল্লাহু সেখানে উপস্থিত ছিলো। সে হেসে ফেললো। আমি লজ্জিত হলাম। ভাবলাম, পানশূন্য আবৃত পাতাটি ফেলে দেবো কি না। দেখলাম, পাতাটির মধ্যে মসলাযুক্ত অনেক পান। আমি খুবই বিস্মিত হলাম এবং হজরতের কারামতপূর্ণ একটি পান মুখে পুরে দিলাম।

কারামত ঃ একবার আমি অসুস্থ হলাম। অবস্থা এমন হলো যে, জীবনের আশা ছেড়ে দিলাম। তিন মখদুমজাদা আমার অসুস্থতা দেখার জন্য এলেন। আমার দুর্বলতা চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলো। খেয়াল হলো, ইমানের সাথে মৃত্যুর জন্য দোয়ার দরখাস্ত জানাবো। এরকম ধারণা করতেই খাজা মোহাম্মদ সাঈদ র. বললেন, হাদিস শরীফে এসেছে, কেউ এই দোয়া অসুস্থতার সময় পড়লে মহান আল্লাহ্ তাকে ইমানের সাথে নিয়ে যান। আমি বললাম, দয়া করে ফাতেহা পাঠ করুন। হজরত মিঞা মোহাম্মদ মাসুম বললেন, আমরা আপনার সুস্থতার জন্য ফাতেহা পাঠ করছি। ফাতেহা (দোয়া) পাঠ করা হলো, মহান আল্লাহ্ আমাকে সুস্থ করে দিলেন। খাজা মোহাম্মদ সাঈদ থেকে এ ধরনের অসংখ্য কারামত দেখেছি।

কারামত ঃ খাজা মোহাম্মদ সাঈদের বংশধর শায়েখ লতীফুল্লাহ বর্ণনা করেন, একবার তিনি নূরনবী স. এর চাচা হজরত হামযা রা. এর শাহাদাতের ঘটনা বর্ণনা করছিলেন। বললেন, জাবির বিন মুতআমের ক্রীতদাস ওয়াহ্শী আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দার ইঙ্গিতে হজরত হামযাকে শহীদ করে। আর হিন্দা তার কলিজা চিবিয়ে খায়। এ সকল কথা শুনে আবু সুফিয়ান ও হিন্দা সম্পর্কে আমার মনে ঘৃণার উদ্রেক হচ্ছিলো। হজরত মোহাম্মদ সাঈদ প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, বৎস! আবু সুফিয়ান এবং তাঁর স্ত্রী হিন্দার প্রতি ঘৃণা পোষণ না করাই উচিত। কেনোনা পরে দু'জনই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ইমান এনে আল্লাহ্র দরবারে গ্রহণযোগ্য হয়েছিলেন। মক্কাবিজয়ের দিন রসুলুল্লাহ স. ঘোষণা করেছিলেন, মান দাখালা দারা আবী সুফিয়ানা ফাহুয়া আমিনুন (যদি কেউ আবু সুফিয়ানের গৃহে আশ্রয় নেয়, তাহলে সে নিরাপদ)। মক্কাবিজয়ের পরে তাঁরা ইসলামে অনুপ্রবেশ করে আল্লাহ্র রসুলের সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন।

কারামত ঃ এই দরবেশ (লেখক) এক বিশেষ কাজের জন্য সেনানিবাসে গিয়েছিলো। ঘটনাক্রমে এ কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি হলো। সেনাধ্যক্ষ আবেদনপত্রে স্বাক্ষর

করলেন না। বরং কঠোরতা প্রদর্শন করলেন। আমি বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে এলাম। হজরত মোহাম্মদ সাইদ র. এর কথা মনে হলো। চিন্তিত মনে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম। স্বপ্নে দেখলাম, আমি অতি উচ্চমর্যাদায় আসীন। এক সুন্দরী রমণী আমাকে উৎপীড়ন করছিলো। অবশেষে শত্রুতাবশতঃ সে আমার বুকের উপর উঠে বসলো। আমার গলা কেটে ফেলতে চাইলো। এমন সময় দেখলাম, হজরত খাজা মোহাম্মদ সাঈদ নামাজ পড়তে মসজিদের দিকে যাচ্ছেন। তাঁর হাতে একটি লাঠি। মুখাবয়ব গম্ভীর। তিনি মসজিদে প্রবেশ করতেই ওই মহিলা পালিয়ে গেলো। সকাল হলো। আমার মনে হলো, স্বপ্নের ব্যাখ্যা হবে এরকম— সেনাধ্যক্ষ আমাকে বিপত্তি থেকে মুক্তি দিবে। আমি তাঁর কাছে গেলাম। তিনি খুশি হয়ে বললেন, খাজা মোহাম্মদ সাঈদ সাল্লামাহুল্লাহ্র প্রতি ভালোবাসাই তোমাকে সাহায্য করেছে। তিনি তোমার অবস্থার প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগী। আমার মনে হলো, স্বপ্নযোগে তিনি তাকে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি হাসিমুখে কাগজে স্বাক্ষর করলেন।

খাজা মোহাম্মদ মাসুম সাল্লামাল্লাহুল কাইয়্যুম

তিনি হজরত মোজাদ্দেদ র. এর তৃতীয় পুত্র ছিলেন। তিনি ১০০৯ [১] হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। হজরত মোজাদ্দেদ র. বর্ণনা করেন, আমার সন্তান মোহাম্মদ মাসুমের জন্ম আমার জন্য বহুমুখী কল্যাণ বয়ে নিয়ে এসেছে। তার জন্মের কয়েকমাস পর আমি হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ কুদ্দিসা সিররুহুর দরবারে উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করলাম। যাবতীয় এলেম ও মারেফাত অর্জন করতে সক্ষম হলাম।

হজরত মোজাদ্দেদ র. খাজা মোহাম্মদ মাসুমের অতি শৈশবকাল থেকেই তাঁর উচ্চমর্তবা ও যোগ্যতার প্রশংসা করতেন। বলতেন, এ সন্তান বেলায়েতে মোহাম্মদীর যোগ্যতাধারী এবং মোহাম্মাদীআল মাশরাবের অন্তর্ভুক্ত। তিনি এ-ও বলতেন, মোহাম্মদ মাসুম মাত্র তিন বছর বয়সে কালেমা তওহীদ সম্পর্কে যে সকল কথা বলতো, সেগুলো নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর। প্রাচীর গাত্রে অথবা ফুলবাগিচায় ফুলের উপর এবং অন্যান্য বস্তুর উপর যখন তার দৃষ্টি পড়তো তখন সে বলতো, এ আমি এবং সে-ও আমি। একদিন বললেন, এই নেয়ামতপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে ছোট-বড়,

---

১. হাজ্‌রাতুল কুদুস গ্রন্থে ১০০৯ হিজরীতে জন্মের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু যুবদাতুল মাকামাত গ্রন্থে এগারো শাওয়াল ১০০৭ হিজরীতে জন্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এটা্ই বিশুদ্ধ। কেনোনা তাঁর জন্মের কয়েকমাস পর হজরত মোজাদ্দেদ র. ১০০৮ হিজরীতে রবিউল আখের মাসে খাজা বাকী বিল্লাহ র. এর সাথে সাক্ষাতের জন্য দিল্লীতে আগমন করেছিলেন। মাবদা ওয়া মাআদ গ্রন্থের সূচনায় এই আলোচনাটি করা হয়েছে।

যুবক-বৃদ্ধ, মুক্ত-বন্দী, পুরুষ-নারী, বয়োজ্যেষ্ঠ-বয়োকনিষ্ঠ, দুর্বল-সবল, জীবিত-মৃত সকলেই সমান। 'যালিকা ফাজলুল্লাহি ইউ'তি মাইঁইয়াশাউ ওয়াল্লাহু যুল ফাজলিল আজীম' (এটা আল্লাহ্‌র মহান অনুগ্রহ। তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন এবং মহান আল্লাহ্ বড়ই অনুগ্রহকারী)। তিনি স্বীয় বুজর্গ পুত্র সম্পর্কে এ-ও বলতেন, সে প্রিয়জনদের অন্যতম। হজরত মোজাদ্দেদ র. এর এক খাদেম, যিনি সফরে ও গৃহে সর্বক্ষণ তাঁর খেদমতে থাকতেন, তিনি আমাকে বলেছেন, হজরত মোজাদ্দেদ র. এর একবারের দিল্লী সফরের সময় খাজা মাসুম তাঁর সঙ্গী ছিলেন। একদিন তিনি মোরাকাবা শেষে বিশ্রাম গ্রহণের জন্য তাঁর নিজস্ব প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করলেন। দেখলেন, খাজা মোহাম্মদ মাসুম তাঁর বিছানায় শায়িত। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলেন। খাদেম বললেন, হজরত! ফিরে এলেন কেনো? যদি বলেন, তাহলে তাঁকে জাগিয়ে দেই। তিনি বললেন, আমি মহান আল্লাহ্‌র ইজ্জতের ভয়ে আতংকিত হয়ে ফিরে এলাম। ভাবলাম, আল্লাহ্‌র এক বন্ধু বিশ্রাম করছেন। তার বিশ্রামের ব্যাঘাত যেনো না হয়ে যায়। তিনি রৌদ্রের মধ্যে বসে পড়লেন। আবহাওয়া ছিলো অতি উত্তপ্ত। মসজিদে ফিরোজ প্রস্তরনির্মিত হওয়ায় তা ছিলো আরো অধিক উত্তপ্ত। এমন সময় খাজা মোহাম্মদ মাসুম জেগে উঠলেন। পরম শ্রদ্ধেয় পিতাকে রৌদ্রে বসে থাকতে দেখে অস্থির হয়ে গেলেন।

হজরত মোজাদ্দেদ র. স্বীয় সন্তানের মধ্যে উচ্চমর্যাদা, কামালত (পূর্ণতা) মহান আল্লাহ্‌র প্রতি গভীর অনুরাগ, কামালতের গোপন তত্ত্ব— এ সকল কিছু দেখার অপেক্ষায় থাকতেন। বলতেন, তুমি বাহ্যিক জ্ঞান অর্জন থেকে দ্রুত অবসর হও, কেনোনা আমি তোমার দ্বারা এক মহান খেদমত সম্পাদন করতে চাই। খাজা মোহাম্মদ মাসুম মাত্র ষোলো বছর বয়সে সকল প্রকার পুঁথিগত বিদ্যা অর্জন সমাপন করলেন। বাহ্যিক জ্ঞান অর্জনের সাথে সাথে মাত্র এগারো বছর বয়সে তিনি নকশবন্দিয়া তরিকার কাজও শুরু করেন। এভাবে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় দিকের জ্ঞান অর্জন করেন। বাহ্যিক এলেম অর্জনের পর পাঠদানের কাজে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু তাঁর অভ্যন্তরীণ অবস্থা বাহ্যিক অবস্থা থেকে অত্যন্ত প্রবল ছিলো। তিনি সর্বান্তকরণে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখে স্বীয় বুজর্গ পিতার এলমে মারেফাতের গুপ্তভাণ্ডারের জ্ঞান অর্জনে নিজেকে উৎসর্গ করেন। হজরত মোজাদ্দেদ র. তাঁর বাতেনী দিকের উন্নতির জন্য সর্বক্ষণ তাওয়াজ্জোহ দান করতেন এবং জনসমাবেশে ও নির্জনতায় সার্বক্ষণিক নিজের সান্নিধ্যে রাখতেন। এভাবে হজরত মোজাদ্দেদ র. এর উপস্থিতিতেই তিনি মারেফাতের উচ্চমর্তবা ও মাকামসমূহ অর্জনে সক্ষম হন এবং মারেফাতের গূঢ় রহস্য ও তত্ত্ব অর্জনে সফল হন। একদিন এক বিশেষ পরিবেশে হজরত মোজাদ্দেদ র. তাঁর সাথীদের উদ্দেশ্যে বললেন, আমার সন্তান মোহাম্মদ মাসুমের ও আমার নেসবতের বিষয়টি 'শরহে বেকায়া' গ্রন্থের লেখকসদৃশ। তিনি তাঁর গ্রন্থের একটি অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন—

'আমার দাদা আমাকে 'বেকায়া' নামক গ্রন্থ এক এক অধ্যায় করে লিপিবদ্ধ করতে বলতেন, আমিও সঙ্গে সঙ্গে তা মুখস্থ করে নিতাম। এমনকি কিতাব লিপিবদ্ধ সম্পন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমারও সম্পূর্ণ কিতাব মুখস্থ হয়ে গেলো।'

এই মখদুমজাদা ছিলেন প্রখর মেধাশক্তিসম্পন্ন, অত্যন্ত দ্রুততার সংগে সায়ের-সুলুক সম্পন্নকারী ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. অনেক সুসংবাদ দিয়েছেন। যদি সেগুলোর আদ্যপান্ত বিবরণ দান করা হয়, তবে নিকটবর্তীগণ আতংকিত হবেন এবং যাঁরা দূরে আছেন তাঁরা আরো দূরে সরে যাবেন।

উচ্চমর্তবার অধিকারী মখদুমজাদা যখন মহিমময় হাল, অলৌকিক ক্ষমতা অর্জন, উচ্চ মাকামে উন্নীত ও কামালাত পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হলেন, তখন হজরত মোজাদ্দেদ র. তাঁকে খেলাফত দান করে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করলেন। মাশাআল্লাহ্! মখদুমজাদা জাহেরী ও বাতেনীভাবে দৃঢ়তার সাথে প্রতিষ্ঠিত হলেন এবং শরীয়ত ও তাক্বওয়ার বেষ্টনীতে আবদ্ধ হয়ে সুন্নতের পূর্ণ অনুসরণ এবং পরিপক্কতার সাথে সন্তোষজনক আমলে অভ্যস্ত হয়ে উত্তম চরিত্র, বিনয়, কথা, কাজ এবং সকল ক্ষেত্রে তাঁর বুজর্গ পিতার মূর্ত প্রতীক হয়ে গেলেন। তিনি এই মর্মে বিশেষভাবে সতর্ক থাকতেন যে, সুলুক, সৎকার্যাদি, সুন্নত, মোস্তাহাব আদায়ের ক্ষেত্রে স্বীয় পিতার অনুকরণ ও অনুসরণের মধ্যে যেনো বিন্দুমাত্র পার্থক্য বা ঘাটতি না ঘটে। তাঁর সকল কার্যাবলী হুবহু হজরত মোজাদ্দেদ র. এর আমলের মতো ছিলো এবং তাঁর তরিকা ছিলো অবিকল মোজাদ্দেদ র. এর তরিকা। তাঁর দিন-রাতের সকল আমল নির্ধারিত তালিকাভুক্ত। প্রতি নামাজের পরে দোয়াও নির্ধারিত ছিলো।

ফজরের নামাজ শেষে নির্ধারিত অজিফা শেষ করতেন। তাঁর সাথীদের নিয়ে জিকিরের সমাবেশ করতেন এবং মোরাকাবায় বসতেন। জোহর নামাজের পর হাফেজ সাহেব কর্তৃক পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত শ্রবণের মজলিসে বসতেন। অধিকাংশ সময় জোহর নামাজের পরে জিকিরের মজলিস শেষে বিভিন্ন কেতাব যেমন— বায়যাবী, আজুদী, তালবিহ, মেশকাত, হেদায়াহ গ্রন্থের পাঠদান করতেন। দু'একটি অধ্যায় সম্পর্কে অতি সূক্ষ্ম বিষয়ের উপর প্রাণবন্ত আলোচনা করতেন। কখনো কখনো জোহর নামাজের পর নির্জন প্রান্তরে গিয়ে নিরিবিলি বসে থাকতেন। কখনো জোহর নামাজ শেষে দুই রাকাত শোকরানা নামাজে লিপ্ত হতেন। এই দু'রাকাত নামাজ আদায় করতেই আসর নামাজের সময় হয়ে যেতো। তিনি বলতেন, নামাজের মধ্যে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত বড়ই তৃপ্তিদায়ক। তিনি সর্বদাই কোরআন মজীদ ধীরস্থিরভাবে তাজবীদের সঙ্গে তেলাওয়াত করতেন। তিনি মাত্র তিন মাসে পবিত্র কোরআন মুখস্থ করেছিলেন। প্রায় সারাক্ষণ তিনি কোরআন তেলাওয়াতে লিপ্ত থাকতেন। রমজান মাসে তারাবী

নামাজে তিনি নিজেই এক খতম করতেন। আর হাফেজদের থেকে দুই খতম কোরআন শ্রবণ করতেন। শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, দূর দূরান্ত থেকে গ্রামাঞ্চলের লোকেরা তাঁর কোরআন তেলাওয়াত শ্রবণ করে নিজেদেরকে ধন্য বা সৌভাগ্যময় করার জন্য পঙ্গপালের মতো উপস্থিত হতো। মসজিদ বিশাল আয়তনের হওয়া সত্ত্বেও স্থান সংকুলান হতো না। আর রোজার মাসে ইফতারীর পূর্বেই অসংখ্য লোক সমবেত হতো।

মুরিদদের হাল পর্যবেক্ষণ, তাদের সুলুকের অগ্রগতি এবং তাদেরকে দূরবর্তী মাকামে পৌঁছানোর জন্য মোজাদ্দেদ র. যে প্রক্রিয়া পছন্দ করতেন, সেই প্রক্রিয়াই ছিলো তাঁর পছন্দ। বলাবাহুল্য, সেই প্রক্রিয়া ছিলো সুন্নতে রসুলের পূর্ণ অনুকূল। তিনি মুরিদগণের প্রতি সার্বক্ষণিক তাওয়াজ্জোহ অব্যাহত রাখতেন। মুরিদগণের মধ্যে তাওয়াজ্জোহের প্রভাব প্রকাশ পেতো। তাদের হাল এবং ভবিষ্যৎ সংশোধনীর বিষয়েও তিনি তাদেরকে অবহিত করতেন। ঊর্ধ্ব মাকামের নিদর্শনাবলী বর্ণনাপূর্বক তাদেরকে বেলায়েতের সুসংবাদ দান করতেন। বলতেন, ওমুক বেলায়েতের মাকামে অবস্থান করছে, ওমুক ব্যক্তি বেলায়েতের মাকামে পদার্পণ করেছে। তাঁর অনেক মুরিদ বাতেনী হাল এবং বাতেনী রহস্যপ্রাপ্তিতে ধন্য হয়ে কুতুবিয়াতের দায়েরায়ে উপনীত হয়ে খেলাফত লাভ করেছিলেন। তাঁরা নিজ নিজ দেশে বা অঞ্চলে যথেষ্ট জননন্দিত হয়েছিলেন। লোকেরা তাঁদের সঙ্গ লাভ করে মারেফাতের সূক্ষ্ম তত্ত্বের সবক গ্রহণ করতেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ খেলাফতও লাভ করেছিলেন। তাঁরা অত্যন্ত বিস্ময়কর, অসাধারণ ও অলৌকিক ঘটনা বর্ণনা করতেন। তাঁদের সোহবতও ছিলো সক্রিয় ও প্রভাবশালী।

মহান আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ, রসুল স. এর জিম্মাদারী এবং মোর্শেদের তাওয়াজ্জোহের বরকতে সুলুক এবং তার পূর্ণতাগত বিষয়গুলো অধিক সহজভাবেই চলছে। পথও হয়েছে যথেষ্ট নিকটবর্তী। দীর্ঘ সময়ের কাজ মাত্র একদিনে, অথবা এক মাসে সম্পন্ন হচ্ছে। এক মুরিদ তরবিয়তের (আত্মিক পরিচর্যার) সূচনাতেই সাত দিনের মধ্যে কৃলবের ফানার বর্ণনা দিয়েছেন। এমনও তথ্য দিয়েছেন যে, মনে হয় তিনি নফসের ফানার স্তরেও প্রবিষ্ট হতে চলেছেন। ‘ওয়ামা যালিকা আ’লাল্লাহি বি আজীম’ (আল্লাহ্‌র জন্য এটা কোনো কঠিন বিষয় নয়)। এ দরবেশের অধিকাংশ এজাযতপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাদের মুরিদগণের বিস্ময়কর হালের কথা বলেন। দ্রুত আল্লাহ্‌প্রাপ্তির এমন অলৌকিক ঘটনা বর্ণনা করেন, যা অভূতপূর্ব।

বৃদ্ধার দুয়ারে যদি আসেন রাজন
হে খাজা কোরো না তাতে গোঁফ উৎপাটন

তবে এ বিষয়ে আমাদের সকলেরই জানা উচিত যে, আমাদের মূল অভিভাবক ও পালনকর্তা হলেন মহান আল্লাহ্। তোমার আমার সকলেরই করুণাপরবশ প্রভুপালক।

সতর্কবাণীঃ এ সকল নূরের বিচ্ছুরণ এবং বাতেনী রাজ্যের কল্যাণ সত্ত্বেও এই অধমের কার্যকলাপ দিনের পর দিন অধোমুখী। আল্লাহ্প্রাপ্তির বিষয়টি অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও বঞ্চনাপ্রবণ এবং উদাসীনতা ও গুনাহর পরিমাণ অনেক বেশী। পেরেশানীর সমুদ্রে সে নিমজ্জমান এবং আল্লাহ্র গ্রেপ্তারীর আশংকায় কম্পমান। আমি জানি না, ভবিষ্যতে আমার সাথে কী আচরণ করা হবে এবং আমাকে কোন দলের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

'রব্বানাগ্ফিরলানা যুনূবানা ওয়া ইছরাফানা ফী আমরিনা ওয়া ছাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বওমিল কাফিরীন' (হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পাপ এবং আমাদের কার্যে সীমালংঘন তুমি ক্ষমা করো, আমাদের পা সুদৃঢ় রাখো এবং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করো)।

এ কথা স্পষ্ট যে, তিনি তাঁর বুজর্গ পিতার সকল বাতেনী রহস্য এবং সূক্ষ্ম মারেফাতের বিষয়ে পরিপূর্ণরূপে অবগত ছিলেন। সেই মারেফাত এবং গুপ্ত রহস্য ওই ধরনের হয় যা মকতুবাতে কুদসী আয়াতের মধ্যে লিপিবদ্ধ রয়েছে, যদিও সেই বিশেষ গুপ্তরহস্য হজরত মোজাদ্দেদ র. এর বিশেষ নির্জন পরিবেশে তাঁরই পবিত্র জবান থেকে এলহামের মাধ্যমে শ্রুত হতে পারে এবং কোনো কোনো মারেফাত এমনও রয়েছে, যা তিনি তাঁর ব্যক্তিগত দিনলিপিতে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। কিছু গোপন রহস্য এবং মারেফাতে লাদুন্নিয়া এমনও রয়েছে, যা কেবল তাঁর নিজস্ব বেলায়েতের উদ্যানের নতুন নতুন পুষ্পসদৃশ এবং যা অন্য কেউই অবগত নয়। কোরআনের কোনো কোনো মুতাশাবিহাত এবং মুকাত্তাআতের রহস্যের বিষয়ে আলোচনা শুধুমাত্র তাঁর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো। অন্যান্য গুপ্ত রহস্যসমূহ তাঁর সাথেই সম্পৃক্ত ছিলো। সেগুলো গোপন রাখাও ছিলো সমীচীন। এ সকল বিষয়ে তিনি কিছুই বলেননি। অবশ্য কিছু মারেফাত বিষয় এমন রয়েছে যা প্রকাশযোগ্য। তাঁর সে বিষয়গুলো লেখনীতে উহ্য রাখার বিষয় হলেও প্রকাশযোগ্য ছিলো, সেগুলো তিনি তার কোনো কোনো মকতুবে উল্লেখ করেছেন।

কুদসিয়্যাহ্ ১ঃ যদি এই মহান বুজর্গের আধ্যাত্মিকতার বাস্তব অবস্থার এক বিন্দু পরিমাণ বর্ণনা করা হয় তবে নিকটবর্তীরাই দূরবর্তীর প্রত্যাশী হবে এবং যারা মিলনপ্রত্যাশী তারা হবে বিচ্ছেদের সন্ধানী। শ্রবণকারীরা জ্ঞান হারাবে এবং বর্ণনাকারীরা হবে নির্বাক।

হাফেজের এহেন ফরিয়াদ নয় অহেতুক
ঘটনা অসাধারণ বিস্ময়কর ও বেদনাবিধুর।

কোরআনের মুতাশাবিহাত অন্যতম রহস্যময় বিষয় এবং কোরআনের মুকাত্তাআত তাঁরই ইঙ্গিতবাহক। এ মহামূল্যবান সম্পদ প্রকৃতপক্ষে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম এবং তাঁদের পূর্ণ উত্তরাধিকারীদের পূর্ণ অনুসরণের মাধ্যমে অর্জিত হয়। সুতরাং খতিমুল মুরসালীন সল্লাল্লাহু আলাইহিমুত্ তাসলীমাতের পূর্ণ অনুসরণের জন্য সাধনা করো যেনো তাঁর বরকত হাসিল করতে পারো এবং তার স্বাদ আস্বাদন করতে সক্ষম হও এবং কিয়ামতের ভয়াবহ বিপদ থেকে তাঁর সুপারিশে মুক্তি পাও (মকতুবাতে মাসুমিয়া প্রথম খণ্ড ১৩৪ নং মকতুব)।

ওই সকল মহাসুসংবাদ যা হজরত মোজাদ্দেদ র. স্বীয় পুত্র হজরত মোহাম্মদ মাসুম র. এর উচ্চমর্যাদা সম্পর্কে বলেছিলেন, ইতোমধ্যে সেগুলোর কিছু কিছু আলোচনায় এসে গিয়েছে। ওই সকল শুভ সংবাদ বা ভাবিষ্যৎ বাণী তাঁর ক্ষেত্রে প্রকাশিত হয়েছে, যেগুলো কেবল তাঁর সাথে সম্পৃক্ত।

একবার তিনি স্বীয় বুজর্গ পিতাকে বললেন, আমি আপনাকে একটি নূর হিসেবে দেখলাম, যে নূরের দ্বারা সমগ্র জগত আলোকিত হয়েছে। ওই নূর সকল বিন্দু বা অণু-পরমাণুর মধ্যে প্রবাহিত হয়েছে, যেমন সূর্যের আলো দ্বারা সবকিছু জ্যোতির্ময় হয়। হজরত মোজাদ্দেদ র. বললেন, হে বৎস! তুমি এ যুগের কুতুব হয়ে গিয়েছো। আমার কথা স্মরণ কোরো। তিনি কোনো কোনো মকতুবে লিখেছেন— "যখন আমার বয়স চৌদ্দ বছরে পড়লো, তখন হজরত মোজাদ্দেদ র. আমাকে কুতুবিয়াতের সুসংবাদ দান করলেন। এই কুতুবিয়াতের পোশাক পরিধানের পূর্বে আলহামদুলিল্লাহ মাত্র এগারো বছর বয়সে সেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে। এখন ওই ভবিষ্যদ্বাণীর নিদর্শন প্রকাশিত হলো (মকতুবাত প্রথম খণ্ড ৮৬)।

তিনি এরকমও লিখেছেন, একবার হজরত মোজাদ্দেদ র. তাঁর নিজস্ব নিয়মে ফানা ও বাকা এবং যাওয়ালে আইন ও আছার সম্পর্কে বর্ণনা দিলেন। মূল মকছুদপ্রাপ্তি এবং তার নিদর্শন সম্পর্কেও আলোচনার অবতারণা করলেন। একমাস কালেরও অধিক সময় ধরে মারেফাতের এই গুপ্তরহস্যের বিষয়ে আলোচনা চলছিলো এবং দিনের পর দিন এলমে মারেফাতের দুর্লভ ও অসাধারণ এবং সূক্ষ্ম বিষয়গুলো উন্মোচিত হতে লাগলো। এই অধম হজরত র. এর তাওয়াজ্জোহের মাধ্যমে ওই মাকামগুলো অর্জনের জন্য প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলো। হজরত র. এই নগণ্যের অবস্থার প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগী ছিলেন। আমার আধ্যাত্মিক সফলতার জন্য ছিলেন অপেক্ষমাণ। এই মর্মে তিনি সর্বদাই তাওয়াজ্জোহের মধ্যে থাকতেন এবং সূক্ষ্ম বিষয়গুলো বর্ণনার সময় এই নগণ্যের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন এবং অনুকম্পা প্রদর্শন করতেন। মাকামগুলোতে উপনীত হওয়ার সুসংবাদ দিতে থাকতেন। কখনো তাঁর পবিত্র রসনা থেকে এই কবিতাটি উচ্চারিত হতো—

পিপীলিকার বাসনা ছিলো কাবাকে দর্শন
অবশেষে কবুতরের চরণ ভর করে করলো সেথায় অবতরণ

মহান আল্লাহ্‌র সীমাহীন ইহসান এ সকল নেয়ামত দানের জন্য (মকতুবাতে মাসুমীয়া ২৩৮)।

হজরত মোজাদ্দেদ র. লিখেছেন— একদিন ফজর নামাজের পর আমি মোরাকাবায় ছিলাম। স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, আমি যে পোশাক পরিহিত ছিলাম তা আমার থেকে পৃথক হয়ে গেলো। এলো অন্য পোশাক। আমার ধারণা হলো পৃথক হয়ে যাওয়া পোশাকটি অন্য কাউকে দিয়ে দিবো কি না। ইচ্ছা হলো এ পোশাকটি আমার পুত্র মোহাম্মদ মাসুমকে প্রদান করি। এক মুহূর্তের মধ্যে দেখলাম, পোশাকটি আমার সন্তানকে পরিধান করানো হলো। পৃথক হওয়া পোশাকটি ছিলো কাইয়্যুমিয়াতের প্রতি ইঙ্গিত, যা তরবিয়ত (আত্মিক প্রতিপালন) এবং তকমিলের (পূর্ণতার) সাথে সংশ্লিষ্ট। এ ঘটনার মূল হেতুই ছিলো আমার সন্তান মোহাম্মদ মাসুম। এই নতুন পোশাক পরিধানের ব্যবস্থাপনা যখন হবে এবং তাঁর পরিহিত পোশাক খুলে ফেলার সময় যখন আসবে, তখন মহান আল্লাহ্‌র কামেল বান্দার অনুগ্রহে আশা করি তা আমার প্রিয় সন্তান মোহাম্মদ সাঈদকে প্রদান করা হবে। এই ফকির অত্যন্ত বিনয়ের সাথে এ বিষয়টি প্রার্থনা করেন এবং তা কবুল হওয়ার চিহ্নও অনুমিত হচ্ছে। আর আমার এই সন্তানকে এই মূল্যবান সম্পদের জন্য উপযুক্ত হিসেবে দেখতে পাচ্ছি। 'আল্লাহ্‌র ওলীদের জন্য কোনো কাজই দুঃসাধ্য নয়'। বন্ধুদের জানা উচিত যে, এই সম্মানসূচক পোশাক দ্বারা উদ্দেশ্য— খোল্লাত (বন্ধুত্ব)। ওই পোশাক দানের জন্য যে অঙ্গীকার খাজা মোহাম্মদ সাঈদের ব্যাপারে করা হয়েছিলো, তা কয়েকদিনের মধ্যে বাস্তবায়িত হলো। আলহামদুলিল্লাহি ওয়াল মান্নাহ। বিষয়টি হজরত মোজাদ্দেদ র. এর সময় কালেই স্থির হয়েছিলো। হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম র. স্বীয় অবস্থার বিবরণীতে নিজের কোনো কোনো মকতুবের মধ্যে উল্লেখ করেছেন—

এ যুগে যখন এক দরবেশকে (মোহাম্মদ মাসুমকে) স্থলাভিষিক্ত হওয়ার পোশাক পরিধান করিয়ে ধন্য করা হলো, তখন হজরত মোজাদ্দেদ র. তাঁকে নির্জনে ডেকে বললেন, এই সম্মেলনে আমার সম্পৃক্ততার মূল উদ্দেশ্যই ছিলো কাইয়্যুমিয়্যাত (স্থলাভিষিক্ত) এর বিষয়, যা তাওয়াজ্জোহ প্রদানের পর তোমার প্রতি অর্পণ করা হয়েছে। এখন মহান আল্লাহ্‌র গুপ্ত রহস্যপূর্ণ আকর্ষণ তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে। এখন এই অস্থায়ী জগতে আমার থাকার আর কোনো প্রয়োজন নেই। এরপর তিনি খুব নিকটবর্তী সময়ের মধ্যেই তাঁর প্রস্থানের বিষয়টি অবহিত করলেন। এই দরবেশ এহেন সুসংবাদপ্রাপ্তি সত্ত্বেও অধিক চিন্তাযুক্ত ও ভারাক্রান্ত হয়ে পড়লেন এমনভাবে যে, তা ভাষায় ব্যক্ত করার ও শ্রবণ করার

মতো ছিলো না। যখন হজরত মোজাদ্দেদ র. এই ফকিরের এমন চিন্তামগ্ন অবস্থা দেখলেন, তখন একান্ত অনুগ্রহের সাথে বললেন, তুমি চিন্তা কোরো না, এটাই আল্লাহ্‌র বিধান যে, একজনকে তাঁর নিজের কাছে আহবান করেন এবং অন্যকে সে স্থানে স্থলাভিষিক্ত করেন। তারপর পূর্ণ মহানুভবতা ও আন্তরিক মহব্বতের সাথে হজরত জামী র. এর এই বাক্যগুলি শোনালেন—

'যখন রসুলুল্লাহ স. কে আল্লাহ্‌ উঠিয়ে নিলেন, তখন হজরত আবুবকর রা.কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করলেন। যখন হজরত আবু বকর রা. কে নিজের কাছে আহবান করলেন, তখন হজরত ওমর রা.কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করলেন। যখন হজরত ওমর রা. কে নিজের দিকে আহ্বান করলেন তখন হজরত ওসমান রা কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করলেন। আবার যখন হজরত ওসমান রা. প্রকৃত প্রেমাস্পদের সাথে মিলিত হলেন, তখন হজরত আলী রা. কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করলেন।'

যখন হজরত মোজাদ্দেদ র. এই ফকিরকে অধিকতর ভারাক্রান্ত দেখলেন, তখন বললেন, আমার ইন্তেকালের সময় তো এখনই। কিন্তু আমি মধ্যবর্তী কতো সম্পর্কই তো দেখতে পাচ্ছি। তিনি গভীর তাওয়াজ্জোহের সঙ্গে মোরাকাবায় লিপ্ত হলেন এবং কিছুক্ষণ পর বললেন, আমার প্রস্থানের পূর্ব পর্যন্ত তোমার দায়িত্ব আমার উপর এবং পৃথিবীবাসীর দায়িত্ব তোমার উপর— এই বাণী শ্রবণের পর এই অধমের অন্তর কিছুটা শান্ত হলো। এই ঘোষণা দেওয়ার এক বছর তিন মাস পর হজরতের ইন্তেকালের ঘটনা ঘটে।

খাজা মোহাম্মদ মাসুম বর্ণনা করেন, কোনো ব্যক্তির যতক্ষণ পর্যন্ত উদ্দেশ্যের প্রতি অটলতা বা দৃঢ়তা না আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার স্থলাভিষিক্তের নেসবত অর্জিত হবে না। হজরত মোজাদ্দেদ র. এই দরবেশ (খাজা মোহাম্মদ মাসুম) কে কাইয়্যুমিয়্যাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন এবং মূল উদ্দেশ্যের প্রতি দৃঢ়তা ও তার সমৃদ্ধি ও স্থায়িত্বেরও সুসংবাদ দিয়েছিলেন। এরকমও বলেছিলেন যে, তোমার মূল উদ্দেশ্যের প্রতি তোমার যে পরিমাণ দৃঢ়তা অর্জিত হয়েছে, তোমার ওই পরিমাণ মাহবুবিয়াতের (প্রেমাস্পদত্বের) মাধ্যমে করা হয়েছে। অর্থাৎ মাহবুবিয়াতে যাতি (সত্তার ভালোবাসা) যার অস্তিত্ব এই দরবেশের পূর্ণ অনুতাপ দ্বারা হয়েছে। ওয়ামা যালিকা আলাল্লাহি বি আযীম (এবং বিষয়টি আল্লাহ্‌র নিকট বড় কিছু নয়) (মকতুবাতে মাসুমিয়া ১ম খণ্ড ৮৬)। তিনি লিখেছেন—

হজরত মোজাদ্দেদ র. ইন্তেকালের পূর্ব রাতে অথবা তার একদিন পূর্বের রাতে যখন আমার মখদুম ও উস্তাদ মিঞা মোহাম্মদ সাঈদ সাল্লামাহু উপস্থিত ছিলেন এবং হজরতের অসুস্থতা মারাত্মক আকার ধারণ করেছিলো। তিনি বললেন, আমাকে বসিয়ে দাও। এই নগণ্য তাঁকে বাহুর উপরে ভর করে বসিয়ে দিলেন। এমনভাবে যে, তাঁর ভার আমার উপরেই ছিলো। সেই ভার বা বোঝার কারণে অনুমান করেছিলাম যে, এই নগণ্যের প্রতি দায়িত্বের বোঝা কী পরিমাণ ভারী

হবে। আর কী পরিমাণ গুপ্তরহস্য (যা একান্ত গোপনীয়) এই অধমের উপর ন্যস্ত হবে। মোট কথা, হজরত র. বলেছিলেন, যখন বিদায়ের ধ্বনি আমার হৃদয়ে এভাবে বেজে উঠলো— বাদশাহ্ (আল্লাহ্) তোমাকে আহবান করেছেন, তখন আমার সাহসের পাখি যা বস্তুহীন লা মাকানের অভিমুখী হলো এবং যেখানে পৌঁছানোর কথা সেখানেই পৌঁছলাম। কিন্তু মহান দরবার থেকে আওয়াজ শুনলাম, বাদশাহ্ ঘরে নেই। পরে বুঝতে পারলাম, এটা হকিকতে কাবা তিসমানীর মাকাম। যখন আমি সম্মুখবর্তী হলাম এবং ঊর্ধ্বগমন করলাম, তখন আমি সিফাতে হাকিকী মাকামে (যা অতিরিক্ত অস্তিত্বের সাথে বিদ্যমান) পৌঁছলাম। এই সিফাতের মাকাম ওই সিফাতের এলমি সুরত থেকে সামনে, যা তাআইয়্যুনে অজুদীর (নির্ধারিত অস্তিত্বের) মধ্যে তাআইয়্যুনে হুব্বী (নির্ধারিত প্রেম)। কেনোনা এই আহবান এবং ভ্রমণ তাআইয়্যুনে হুব্বী থেকে সামনে। সে সম্পর্কে অবশ্যই বিস্তারিত বর্ণনা করা হবে। এরপর আমি এই মাকামও অতিক্রম করলাম এবং এই সিফাতের মূলের মধ্যে (যা যাতপাকের শান এবং যা যাত বারি তায়ালার মধ্যে এতেবার (বিশ্বাসের মর্যাদা রাখে) প্রবেশ করলাম। এবং তোমরা দুই ভাই (মোহাম্মদ সাইদ এবং মোহাম্মদ মাসুম) সকল মাকামে আমার সঙ্গী ছিলে। তারপর এই মাকাম থেকেও ঊর্ধ্বে নিয়ে যাওয়া হলো যাতে বাহাতের মধ্যে, যা সম্পর্ক এবং ধারণা থেকে পৃথক।

হজরত মোজাদ্দেদ র. হজরত মোহাম্মদ সাঈদ র.কে নামাজের ইমামতির সময় উচ্চতর স্তরে উপনীত হওয়ার ব্যাপারে সুসংবাদ দান করেছিলেন (হজরতের অসুস্থতার সময় তিনিই ইমামতির দায়িত্ব পালন করতেন)। আর এই দরবেশকে ভিন্ন পন্থায় ওই স্তরে উপনীত হওয়ার ব্যাপারে সুসংবাদ দান করেছিলেন এবং ওই মজলিসে অথবা তাঁর অন্তিম অসুস্থতার সময় অন্য কোনো মজলিসে বলেছিলেন, এই কামালতের স্তরপ্রাপ্তি এবং এই উচ্চ মর্যাদায় উপনীত হওয়া কালামে মজীদের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। আমি নিজেও পবিত্র কোরআনের যিম্মাদারীর মাধ্যমে এই মাকামের সাথে এমনভাবে সম্পৃক্ত হয়েছি যে, কোরআন মজীদের এক একটি হরফকে এক একটি সমুদ্রতুল্য পেয়েছি, যা মূল উদ্দেশ্যের কেন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। এ প্রসঙ্গে তিনি একটি কবিতা উচ্চারণ করেছেন, যা শুনে ওই কবিতার কবির সঙ্গে শায়েখ আবু সাঈদ আবুল খায়ের র. দূর দূরান্তের পথ অতিক্রম করে সাক্ষাৎ লাভের জন্য গমন করেছিলেন।

নিজের গানের মাঝে আমাকে রাখবো গোপন
গাইবো যখন তুমি পাবে তার সুঘ্রাণ।

তিনি এই কবিতা পড়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লেন। বললেন, আমার হাল অনুযায়ী কবিতাটি এরূপ হওয়া উচিত—

তারই ভাষায় আমি নিজেকে রাখব গোপন
গাহিবে যখন সে আমি পাব সুঘ্রাণ।

আশেকের কথা মাশুকের কান পর্যন্ত কেমন করে পৌঁছুতে পারে? তার ভাষাই তার নৈকট্য লাভের মাধ্যম হতে পারে এবং তারই ভাষার মাধ্যমে তার কাছে পৌছানো যায়, নিজের ভাষার মাধ্যমে নয়। কেনোনা আশেকের ভাষা থাকে অব্যক্ত ও অসম্পূর্ণ। এ ফকির বলেন, 'মান আরাফাল্লাহা কাল্লা লিসানুহু' (যে আল্লাহ্‌কে চিনেছে তার বাকশক্তি রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে) তার জন্য সাক্ষীস্বরূপ। ওয়াস্‌সালাম (মকতুবাতে মাসুমিয়া ১৮৩)।

হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম আরো লিখেছেন— হজরত মোজাদ্দেদ র. শেষ অসুস্থতার সময় বলতেন, ইসরারে সালাত (নামাজের গুপ্তরহস্য), হাকিকাতুস সালাত (নামাজের বাস্তব স্বরূপ), বায়ানে সলাতুল আম্বিয়া আলাইহিস্ সালাম (আম্বিয়া কেরামের নামাজের স্বরূপ) এবং আকমালুল আউলিয়া (আউলিয়াগণের পূর্ণতা) এবং আম্বিয়া আ. গণের ওই সকল বিশেষত্ব অন্যদেরও অর্জিত হয়। আম্বিয়া আ.গণের চার অগ্রপথিক, যারা রসুলের পূর্ণ অনুসারী এবং ওই সকল বুজর্গদের শ্রেণীবিন্যাস এবং তাঁদের মর্যাদার পার্থক্য কেবল নৈকট্যলাভের স্তরের কারণেই ছিলো। এ সকল বুজর্গ হজরতগণের মধ্যে প্রথম শ্রেণী কোনটি? আম্বিয়া আ.গণ, যাদের কথা পাক কালামে এসেছে, সম্মিলিতভাবে তাঁরা কোন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী? সর্বশেষ রসুল স. যিনি দ্বীন ও দুনিয়ার সর্দার তাঁর বিশেষ মর্যাদা কী এবং তিনি ও অন্যান্য আম্বিয়া আলাইহিস্ সালামের সকল মাকামের মধ্যে কী পরিমাণ মাহাত্ম্য রয়েছে? এই সকল মর্যাদা ও মাকামের বিস্তৃতি থেকে বোঝা যায় যে, শুধু রসুলে আনওয়ার স. এর মধ্যস্থতা বা সঙ্গলাভ ও আনুগত্যের কারণেই এই সকল বুজর্গ এই মাকাম পর্যন্ত পৌঁছুতে পেরেছিলেন। তিনি নিজের মাকামের নির্ধারিত অবস্থার কথা ও তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও বলতেন। তিনি আমার মখদুম উস্তাদের (মোহাম্মদ সাঈদ) নেয়ামতপ্রাপ্তি সম্পর্কে এবং আমার মতো কদাকারের জন্য যে সকল শুভবার্তা শুনিয়েছিলেন, সেগুলোর সাথে সম্পর্কিত এমন হালের কথাও বর্ণনা করতেন যা জ্ঞান ও বিবেক অনুধাবনে অক্ষম। উপরোল্লেখিত সূক্ষ্ম বিষয়সমূহ বিশদ বিবরণের সাথেই সংশ্লিষ্ট, অথচ তা একান্তই গোপনীয়। এজন্য এ বিষয়ে খুব সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো (মকতুবাতে মাসুমিয়া প্রথম খণ্ড ১৮০)।

হজরত মোজাদ্দেদ র. বলেছেন, সাবেক্বীন (অগ্রগামী) দল যাদের সম্পর্কে পবিত্র কোরআন পাকে বলা হয়েছে 'ছুল্লাতুম মিনাল আউয়ালীনা ওয়া ক্বলীলুম মিনাল আখিরীন' (পূর্ববর্তীগণের মধ্য হতে বহুসংখ্যক এবং পরবর্তীগণের মধ্য হতে অল্পসংখ্যক, সূরা ওয়াকিয়া, আয়াত ১৩) আমার দৃষ্টিগোচর হলো। দেখলাম, আমিও ওই দলের অন্তর্ভুক্ত। আমার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্য আর এক ব্যক্তিকে (খাজা মোহাম্মদ মাসুমকে) সেখানে আমার সাথে পেয়েছি।

এভাবে মুতাশাবিহাতের গুপ্তরহস্য সম্পর্কে বলেছেন— মুতাশাবিহাত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মুআমালাত (আচরণিক বিষয়) এবং এটা জায়েয (বৈধ) যে, এক ব্যক্তির এক মরতবা অর্জিত হলো অথচ সে বিষয়ে তার কোনো জ্ঞান নেই। আমি আমার সাথে সংশ্লিষ্ট এক ব্যক্তির (মোহাম্মদ মাসুম র.) মধ্যে এ বিষয়টি প্রত্যক্ষ করেছি। তাহলে অন্যদের অবস্থা আর কী হবে?

সৌভাগ্য হলো বহু পর্দার অন্তরালে
পর্যবেক্ষণ করে দ্যাখো, কে তার সন্ধান পেলো।

খাজা মোহাম্মদ মাসুম র. লিখেছেন— হজরত মোজাদ্দেদ র. বলেছেন, দ্বীন দুনিয়ার সর্দার স. আপাদমস্তক সৃষ্টির বরকত (খামিরের মধ্যে) থেকে যা কিছু অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছিলো, তা থেকে তাঁর উম্মতের এক ব্যক্তিকে এক মহাসম্পদ দান করা হয়েছে এবং তার খামির ওই অতিরিক্ত মাটি থেকে প্রস্তুত করা হয়েছে। এ দিক দিয়ে ওই ব্যক্তিকে এসালাতের (মূল উদ্দেশ্যের প্রতি দৃঢ়তার) নেসবতের দ্বারা সৌন্দর্যমণ্ডিত করা হয়েছে। এর অবশিষ্ট অংশ থেকে এই ব্যক্তির মাটির খামিরের পর খুবই সামান্য কিছু মাটি বেঁচে গিয়েছিলো। তাই দিয়ে এই ব্যক্তির সম্পর্কযুক্ত খামির করা হলো এবং ওই পরিমাণ তিনিও এসালাতের অংশ পেলেন। 'ইন্না রব্বাকা ওয়াসিয়াল মাগফিরাত (নিঃসন্দেহে তোমার প্রভু প্রশস্ত ক্ষমাকারী)।

হজরত মাহ্দী মাওউদ আলাইহির রিজওয়ানের এসালাত (রসুল স. এর মাধ্যমে) নসীব হয়েছে হজরত ঈসা আ. এর মধ্যস্থতায় (মকতুবাতে মাসুমিয়া ১৯২)।

হজরত মোজাদ্দেদ র. হজরত খাজা মোহাম্মদ সাঈদ এবং হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুমকে বলেছেন, আমি তোমাদের দু'জনকে ক্রোধবৃত্তের (দায়রায়ে জালালের) বাইরে বের করে দিয়েছি, এখন তোমরা ঊর্ধ্বগমনের আকাঙ্ক্ষী হও (মকতুবাতে মাসুমিয়া প্রথম খণ্ড ৪৫)।

ওই দুই মখদুমজাদা সম্পর্কে আরো বলেছেন, আমি মুজিবুদ্ দাওয়াতের (দোয়া কবুলকারীর) দরবারে এই ফরিয়াদটি করেছি যে, যেনো তোমাদের দু'জনের বাদশাহ্র পক্ষ থেকে সান্নিধ্য ও অনুকম্পার প্রতিবন্ধক সৃষ্টি না হয় এবং তোমাদের দু'জনকে মসিবতের মধ্যে ফেলে দেওয়া না হয়। এ দোয়া কবুল করা হয়েছে। বাস্তবে সেরূপই ঘটেছিলো।

এখন এই পর্যায়ে হজরত মখদুমজাদার (মোহাম্মদ মাসুমের) কিছু বাণী ও অলৌকিক ঘটনা লেখা হচ্ছে। তাঁর মুআমালাত (আধ্যাত্মিক আচরণ) এবং মাকামসমূহ, যা হজরত মোজাদ্দেদ র. এর পবিত্র জীবদ্দশায় ঘটেছিলো এবং ওই গুপ্ত রহস্যাবলী, যা হজরতের দরবারে উপস্থাপন করা হয়েছিলো, তা তিনি

গোপনীয়তার কারণে বর্ণনা করেননি। কিন্তু কোনো কোনো বিষয় তাঁর দূরে থাকার সময়ে চিঠিতে উল্লেখ করেছিলেন (ওই সকল মকতুব তো সে রকমই, তাসাউফ তত্ত্বের সারবস্তুই যার সূচনা। আলেম ও আরেফদের সূক্ষ্মরহস্য হচ্ছে তার ভূমিকা এবং তার প্রত্যেকটি বাক্য সূক্ষ্মদর্শনের আঙটির পাথর তুল্য এবং তার প্রত্যেকটি অধ্যায় সূক্ষ্মতত্ত্বে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে যেনো মণি-মুক্তার ভাণ্ডার)। ওগুলোর মধ্য হতে কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে।

কুদসিয়্যাহ্ ১ঃ নগণ্য এই বান্দা মোহাম্মদ মাসুম হজরতের মহান দরবারে নিজেকে বিন্দু থেকেও অধিক অস্তিত্বহীন ভেবে বিনয়ের সাথে অবগত করছে যে, মহান হজরতের প্রদর্শিত পথে মারেফাত ও গুপ্ত রহস্যের সাথে একের পর এক স্তরে উপনীত হয়েছি। আমার মুআমালা সর্বনিম্ন স্তর থেকে সর্বোন্নত পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে। ওই মকতুব, যা তিন তাজাল্লীর উপর নিবদ্ধ, তন্মধ্যে দুটিতে উপনীত হয়েছি। স্বীয় যোগ্যতা অনুযায়ী এই অধম এর থেকে উপকৃত হয়েছে এবং হৃদয়ঙ্গম করেছে। এরপর ওই মকতুব যা জ্যোর্তিময় মারেফাতের সাথে সংশ্লিষ্ট তা বক্ষে ধারণ করেছে। ওই পবিত্র পত্র পাঠ করে অবিমিশ্র নূর সম্পর্কে জানতে পেরেছি। তা থেকে ফানা ও বাকাও উপলব্ধিতে এসেছে। এর মধ্যে দীর্ঘকাল পর্যন্ত নিমজ্জিতও রয়েছি। মহাপ্রশান্ত হজরত! মহান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের কথা কী আর লিখবো, তাঁর এহসান কীভাবে বর্ণনা করবো। আমাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হলো কিন্তু এই অধম জানে না তাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কিন্তু এ মাকামে যে আস্বাদপ্রাপ্ত হচ্ছি তা বর্ণনাতীত। এ অবস্থার সম্পর্ক আস্বাদনের সঙ্গে, বর্ণনার সঙ্গে নয়।

মহান আল্লাহ্ তাঁর মহান তাওয়াজ্জোহের প্রতিপালনের মাধ্যমে এলেম ও বিশেষ কামালত দান করুন। 'রব্বী জিদ্‌নী ইলমা (হে প্রভু! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও)।

কুদসিয়্যাহ্ ২ঃ ১০৪১ হিজরীর তৃতীয় শাবান আসর নামাজের মধ্যে এক বসতে আজীম (বিশাল অবিমিশ্র হাল) প্রকাশিত হলো। উচ্চ মনজিল এবং বিস্ময়কর এমন হালের আবির্ভাব হলো যে, ইতোপূর্বে কখনো প্রকাশিত হয়নি। এমন কি তা ধারণা ও চিন্তাজগতেরও বহির্ভূত ছিলো। এমন বিষয়ের অবতারণা হলো যে, বলা যেতে পারে কোনো চক্ষু তা দেখেনি এবং কোনো কান তা শ্রবণ করেনি এবং যা ভাষা ব্যক্ত করতে পারে না। কলম দ্বারা লিপিবদ্ধ করা যায় না।

হাফেজের এহেন ফরিয়াদ নয় অহেতুক
ঘটনা অসাধারণ বিস্ময়কর ও বেদনাবিধুর।

সম্ভবত এই মাকাম রাকেমুল হরূফ (পত্র-নবীশ) এর সাথে বিশেষায়িত ছিলো। কেনোনা ওই দরবারে তিনি নিজেকে সঙ্গীহীন পেয়েছেন। কলেমা

তাইয়্যেবার সমষ্টি এবং জিকিরের শব্দসমূহ যেমন 'সুবহানাল্লাহ্' 'আলহামদুলিল্লাহ্' 'আল্লাহু আকবর' ওই পবিত্র দরবারে ঠাঁই পায় না। স্থানের সংকুলান হলে পাক কোরআনে হবে। আর কোরআন পাকের কারণে নামাজেরও ঠাঁই হবে। নামাজ এবং কোরআন ব্যতীত সেই মহান সম্পর্কযুক্ত প্রেমাস্পদের দরবারে কোনো আমল ফলপ্রসূ নয়। এমনই মনে হচ্ছে যে, কোনো রেয়াজত এবং মোজাহাদা (সাধনা) সেখানে প্রবেশ করতে সক্ষম নয়। সেখানে শুধুই দৃষ্টি ও অনুগ্রহ। সেখানে অনুগ্রহই চাও, অন্য কিছু চেয়ো না। একথা সত্য যে রেয়াজত এবং মোজাহাদা বেলায়েতের নৈকট্যের শুরুতে আমল এবং প্রবেশাধিকার রাখে ওই সময় পর্যন্ত যখন মূল এবং মূলের মূল পর্যন্ত সায়ের হয়। নেক আমল অনেক উপকারী এবং এর পরিণতি ক্ষমাময় হয়। এর মাধ্যমে একজন সালেক উন্নতির দিকে ধাবিত হয়। এভাবে কলেমা তাইয়্যেবার বেদনা (যা, না অথবা হাঁ-বোধক) প্রতিবিম্ব থেকে মূলের মূল এর দিকে নিয়ে যায় এবং মূল থেকে মূলের দিকে ঊর্ধ্বারোহণ করে। কিন্তু যা কিছু উপরে আলোচনা করা হয়েছে, তা সবই নবুওয়াতের নৈকট্যের সাথে সম্পর্কিত। সেখানে মূলকে প্রতিবিম্বের ন্যায় পথিমধ্যেই ত্যাগ করা চাই। এর জন্য কঠিন রেয়াজত কোনো কাজে আসে না। বরং এই মাকাম পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য যথার্থই ক্ষমাপ্রাপ্তি এবং খাঁটি ভালোবাসার প্রয়োজন। এ মাকামের যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য তা হলো— এখানে কোনো অংশীদারিত্ব গ্রহণযোগ্য নয়। এ বিষয়ে যখন আরো বেশী মনোযোগী হলাম, তখন দেখলাম এই পথ অতিক্রম করে যারা এই মাকামে পৌঁছেছে, তাদের নিজস্ব একটা মাকাম রয়েছে, যেখানে এসালাতের (মূল উদ্দেশ্যের প্রতি দৃঢ়তার) দিক দিয়ে অন্য কারো প্রবেশাধিকার নেই। যদিও এই মাকামে উপনীত ব্যক্তির সংখ্যা খুবই কম। তাঁদের মধ্যে হজরত মোজাদ্দেদ র. কে দেখেছি। তাঁকে দেখেছি বিশাল মর্যাদা ও শান শওকতপূর্ণ অবস্থায়। জ্ঞান এবং চিন্তাশক্তি ওই মর্যাদাকে ধারণ করতে অক্ষম এবং কলমের ভাষা এবং ভাষার কলম দুই-ই এ সম্পর্কে বর্ণনা করতে অক্ষম ও অপারগ।

জানা প্রয়োজন যে, আলম (জগত) কে হক সুবহানাহুর প্রতিবিম্ব বা ছায়া মনে করা এবং এর দর্পণ মনে করা, তাঁকে কল্পনায় দেখা, প্রতিবিম্বের আকর্ষণকারী কামালতকে মূলের উপর ন্যস্ত করা এবং প্রতিবিম্বকে শূন্য ও আমিত্বহীন মনে করা, তারপর তাঁকে মূল কামালতের সাথে প্রতিষ্ঠিত পাওয়া— সবকিছুকে বেলায়েতের নৈকট্যর অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করি যা ছায়া বা প্রতিবিম্বকে মূলের সঙ্গে মিলিত করে। সালেক এরপর মূলকে প্রতিবিম্বের রঙে রঞ্জিত করে পথিমধ্যে ছেড়ে দেয় এবং তা পবিত্র মহান দরবারের নিকটে পৌঁছে যায়। তখন এ সকল বিষয়ে বা কাজে তার কোনো মধ্যস্থতা থাকে না। কল্পনা বা চিন্তাও

উপস্থিত হয় না। ওই স্থানে প্রতিবন্ধকে জানার উপযোগী বা প্রয়োজন মনে না করা এবং গুণাবলীকে মূলের দিকে ন্যস্ত করে নিজেকে বিলীন ও অস্তিত্বশূন্য দেখা হয় না। ওখানে বাকা এবং তার বাস্তবতা মূলের সাথে হয়ে যাওয়াও দর্শনীয় বিষয় নয়। এই মাকামে উপনীত হওয়ার রাস্তা ভিন্ন। এই রাস্তা থেকে ওই মাকামে উপনীত হওয়া খুবই দুষ্কর। ওখানে জামাল (সৌন্দর্য) এবং রেজা (সন্তুষ্টি) অধিক মাত্রায় বিকশিত হয়। এ জন্য এটাকে যদি কেন্দ্রীয় রাস্তা বা মূল প্রধান রাস্তা বলে উল্লেখ করা বা বিশ্লেষণ করা হয়, তাহলেও তা সঠিক হবে। 'আল ইলমু ইনদাল্লাহি সুবহানাহু' (জ্ঞান মহান পবিত্র সত্তা আল্লাহ্ থেকে)।

কুদসিয়্যাহ্ ৩ ঃ মহান দরবার থেকে দূরে অবস্থানকারী মোহাম্মদ মাসুম আপনার আলীশান দরবারে নিবেদন রাখছে যে, যে সৌন্দর্য ও কমনীয়তা কল্পনা ও চিন্তার মধ্যে আসে সে অনুগ্রহ আমানতস্বরূপ ছিলো। তা আমানত রক্ষকের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। এখন দোষ-ক্রটি ছাড়া কোনোকিছুই অবশিষ্ট নেই। দীর্ঘজীবী হোন হজরত! এই চিঠি লিপিবদ্ধ করার সময়কালে এক বিশেষ অবস্থা দৃশ্যমান হলো। দেখলাম, নাস্তি যা ছাড়া অন্য কোনো কিছুই প্রকাশিত ছিলো না— সবই বিলীন হয়ে গেলো। আর যে কামালত নিজের মূলের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছিলো তা দীপ্তিময় হতে থাকলো। ইত্যবসরে এক অলৌকিক বিষয় দৃশ্যমান হলো। দেখলাম, উদর পূর্ণ করে আহার করলাম। তাই স্বভাবে অস্থিরতা দেখা দিলো। তীব্র কষ্ট হতে লাগলো। এমনই মনে হতে লাগলো যে, প্রত্যেকটি শিরা-উপশিরা পিঠ থেকে নখের শিরা পর্যন্ত সংকুচিত হচ্ছে যেনো সবকিছু ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে। যখন অবকাশ হলো, তখন দেখলাম, নাস্তিকে পরিপূর্ণভাবে বের করে দেওয়া হয়েছে। ওই কামালত ব্যতীত, যা স্বীয় মূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে লাগলো এবং মূলের মূল এর মধ্যে গিয়ে মিলে গেলো। তিনি ওই দরবারের মধ্যে এসালাত (মূল উদ্দেশ্যের প্রতি দৃঢ়তা) এবং হকিকতের ভিত্তিতে বিকাশমান হয়ে আনুরূপ্যবিহীন, হাকিকী ইত্তেসাল (প্রকৃত মিলনত্ব) অর্জন করে নিলো। এ সময় আনা (উপস্থিত) নাস্তি থেকে পরিপূর্ণভাবে বের হয়ে ওই কামালতে গিয়ে মিলিত হলো। এ ক্ষেত্রে সংযোজন পেলাম এবং বিকাশের বিকাশস্থলের সঙ্গে এমন সম্পর্ক বিকশিত হলো, যেমন, সম্পর্ক হয় আলমে খালকের সঙ্গে আলমে আমরের। ইনফি আলি কামালত (লজ্জা বা অনুতাপের পূর্ণতা) এর সম্পর্ক এই মাকামেই বিকশিত হয়। অন্যান্য বিষয়াবলীও বিকশিত হয়েছে, যা লিখে প্রকাশ করা সম্ভব নয় (মকতুবাতে মাসুমিয়া প্রথম খণ্ড ৬)।

কুদসিয়্যাহ্ ৪ ঃ এই নগণ্য বান্দা মোহাম্মদ মাসুম আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে বিন্দুতুল্য। তার নিবেদন এই যে, এই ফকিরকে এরপর থেকে এ জগতের মধ্যে বিশেষ দরবারের নিচে নিয়ে যাওয়া হলো। ওই সম্পর্কের নিদর্শনকে যার সাথে উরুজের (ঊর্ধ্বারোহণের) সময় সম্পৃক্ত করে ধন্য করা হয়েছিলো তাকে নিজের

মধ্যে বিদ্যমান পেলাম। ডানে বামে সম্পর্কহীনতা, অপরিচিতি। ডান এবং বামের এই নেসবত (সম্পর্ক) থেকে খুব কমই প্রাপ্তি ঘটেছে। বরং সে যেনো কোনো সম্পর্কই রাখে না। এই নেসবত কেবল সাবেক্বীন (অগ্রগামী) দের সাথে সংশ্লিষ্ট। আসহাবে ইয়ামীন (ডানপন্থী) এবং আসহাবে ইয়াছ্‌ছার (বামপন্থী) যারা তারা এই কামাল (পূর্ণতা) থেকে কী-ইবা অর্জন করবে। প্রতিবিম্বধারী হজরতগণ সাধারণ মুমিনদের মতো এই জটিল বিষয় থেকে কীভাবে উপকৃত হবেন? মহব্বতে যাতিয়া (সত্তাসম্পৃক্ত ভালোবাসা) যেখানে প্রেমিককে কষ্ট দেওয়া তাঁর নেয়ামতের এই সম্পর্ক, ভালোবাসা বা প্রেম বৃদ্ধিকারী হয়ে থাকে— এ মাকামেই প্রতিষ্ঠিত হয়। যখন ওই সালেক নিজের আস্বাদন ও প্রেমের দিকে ধাবিত হয়, তখন সে বিনা দ্বিধায় ওই আস্বাদ ও মিষ্টতার স্বরূপ অনুধাবন করতে পারে। বরং মাহবুব কর্তৃক কষ্ট প্রদানের সময়ই ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। নেয়ামতপ্রাপ্তির সময়ে নয়। মাহবুবের দেওয়া ব্যথা-বিরহ এমন আনন্দদায়ক হয়, যা তার নেয়ামতপ্রাপ্তিতে হয় না। কেনোনা যাতপাকের ভালোবাসার আনন্দ প্রবৃত্তিগত আনন্দ থেকে পুত ও পবিত্র। ওই ভালোবাসাই অধিক পরিপূর্ণ হয়ে থাকে (মকতুবাতে মাসুমিয়া ৫)।

কুদসিয়াহ ৫ ঃ আমার মূল উদ্দেশ্য জয্‌বা (আকর্ষণ) এবং সুলুক (পথ পরিক্রমণ) ব্যতীত অন্য কিছু। তা আনফুস (আত্মভ্রমণ) ও আফাক (বহির্ভ্রমণ) থেকে ভিন্ন। ফানা (বিলীন) ও বাকা (স্থিতি) থেকে স্বতন্ত্র। তাজাল্লিয়াত (বিচ্ছুরণ) এবং জহুরাত (বিকাশমান) থেকে পৃথক। দুখুল ও খুরুজ (প্রবেশ এবং বাহির) থেকে দূরের কিছু। নিকটবর্তী ও দূরবর্তী একত্ববাদ ও মিলনতা, দর্শন ও দর্শিত, শব্দ ও অর্থ, জ্ঞান ও মূর্খতা, আধিক্য ও একক, নাম ও গুণ, আবদ্ধ ও সংযোজন, শুয়্যুন ও ই'তিবার (অবস্থা ও বিশ্বাস বা আস্থা), কল্পনা ও ধারণা ও অলৌকিকতা, মহান আল্লাহ্‌র তাজাল্লী ও গুণাবলীসহ অন্যান্য সকল কিছু থেকে ভিন্নতর। মূল প্রতিবিম্বের স্বরূপ এই মহান সম্পদ পথপ্রান্তে থেকে যাচ্ছে। ওই যাতপাক তার থেকে ওয়ারাউল ওয়ারা (ঊর্ধ্বের ঊর্ধ্বে) অতঃপর তা থেকেও ওয়ারাউল ওয়ারা বা তদুর্ধ্বে। কিন্তু এই দিরাইয়াত (সূক্ষ্ম তত্ত্ব) কুরব (নৈকট্য) এর পক্ষে নিতান্তই কল্পনার অগ্নিশিখাতুল্য। নৈকট্য লাভকারীদের পক্ষে এই সূক্ষ্মতত্ত্ব উদঘাটন জ্ঞান, অনুভূতি, চিন্তা ও কল্পনাবহির্ভূত। কেনোনা ফাহম (অনুধাবন) ও অহম (কল্পনা) নিজে কখনো নিজের অতি নিকটবর্তী বিষয়কে অনুধাবন করতে সক্ষম হয় না। সুতরাং ওই মহান আল্লাহ্ অজুদ (অস্তিত্ব) থেকে অধিক নিকটবর্তী এবং তার বিজদান (প্রাপ্তি) থেকে অনেক দূরে। (অজুদের মধ্যে অধিক নৈকট্য এবং প্রাপ্তিতে অনেক দূরে)। এই কামাল (পূর্ণতা) আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালামের কামালত এবং বেলায়েতের অন্তর্ভুক্ত। কেনোনা আউলিয়া কেরামের কামালত ও বেলায়েত তো কুরবের (নৈকট্যের) মর্তবার মধ্যে সীমাবদ্ধ। কুরবের প্রান্তে সম্মিলন বা একাত্বতা এবং দ্বিত্বতা উঠে যায়। এটাই হচ্ছে এই

বেলায়েতের শেষ প্রান্ত এবং আকরাবিয়াত (অধিক নৈকট্য) এর বিষয়টি ইত্তেহাদ (সম্মিলন) থেকে অনেক গভীরের। ইত্তেহাদের প্রস্থান হওয়া উচিৎ, যেনো আকরাবিয়াতের বিষয়টি উন্মোচিত হতে পারে। তুমি তো খেলেই না, তাহলে স্বাদ কেমন করে বুঝবে? (মকতুবাতে মাসুমিয়া ২০৫)।

কুদসিয়্যাহ্ ৬ ঃ প্রকৃত প্রেমাস্পদ সকল জল্পনা-কল্পনা, অনুধাবন ও চিন্তা-ভাবনার উর্ধ্বে। তাই ওই পবিত্র সত্তার পরিচয়প্রাপ্তি অসম্ভব। সকল জ্ঞান এখানে মূর্খতা। যখন তিনি দীপ্তিমান হন, তখন প্রেমিক বেচারা নিজেই অস্তিত্বহীন হয়ে যায়।

মেনে নিলাম আজ আমার বন্ধু হেথায়
দীদারের আশা উদ্দীপনা ও শক্তি তব কোথায়।

এজন্য আল্লাহ্ প্রত্যাশীদের তিনি ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। সে চরম সংকটের মধ্যেও তাঁকে ডাকবে এবং হতাশার মধ্যেই স্বস্তি উপলব্ধি করবে।

আশেকের ভাগ্যে তার পক্ষ থেকে
হতাশা বা জানবাজি রেখে বিনা দ্বিধায় তা মানতে হবে।

যদি অজুদে মাওহুবের (প্রকৃত অস্তিত্ব থেকে ক্ষমাপ্রাপ্তি) পরে তালেবকে (মুরিদকে) পুনরায় জ্ঞান ও উপলব্ধি প্রদান করা হয়, তাহলে সে নিজের যোগ্যতা ও প্রচেষ্টা অনুযায়ী নিজের মাতলুব (প্রাপ্তি)কে অর্জন করতে পারে এবং নিজের শক্তি ও উদ্দীপনা দ্বারা অতিদ্রুত চালিত হতে পারে। কেনোনা আবদ্ধকারী নিজেই চিন্তার কারণ। নিজেকে যদি সে সকল বন্দীত্ব থেকে মুক্তও করে নেয়, তবুও সে মুতলাকে হাকিকী (প্রকৃত উদ্দেশ্য) হতে পারে না। সুতরাং বঞ্চনাই তার নিত্য সঙ্গী। হতাশাই তার প্রাপ্তি।

নিত্যদিনের মিলন চাও কিন্তু থাকতে হবে প্রত্যাশা
বিরহীর রজনীর হয়না কভু প্রভাত।

বিরহী প্রেমিকের কোনো স্বস্তি নেই। কোনো স্থিরতাও নেই। বঞ্চনা ও বিরহের আগুনে তার হৃদয় সর্বক্ষণ জ্বলতে থাকে। বিচ্ছিন্নতার কাঁটার আঘাতে তার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে। যখন প্রেমিককুলের সর্দার স.ই চিন্তা, ব্যথা-বেদনায় পরিবেষ্টিত ছিলেন, তখন অন্যের ব্যাপারে আলোচনার অবকাশ আর কোথায়? জিলাল ও ই'তেবারের (প্রতিবিম্ব ও ধারণার) শান্তি কোনো শান্তি নয়। যে মূল যাতের প্রার্থী, সে এ সকল বিষয় বা কথা দ্বারা খুশি হতে পারে না।

চিন্তিত মনে যাবো আমি স্বীয় উদ্দেশ্য পানে
নেই তো কোনো বন্ধু আমার যতই বলুক লোকজনে।

কুদসিয়্যাহ্ ৭ ঃ যাত জাল্লা সুলতানুহুর পবিত্র নাম 'আল্লাহ্'— যার নামকরণের কারণ পাওয়া না যাওয়ার প্রতি তিনি নিজেই ইঙ্গিত করেছেন। মারেফাহ (নির্দিষ্টসূচক) এর লাম (আলিফলাম) ইলাহ শব্দের লাম এর সাথে মিলিত হয়ে এর মধ্যে সন্ধি করেছে এবং বস্তুহীন হয়ে গিয়েছে। আর এই 'আল্লাহ্' শব্দের লাম অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছে। সম্ভবত এক্ষেত্রে এ দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যখন মারেফাত এই যাত পাকের সাথেই সমাপ্ত হয়ে যায় এবং বিলীন ও ধবংস হয়ে যায়, তখন মা'রুফ (হক তায়ালা) ব্যতীত কোনোকিছুই অবশিষ্ট থাকে না। যখন মারেফাত-ই থাকলো না, তখন আরেফও নাস্তির সংগে মিশে গেলো। কেনোনা এলেম আলেমের সাথেই সংশ্লিষ্ট। এই এসেম মোবারক (আল্লাহ্) এর মধ্যে এমন সূক্ষ্ম দর্শন রয়েছে যে, বিশিষ্ট আলেমগণও এ বিষয়ে অজ্ঞ। যে তার হকিকত বা বাস্তব অবস্থা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি, সে তাঁর নামকরণ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে কীভাবে? নাম-ই যখন এরকম, তাহলে নামওয়ালা হবে কেমন! কেউ কেউ বলে থাকেন, এই এসেম (আল্লাহ্) সুরিয়ানী ভাষার শব্দ। আবার কেউ কেউ বলেন, শব্দটি আরবি শব্দ এবং আরবি ভাষার শব্দ হওয়ার ক্ষেত্রে কারো কারো মতে এটি অনুৎপন্ন শব্দ। কেউ কেউ বলেন, এটি মুশতাক (উৎপন্ন শব্দ)। যদি মুশতাক হয়, তাহলে, এটা বিশ্লেষণের মাধ্যমে জানা যায় না যে, এর মূল শব্দ 'আলাহ'র 'লাম' যবর এর সঙ্গে যা 'আবাদ' এর অর্থপ্রকাশক। অথবা ইলাহ শব্দের মধ্যে 'লাম' যের এর সঙ্গে, যার অর্থ তাহাইয়ার (বিস্ময়)। অথবা ইয়া আলিহুতু ইলা ফুলান শব্দ থেকে উৎপন্ন। আয় সাকানতু ইলাইহি (আমার উমুক ব্যক্তির সাথে শান্তি লাভ হয়েছে)। অথবা 'আলাহা' শব্দ থেকে উৎসারিত। যখন সে এমন কোনো বিষয়ে ভীতু হয়েছে, যা তার সামনে উপস্থিত। অথবা এসেছে 'ইয়া আলাহাল ফাসীলু' শব্দ থেকে। 'ইযা আওয়ালিআ বিউম্মিহী (অর্থাৎ যখন উটের বাচ্চা তার মা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, যখন সে তার মায়ের প্রতি আসক্ত হয়)। অথবা 'ওয়ালাহা' শব্দ থেকে এসেছে। যখন সে বিস্মিত এবং উন্মাদ হয়েছে এবং কোনো কোনো লোক বলেন, এর মূল শব্দ হলো 'লা-হা'। মূল শব্দ লাহা ইয়ালিহি লায়হান। যখন সে গোপন এবং দূর হয়ে যাবে। কোনো কোনো আলেম এমতো অভিমত পোষণ করেন যে, এই এসেম আলামে যাত। আবার কেউ বলেন, প্রকৃতপক্ষে এটি সিফাত বা গুণ, যা যাত তায়ালার উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে এবং এসমে আলামের বিধান অবলম্বন করেছে। যেমন 'আশশারইয়া'। মোট কথা, এই এসেমের দর্শন এবং এর বাস্তব স্বরূপকে না পাওয়াই নামকরণের সূক্ষ্ম দর্শন এবং এটা না পাওয়ারই একটি দলিল বা প্রমাণ।

আল্লাহ্ শব্দ দ্বারা করেছেন নিজের নামকরণ
জবানে উচ্চারণ করেন সবাই বিশেষ ও সাধারণ।

— (মকতুবাতে মাসুমিয়া ১ম খণ্ড ১৩)।

কুদসিয়্যাহ্ ৮ ঃ হামদ ও সালাতের পর প্রকাশ থাকে যে, এই নগণ্য ভগ্ন হৃদয়ের পক্ষ থেকে জ্ঞানী বন্ধুদের জন্য কিছু উপদেশ— চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করবেন। জানা প্রয়োজন, তাঁর সৃষ্টির উদ্দেশ্য এই যে, তারা আল্লাহ্তায়ালার পরিচয় লাভ করবে। এই মারেফাত বা পরিচয় লাভের জন্য যোগ্যতা অনুযায়ী প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক স্তর রয়েছে। পরস্পরের উপর পরস্পরের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। প্রত্যেকে এই বিষয়ে নিজের মারেফাত অনুযায়ী বক্তব্য দিয়েছেন। কিন্তু যে বিষয়টি সম্পর্কে এ সম্প্রদায়ের ঐকমত্য রয়েছে এবং একই ধারণা পোষণকারী এবং নৈকট্যের স্তরের মধ্যে যা আবশ্যক তা হলো, মারেফাত ফানা ব্যতীত মারুফের (সাধকের) মধ্যে সৃষ্টি হয় না।

যতোদিন ভবে হাসিল না হবে
নিজেকে করো বিলীন তবে সবার বড়কে পাবে।
বিশ্বাসের পথে তুমি নিজে বড় অন্তরায়
মাসআলা যা-ই বলো এ বিষয়ে একমত সবাই
দেখবে তুমি কিন্তু বলবে না তো কাউকে
চলার পথে থেকে না যাও কিন্তু তুমি কোথায় যে।

তোমাকে ধোকায় ফেলেছে, আমি তো নই। কিন্তু সচেতন হজরতবৃন্দের জন্য আবশ্যক যে, নিজের অর্জন এবং বর্তমানের আমলের উপর বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখা ও চিন্তা করা। যে ব্যক্তির ওই গোপন মারেফাত অর্জিত হয়, তার জীবন ধন্য। তার জন্য সুসংবাদ। তার উচিত ওই অর্জনকে অনর্জিত বিষয়ের মধ্যে ব্যয় করা বা ব্যবহার করা। আসল (মূল) কে জিল্ল (প্রতিবিম্ব) এর ন্যায় ছেড়ে দেওয়া। যাকে মারেফাতের পথপ্রদর্শন করা হয়নি, তাকে আল্লাহ্প্রেমের বেদনা এবং তার অমূল্য সম্পদের কোনো আস্বাদ ও চিন্তাভাবনা দেওয়া হয়নি। তার জন্য অনুতাপ। অতীব অনুতাপ। সে তার নিজের সৃষ্টির উদ্দেশ্যই জানতে পারেনি। যা তার কাঙ্ক্ষিত ছিলো, তা আকাঙ্ক্ষাতেই রয়ে গেলো। সে অন্য কাজে নিজেকে ব্যবহার করেছে এবং ওই পটভূমিই তৈরী করেছে, যার কুফল তার থেকে প্রত্যাশা করা হয়েছিলো। সে তার জীবনের মূল্যবান সময় অপ্রয়োজনীয় খাতেই ব্যয় করে ফেলেছে। নিজের অর্জনের উপকরণ ও যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও অবহেলায় সময় অতিবাহিত করেছে। বড়ই লজ্জার কথা যে, কাঙ্ক্ষিতের আহবান সত্ত্বেও স্বল্প সময়ের জীবনে সামান্য কিছুও অর্জন করলো না। কর্মক্ষেত্র দুনিয়া থেকে তার সফরের সামগ্রীও সংগ্রহ করলো না। শেষ বিচারের দিন মহান ইলাহীর সকাশে সে কোন্ মুখ নিয়ে দণ্ডায়মান হবে এবং কোন্ কৌশলে তার ওজর পেশ করবে। আল্লাহ্র ভালোবাসা থেকে দূরে থাকা ও বঞ্চনার কষ্ট দোজখের আযাব থেকেও নিকৃষ্ট। বিষয়টি এরকমই যেমন আল্লাহ্র নৈকট্য এবং তাঁর মিলনের স্বাদ,

জান্নাতপ্রাপ্তির স্বাদ থেকেও উৎকৃষ্ট। অধিক অনুতাপ ওই ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহ্‌র মহব্বত থেকে বিমুখ হয়। আর দুঃখ ও আক্ষেপ ওই ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহ্ থেকে দূরে থাকলো। পৃথিবীতে তো পুনরাগমন ঘটবে না। যে পৃথিবীতে অন্ধ থাকলো, সে পরকালেও অন্ধ থাকবে। পথভ্রষ্ট থাকবে। (সুরা বনী ইসরাইল) (মকতুবাতে মাসুমিয়া ১ম খণ্ড ৬৪, ১০২, ১৭৬)।

শংকিত আমি বন্ধু পানে কতোদিন রবে বন্ধুত্ব
হাশরের দিন পর্যন্ত আমি থাকবো চিন্তিত।

আমার মখদুম! বিব্রত করা সত্ত্বেও এই ফকির এতোটুকু তথ্য অবগত যে, সূচনাতেই এক মুষ্টি মাটির স্বভাবের মধ্যে একটি অর্থ উহ্য রাখা হয়েছে এবং এক মারেফাতকে গচ্ছিত রাখা হয়েছে। সে অর্থ মহান আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহে দৃশ্যমান। এ বিষয়ে তাঁর গুপ্ত অনুগ্রহ বা দান হালের অন্তর্ভুক্ত। এর চেয়ে অধিক কিছু বিশ্লেষণ করা যায় না। বিস্তারিত বিবরণ দানও সম্ভব নয়। বর্ণনাকারী তা ব্যক্ত করতে অক্ষম। শ্রবণকারীও অক্ষম শ্রবণে। এর কারণ হচ্ছে, এই বিষয়টি প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে আনুরূপ্যবিহীন আকর্ষণ, আসক্তি, অনুরাগ ও ভালোবাসা নিজের মধ্যে পাচ্ছিলাম। মখলুক থেকে আমার স্বভাব বিমুখ ছিলো। নীরবতা ও নির্জনতাই ছিলো পছন্দনীয়। আমি নিজে মনে মনে বলতাম—

নীরবতার প্রতি মোর এতো আকর্ষণ কেনো?
এখানে প্রাপ্তি কী? নির্জনতাই বা কেমন?

আমার একেবারেই জানা ছিলো না যে, ভালোবাসার গুপ্ত রহস্য কী? এবং আমি জানতাম না যে, এই অনুরাগ কোথাকার এবং এটা আমাকে কোন আকর্ষণের দিকে নিয়ে যাবে। বহুকাল পর্যন্ত এই হালই প্রবল ছিলো। কেবল এই বাসনাই ছিলো যে, এই ইশকের সাথে যা সম্পৃক্ত তা যেনো প্রকাশিত হয়ে যায়। আর যে কারণে হতাশা ও অস্থিরতা, তা-ও যেনো প্রকাশ পায়। ভালোবাসাকে পার্থিব সৌন্দর্যের দিকে ফিরানো হয়। তবুও রোগের কোনো উপশম হয় না। ওটা ছিলো এক মত্ততাপূর্ণ অবস্থা। অগ্নিশিখাসম প্রেমবাসনা ছিলো। জানা ছিলো না যে, এই মত্ততা বা পাগলপ্রায় অবস্থায় বাতাস নিক্ষেপকারী কে ছিলো? আগুনের প্রবাহ কিসের জন্য? আমি অশান্ত ছিলাম এবং নিজে নিজে অনেক প্রেমোন্মাদনামূলক কবিতা পড়তাম। একদিন আমি আসল কথার দিকে ফিরে আসি। এক বিশেষ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর এই গুপ্তরহস্যের হাল উন্মুক্ত হলো। পূর্বের বিষয়টি পরিপূর্ণভাবে স্পষ্ট হলো। বুঝতে পারলাম, এই ভালোবাসা সম্পর্ক কার সাথে। আর আসক্তি কোথায় ও কার জন্য? অর্থাৎ মাহবুবের প্রকৃতরূপ যখন বিকশিত হলো, তখন চূড়ান্ত পর্যায়ের সৌন্দর্য এবং কমনীয়তা ও আকর্ষণের সাথে উচ্চ মরতবায় উন্নীত হলো। তখন এর থেকে আরো অধিক

সৌন্দর্য ও কমনীয়তা অনুভূত হতে পারে না। বরং এই সম্মানিত পদ এতোই সুন্দর যে, ওই সৌন্দর্য ও সুশ্রীতার প্রয়োগ মহান দরবারের ক্ষেত্রে শোভনীয় নয়। সুতরাং কথিত সৌন্দর্য ও পূর্ণতা এই মহান দরবারের তুলনায় যোগ্যতাই রাখে না। পৃথিবীতে যে পূর্ণতা রয়েছে, তা হচ্ছে ওই কামাল বা পূর্ণতার আছর (প্রভাব) বা প্রতিবিম্ব বা নমুনা। এখানে যা কিছু সৌন্দর্য ও কমনীয়তা দৃশ্যমান হয়, তা হলো ওই সৌন্দর্য ও কমনীয়তার এক নমুনা বা নিদর্শন মাত্র। এ ক্ষেত্রে বিশ্বাস হলো যে, মাহবুবী (প্রেমাষ্পদত্ব) একমাত্র তাঁরই জন্য শোভনীয় এবং মতলুবী (বাঞ্ছিত) হওয়ার জন্য তিনিই উপযুক্ত। সুতরাং সকল দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কেবল তাঁর খেদমতের বাগিচার দিকে মুখ ফেরানো উচিত। অত্যন্ত সাহস ও দৃঢ়তার সাথে এমনভাবে কোমরকে মজবুত করে বাঁধতে হবে, যেনো কোনো শক্তিই তাঁর মুখ বাগিচার দিক থেকে অন্য দিকে ফিরিয়ে না নিয়ে যেতে পারে। প্রকৃত বিষয় এই যে, কোনো খেদমতই এই মহান দরবারের জন্য উপযোগী নয়। তাঁর বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ ব্যতীত কোনো প্রচেষ্টা সফল হবে না। তাঁর অনুগ্রহই মুখ্য। এটাই মূল কথা। তাঁর প্রতি আসক্তি বা আকর্ষণ প্রয়োজন, আর কিছু নয়। এরপর স্থায়ী অনুগ্রহ এসে গেলো এবং তিনি দয়া করে এই অকর্মণ্যকে কৃপা দান করলেন। তাঁর মহানুভবতা ও অপার অনুগ্রহে এই পতিত মাটিকে তাঁর পবিত্র দরবারে স্থান দিলেন। ওই গুপ্ত রহস্য ও গোপন ইঙ্গিত নূরে বারেগাহের মধ্যে প্রকাশিত ও উন্মুক্ত হলো। খুবই উজ্জ্বলতার সাথে আকাঙ্ক্ষার পুষ্পোদ্যানে স্থায়ী আশ্রয় লাভ হলো। এক কদম চিত্তাকর্ষকভাবে ওঠাই, অন্য কদম উৎসর্গের সাথে রাখি। নিতান্তই প্রফুল্লতার সাথে মিলনের সুবাসে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আছি। বান্দা ও গোলাম হওয়া সত্ত্বেও সে সার্বক্ষণিক মাথা লুটিয়ে মত্ততার মধ্যে রয়েছে। এখন যদি সে নিজেই আমার অনুরাগ হয়ে যায়, তাহলে তাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে। কেনোনা মাহবুবই তাকে অনুগ্রহ করেছে। আর যদি সে ওই সৌন্দর্যের প্রণয়াসক্ত হয়ে যায়, তাহলেও তা গ্রহণীয়। কেনোনা এখন সে তার মাতলুবের (বাঞ্ছিতজনের) সুনজরের মধ্যে রয়েছে। হে স্নেহবর! এই সুঘ্রাণদাতা যার সুবাসে সুবাসিত হয়, এই নাপাক শরীরের সাথে তার কী-ই বা সম্পর্ক হতে পারে। তার উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন রুহানিয়াতকে এই মাটির ছবির সাথে (যে অসহায় এলোমেলো, বিদেশী মিসকীনও বটে, স্বীয় প্রেমিক থেকে পিছলে গিয়েছে এবং শত্রুর দেশে বন্দী) কী-ই বা সামঞ্জস্য রাখতে পারে? এ তো মূল উপাদানসম্ভূত এক ছবি, যা চিন্তা-আক্ষেপের অরণ্যমধ্যে চিন্তান্বিত অবস্থায় ঘূর্ণায়মান। যার হৃদয় চিন্তাক্লিষ্ট এবং কেশরাজি বিক্ষিপ্ত। বিরহ-ব্যথা চতুর্দিক থেকে তাকে আঘাত করে যাচ্ছে। অন্তরায়সমূহ ঢেকে ফেলেছে তার পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে। ওই আওয়াজদাতা আওয়াজের কৌশলে অক্ষম হয়ে আবেগ ও আকর্ষণ থেকে হাত গুটিয়ে বিস্বাদ ও উদাসীনতার

মধ্যে পড়ে গিয়েছে। সাহসের বাগিচা হাতছাড়া হতে চলেছে। সেবা করার সাহস হারিয়ে ফেলেছি এবং যারপরনাই চিন্তাক্লিষ্টতার কারণে শক্তিশূন্য হয়ে গিয়েছি। চিন্তার আধিক্যের কারণে কারো কাছে প্রশ্নও করতে পারিনি। যদিও আমার ওই গুপ্তরহস্য অর্জিত ছিলো। কিন্তু তা এক প্রেমিক নিয়ে নিয়েছে। তাই সে এই প্রার্থী থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছে। দু'জনের মধ্যে উপস্থিত হয়েছে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের ব্যবধান।

মাহবুব (প্রেমাস্পদ) ভালোবাসার মূল্যবান আসনে দীপ্তিমান হলেন এবং এই মূল উপাদানবিশিষ্ট ছবি ভাসমান মাটির আতঙ্কের মধ্যে বন্দী রয়েছে। সে তার উদ্দেশ্যের পক্ষে আনন্দিত। আর বজ্রাহত হওয়ার কারণে আক্ষেপের শোকে মত্ত এবং বিশেষভাবে বিলাপে এবং মিনতিতে লিপ্ত। সে অমূল্য সম্পদ এবং অনুগ্রহের মধ্যে লিপ্ত। মগ্ন হাজারো মিনতির সাথে প্রেমিকের গুপ্ত ভেদের অনুসন্ধানে। সে পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিজেই নিজের গুপ্তরহস্যের মধ্যে রয়েছে।

কুদসিয়্যাহ্ ৯ ঃ যখন একজন আরেফ মাকামসমূহে উপনীত হয়ে ঊর্ধ্বা-রোহণের শেষ স্তর পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, যা ওই আরেফের মাবদা তায়াইয়্যুনের এক আসল বিষয় এবং এসেমের জামেয়িয়াত (নিবদ্ধতা) অনুযায়ী তার মধ্যে জামেয়িয়াত হয় এবং যে পরিমাণ এসেম জামে (সমবেত) হয় এবং ওই পরিমাণ কারণও তদ্রূপ সমবেত হয়। কিন্তু 'জামে' কারণসমূহ থেকে উদ্ধার হওয়া পর্যন্ত পৌঁছানো ভিন্ন আর একটি বিষয়। এক কারণ থেকে যা জামে' হওয়ার কারণ থেকে ভাগ্যবান হওয়া আর এক বিষয়। বিষয়টি সচেতন ব্যক্তিদের কাছে গোপন নয়।

আরেফের ব্যাপারটি মূল থেকে এবং মূলের মূল থেকে অগ্রগামী হয়। কিন্তু সে তার এসেম অনুযায়ী যে তার প্রভুপালক, পুন্যবানকে নিজের সাথে নিয়ে যায় এবং সকল শ্রেষ্ঠত্ব থেকে সৌভাগ্যবান হয় না। প্রথম প্রাপ্তি বা উদ্ধারের স্থানে এই কারণকে সকল কারণের মধ্যে বিলীন পেয়ে কোনো পার্থক্য বা বিশেষত্ব দেখতে পায় না। অথচ বাস্তবতার মধ্যে তা ভিন্ন বা পৃথক। যখন এই মাকামের পরিপূর্ণ স্থিতি পাবে এবং দৃষ্টিতে এককত্ব পরিদৃশ্যমান হবে, তখন এই পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারবে। যখন এই মারেফাত অর্জিত হয়েছে, তখন আর এক ভিন্ন মারেফাত যা আরো অধিকতর সূক্ষ্ম ও বিস্ময়কর তা-ও অর্জিত হবে। আর তা হচ্ছে— কোনো কোনো কামেলীন (পূর্ণতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি) এমন রয়েছেন যে, সকল উপায় অবলম্বন থেকে তার অংশপ্রাপ্তি হয়। তার স্পষ্টতা বা বিস্তৃতি এই যে, এই উপায় (এসেমওয়ালা)কে অন্য কারণের সাথে একই রকম সাদৃশ্য বা সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। তাই আরেফ এই সংশ্লিষ্টতার কারণে সকল কারণ বা উপায় থেকে চিহ্নপ্রাপ্ত হবে। কেনোনা মূলের সংগে শাখার রয়েছে গভীর সম্পর্ক।

প্রশ্ন ঃ যখন যার সাথে সংশ্লিষ্টতা এবং যার সাথে পৃথকীকরণের বিন্যাস থেকে মূল বিষয়ের উৎপত্তি এবং প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যও যখন পৃথক, তাহলে কী এটা সম্ভব যে, আরেফ পৃথকীকরণের বিনিময়ে সকল অজুহ বা কারণসমূহ থেকে অংশ নিতে পারবে?

উত্তর ঃ যেহেতু সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে পৃথকীকরণের উপর বিশ্বাস আসা আবেদন বা অনুনয়ের দিক দিয়ে, জিনস (বস্তু) বিশেষ করে তার রকম প্রকার ও যাতের মধ্যে ফুসুলের (বিন্যাসের) জন্যই সাধারণভাবে আবেদন বা অনুনয় হয়ে থাকে। তাই সে পৃথকীকরণের বিষয় থেকেও পূর্ণ অংশ নিয়ে নিবে। সাধারণ আবেদন বা অনুনয়ের মাধ্যমে এর এককে পৌঁছে যাবে এবং যাত তায়ালার কারণসমূহ বা উপায় থেকে ব্যাপকভাবে অংশপ্রাপ্ত হবে। তার কামালত থেকেও অংশ পেতে পারবে যা মানবকুলের সম্ভাব্য প্রাপ্য। খতামুল আম্বিয়া আলাইহিস্ সালাত ওয়া তাসলীমের অসিলায় এই মারেফাত আম্বিয়া আলাইহিস সালামের পরে হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. এর বিশেষ মারেফাত ও কামালতের অন্তর্ভুক্ত।

কুদসিয়্যাহ্ ১০ ঃ হামদ ও সালাতের পরে নিবেদন এই যে, বিদ্যমান হাল কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অনুকূলে। মহান আল্লাহ্র দরবার থেকে নিরাপত্তা, দৃঢ়তা এবং নৈকট্যের স্তরে মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমনকি তিনি বেলায়েতের ধাপ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছেন। অতঃপর সেখান থেকে ওয়ারিশ (উত্তরাধিকার) জ্ঞান পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য এবং কামালতে নবুওয়াতের অংশপ্রাপ্তি পর্যন্ত। অতঃপর সেখান থেকে খতামুল আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সলাত্ ওয়াত্ তাস্লিমাতের মাকামের সংবাদ পাবার জন্য দোয়া করা হয়েছে, যেনো নফস পূর্ণমাত্রায় প্রশান্ত হয়ে যায়। যথাসম্ভব প্রশস্ত হয়ে যায় বক্ষ। বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন ঘটে। সুতরাং সে বন্ধুই যাতি ভালোবাসা থেকে অংশ পায় এবং ওই গোপন রহস্য থেকে মুনাফা অর্জন করে। সাহাবী হজরত আবু হুরায়রা রা. এর ভাষায় ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, যদি আমি এই সকল গোপন রহস্য তোমাদের প্রতি ফাঁস করে দেই, তাহলে আমার গলা কেটে দেয়া হবে। হাদিসটি নিম্নরূপ ঃ

"ক্বলা আবু হুরায়রাতা রা. হাফিজতু মির রসুলিল্লাহি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা উআম্মাইনে ফাআম্মা আহাদুহুমা ফাবাছাছতুহু ওয়া আম্মাল আখারু ফালাও বাছাছতুহু লা কুতিয়া হাযাল বুলউমি (মাজরাত তয়াম) (বোখারী শরীফ, কিতাবুল ইলম, বাবু হিফজুল ইলম)।

প্রকাশ থাকে যে, বেলায়েতে সোগরার কামালত লাভের জন্য বড় বিষয় হচ্ছে মোরাকাবা এবং কলবী জিকির। অর্থাৎ এসমে যাত এবং নফি এসবাতের জিকির। পরবর্তী দুই বেলায়েত (বেলায়েতে কোবরা এবং বেলায়েতে উলইয়া) লাভের জন্য নফি এসবাতের জিকির জবানের সাথে করা (জিহ্বা সঞ্চালন) এবং যে কামালত নবুয়াতের সাথে সম্পৃক্ত তা লাভের জন্য সাহায্যকারী হচ্ছে অধিক

কোরআন তেলাওয়াত করা এবং নামাজ পড়া, বিশেষ করে ফরজ নামাজগুলো যথাযথভাবে আদায় করা। এরপর ওই মাকাম আসে যেখানে কোনো আমল এবং বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্তির কোনো সুযোগ নেই। এই মাকামের অর্জন এবং তার উন্নতি নিছক অনুগ্রহ ও কৃপার উপর নির্ভরশীল। এই মাকামের দৃঢ়তা আম্বিয়া মুরসালীন আলাইহিস্ সালাম ওয়াল বরকাতের সাথে নির্ধারিত। অনুগামী হিসাবে অন্যদের জন্যও এই মাকামে অংশ রয়েছে। এরপর ওই কামাল (পূর্ণতা) আসে যার মধ্যে বদান্যতা থেকে মহব্বতের দিকে উন্নতি হয়। এই কামালের মধ্যে উন্নতি সাধন মহব্বতে ছেরফার (খাঁটি মহব্বতের) উপর নির্ভরশীল এবং মহব্বতের মধ্যে মুহিব্বিয়াত এবং মাহবুবিয়াত কামালের দুটি ধারা বিদ্যমান। সুতরাং মুহিব্বিয়াতে কামালতের বিকাশ, এসালাত (মূল উদ্দেশ্যের প্রতি দৃঢ়তা) এর ভিত্তিতে কলিম নবী মূসা আলাইহিস সালামের সাথে নির্ধারিত এবং মাহবুবিয়াতে যাতিয়ার কামালত (পূর্ণতা) প্রথমত হাবিবুল্লাহ আলাইহি ওয়াআলিহি আফজালুস্ সলাত্ ওয়া আকমালুত্ তাহিয়্যাতির সাথে নির্ধারিত। তারপর এই দুই মহব্বত (কলীম এবং হাবীব আলাইহিস্ সলাতু ওয়াস সালাম) এর তফীলের (প্রতিপালনে) মধ্যে অন্যদেরও এ দুই কামাল এর প্রত্যাশা রয়েছে। (মকতুবাতে মাসুমিয়া ১ম খণ্ড ১৩৭)।

কুদসিয়্যাহ্ ১১ ঃ একজন আরেফ পরিপূর্ণ ফানা হওয়ার পর হকিকাতে আদমিয়া (প্রকৃত নাস্তির) সাথে সম্পর্কিত হয় এবং আমিত্ব হয় প্রত্যাখ্যাত। যখন এসমে ইলাহী জাল্লা শানুহুর সংগে বাকা (স্থিতি) সৃষ্টি করে নেয় এবং হকিকতে আদমিয়ার (প্রকৃত নাস্তির) স্থানে হকিকতে ছুবুতিয়াহ (প্রকৃত স্থায়িত্ব) প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তখন ওই এসমে ইলাহী সালেকের জন্য উপদেশ হয়ে যায়। ওই সালেক এ এসেমের গুণে গুণান্বিত ও সজ্জিত হয়ে যায়। হায়াত (জীবন), এলেম (জ্ঞান), সামা (শ্রবণশক্তি), বাসার (দর্শনশক্তি), কালাম (বাকশক্তি), এরাদা (ইচ্ছাশক্তি) এবং কুদরত (ক্ষমতা) গুণে গুণান্বিত হয়ে হাই (জীবন্ত), আলেম (জ্ঞানী), কাদের (শক্তিশালী), সামী (শ্রবণকারী) বাসীর (দর্শনকারী) এবং মুতাকাল্লিম (কথোপকথোনকারী) হয়ে যায়। কেননা প্রত্যেক এসমে এলাহী (আল্লাহ্‌র নামসমূহ)ও গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত এবং এসেম (নাম) অন্যান্য এসেমের প্রতিবিম্ব এবং ওই এসেমের অংশসমূহের মধ্য হতে একটি অংশ। এজন্য জিল্লের (প্রতিবিম্বের) পথ থেকে ওই আরেফ আসলের (মূলের) সাথে মিশে যাবে। পূর্ববর্তী এসেমের মতো এসমে লাহেকের গুণে গুণান্বিত হয়ে যাবে। তারপর এই আসল (মূল) থেকে মূলের মূলে মিশে যাবে। এভাবে দ্বিতীয় আসল (মূল) থেকে তৃতীয় মূলে এবং তৃতীয় থেকে চতুর্থ এবং পঞ্চম পর্যন্ত মিলে যাবে। এর থেকে সামনে মহান আল্লাহ্ যে পর্যন্ত চান প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। যেহেতু প্রত্যেকটি এসেম অন্যান্য এসেমের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক বা সংশ্লিষ্টতা রাখে, তাই যার

সাথে সংশ্লিষ্টতা তার পথ থেকে অন্য আসমা (নামসমূহ) এর সাথেও এই এসমের মূলনীতি থেকে ভিন্ন বাকা অর্জন করে নিবে। এ সকল অগণিত ও অসংখ্য নাম আরেফদের অংশতুল্য হয়ে যাবে। এমন কি মহান যাত পাক পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। আল্লাহ্‌র নিয়ম বহমান। শতাব্দীর পরে হাজারো মানুষের মধ্য থেকে যে কোনো একজনকে যাতের বাকা থেকে ধন্য করে থাকেন। ওই পবিত্র মরতবা থেকে এই আরেফকে এক ও আনুরূপ্যহীন যাত থেকে কিছু প্রদান করা হয়, যা আরেফের বাস্তবতা ও মূল বিষয় এবং এর সকল গুণাবলীর সাথে প্রতিষ্ঠিত হয় (কেনোনা জগতের একক তার সামনে উপস্থিত হয়)। সুতরাং ওই জগতের একক তাঁর নামসমূহ ও গুণাবলীর বহিঃপ্রকাশ হয়। যাতের মধ্যে কার্যকারক হয় না। তাই ওই আরেফ প্রতিনিধিত্বের কারণে আলমের ক্বইয়্যুম (জগতের সংরক্ষক) হয়ে যায় এবং উপদেষ্টার মর্যাদা লাভ করে। “ফানা জুন ইলা আছারি রহমাতিল্লাহি কাইফা ইউহ্‌য়িল আরদ্বা বা’দা মাওতিহা’ (তুমি আল্লাহ্‌র রহমতের নিদর্শন অবলোকন করো তিনি কেমন করে ভূমিকে মৃতসদৃশ হওয়ার পর জীবিত করে থাকেন)।

এ সময় ওই যাত হকিকাতে ছুবুতিয়া (প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা) এর স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। উপদেষ্টা ও নির্বাহী হয়ে যায়। এখান থেকে ওই আরেফের জামেয়িয়্যাত (পূর্ণ একত্রতাকে) উপলব্ধি করা চাই যে, সকল জগতের একক তার তুলনায় তুচ্ছাংশেরও হুকুম রাখে না। যেনো বিন্দু একটি সাগরের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে। কিন্তু আলমের (জগতের) সাথে কোনো সম্পর্কই হয় না, যেমন গুণসমূহ তার সত্তার সাথে বস্তুহীন এবং বিনাশের সম্পর্ক হয় (সে-ও এরূপ হয়)। সুতরাং এই কামেল আরেফ জিকির করার সময় যেনো কয়েক হাজার জবান থেকে জিকির করে। প্রত্যেকটি এসেম স্বীয় জবানের সাথে জিকিরকারী হয়ে থাকে। আরেফ এই সকল ক্ষেত্রে যন্ত্রতুল্য হয়ে থাকে। যখন (নামাজের জন্য) তাহরীমা বাঁধে, তখন যেনো হাজারো ব্যক্তি তাহরীমা বাঁধে। এরপর সকল ব্যক্তি ক্বেরাত পাঠ করেন। রুকু করেন। সেজদায় যান এবং এই আলমে ইমকানের (সম্ভাব্য জগতের) অধিকাংশ রহস্যও এ সকল বিষয়ে আরেফের সঙ্গী হয়ে যায়। যারা শুধুমাত্র জবান দ্বারা জিকির করে, তারা নফসে আম্মারার আমিত্ব থেকে মুক্ত নয়। এ জন্য তাদের জিকির আল্লাহ্‌র পবিত্র দরবারের জন্য উপযোগী হয় না এবং তা তাদের দিকেই ফিরিয়ে দেওয়া হয়। আর এই আরেফ যেহেতু আমিত্ব থেকে মুক্ত, সে জন্য সে হাজারো জবান দ্বারা জিকির করে থাকে। আমিত্বের কোনো প্রতিবন্ধকতা তার মধ্যে নেই। বাহ্যিকভাবে সাধারণ লোকেরা এ দু’জনকেই জিকিরকারী ও আবেদ হিসেবে জেনে থাকে। কিন্তু প্রকৃত পার্থক্যের বিষয়ে তারা অবগত নন। এই আরেফের তো পূর্ণমাত্রায় হুজুরী (আল্লাহ্‌র উপস্থিতি) অর্জিত হয়েছে এবং সে উদাসীনতার মধ্যেও হাজের (উপস্থিত)। কেনোনা এলমে হুজুরীর (উপস্থিতি জ্ঞানের) মধ্যে কখনো

উদাসীনতা পাওয়া যায় না। উদাসীন লোকেরা এ সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সুতরাং ওই আরেফ উদাসীনতার মধ্যে হুজুরীর যোগ্যতা রাখে। আর লোকেরা তো দৃশ্যমান হুজুরীর মধ্যে উদাসীন ও দূরবর্তী যেমন উপরে বর্ণিত হয়েছে। তার এই হুজুরি হুছুলের (প্রাপ্তির) কারণে এবং হুছুল (প্রাপ্তি) হচ্ছে দৃশ্যমান উদাসীনতা। সুতরাং সাধারণ লোকেরা তাকে হাজের (উপস্থিত) এবং জিকিরকারী মনে করে এবং ওই আরেফকে উদাসীন মনে করে। আল্লাহ্ তাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন।

পরী গুপ্ত রয়েছে কিন্তু দর্শিলো উন্মাদ
এ কেমন বিস্ময় যে জ্ঞান বিবেক হলো পেরেশান

জয্বা জগতের আরেকটি সূক্ষ্ম বিষয় হচ্ছে আরেফ যখন নিজে আনা (আমিত্ব) শব্দ এর প্রয়োগ থেকে নিজেকে পবিত্র ও মুক্ত করে নেয় এবং নফসে আম্মারা থেকে পরিপূর্ণভাবে মুক্তি লাভ করে, তখন— 'হাল জাযাউল ইহ্সানে ইল্লাল ইহসান' (ইহসানের বিনিময় ইহসান ছাড়া অন্য কিছু কি হতে পারে?) এই আয়াতের বাস্তবতায় স্বয়ং মাহবুবের ইহসান এসে পৌঁছায়। তখন এই পথ-অন্বেষীকে স্বীয় আনা (আমিত্বে) স্থান দেয়। আর ওই সত্য প্রেমিক, অন্য সব কিছুর আকর্ষণ থেকে মুক্ত হয়ে মাহবুবের আনার (আমিত্বের) প্রেম দরবারের মধ্যে প্রশান্তি অর্জন করে। এই সম্প্রদায়ের একদল এমনও রয়েছে যে, মাহবুবকে স্বীয় আনা (আমিত্বের) নির্জন প্রান্তরে স্থান দিতে চায় এবং সে এ ধরনের ইচ্ছায় আনন্দিতও। কিন্তু তারা জানে না যে, তারা তো মাহবুবের একটি প্রতিবিম্বের মধ্যে প্রশান্তি অর্জন করেছে এবং ওই আনুরূপ্যবিহীনতা থেকে একটি নিদর্শন ব্যতীত অন্য কিছু অর্জন করেনি। এখন আমি আসল কথায় ফিরে আসি। আরেফে কামেলকে যে যাত (অস্তিত্ব) দান করা হয়েছে, তা যেহেতু আকারহীন দ্বারা ঐশ্বর্যমণ্ডিত, তাই তার একত্রতা বা সমষ্টি কেমন করে মখলুকের দৃষ্টিগোচর হতে পারে? কিন্তু সে বাস্তবতার মধ্যে সকল এসেম ও সিফাত এর দিক দিয়ে আরেফের অংশতুল্য হয়ে গিয়েছে। অধিক একত্রকারী বরং ওই জামিয়িয়্যাত (সমষ্টি) এর সঙ্গে এই জামিয়িয়্যাতের কোনো কিছুরই সম্পর্ক নেই। তাঁর তুলনায় লা শাই (কিছু না) এরই হুকুম রাখে। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী! কেমন বিশাল সাম্রাজ্য এক নিকৃষ্ট মানুষের মধ্যে গচ্ছিত রেখেছেন এবং মুলকে মালাকুতের এ সকল ধনভাণ্ডার ও অমূল্য সম্পদ নিকৃষ্টতার মধ্যে অর্জন করেছেন। এ সকল রঙহীন সৌন্দর্য ও কমনীয়তা এবং আনুরূপ্যবিহীন নূর এবং গুপ্ত রহস্য এই কৃষ্ণকায় প্রতিচ্ছবির মধ্যে সংরক্ষিত করে দিয়েছেন— যা সৃষ্ট হয়েছে নিকৃষ্ট ও নাপাক পানি দ্বারা। 'ওয়ালা যালিকা আলাল্লাহি বিআযীয' (এবং এটা আল্লাহ্র কাছে কঠিন কিছু নয়) এই সূক্ষ্ম হেকমত যাচাই বা পরীক্ষাস্বরূপ। 'হাত্তা ইয়ামিযাল খবীছু মিনাত্ ত্বাইয়্যেবে' (যেনো নাপাককে পাক থেকে পৃথক করে)।

যে ব্যক্তির দৃষ্টি আরেফের বাতেনী ও প্রকৃত অবস্থার মধ্যে নিক্ষেপ করেছে, সে তার বরকত থেকে খুবই সতেজতা অবলম্বন করেছে এবং যে তার বাহ্যিক অবস্থা দেখেছে এবং নিজের অবাস্তব অবস্থার উপর অনুমান করেছে সে তার বরকত থেকে বঞ্চিত হয়েছে। স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সে জানে না যে, এই আরেফে কামেল মস্তিষ্কেরই মজ্জাস্বরূপ। কোনোকিছুই তার মধ্যে প্রতিবন্ধক নয়। বরং তার ছাল-বাকল ও মজ্জায় পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে এবং সাধারণ লোকেরা তার তুলনায় যথার্থই ছালস্বরূপ যা মগজশূন্য। কিন্তু এই আরেফের পরিবর্তিত ছালকে ছালবিশিষ্ট দেহের উপর অবশিষ্ট ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তাই সে সর্বদাই এক মজ্জাহীন ছালের সাথে বাহ্যিকভাবে সম্পর্ক রাখে এবং এই প্রকাশ্য পারস্পরিক সম্পর্কের সাথে, যা দৈহিক আবদ্ধতার সাথে সম্পৃক্ত, যা দেহ ছিন্ন হওয়ার পর প্রতিবন্ধক সৃষ্টিকারীদের দৃষ্টিতে ধূলি নিক্ষেপ করে, এ জাতীয় বন্ধুকে সম্পর্কহীন রাখে। আওলিয়ায়ি তাহ্‌তা কুবায়ী লা ইয়া'রিফুহুম গয়রী (আমার আউলিয়া আমার পোশাকের নিচে, আমি ছাড়া তাদেরকে অন্য কেউ চিনতে পারে না)। 'কুল হাযিহী ছাবিলী ওয়াদউ ইলাল্লাহি আলা বাসীরাতিন আনা ওয়ামানিত্তাবাআনী ওয়া সুবহানাল্লাহি ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকীন' (আপনি বলে দিন যে, এটাই আমার রাস্তা, আমি আল্লাহ্‌র দিকে আহবান করছি। আমি ও আমার আনুগত্যকারীরা প্রকাশ্য দলিলের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং আল্লাহ্ পবিত্র এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই)।

কুদসিয়্যাহ্ ১২ ঃ যে আরেফে কামেল যাতি বাকা দ্বারা ধন্য হলো সে হকের সৌন্দর্য আলমের দর্পনের মধ্যে দর্শন করে। স্বীয় সত্তাকে বিস্তারিত এবং সংক্ষিপ্তভাবে দর্শন করে এবং আলম (জগত)কে স্বীয় বিকাশস্থল এবং স্বীয় সৌন্দর্যের বিশদতারূপে প্রাপ্ত হয়। আলমের সকল এককের মধ্যে স্বীয় যাতকে প্রবহমান দেখে। এভাবে পরিবেষ্টিত দেখে, যেমন পূর্ণ অংশ তার খণ্ডিত অংশকে পরিবেষ্টিত করে রাখে। যেমন যাত সিফাতকে পরিবেষ্টিত করে। সুতরাং তার জন্য যাত এবং তা ব্যতীত সিফাত বিকশিত। এটাই চূড়ান্ত পর্যায়ের কামেলীনদের মধ্য থেকে কোনো কোনো ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত, যা আনকা পাখির মতো অ-দৃষ্ট। হাজার বছর পরেও যদি এরূপ একজন আরেফ পাওয়া যায়, তাহলে সেটাকেই অমূল্য সম্পদ মনে করতে হবে।

যদি আসে সম্রাট স্বেচ্ছায় গৃহ অভ্যন্তরে
হে খাজা, তুমি কখনো চিন্তিত হয়ো না তার তরে।

কুদসিয়্যাহ্ ১৩ ঃ মহান আল্লাহ্‌র যে সকল অনুগ্রহ এই গুনাহ্গারের হালের মধ্যে বিদ্যমান সে সম্পর্কে কী-ই বা লেখা সম্ভব। 'গ্রহণযোগ্যতার শর্ত দেখবে কখন, ক্ষমার জন্য মাফ করে দাও।' যা কবুল হয়েছে, কারণ ছাড়াই তা কবুল হয়েছে। যদি এই দয়ার কথা বিস্তারিত লেখা হয়, তাহলে কলম তার শক্তি বহন

করতে পারবে না। কাগজ জ্বলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর বক্তা ও শ্রবণকারী হুঁশ হারাতে পারে। এরপরও কে বলবে এবং কে শুনবে। কোনো ব্যক্তি কতো সুন্দরই না বলেছেন—

আপাদমস্তক অগ্নি-আকাঙ্ক্ষা বলো কাউকে আরো ভরে দিতে—
নতুবা পাত্র নিজেই জ্বলে উঠবে, যখন চাইবে নিজে ভরতে।

তাঁর সূক্ষ্মতা, অনুগ্রহ এবং উচ্ছ্বসিত প্রশংসা রসনাকে নির্বাক করে দেয়। 'ওয়া ইয়াজিকু সদরী ওয়ালা ইয়ানতালিকু লিছানী' (আমার বক্ষ সংকুচিত হয়ে যায় এবং আমার জবান অচল হয়ে যায়)।

সুতরাং শ্রবণকারীর উচিত, যে বলছে তাকে বলা থেকে বিরত রাখা। এবং আমি জিনস (জাতি) হওয়ার কারণে তার যাতের পথ অন্বেষণ করি, যেনো তাঁর আকারবিহীন সত্তার সাথে সম্পৃক্ত হতে পারি, যদিও কথোপকথনকারীর যাত এবং শ্রবণকারীর যাতের মধ্যেবর্তী কোনো যাতিত্ব নেই। কেনোনা সে আকারবিহীন যাত থেকে অস্তিত্বপ্রাপ্ত। প্রকৃত যাতের সাথে এক প্রকার সংশ্লিষ্টতা ও এক বিশেষ সম্পর্ক সৃষ্টি করেছে। সুতরাং ওই সকল লোক, যারা যাতের মর্যাদা থেকে সাধারণত ভাগ্যবান নয় তারা এর যাত সম্পর্কে কীভাবে অবগত হতে পারে। আরেফের সৃষ্টিকর্তার যাত তো আরো অনেক উর্ধ্বের বিষয়। যাই হোক, সর্বাবস্থায় সাধনা করা চাই এবং সর্বদাই এমনিভাবে প্রেমের গান গেয়ে যাওয়া উচিত।

হে আল্লাহ্! সবকিছু থেকে তোমার মহব্বত আমাকে প্রিয় বানিয়ে দাও। সকল জিনিসের ভয় থেকে তোমার ভয় আমার মধ্যে সবচেয়ে বেশী বৃদ্ধি করে দাও। তোমার সাক্ষাতের বাসনার বিনিময়ে দুনিয়ার সকল প্রয়োজন থেকে আমাকে ছিন্ন করে দাও। যার চক্ষু দুনিয়ার সাজসজ্জায় প্রশান্তি পায়, তার থেকে তুমি আমার চক্ষুকে তোমার ইবাদতে প্রশান্ত করে দাও (মকতুবাতে মাসুমিয়া ১ম খণ্ড ১৬৩)।

কারামত ১ ঃ এ ফকির (বদরুদ্দীন সেরহিন্দী) একবার স্বপ্নের মধ্যে দেখলেন, খাজা মোহাম্মদ মাসুম এক দীপ্তিমান সম্রাটের আসনে উপবিষ্ট। তাঁর পবিত্র মস্তকের উপরে বিশাল এক চত্বর ছায়া দান করছে। সুখ্যাতিফলক ধরে রয়েছে এক খাদেম। ওই স্তরের বিশালতা সম্পর্কে কী আর বলবো। যেনো তা আসমানসদৃশ এবং সকল জগতকে পরিবেষ্টন করে আছে। ওই চত্বর মণি-মুক্তাখচিত এবং তার চতুর্দিকেও অসংখ্য মণি-মুক্তা ঝুলছে। ওই চত্বরের সৌন্দর্য বর্ণনার অযোগ্য।

তাঁর বিস্ময়কর ও অলৌকিক ঘটনাবলী কী আর বর্ণনা করবো! তিনি তো অভিজাত বংশদ্ভূত। তাঁর কারামত লেখার জন্য পৃথক গ্রন্থের প্রয়োজন। তাঁর

মুরিদগণ, পথপ্রাপ্তগণ এবং খলিফাবৃন্দের বর্ণনা থেকে অনেক আশ্চর্যজনক ও দুর্লভ ঘটনাবলী জানা যায়। অধিকাংশ বিস্ময়কর ঘটনাবলী তাঁর কারামতের প্রমাণ বহনকারী। এখানে তার মধ্য হতে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে—

কারামত ২ ঃ দ্বীনের শ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী এবং গুপ্ত রহস্যের তথ্য প্রদানকারী খাজা মোহাম্মদ সিদ্দীক যিনি তাঁর সুযোগ্য খলিফা ছিলেন, পেশোয়ারে তরিকা প্রচারের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন— আমি তাঁর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে পেশোয়ার থেকে খচ্চরে চড়ে রওনা হলাম। হঠাৎ খচ্চরটি রাস্তা থেকে ভিন্ন দিকে পালাতে লাগলো। লাগাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। কিন্তু আমার পদযুগল ছিলো রেকাবের মধ্যে। আমি টেনে হিঁচড়ে চলতে লাগলাম। কিছু লোক তাকে ধরার চেষ্টা করলো। কিন্তু পারলো না। হঠাৎ আমার অন্তরে আমার পীরের কথা স্মরণ হলো। দেখলাম, আমার পীর নিজে এসে খচ্চরের গতি রোধ করলেন। থামিয়ে দিলেন। রেকাব থেকে আমার পদযুগল পৃথক হয়ে গেলো। আমি ইচ্ছা করলাম, তাঁর কদমে লুটিয়ে পড়ি। কিন্তু তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

কারামত ৩ ঃ মোহাম্মদ সিদ্দীক র. বর্ণনা করেন, একবার আমি হজরতের দরবার থেকে বিদায় নিয়ে নিজ দেশে যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে সুলতানপুর নামক স্থানের একটি পুলের নিচে (নদীপথে) আমার কাপড় পাক করছিলাম। হঠাৎ আমার পা পিছলে গেলো। নদীতে পড়ে গেলাম। সাঁতার জানতাম না। উত্তাল ঢেউয়ের মধ্যে আমি নিমজ্জিত হতে লাগলাম। এমন সময় দেখলাম, হজরত উপস্থিত হয়ে আমার হাত ধরে পানি থেকে ওঠালেন। অতঃপর অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

কারামত ৪ ঃ তিনি এরকমও বর্ণনা করেছেন যে, হালের আধিক্যের কারণে একবার আমি একদিনের দূরত্বে এক জঙ্গলের দিকে চলে গেলাম। জঙ্গলটি ছিলো লোকালয় থেকে অনেক দূরে। আমার খুবই তৃষ্ণা পেলো। জীবন নাশের উপক্রম হলো। এমন সময় দেখলাম, তিনি দূর থেকে আসছেন। আমি অতি উৎফুল্য হয়ে তাঁর দিকে দৌড়ে গেলাম। কাছাকাছি পৌঁছে তাঁকে আর দেখতে পেলাম না। কিন্তু সেখানে একটি পানির হাউজ দেখতে পেলাম। আমি পানি পান করে পরিতৃপ্ত হলাম।

কারামত ৫ ঃ ওই একই ব্যক্তি বর্ণনা করেন, একবার আমার উপর 'সুলতানুল আজকার' জিকিরের হাল প্রবল হয়ে গেলো। সারাদিনই আমি জঙ্গলে অবস্থান করলাম। সেখানে জনমানবের বিচরণ ছিলো না। যেদিকেই তাকালাম, সেদিকেই দেখলাম তিনি হাজার হাজার চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এরকমই চললো। অতঃপর তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

কারামত ৬ ঃ মোহাম্মদ সিদ্দিক র. আরও বর্ণনা করেন, আমার একজন বিশিষ্ট ভক্ত, যিনি হজরতকে দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন, তিনি বর্ণনা করেন, আমি বিলের মধ্যে জ্বালানী কাঠ সাজিয়ে রাখছিলাম। এমন সময় ওই কাঠের বোঝা খাড়ি থেকে মাটিতে পড়ে গেলো। সেখানে এমন কেউ ছিলো না যে, ওই কাঠ সাজিয়ে রাখতে আমাকে সাহায্য করবে। আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম। এমন সময় দেখলাম, হজরত উপস্থিত হয়ে আমার কাঠের বোঝা সাজিয়ে দিলেন। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

কারামত ৭ ঃ হজরত র. এর এক খাদেম বর্ণনা করেন, একবার এক কর্মচারী বাড়ির মধ্য থেকে এসে বললেন, তিনি হজরত মোজাদ্দেদ র. এর রওজা মোবারকের পিছনে বসে আছেন। তাঁকে ডেকে নিয়ে আসুন। যখন আমি রওজা মোবারকের বেষ্টনির মধ্যে গেলাম, তখন তাঁর জুতা দরজার সামনে রাখা দেখলাম। আমি রওজা মোবারকের পিছনে গেলাম। সেখানে তাঁকে পেলাম না। চতুর্দিক খুব ভালো করে দেখলাম, কিন্তু কোথাও পেলাম না। পুনরায় রওজা মোবারকের পিছনে এসে দেখলাম তিনি মোরাকাবায় মগ্ন। আমি অবাক হয়ে গেলাম।

কারামত ৮ ঃ তাঁর এক মুরিদ বর্ণনা করেন, আমি মসজিদের পাশের হুজরায় বসেছিলাম। আমাকে একটি কাজের জন্য পাঠানো হয়েছিলো। যখন ফিরে এলাম, দেখলাম, হুজরার মধ্যে কেউ নেই। মসজিদের মধ্যে তাঁকে পাওয়া গেলো না। যখন বাইরে এলাম তখন তিনি হুজরার মধ্য থেকে আওয়াজ দিলেন, হে ওমুক! এখানে এসো। আমি বিস্ময়বিমুগ্ধ হয়ে গেলাম।

কারামত ৯ ঃ হজরতের মুরিদ এক বিত্তবান ব্যক্তি বর্ণনা করেন, আমি কিছু দিন পর্যন্ত আমার স্ত্রী থেকে পৃথক ছিলাম। ওই দিনগুলোতে আমি যেখানে ছিলাম, তার পাশের বাড়িতে এক মহিলা কণ্ঠশিল্পীও থাকতো। সে ছিলো সুন্দরী ও মনোহরা। এক রাতে পূর্ণ উন্মত্ততা এবং আত্মহারা অবস্থায় সে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলো। সে আমার উপর প্রাধান্য বিস্তার করলো। আমি কৌশলে তাকে এড়িয়ে যেতে লাগলাম। কিন্তু পারলাম না। ধমক ও তিরস্কারেও কোনো কাজ হলো না। সে আমার নফসের উপর প্রাধান্য বিস্তার করলো। আমি অনিচ্ছাকৃতভাবে তাকে সঙ্গদানের ইচ্ছা করলাম। সহসা দেখলাম, তিনি আমার এবং তার মধ্যে অন্তরায় হয়ে আছেন। এক সময় আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। যখন জেগে উঠলাম, তখনও আমার উপর ভীতি কাজ করছিলো। আমি উঠে দাঁড়ালাম এবং তওবা করলাম।

কারামত ১০ ঃ হজরতের একজন খালেস মুরিদ মাওলানা মোহাম্মদ মহসিন কাবেলী বর্ণনা করেন, তিনি রমজান মাসের শেষ দশকে এতেকাফে ছিলেন।

একদিন চাশতের সময় তাঁর দরবারে পৌঁছে দেখলাম, তিনি নিদ্রিত। আমার খেয়াল হলো আজ তিনি অভ্যাস বহির্ভূত অতিরিক্ত ঘুমাচ্ছেন। একথাও মনে হলো যে, এটি অলসতার নিদ্রা। এমন সময় তিনি বললেন—

স্বপ্ন মাঝে মিলনে তাঁকে দেখেছি
এখন বলো নিদ্রা উত্তম, না জাগরণ?
আমি খুবই লজ্জিত ও অপ্রস্তুত হলাম।

কারামত ১১ ঃ ওই ব্যক্তি আরো বর্ণনা করেন— তিনি একান্ত নির্জন পরিবেশে আমাকে নফী ইসবাত জিকিরের শিক্ষা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, কলেমা তাইয়্যেবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ নিজের অন্তরের মাধ্যমে পড়ো। তার পদ্ধতিও বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন যে, শব্দের অন্তর্নিহিত সত্তার প্রতি খেয়াল করো এভাবে যে, যাত পাক ব্যতীত আমার কোনো উদ্দেশ্য নেই। আমার মনে খেয়াল হলো, কলেমার অর্থ তো এটাই যে, 'উদ্দেশ্য নেই যাত পাক ব্যতীত'। 'কোনো' শব্দটি অতিরিক্ত। এ কথাটি কয়েকবার আমার অন্তরে উদিত হলো। কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করলাম না। তাঁর প্রতি আমার অন্তরের হাল প্রকাশিত হলো। তিনি বললেন, তুমি কী জানো না যে, অনির্দিষ্ট কালের না-সূচক ক্রিয়া সামনে থাকলে তা সাধারণ অর্থ প্রকাশ করে। হজরতের কথা শুনে আমার অন্তরের ওই সন্দেহটি দূর হয়ে গেলো। তাঁর প্রতি আমার আস্থা আরো বহুগুণ বেড়ে গেলো।

কারামত ১২ ঃ হাজী নুরুদ্দীন ছিলেন কঠোর রেয়াজতকারী ও বিশুদ্ধ সাধক। তিনি বর্ণনা করেন, আমি জিয়ারতে বায়তুল্লাহ্ ও রওজা মোবারক জিয়ারতের সফরে ছিলাম। ছিলাম জাহাজে আরোহণকারী। হঠাৎ ভয়ানক তুফান শুরু হলো। জাহাজ নিমজ্জিত হওয়ার উপক্রম হলো। ভীতসন্ত্রস্ত যাত্রীরা আহাজারী শুরু করে দিলো। জাহাজ হালকা করার জন্য লোকজন তাদের আসবাবপত্র সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে লাগলো। এমন সময় মখদুমজাদার কথা মনে হলো। দুই সাহেবজাদা খাজা মোহাম্মদ সাঈদ এবং খাজা মোহাম্মদ মাসুম র. দু'জনেই উপস্থিত হলেন। বললেন, মহব্বতের বন্ধন সুদৃঢ় করো। আমরা তোমাদের সাহায্যের জন্য পৌঁছেছি। ইনশাল্লাহ্ এই জাহাজ ডুববে না, আমার অন্তরে যখন এই সুসংবাদটি পৌঁছলো, তখন আমি জাহাজের যাত্রীদেরকে বললাম, আপনারা মালপত্র সমুদ্রে নিক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকুন। ইনশাল্লাহ্! এই জাহাজ ডুববে না। আমার পীর-মোর্শেদ এই সুসংবাদ দিয়েছেন। কিছু লোকের ধারণা ছিলো তুফান থেকে বাঁচার কোনো সম্ভাবনা নেই। আমার কথা তারা বিশ্বাস করলো না। একটু পরেই তুফান বন্ধ হয়ে গেলো। আবহাওয়া হয়ে গেলো স্বাভাবিক। লোকেরা আমার হজরতের প্রতি অধিক আস্থাবান হলো। আস্থাশীল হলো এ নগণ্যের প্রতিও। আমরা নিরাপদে গন্তব্যস্থানে পৌঁছে গেলাম।

হজরত খাজা মোহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া সাল্লামাল্লাহু তায়ালা।

তিনি ছিলেন হজরত মোজাদ্দেদ র. এর সর্বশেষ পুত্র। তিনি যখন কিশোর তখন হজরত মোজাদ্দেদ র. ইন্তেকাল করেন। হজরত মোজাদ্দেদ র. তাঁর প্রতি অত্যধিক স্নেহপরায়ণ ছিলেন।

খাজা মোহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া পবিত্র কোরআনের হেফজ শেষ করে ইলমে দ্বীন অর্জনের প্রতি আগ্রহী হলেন এবং অধিকাংশ আকলী এবং নকলী এলেম শিখলেন বড় ভাই খাজা মোহাম্মদ সাঈদ এবং খাজা মোহাম্মদ মাসুম সাল্লাহুমাল্লাহু তায়ালার কাছ থেকে। কুড়ি বছর বয়সের মধ্যে তিনি শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করেন। হাদিসশাস্ত্রে তিনি সূত্রসহ বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। ফেকাহ্ শাস্ত্রে বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। কিতাব পাঠদানে লিপ্ত হন। বিশেষ দক্ষতা ও যোগ্যতার সাথে শিক্ষার্থীদের উপকৃত করতে থাকেন। তিনি তরিকা আলীয়া নকশবন্দিয়া বড় ভাই খাজা মোহাম্মদ সাঈদ সাল্লামাল্লাহু থেকে অর্জন করেছিলেন এবং বাহ্যিক এলেম অর্জন সমাপ্তির পর পূর্ণ সুলুক স্বীয় ভ্রাতা খাজা মোহাম্মদ মাসুম র. এর সান্নিধ্যে লাভ করেন। তাঁর দুই ভ্রাতা থেকে খেলাফতপ্রাপ্ত হন। আত্মশুদ্ধি ও খোদাভীতি অর্জন, ইবাদত এবং অজিফা অনুশীলনে তিনি পূর্ণত্ব অর্জন করেছিলেন।

হজরত মোজাদ্দেদ র. তাঁর জন্মের পূর্বে এইমর্মে একটি শুভসংবাদ [১] পেয়েছিলেন, তাঁর একটি পুত্র সন্তান হবে। তাঁর নাম হবে ইয়াহ্ইয়া। এভাবে জন্মের পূর্বেই তাঁর নাম নির্ধারিত হয়েছিলো। হজরত শাহ কামাল কায়থলী র. এর পৌত্র হজরত শাহ্ সেকান্দার [২] র. যখন হজরত মোজাদ্দেদ র. এর বাড়িতে আগমন করেছিলেন তখন তিনি শিশু। শাহ্ সাহেব হজরত মোজাদ্দেদ র.কে বলেছিলেন, মিঞা আহমদ! আমাকে আপনার একটি পুত্র দান করুন। আমি তাকে প্রতিপালন করবো। সে আমার মতো দিওয়ানা হবে। মোজাদ্দেদ র. মোহাম্মদ ইয়াহ্ইয়াকে ডাকলেন। শাহ্ সেকান্দার নতুন কাননের কুসুম কলিটিকে নিজের কোলে বসিয়ে নিয়ে বললেন, এ তো আমার। তিনি তাঁকে অনেক আদর করলেন। তাঁর প্রতি বিশেষ তাওয়াজ্জোহ দিলেন। তাওয়াজ্জোহের প্রভাবে তাঁর চক্ষু মুদ্রিত হলো। আতংকের নিদর্শন প্রকাশিত হলো। তিনি বললেন, এই

১. 'রওজাতুল কাইয়্যুমিয়া' ৩১০ পৃষ্ঠায় রয়েছে এই আয়াতের শুভসংবাদ দেওয়া হয়েছিলো— 'ইন্না মুবাশ্শিরুকা বি গুলামিন ইসমুহু ইয়াহ্ইয়া (আমি তোমাকে এক পুত্রসন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি– যার নাম ইয়াহ্ইয়া।)

২. শাহ সিকান্দার র. ১০২৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, খাজা মোহাম্মদ ইয়াহ্ইয়ার জন্ম হয় ১০২৪ হিজরী সনে। কিন্তু যারা ১০২২ হিজরী সন বলেছেন, তাদের কথাই সঠিক। যুবদাতুল মাকামাত গ্রন্থে ১০৩৭ হিজরী উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৩১৩ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে যে, যখন তাঁর বয়স হয়েছিলো ১৫ বছর তখন তিনি মুতাওয়াল পড়ছিলেন। যদি তাঁর জন্মসাল ১০২৪ হিজরী মেনে নেয়া হয় তাহলে শাহ্ সিকান্দারের সঙ্গে কেমন করে সাক্ষাৎ হওয়া সম্ভব?

মখদুমজাদাকে শাহ্ বলবে। সুতরাং সে দিন থেকে তাঁকে শাহ্ মোহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া বলে ডাকা হয়। হজরত মোজাদ্দেদ র. মজলিস শেষে বললেন, সুবহানাল্লাহ্! আমার শিশুসন্তান অল্প বয়সে আউলিয়াদের যোগ্যতা অর্জন করে ধন্য* হয়েছে।

হজরত মোজাদ্দেদ র. সর্বদাই তাঁর সুমহান স্বভাব এবং বিশেষ যোগ্যতাবলীর বিবরণ দিতেন। তাঁর সম্পর্কে উচ্চ কামালত এবং বিশেষ মাকামের যে সকল সুসংবাদ তিনি দিয়েছিলেন, সেগুলো বাস্তবায়িত হয়েছিলো। একদিন খাজা মোহাম্মদ মাসুম র. এই মখদুমজাদা সম্পর্কে সুসংবাদপ্রাপ্ত কামালতের খবর ইঙ্গিত ও ইশারার দ্বারা দিয়েছিলেন। কোনো কোনো কামালতের কথা বাস্তবে প্রকাশও করেছিলেন।

হজরত মোজাদ্দেদ র. এর দু'টি বড় কারামত তিনি তাঁর দিনলিপিতে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। একটি হচ্ছে— তাঁর বাক্যের তুলনা মাশায়েখ ও আরেফগণ লিপিবদ্ধ করতে অসমর্থ ছিলেন। দ্বিতীয়টি হচ্ছে— তিনি তাঁর সন্তানদের স্বীয় পরিচর্যায় এলেম, আমল এবং বাতেনী কামালত এমনভাবে শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, পৃথিবীতে এর কোনো দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। অন্য কাউকে তিনি এভাবে প্রতিপালন করেননি। এই দু'টি কারামত পৃথিবীতে সূর্য অপেক্ষা অধিক প্রোজ্জ্বল। 'যালিকা ফাজলুল্লাহি ইউ'তিহী মাইঁইয়াশাউ ওয়াল্লাহু যুল ফাজলিল আজীম।' (এটি মহান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ— যাকে ইচ্ছা তাকে দান করেন এবং আল্লাহ্ বড়ই অনুগ্রহকারী)।

মোহাম্মদ ফররুখ, মোহাম্মদ ঈসা এবং উম্মে কুলসুম সাল্লামাল্লাহু তায়ালা আজমাইন

মোহাম্মদ ফররুখ, মোহাম্মদ ঈসা এবং উম্মে কুলসুমও হজরত মোজাদ্দেদ র. এর বুজর্গ সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁরা কম বয়সে ইন্তেকাল করেছিলেন এবং হজরত মোজাদ্দেদ র. নিজে তাঁদের কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করেন। প্লেগ মহামারীর সময় ১০২৫ হিজরীতে মোহাম্মদ ফররুখ এবং মোহাম্মদ ঈসা দু'জনই আক্রান্ত হন। চিকিৎসকের নিয়মানুসারে দু'জনকে পৃথক স্থানে রাখা হয়। মোহাম্মদ

* 'যুবদাতুল মাকামাত' নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায়, হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ র. এর বড় পুত্রের পুত্র খাজা মোহাম্মদ ইয়াহ্ইয়ার বিবাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এ-ও জানা যায় যে, তিনি তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে ১০৬৭ হিজরীতে হজ্ব পালন করেন। তিনি ১০৯৬ হিজরীর ২৭শে জমাদিয়াল উখরা সেরহিন্দ শরীফে ইন্তেকাল করেন। পৃথক গম্বুজের মধ্যে তাঁর কবর রয়েছে। হজরত মোজাদ্দেদ র. তাশাহুদের মধ্যে শাহাদাত আঙ্গুলী উঁচু করতেন না (ফরজ ব্যতীত অন্য নামাজে ইচ্ছামতো আঙুল উঁচু করতেন)। কিন্তু খাজা মোহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আঙুল উঠানোর পক্ষে একটি পুস্তিকা রচনা করেছিলেন।

ফররুখকে জামাতখানার হুজরার মধ্যে এবং মোহাম্মদ ঈসাকে বাড়ির মধ্যে। প্রথমে মোহাম্মদ ঈসার ইন্তেকাল হলো। লোকেরা বললো, মোহাম্মদ ফররুখকে সংবাদটি যেনো না দেওয়া হয়। কিন্তু দেখা গেলো মোহাম্মদ ফররুখ আপনাআপনি বলে উঠলেন, ভাই তুমি আমাকে একা রেখে চলে গেলে। পাটনার অধিবাসী মাওলানা আবদুল হাই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, বাবা! তুমি কার কথা বলছো? তিনি বললেন, মোহাম্মদ ঈসার কথা। তিনি তো আগেই বিদায় নিলেন। মাওলানা বললেন, তুমি কী করে জানলে। তিনি বললেন আমি দেখলাম, ফেরেশতারা তাঁকে গোসল দিচ্ছে। ওই দিনই সন্ধ্যার সময় মোহাম্মদ ফররুখ ইন্তেকাল করলেন। তারিখটি ছিলো ৭ই রবিউল আউয়াল ১০২৪ [১] হিজরী সন।

একদিন হজরত মোজাদ্দেদ র. হাফেজ সাহেব কর্তৃক সূরা ত্বা-হা শুনছিলেন। বললেন, আমি হজরত ঈসা আলানাবিয়্যিনা ওয়া আলাইহিস্ সলাতু ওয়াস্সালামকে দেখলাম। তিনি মজলিসে উপস্থিত হয়েছেন। আমি তাঁকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলাম। জানতে পারলাম, তাঁর থেকে এসেছে আমার বংশের [২] ধারা। এ সময় আমার উপর এলকা হলো, তোমার ঘরে একটি পুত্রসন্তান জন্ম নিবে। সে হবে নবী ঈসার কদমতলে। কয়েকদিন পর মোহাম্মদ ঈসা মায়ের পেটে এলেন। সঠিক সময়ে ভূমিষ্ঠ হলেন। হজরত মোজাদ্দেদ র. তাঁর নাম রাখলেন মোহাম্মদ ঈসা। যখন তাঁর বয়স মাত্র চার বছর, তখন থেকেই তাঁর স্বভাবে অলৌকিক ঘটনা প্রকাশিত হতে লাগলো। গর্ভবতী মহিলারা তাঁকে জিজ্ঞেস করতো, পুত্রসন্তান হবে, না কন্যাসন্তান? তিনি যেমন বলতেন, তদ্রূপই হতো। একদিন এক মহিলা মহিলাদের সমাবেশে বসে ছিলো। অন্যান্য মহিলারা বললো, মনে হয় পুত্রসন্তান হবে। চার বছর বয়সী মোহাম্মদ ঈসা বললেন, কন্যা সন্তান জন্ম নিবে। মহিলারা বললো, বাবা! মহিলারা তো অনুমান করে বলে থাকে, তুমি কেমন করে বলো? তিনি বললেন, আমি দেখতে পাই। তারা বললো কেমন করে? তিনি বললেন, যেমন আমি আপনাদেরকে দেখছি। যথাসময়ে ওই মহিলার কন্যাসন্তান জন্ম নিলো। মহিলারা উপহাস করে বলতে লাগলো মিঞাজি! মহিলার তো পুত্র সন্তান হয়েছে। তিনি বললেন, হতেই পারে না। আমি তো কন্যা সন্তানকে দেখেছি।

অন্য আরেকটি কারামত এরূপ ছিলো যে, মাওলানা আমানুল্লাহ বিবাহ করার জন্য সেরহিন্দ থেকে কয়েক মনজিল দূরে এক গ্রামে গিয়েছিলেন। সংবাদ পেলেন,

---

১. হাজ্‌রাতুল কুদুস গ্রন্থে হজরত ফররুখ র. এর ইন্তেকালের সন ১০২৪ হিজরী বলা হয়েছে। তথ্যটি সঠিক নয়। তার মৃত্যুর সন ১০২৫ হিজরী হওয়াই সঠিক।
২. যুবতাদুল মাকামাত ৩১২ পৃষ্ঠায় বংশ বিষয়ে কোনো কথা উল্লেখ নেই।

কন্যাপক্ষ বিবাহের জন্য প্রস্তুত নয়। কেনোনা তারা তাঁকে বিবাহের উপযুক্ত মনে করেন না। মাওলানা খুবই মনোক্ষুণ্ন হলেন। তিনি মোহাম্মদ ঈসার কাছে তাঁর দুঃখের কথা জানালেন। তিনি বললেন, মাওলানা আমানুল্লাহর বিবাহ ইনশাল্লাহ্ হবে। চিন্তার কোনো কারণ নেই। তাই হলো। অল্প কয়েকদিন পরেই তিনি সস্ত্রীক সেরহিন্দে আগমন করলেন।

খাজা মোহাম্মদ হাশেম বর্ণনা করেন, একদিন হজরত মোজাদ্দেদ র. জানানা নামক স্থানে আগমন করলেন। তাঁর কন্যা উম্মে কুলসুমের সাত বছর বয়স তখন। একদিন শিক্ষকের কাছ থেকে পড়ে এসে তিনি আক্ষেপ করলেন। বললেন, উহ্! আমি তোমাদের সকলকে আল্লাহ্র জিকির থেকে উদাসীন দেখতে পাচ্ছি। তিনি আরো বললেন, আপনি একদিন জনৈক মহিলাকে জিকিরের প্রশিক্ষণ দিলেন। আমিও সেখানে ছিলাম। ওই দিন থেকে আমার কলবে জিকির জারী হয়েছে। একটি মুহূর্তও আমার জিকিরবিহীন কাটে না। অন্যদের কলবের অবস্থা আমার কাছে গোপন থাকে না।

উল্লেখিত সনে ৮ই রবিউল আউয়াল দুই ছোট ভাইয়ের পরে তিনিও পৃথিবী ছেড়ে চলে যান।

একাদশ হাজ্‌রাত

হজরত মোজাদ্দেদ র. এর খলিফাবৃন্দ

১. মীর মোহাম্মদ নোমান র. [১]

হজরত মোজাদ্দেদ র. এর স্বনামধন্য খলিফাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তিনি। তাঁর বুজর্গ মাতার পিতা ছিলেন মীর শামসুদ্দীন বদখশানী। অনেকে তাঁকে মীর বযরক নামেও ডাকতেন। তিনি সম্ভ্রান্ত বংশ, আভিজাত্য, জ্ঞান, আল্লাহ্‌ভীতি, আল্লাহ্‌মগ্নতা এবং আত্মশুদ্ধির কারণে বদখশান এবং মাওরাউন্নাহার অঞ্চলে ছিলেন খ্যাতিমান। কথন বিদ্যা, খণ্ডন বিদ্যা (তাকসীর)সহ অন্যান্য বিদ্যায় তিনি ছিলেন দৃষ্টান্তহীন। 'কাশাম' শহরে ছিলো তাঁর জন্মস্থান ও বাসস্থান। কাশাম ছিলো বদখশান অঞ্চলের একটি শহর। কাবুলে তাঁর মাজার অবস্থিত। মীর বুজর্গের পিতা আমীর জালালুদ্দিন এবং দাদা মীর সাইয়্যেদ হামীদুদ্দীনও প্রসিদ্ধ আলেম ছিলেন। মুত্তাকী এবং আরেফ তাঁদের পূর্ব পুরুষদের মধ্যে আর একজন বিশিষ্ট বুজর্গ ছিলেন। তাঁকে বলা হতো শায়েখ বুলবুল। কারণটি ছিলো এরকম— তিনি সুমধুর কণ্ঠে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করতেন। নিকটের ও পার্শ্ববর্তী এলাকার বুলবুলি পাখিরা সমবেত হয়ে তাঁর কোরআন পাঠ শুনতো। পবিত্র কোরআন শুনে ক্রন্দন করতো। তাদের ভাষায় প্রার্থনা করতো। কখনো কখনো দেখা যেতো পাঁচ ছয়টি বুলবুলি প্রাণত্যাগ করেছে।

'মীর বুজর্গ' মোজা পরিহিত তরিকত অনুশীলনকারী এক দরবেশের অনুরক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন সিলসিলায়ে আলিকিয়্যার (প্রেমিককুলের) মধ্যে একজন জযবা ও কারামতসম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি নিজেকে সমরখন্দের বিরানভূমিতে আত্মগোপন করে রাখতেন। মোজা পরিধান করাকে স্বীয় পর্দা বা আবরণ বানিয়ে নিয়েছিলেন। মীর বুজর্গ তাঁর পীর মোর্শেদের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন এভাবে— একবার সমরখন্দের জামে মসজিদে তার উপর 'ওয়াজদে আজীম' (বিশাল মত্ততা) প্রভাব বিস্তার করলো। বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও এমনভাবে ছুটাছুটি করলেন যে, মিম্বর মানব দেহের দ্বিগুণ উঁচু এবং এক গুণ প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তার এক দিক থেকে অন্য দিক তীব্র তেজে যাতায়াত করলেন। শরীরে এতটুকুও আঘাত পেলেন না।

আমি আমার নিজের লেখা পুস্তক 'সানওয়াতুল আতাকিয়া'য় মীর বুজর্গের বিবরণের মধ্যে ওই মোজা পরিহিত বুজর্গের কিছু কারামতের কথা তুলে ধরেছি। মীর বুজর্গ শায়েখ কারমানী র. এর সোহবতও অর্জন করেছিলেন এবং তাঁর নামে

১. মূল ফারসী গ্রন্থে মীর মোহাম্মদ নোমানের নামের পরে 'কুদ্দিসা সিররুহু'ও লেখা ছিলো। যদিও অনুবাদক এখানে কথাটি বাদ দিয়ে লিখেছেন। মীর মোহাম্মদ নোমান সাহেবের ইন্তেকাল হয় ১০৫৮ সালের ১৮ সফর 'হাজ্‌রাতুল কুদুস' গ্রন্থখানির কাজ সুসম্পন্ন হয় তাঁর তিরোধানের পরে।

একটি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেছিলেন। ওই পুস্তকে তিনি শায়েখ কাশেম সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। পুস্তকটি দেখে তিনি অত্যধিক খুশি হয়ে বললেন, তুমি যেমন আমার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছো, তেমনি আল্লাহ্‌পাক তোমাকে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ও শক্তিমান করবেন। এমনই বরকতপূর্ণ সময়ে শাহজাদা মোহাম্মদ হাকিম [১] হৃদয় নিংড়ানো মমতাপূর্ণ একটি পত্র মীর বুজর্গের কাছে পাঠালেন। তাঁকে কাবুলে আগমনের আমন্ত্রণ করলেন। তিনি সম্মত হলেন। যখন কাবুলে পৌঁছলেন তখন শাহজাদা অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে তাঁকে স্বাগতম জানালেন। যখন তাঁর ইন্তেকাল হয়ে গেলো, তখন সেখানকার প্রশাসক হয়ে এলো এক কাফের। তখন মীর বুজর্গ পরকালযাত্রার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করলেন। আল্লাহ্‌পাক দোয়া কবুল করলেন। তিনি ৯৯৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করলেন।

মীর মোহাম্মদ নোমান বলেন, আমি আমার পিতাকে সত্তরটি বিশেষ বিষয়ে অভিজ্ঞ মনে করতাম। তাঁকে আমি মুত্তাকী মনে করতাম, কিন্তু আউলিয়া মনে করতাম না। একদিন আমার বড় বোন যিনি উচ্চ পর্যায়ের একজন আরেফা ছিলেন, আমাকে বললেন, আমি পিতাকে স্বপ্নে দেখলাম, তিনি বললেন, আমার পুত্র মীর মোহাম্মদ নোমানকে বোলো, কেনো সে আমার প্রতি অন্য ধারণা পোষণ করে? ওই দিন থেকেই তাঁর বেলায়েতের প্রতি আমি আস্থাবান হলাম।

এখন মূল উদ্দেশ্যের দিকে ফিরে আসি। হজরত মীর আমাকে বলেছেন, আমার পিতা আমার কাছ থেকে এই অঙ্গিকার করিয়ে নিয়েছিলেন যে, আমার ঘরে যে সকল সন্তান জন্ম নিবে তাদের নাম নবীজীর স. নামের সঙ্গে সংযুক্ত করে রাখবে। তাই তাঁর সন্তানদের নাম জালালুদ্দীন মোহাম্মদ, সাআদুদ্দীন মোহাম্মদ এবং জিয়াউদ্দীন মোহাম্মদ ছিলো। যখন আমি আমার মায়ের পেটে তিন মাস বয়সের ছিলাম, তখন আমার বুজর্গ মাতা হজরত ইমাম আজম আবু হানিফা নোমান বিন ছাবেতকে স্বপ্ন দেখলেন। তিনি বলছেন, তোমার সন্তানের নাম আমার নামে রেখো। আমার বুজর্গ মাতা সেই নির্দেশ পালন করলেন। আমার নাম রাখলেন মোহাম্মদ নোমান। মীর সাহেব এ-ও বর্ণনা করেছেন যে, সমরখন্দে ৯৭৭ হিজরীতে আমার জন্ম হয়।

কুদসিয়্যাহ্ ঃ তিনি বর্ণনা করেন, শৈশবকালে আমার প্রতি অসাধারণ নেসবত (সম্পর্ক) প্রাধান্য বিস্তার করতো এবং আমাকে শক্তিহীন করে দিতো। অস্বাভাবিকতা এবং নিমজ্জমান অবস্থার সৃষ্টি হতো। যখন আমি ফকিরগণের দরবারে উপস্থিত হলাম, তখন সেখানে তাঁদেরকে মোরাকাবা করতে দেখলাম। অলৌকিক ঘটনাবলীর কথা জানলাম। আমার বিশ্বাস হলো, এ সকল অবস্থা তরিকতের বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

---

১. শাহ্‌জাদা মোহাম্মদ হাকীম বাদশাহ্ আকবরের ভাই ছিলেন। ৯৯৩ হিজরী ১২ ই শাবান কাবুলে ইন্তেকাল করেন (মুনতাখাবুত্ তাআরিখ বদায়ুনী)।

যখন তিনি বড় হলেন, তখন বলখ শহরে আমীর আবদুল্লাহ বলখী আশেকী র. এর দরবারে উপস্থিত হলেন। তাঁর ইঙ্গিত ও সুসংবাদের ভিত্তিতে তওবা করলেন। এরপর ঘটনাক্রমে বিশেষ প্রয়োজনে হিন্দুস্তানে আসতে হলো। তিনি বলেছেন, সুলুকের পথ অবলম্বনের জন্য আমি অসংখ্য বুজর্গের খেদমতে উপস্থিত হলাম। প্রত্যেকের কাছ থেকে জিকিরের শিক্ষা নিলাম। আমলও করলাম। হজরত শায়েখ সাঈদ হাবশীর সাথে করমর্দনের সৌভাগ্য অর্জন করলাম। যেখানেই বুজর্গের সন্ধান পেতাম, সেখানেই চলে যেতাম। তাঁদের সান্নিধ্য গ্রহণ করতাম। এরপর আল্লাহ্প্রাপ্তির বিশেষ আকর্ষণ আমাকে কুতুবুল মোহাক্কেকীন হজরত খাজা মোহাম্মদ বাকী কুদ্দিসা সিররুহুর দরবারে পৌঁছে দিলো। হজরত আমার হালের প্রতি বিশেষ অনুকম্পা প্রদর্শন করলেন। আমাকে অনুগ্রহের বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করলেন। নকশবন্দিয়া তরিকার জিকির ও মোরাকাবার অন্তর্ভুক্ত করলেন। আমি চাকুরী ও সকল পার্থিব সম্পর্ক ছিন্ন করে স্বীয় সন্তানগণ ও বন্ধুবর্গ হিতাকাঙ্ক্ষীসহ ফকির দরবেশদের একটি দলের সাথে হজরত খাজা র. এর দরবারে অবস্থান গ্রহণ করলাম।

কথিত আছে— একবার কোনো এক আমীর হজরত খাজা র. এর খানকার ফকিরদের দৈনন্দিন জীবিকা প্রদানের লক্ষ্যে খরচা গ্রহণের জন্য কয়েকজনের নাম নির্বাচন করলো। ইতোমধ্যে এক ব্যক্তি নিবেদন জানালেন, মীর মোহাম্মদ নোমান অধিক পোষ্যধারী, পরিবার-পরিজনসহ সবিশেষ সংকটের সাথে কালাতিপাত করছেন। হজরত খাজা কুদ্দিসা সিররুহু বললেন, সে আমার দেহের অংশবিশেষ। তাই আমি তাঁকে এই বিষয়টির সাথে সম্পৃক্ত করতে চাই না। মীর সাহেব বর্ণনা করেন, ওই দিনগুলোতে আমরা ছিলাম সংকট ও দারিদ্রকবলিত, কিন্তু হজরত খাজা র. এর বিশেষ অনুগ্রহে ও মহানুভবতার কারণে আমাদের অন্তরে সীমাহীন আনন্দ ও প্রশান্তি বিরাজ করতো। আমি তখন ছিলাম সদাআনন্দিত এবং সুন্দরতর হালের প্রত্যাশী।

হজরত খাজা র. মীর সাহেবের তরবিয়তের দায়িত্ব হজরত মোজাদ্দেদ র. এর প্রতি ন্যস্ত করলেন। হজরত মোজাদ্দেদ র.কে খেলাফত ও খেরকা প্রদান করে সেরহিন্দের জন্য বিদায় দিলেন। এরপর হজরত খাজা কুদ্দিসাসিররুহু পৃথিবী থেকে বিদায় হলেন। হজরত মোজাদ্দেদ র. সমবেদনার জন্য দিল্লী আগমন করলেন। মীর সাহেব হজরত মোজাদ্দেদ র.কে একটি চিঠি লিখলেন, যার মধ্যে ছিলো নিজের ব্যথিত হৃদয়, অসহায়ত্ব, মুখাপেক্ষিতা, দুর্ভাগ্য ও অযোগ্যতার উল্লেখ। তিনি হজরত খাজা র. এর ওই অসিয়তের কথাও উল্লেখ করলেন, যার মাধ্যমে মীর সাহেবের তরবিয়তের দায়িত্ব হজরত মোজাদ্দেদ র. এর উপর ন্যস্ত করা হয়েছিলো। ওই চিঠিতে এ-ও লেখা ছিলো যে, আপনার অনুগ্রহ লাভের জন্য আমার এটা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই যে, আমি সাইয়্যেদুল মুরসালীন

সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশের সাথে সম্পর্ক রাখি। আমার উপর সাইয়্যেদুল আম্বিয়া আলাইহি ওয়া আলিহিস্ সলাতু ওয়াস্ সালামের অনুগ্রহ বর্ষিত হোক। হজরত মোজাদ্দেদ র. চিঠিখানা পড়ার পর আবেগাপ্লুত হলেন। বললেন, মীর সাহেব! দুঃখিত হবেন না। ইনশাআল্লাহ্ যা ভালো তাই-ই হবে। এ-ও বললেন, হজরত খাজা কুদ্দিসা সিরুহুর সহচরদের মধ্য হতে আপনার সাথে আমার বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে।

যখন হজরত মোজাদ্দেদ র. স্বীয় দেশে প্রত্যাবর্তন করলেন তখন মীর সাহেবকে আমন্ত্রণ করে সেরহিন্দে নিয়ে এলেন। সেখানে তিনি বছরের পর বছর অবস্থান করেছিলেন। হজরত মোজাদ্দেদ র. একবার অসুস্থতার কারণে দুর্বল হয়ে গিয়েছিলেন। আল্লাহ্পাকের পক্ষ থেকে তাঁকে হায়াত ও মৃত্যুর স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিলো। তিনি বিদায়গ্রহণকে পছন্দ করলেন। বললেন, হজরত খাজা খাজেগানের গুপ্ত সম্পদসমূহ তাঁর পরিবারের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া উচিত। এই বোঝা বহনের দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে কেবল তাঁর জ্যেষ্ঠ্য পুত্র খাজা মোহাম্মদ সাদেক এবং মীর সাহেব এই দু'জনকে। যোগ্যতা অনুযায়ী এই আমানত তিনি দু'জনের প্রতি অর্পণ করলেন। এর পর সন্তানদের এবং ভক্তবৃন্দের অনুনয়-বিনয়-নিবেদনের কারণে মহান আল্লাহ্ তাঁর ইচ্ছা পূরণার্থে তাঁকে দ্রুত সুস্থতা দান করলেন। বললেন, দুর্বলতার সময় এই নেসবত ন্যস্ত করার রহস্য হচ্ছে এই যে, কোনো কোনো আচার-আচরণ এবং মাকামসমূহ ওই সময় অর্জিত হতে পারতো, যখন ওই নেসবত আমি তোমাদেরকে দিয়ে দিতাম। এরপর থেকে মীর সাহেবের তরবিয়ত এবং তাঁর প্রতি অনুগ্রহ দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেতে লাগলো। তিনি সর্বদাই তাঁর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি ও অনুগ্রহ দান করতে লাগলেন। আধ্যাত্মিক অগ্রগতি নিম্নস্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত পৌঁছে গেলো। এমনকি ১০১৮ হিজরীর নিকটবর্তী কোনো এক সময়ে মীর সাহেবকে খেলাফত দান করে এবং তরিকত প্রচারের দিক-নির্দেশনা দিয়ে বোরহানপুর প্রেরণ করলেন। এ খেলাফতনামা হজরত মোজাদ্দেদ র.স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করেছিলেন এভাবে— 'ওই এক আল্লাহ্ যিনি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই— আমরা তাঁর প্রশংসা করি এবং তাঁর নবী স. এবং তাঁর বুজর্গ বংশধরদের প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ করছি। এরপর নিবেদন পুণ্যবান ভ্রাতা, সত্য তরিকার সালেক, আরিফ বিল্লাহ, সাইয়্যেদ কামেল মোহাম্মদ নোমান (মহান আল্লাহ্ তাঁকে তাঁর সার্বক্ষণিক রহমত দান করুন) ফকিরের মধ্যস্থতায় সুলুকের জন্য নকশবন্দিয়া মাশায়েখগণের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন, তাঁর মহান তরিকার সুলুককে অতিক্রম করেছেন। তাঁর মাধ্যমে তরিকার জন্য উপকৃত হওয়ার স্থান পাওয়া গিয়েছে তখন আমি তাঁকে ওই জ্যেষ্ঠতর সাধকদের তরিকার প্রশিক্ষণ, পথ-অন্বেষণকারীদের পথ দেখানোর অনুমতি দেওয়া হলো শরীয়ত এবং হকিকত অনুযায়ী। যে সত্য পথের অনুসারী,

তাঁর প্রতি সালাম এবং রসুল আনওয়ার সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণকে যাঁরা নিজেদের উপর আবশ্যিক করেছেন, তাঁদের প্রতি সালাম।'[১]

মীর সাহেব[২] হজরত মোজাদ্দেদ র. এর নির্দেশ পালনার্থে বোরহানপুর গেলেন। সেখানে বিশাল জনপ্রিয়তা অর্জন করলেন এবং তাঁর পরিচর্যায় সোহবতের এমন হাল প্রভাব বিস্তার করলো যে, তার বিস্তারিত বিবরণ দিতে গেলে পৃথক গ্রন্থ রচনা করতে হবে। ফকির, আমীর, উদাসীন, আহলে হুজুর (সচেতন)দের প্রতি তাঁর সোহবত অবলম্বনের ও পরিচর্যার কারণে এতো পরিমাণ জয্‌বা (আকর্ষণ) ও মস্তি (মত্ততা) প্রাধান্য বিস্তার করলো যে, লোকেরা তাদের বস্ত্র ছিন্ন করে ফেলতো, জবাইকৃত মোরগের মতো মাটিতে ছটফট করতো। কখনো কখনো একসাথে ত্রিশ চল্লিশ জন বেঁহুশ হয়ে যেতো, ভূমিতে লুটিয়ে পড়তো। এমন কি দর্শনকারী যারা তাসাউফপন্থী এবং যারা অস্বীকারকারী তারাও আস্থাভাজনদের মতো অচেতন, আত্মহারা হয়ে ভূলুণ্ঠিত হতো। মীর সাহেবের তাসাউফ পরিচর্যা এমন অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিলো যে, অন্যান্য মাশায়েখদের মুরিদগণ যারা শহরের আশেপাশে ছিল, তারাও আত্মহারা হয়ে হজরতের জিকিরের মজলিসে অন্তর্ভুক্ত হতো। অসংখ্য ফাসেক আত্মশুদ্ধি লাভ করেছিলো।

কুদসিয়্যাহ্ ঃ তিনি বর্ণনা করেন, একবার আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি হজরত মোজাদ্দেদ র. এর খেদমতে উপস্থিত হয়েছি এবং তাঁর উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন আবাসনের চতুষ্পার্শ্বে ঘুরছি। এমন সময় হজরত ঘর থেকে বের হয়ে আস্তানায় উপস্থিত হলেন। আমাকে অবনত মস্তক অবস্থায় দেখে খুশি হলেন। আন্তরিকতার সাথে সাদরে গ্রহণ করলেন। খুব বেশী তাওয়াজ্জোহ দিলেন এবং আমাকে বক্ষাবদ্ধ করলেন। বললেন, মীর সাহেব! সফরের কারণে গরম লেগেছে। চিনির শরবত নিয়ে আসুন। শরবতের একটি শাদা পাত্র আনা হলো। হজরত বললেন, মীর এই পাত্র সম্পূর্ণ পান করুন। এর থেকে অন্য কাউকে সামান্য পরিমাণও দিবেন না। আমি ওই পাত্র থেকে সম্পূর্ণ শরবত পান করলাম। এরপর হজরত কেবলামুখী হয়ে দোয়া করার জন্য হাত উঠালেন। বললেন, হে আল্লাহ্! ওই

---

১. কিন্তু হজরত মোজাদ্দেদ র. প্রথম খণ্ড ২২৮ নং মকতুবে উল্লেখ করেছেন, এজাযতনামা বা অনুমতিপত্র লিখে দেবার জন্য এরূপ তাগিদ প্রদানের উদ্দেশ্য কী? আপনাকে তরিকত প্রচারের অনুমতি তো দেওয়াই হয়েছে, যদি তা যথেষ্ট না হয় তাহলে লিখিত এজাযতনামা দ্বারা কী লাভ হবে?

২. মোহাম্মদ হাশেম কাশমী যুবদাতুল মাকামাত ৩১৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে, মীর মোহাম্মদ নোমান দ্বিতীয় বার বোরহানপুর গিয়ে সফলকাম হতে পারেননি। কেনোনা সেখানে শায়েখ মোহাম্মদ ফজলুল্লাহ এবং শায়েখ ঈসা হামীদুল্লাহর মতো বিশেষ হাল সম্পন্ন বুজর্গ বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু তৃতীয়বার যখন হজরত মোজাদ্দেদ র. পাঠালেন তখন গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিলেন।

নেসবত, যা খাস মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহ স. এর, তা মীর সাহেবকে দান করো। তারপর হজরত মোজাদ্দেদ র. তাঁর হাত মুখের উপর মুছে নিলেন। এরপর তিনি পুনরায় হাত উঠিয়ে নিবেদন করলেন, হে মহান আল্লাহ্! যে নেসবত আমার জন্য খাস তা-ও তুমি মীর মোহাম্মদ নোমানকে দান করো।

যখন আমি জাগ্রত হলাম, তখন হজরতের নিকট বিষয়টি খুলে বললাম। ব্যাখ্যা জানতে চাইলাম। তিনি জবাব দিলেন না। মজলিস থেকে বিদায় নিলেন, এর কিছু কাল পর এই মকতুব খানা লিপিবদ্ধ করলেন— এক দিবস ফজরের নামাজান্তে বন্ধুগণের হালকায় উপবিষ্ট ছিলাম। তখন ইচ্ছাকৃতই হোক বা অনিচ্ছাকৃত আপনার প্রতি লক্ষ্য হলো। আপনার নফসের অবশিষ্ট চিহ্ন যা আমার নজরে পড়লো তা বিদূরিত করার প্রতি প্রবৃত্ত হলাম ও আপনার মধ্যে যে সকল তমসা ও মলিনতা অনুভূত হচ্ছিলো তা অপসারিত করার চেষ্টা করলাম। অবশেষে আপনার পূর্ণতার নবচন্দ্র-পুর্নেন্দু হয়ে গেলো। হেদায়েতের সূর্যের মধ্যে যা নিহিত ছিলো, তা সম্পূর্ণ ওই পূর্ণচন্দ্রে প্রতিবিম্বিত হলো। এ পর্যন্ত যে, পূর্ণতার দিকে আর অধিক আশা করার অপেক্ষার কোনো বস্তু রইলো না। কিন্তু যদি পাত্রের সংকুলান হয়, তাহলে তার পরিসর অনুযায়ী অল্প অল্প করে আরো গ্রহণ করতে পারে। দীর্ঘ দিন পর্যন্ত এই ভাবটির উদাহরণিক আকৃতির প্রতি আমার লক্ষ্য ছিলো, ফলে এর (সংঘটনের) সত্যতার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস লাভ হলো। এই হেতু আল্লাহ্পাকের প্রশংসা করছি। আপনি যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, সে স্বপ্ন এটার তাবীল (ফল) স্বরূপ এবং আপনি এই দৌলত লাভের জন্য বিশেষভাবে প্রার্থনা করেছিলেন, আল্লাহ্ তা'য়ালার শোকর গোজারী যে, আপনার ঋণ সম্পূর্ণ পরিশোধিত হলো ও প্রতিশ্রুতি পালিত হলো। আশা করি আপনার পূর্ণতা অনুযায়ী অন্য সকলকে পূর্ণ করতে সক্ষম হবেন। আশা করি ওখানকার মরু প্রান্তরে আপনার পবিত্র অজুদের (অস্তিত্বের) নূরে নূরান্বিত হবে।[১]

হজরত মোজাদ্দেদ র. এর প্রতি মীর সাহেবের অনুরাগ-ভালোবাসা ছিলো অত্যধিক। তাই তাঁর খ্যাতি শুধুমাত্র সেরহিন্দ বা হিন্দুস্তানের মধ্যে ছিলো না। বরং মহাবিশ্বে সূর্যের আলোর মতো ছড়িয়ে পড়েছিলো। মুরিদগণের অধিকাংশই এই পর্যায়ের ছিলো যে, কোনো কোনো শত্রু সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট পর্যন্ত এই সংবাদটি রটিয়ে দিয়েছিলো যে, আপনার সম্রাজ্যের এক প্রান্তে বোরহানপুর শহরে এক দরবেশ রয়েছে, যিনি নিজেকে হজরত মীর বলে থাকেন। তাঁর মুরিদ লক্ষাধিক। সম্রাট গম্ভীরভাবে বললেন, কোথাও বিশৃংখলা বা বিদ্রোহ প্রকাশিত না হয়ে যায়। তাঁকে বোরহানপুর থেকে ডেকে আনা হলো। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি নিজেকে হজরত মীর কেনো বলে থাকেন? তিনি জবাব দিলেন, আমি সাইয়্যেদ বংশের লোক। সাইয়্যেদকে মীর বলা হয়। অবশ্য আমি নিজেকে হজরত মীর বলে পরিচয় দিতে পছন্দ করি না।

১. মকতুবাত শরীফ ১ম খণ্ড ২৪৬

সম্রাট পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কি এক লক্ষ মুরিদ? এ কথা শুনে হজরত হেসে ফেললেন। সম্রাট উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করে বললেন, দেখ, আমি তার কাছে একটি কথা জানতে চাইছি। অথচ সে হাসছে। তার সাহস কতো, দেখছো। মহব্বত খান [1] সে সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বাহ্যিকভাবে সম্রাটের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শনস্বরূপ বলেছিলেন, তাঁর পীর বুজর্গ ব্যক্তি। বিভিন্ন প্রদেশে তাঁদেরকে খলিফা নিযুক্ত করেছেন। বোরহানপুরের দায়িত্ব দিয়েছেন এঁকে। এঁর মাহাত্ম্য এমনই যে, সাধারণ মানুষ তাঁর কাছে ভিড়তে পারে না। সম্রাট বুঝলেন, মহব্বত খানও তাঁর সাথে শত্রুতা পোষণ করেন। তাই তিনি বললেন, এই দরবেশকে তোমার দায়িত্বে দিয়ে দেওয়া হলো। মহব্বত খান তাঁকে নিজ স্থানে নিয়ে এলেন এবং তাঁর প্রতি সব ধরনের খেদমত ও বিনয় প্রদর্শন করলেন এবং বারংবার দাওয়াত করলেন। মুরিদ ও অন্যান্য লোকেরা তাঁকে দেখার জন্য পঙ্গপালের মতো আসতে লাগলো এবং হাদিয়া, উপঢৌকন দিতে লাগলো। সম্রাট যখন এ বিষয় জানতে পারলেন, তখন মহব্বত খানের আচরণে আপত্তি করলেন। মহব্বত খান বিনীতভাবে বললেন, জাঁহাপনা এই দরবেশ তো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েন। এ ব্যতীত তো অন্য কিছু দেখি না। সম্রাট বললেন, ঠিক আছে আমি তাঁকে ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু তিনি বোরহানপুর থাকতে পারবেন না। তিনি যেনো দারুল খোলাফা আগ্রায় অবস্থান স্থল [2] বানিয়ে নেন। মীর সাহেব এ সিদ্ধান্ত মেনে নিলেন। আগ্রায় অবস্থানপূর্বক মুরিদগণের তরবিয়তের কাজে মনোনিবেশ করলেন।

কুদসিয়্যাহ্ ঃ তিনি বর্ণনা করেন, একবার আমি রাতে বোরহানপুরের জামে মসজিদের বারান্দা থেকে পড়ে গেলাম। মসজিদের ভিত ছিলো এক মহিষ সমান উঁচু। হাতে বেশ আঘাত পেলাম। কিন্তু পড়ার সাথে সাথে এক সুলুকের মাকাম যার অন্বেষণে আমি ছিলাম, তার প্রাপ্তি ঘটলো। তাই আঘাত খেয়ে খুব খুশী হলাম এবং এই নেয়ামতপ্রাপ্তির জন্য শোকরানাস্বরূপ হালুয়া রান্না করে বিতরণ করলাম। আমার বিশ্বাস হলো, যে ব্যক্তি এই হালুয়া খাবে সে জান্নাতে যাবে।

---

১. মহব্বত খান ১০৪৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। শাহনেওয়াজ খানের গ্রন্থ মাআছারুল উমারা ৩য় খণ্ড লাহোর ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ এর মধ্যে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। রওজাতুল কাইয়্যুমিয়াহ গ্রন্থে রয়েছে মহব্বত খানও হজরত মোজাদ্দেদ র. এর হাতে বায়াত গ্রহণ করেছিলেন।

২. মীর মোহাম্মদ নোমান যখন আগ্রায় ছিলেন তখন ১০২৮ হিজরী সনে হজরত মোজাদ্দেদ র. তাঁকে লিখেছিলেন, কাফেরেরা যেভাবে মুসলমানদের উপর অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে, সম্রাট যখন রাজ্য ভ্রমণ থেকে ফিরে আসবেন, তখন আমি তাঁর কাছে উপস্থিত হবো। যথাসময়ে তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন। ওই সময়েই কারারুদ্ধ হয়েছিলেন।

কুদসিয়্যাহ্ ঃ হজরত মোজাদ্দেদ র. এর প্রশংসা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, আমি কয়েকজন এমন ব্যক্তিকে জানি যাঁরা হজরত র. এর সোহবতের বরকতে কুতুবের স্তরে উপনীত হয়েছিলেন।

কুদসিয়্যাহ্ ঃ তিনি এ-ও বলতেন, আমি রসুলে নূর স. কে স্বপ্নে দেখেছি। হজরত আবু বকর রা. তাঁর সাথে ছিলেন। তিনি স. বললেন, হে আবু বকর! আমার সন্তান মোহাম্মদ নোমানকে বলে দাও, যে শায়েখ আহমদের (হজরতে মোজাদ্দেদ র. এর) কাছে গ্রহণযোগ্য, সে আমার ও আমার আল্লাহ্র কাছেও গ্রহণযোগ্য। আর যে শায়েখ আহমদের অপছন্দনীয়, সে আমার ও আল্লাহ্র কাছেও অপছন্দনীয়। আমি যখন এই সুসংবাদ শুনলাম তখন অত্যন্ত খুশি হলাম। আলহামদুলিল্লাহ! আমি মোজাদ্দেদ র. এর গ্রহণযোগ্য ও পছন্দনীয়। এজন্য আমি মহান আল্লাহ্র কাছেও পছন্দনীয় হবো।

কুদসিয়্যাহ্ ঃ তিনি এ-ও বর্ণনা করেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, একটি তাঁবু সুউচ্চভাবে বানানো রয়েছে। যেমন বাদশাহ্র কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানের দিনে টানানো হয়। ওই বিশাল তাঁবুর মধ্যে সাত মহাদেশের মানুষ অবস্থান করছে। দুনিয়ার মধ্যে যেমন বাদশাহ্, কর্মকর্তা, বুদ্ধিজীবী এবং জ্ঞানী ব্যক্তি ও কলম থাকে এবং গ্রাম-শহর-পল্লী-বাজার-সীলমোহর-মুদ্রা তৈরীর ছাপ-সড়ক-জীবন-মৃত্যু-দরবেশ-আমীর-মালিক-চাকর থাকে, তদ্রূপ সেখানে সব কিছুই রয়েছে। সকল কর্মকর্তা তাঁবুর দিকে একবার দেখেন, পুনরায় দেখেন পৃথিবী ও পৃথিবীবাসীর প্রতি। কর্মচারীদের প্রতি দায়িত্ব ন্যস্ত করেন। আমার খেয়াল হলো উপরে কী রয়েছে একটু দেখি। সেবাদানকারীগণ সেখান থেকে নির্দেশপ্রাপ্ত হচ্ছেন এবং সেই অনুযায়ী দুনিয়াতে তা বাস্তবায়ন করছেন। আমি মাথা উঠিয়ে দেখলাম, সুবিশাল তাঁবুটির মধ্যবর্তী স্তম্ভের এক স্থানে একটি ছিদ্র রয়েছে। হজরত মোজাদ্দেদ র. ওই তাঁবুর উপরে বসে আছেন। তিনি তাঁর পবিত্র চেহারা ওই ছিদ্র পথে স্থাপন করে সেখান থেকে সব কিছু ইঙ্গিত করছেন। সকল জাহানের অধিপতির দপ্তর থেকে স্বীয় দায়িত্ব অনুযায়ী সেখান থেকে নির্দেশপূর্ণ ইঙ্গিত প্রাপ্ত হচ্ছেন এবং সেই অনুযায়ী কাজ করছেন।

সোপান ঃ মীর সাহেব এ-ও বর্ণনা করেন, একদিন আমি ফজরের নামাজের পরে হালকায় হজরত মোজাদ্দেদ র. সামনে উপবিষ্ট ছিলাম। মোরাকাবা থেকে মাথা উঠিয়ে দেখলাম, হজরত সাইয়্যেদুল কাওনাইন সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করেছেন এবং বসে আছেন। আমি আতংকিত হলাম। দ্রুত মাথা নিচু করে পুনরায় মোরাকাবায় মগ্ন হলাম। কিছুক্ষণ পর পুনরায় মাথা উঠালাম, তখন দেখলাম হজরত মোজাদ্দেদ র. নবীজীর পাশে বসে আছেন। আমি পুনরায় মোরাকাবায় মগ্ন হলাম। বেশ কিছুক্ষণ পর পুনরায় মাথা উঠিয়ে দেখলাম, হজরত

মোজাদ্দেদের স্থানে রসুলে আনওয়ার সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপবিষ্ট। আবার দেখলাম রসুলে আনওয়ার সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্থানে হজরত মোজাদ্দেদ র. উপবিষ্ট। আমি চোখ বন্ধ করলাম। কিছুক্ষণ পর চোখ খুলে দেখলাম, উভয় স্থানেই রসুলে আনওয়ার সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বসে আছেন। তারপর উভয় স্থানে হজরত মোজাদ্দেদকেও পেলাম। শেষে দেখলাম শুধু হজরত মোজাদ্দেদ বসে আছেন। ঘটনাটি আমি স্বচক্ষে দেখেছি। এটা কোনো স্বপ্ন বা কাশফ নয়।

সোপান ঃ তিনি এ-ও বর্ণনা করেন যে, যখন আমি হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ কুদ্দিসা সিররুহুর খেদমতে ছিলাম, তখন একদিন তাঁর সকল মুরিদকে বললেন, তোমরা মিঞা শায়েখ আহমদের দরবারে যাও। তিনি যেভাবে জিকিরের পদ্ধতি বর্ণনা করেন, সেভাবেই আমল করো। তাঁর উপস্থিতিতে আমার প্রতি সম্মান প্রদর্শন কোরো না। আমার দিকে খেয়ালও কোরো না। আমাকেও তিনি হজরত মোজাদ্দেদ র. এর সোহবত অবলম্বনের উৎসাহ দিলেন। বললেন, মিঞা শায়েখ আহমদ এমন এক সূর্য যার উদিত হওয়ার কারণে আমাদের মতো হাজার হাজার নক্ষত্র হারিয়ে গিয়েছে। পূর্ববর্তী আউলিয়াগণের মধ্যে তাঁর মতো ব্যক্তিত্ব খুবই কম ছিলো। মীর সাহেব বলেন, এই ঘোষণার পর হজরত খাজা কয়েক বছর জীবিত ছিলেন। আল্লাহ্ই জানেন এরপর তাঁর মর্যাদা আরো কতো গুণ [১] বৃদ্ধি পেয়েছিলো।

হজরত মোজাদ্দেদ র. মীর সাহেবকে বহুসংখ্যক চিঠি [২] লিখেছেন। সেগুলো সবই তিন খণ্ড মকতুবের মধ্যে সন্নিবেশিত হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে অল্প কয়েকটি মকতুব উল্লেখ করা হলো।

মকতুব ২৩৮/১ ঃ খাজা রহমীর ভৃত্যের দ্বারা যে চিঠি পাঠিয়েছেন তা পেয়ে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলাম। এতে আপনার মুরিদগণের আধ্যাত্মিক অবস্থার বিস্তারিত বর্ণনা ছিলো বলে আরো অধিক সন্তুষ্ট হলাম। যেহেতু বন্ধুগণের আধিক্যের চেষ্টা করার মধ্যে 'তোমরা স্বধর্মীয় ভ্রাতৃবৃন্দের আধিক্যের চেষ্টা করো'— এই হাদিস অনুযায়ী বহু বিষয়ের আশা আছে এবং 'তোমার ভ্রাতার দ্বারা অচিরেই তোমার

১. তাসাউফ বিষয়ে মীর সাহেবের একটি কিতাব ডাঃ গোলাম মোস্তফা ১৩৮৯ হিজরীতে প্রকাশ করেছেন।

২. মীর সাহেবের নামেই মকতুবাত শরীফে সবচেয়ে বেশী মকতুব রয়েছে। প্রথম খণ্ডে— ১১৯, ১২০, ১২১, ১৭৩, ২০৪, ২০৯, ২২৪, ২২৮, ২৩১, ২৩৮, ২৪৬, ২৫৭, ২৬১, ২৮১, ৩১২।
দ্বিতীয় খন্ডে— ৪, ৯২, ৯৯ ।
তৃতীয় খন্ডে— ১, ৪, ৫, ৯, ১০, ১২. ১৫, ১৮, ১৯, ২১, ২৬, ৩০, ৩৬, ৪৯, ১০২।
এ ছাড়াও কিছুসংখ্যক মকতুবে বিশেষ করে তাঁর বিষয়ে আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

বাহুদ্বয় শক্তিশালী করে দিচ্ছি'— আয়াতটিও উক্ত বিষয়ের সহায়তাকারী। অবশ্য স্বীয় অবস্থা ও কার্যকলাপের গতিবিধির প্রতি সর্বদাই যেনো লক্ষ্য থাকে। মুরিদগণের উন্নতি যেনো পীরগণের নিজেদের বিলম্বের কারণ না হয়। পথপ্রার্থীগণের উৎসাহ ও উদ্যম যেনো পথপ্রদর্শকগণের কার্যে শিথিলতা না আনে। এ বিষয়ে সর্বদা ভীত ও সশঙ্কিত থাকা উচিত। তাঁদের হালাত ও মাকামসমূহকে ব্যাঘ্র ও সিংহ সদৃশ জানা আবশ্যক। এগুলো নিয়ে গৌরব ও অহংকার করার আর অবকাশ কোথায়? আল্লাহ্ না করুন, যেনো ওই পথে অহংকারের দরজা খুলে না যায়। বরং 'লজ্জা ইমানের একটি শাখা' হাদিস অনুযায়ী মুরিদগণের উন্নতি পীরগণের লজ্জার কারণ হওয়া উচিত। তালেবদিগের উদ্যম, প্রতিযোগিতাও সাবধানতার কারণ হওয়া আবশ্যক। স্বীয় আমল ও নিয়ত (উদ্দেশ্যসমূহ) দূষণীয় ও ত্রুটিময় জানা অপরিহার্য ও একান্ত কর্তব্য। কায়মনোবাক্যে 'হাল মীম্ মাজীদ' (আরো কী আছে) বলতে থাকা উচিত।

মকতুব ২২৮/১ ঃ ভ্রাতঃ সাইয়্যেদ সাহেবের পত্র পেয়ে বিশেষ আনন্দিত হলাম। হে ভ্রাতঃ! বার বার আপনাকে বলা হয়েছে যে, এই তরিকা দুটি মূল বস্তুর প্রতি নির্ভর করে। শরীয়তের উপর দৃঢ়তার সাথে দণ্ডায়মান থাকা, তার কোনো মোস্তাহাব কার্য পরিত্যাগ করাও সংগত মনে না করা।

দ্বিতীয়তঃ স্বীয় পীরের প্রতি খালেস ও স্বার্থশূন্য অটল মহব্বত রাখা, তাঁর প্রতি মুরিদের কোনোরূপ দোষারোপ করার অবকাশ না থাকা। বরং তাঁর যাবতীয় গতিবিধি মুরিদের চক্ষে যেনো সুন্দর ও মনোরম বলে মনে হয়। আল্লাহ্ না করুন, এই দুই বিষয়ের আনুষঙ্গিক কোনো কার্যেও যেনো কখনো ব্যতিক্রম না ঘটে। আল্লাহ্পাকের অনুগ্রহে যদি এই দুটি মূল অক্ষত থাকে তবে ইহ-পরকালের সৌভাগ্য তার হস্তগত হবে।

মকতুব ২৩১/১ ঃ আপনি লিখেছেন, 'হুছুল' (প্রাপ্তি) এবং উছুল (উপনীত হওয়া) এর পার্থক্য আমি বুঝতে পারছি না। হে ভ্রাতঃ! দূরে থেকে 'হুছুল' (প্রাপ্তি) হতে পারে, কিন্তু 'উছুল' (উপনীত) হওয়া দুষ্কর। আনকা (আকাশ কুসুম) কে যদি কোনো আকৃতি অনুযায়ী ধারণা করা যায়, তবে বলা যেতে পারে যে, আনকা অনুভূতির মধ্যে হাসিল হয়েছে। কিন্তু সে আনকার নিকটে উপনীত হয়নি। কোনো বস্তু দ্বিতীয় স্তরে প্রকাশ পাওয়াকে প্রতিবিম্ব বলা হয়। প্রতিবিম্ব উক্ত বস্তু লাভ হওয়ার প্রতিবন্ধক নয়। কিন্তু নিকটে উপনীত হওয়া প্রতিবিম্বন সহ্য করে না। অর্থাৎ কোনো বস্তুর প্রতিবিম্ব লাভ হওয়াকে উক্ত বস্তু লাভ হওয়া বলা যেতে পারে, কিন্তু প্রতিবিম্বের নৈকট্যকে উক্ত বস্তুর নৈকট্য বলা যাবে না। অতএব উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হলো।

মকতুব ১২/৩ ঃ আপনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, এই তিনটি কাজের মধ্যে কোনটি শ্রেয়— নফী এসবাতের জিকির, পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত এবং দীর্ঘ সময় ধরে নামাজ পড়া?

উত্তর ঃ নফী এসবাতের জিকির যেনো ওজু ও পবিত্রতাতুল্য, যা নামাজের জন্য শর্ত। যে পর্যন্ত পবিত্রতা ঠিক না হবে, সে পর্যন্ত নামাজ আরম্ভ করা নিষেধ। তদ্রূপ যে পর্যন্ত নফী বা নিবারণ পূর্ণ হবে না, সে পর্যন্ত ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নতে মোয়াক্কাদা ব্যতীত অন্য যা কিছু নফল এবাদত করবেন, তা প্রাণের বিপদ তুল্য হবে।

প্রথমতঃ স্বীয় ব্যাধি বিদূরিত করা উচিত, যা নফী এসবাত জিকিরের প্রতি নির্ভরশীল। তৎপর অন্য ইবাদত ও নেক আমল, যা পুষ্টিকর খাদ্যস্বরূপ তৎপ্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যক। ব্যাধি নির্মুল হবার পূর্বে যে কোনো পুষ্টিকর খাদ্যই গ্রহণ করা হোক না কেন, তা অধিক অনিষ্টকর হয়ে থাকে।

ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি যা কিছু করে ভক্ষণ
তাহাতেই ব্যাধি তার বাড়ে অনুক্ষণ।

মকতুব নং ২৩১/১ ঃ হে মান্যবর! হজরত নবী করিম স. এর কার্যকলাপ দু'প্রকার— এক প্রকার আল্লাহ্তায়লার ইবাদত-বন্দেগী সম্পর্কিত এবং দ্বিতীয় প্রকার সামাজিক আচার ব্যবহার ও অভ্যাস সংশ্লিষ্ট। ইবাদত অনুযায়ী যে কার্যকলাপ তার বিপরীত হলে তাকে দুষণীয় ও নতুন কার্য (বেদাত) বলা হয়, যাকে আমি কঠোরভাবে নিষেধ করে থাকি। কারণ এতে করে ধর্মের মধ্যে নূতনত্ব করা হয়, যা পরিত্যজ্য। পক্ষান্তরে, সমাজ ও অভ্যাস অনুযায়ী যে কার্য তার বিপরীত হলে তাকে দুষণীয় নূতন কার্য বলে গণ্য করি না। যেহেতু ধর্মের সাথে এর কোনো সম্বন্ধ নেই। এগুলোর অবস্থিতি ও অন্তর্হিতি সমাজ-বিবর্তনের প্রতি নির্ভরশীল। ধর্মের প্রতি নয়। বিভিন্ন দেশের রীতিনীতি বিভিন্ন প্রকারের এবং এক দেশেই কালের পরিবর্তনে আচার ব্যবহারেও পরিবর্তন ঘটে থাকে, যদিও ব্যবহারিক বিষয়েও সুন্নতের প্রতি লক্ষ্য রাখা ফলপ্রদ ও মঙ্গলজনক।

মকতুব নং ২৮১/১ ঃ যাবতীয় প্রশংসা মহান আল্লাহ্র জন্য ও তাঁর নির্বাচিত বান্দাগণের প্রতি সালাম। কোন্ রসনা দ্বারা এই উচ্চ নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ সম্ভব হতে পারে যে, আমার মতো ফকিরদেরকে মহান আল্লাহ্ আহলে সুন্নাত জামাতের মতানুযায়ী আকীদা-বিশ্বাস সংশোধন করার পর নকশবন্দিয়া তরিকার সুলুক করার সুযোগ প্রদান করেছেন। এই মহান উচ্চ খান্দানের সম্বন্ধভুক্ত

করেছেন। এ ফকিরের নিকট এই তরিকার একপদ অগ্রসর হওয়া অন্য তরিকার সপ্তপদ অগ্রসর হওয়া হতে উৎকৃষ্ট। এই তরিকায় কামালতে নবুওয়াত পর্যন্ত অধীনস্থ ও উত্তরাধিকারী হিসেবে পথ খুলে দেওয়া হয়। কামালতে বেলায়েতের শেষ মর্তবা পর্যন্ত অন্য তরিকার শেষ। সেখান থেকে তাদের কামালতে নবুওয়াত পর্যন্ত কোনোও পথ খুলে দেওয়া হয় না। সে কারণেই এই ফকির বিভিন্ন পুস্তকে লিখেছে, এই বুজর্গগণের তরিকা সাহাবায়ে কেরাম আলায়হিমুর রিজওয়ান এর তরিকা। যেরূপ সাহাবায়ে কেরাম উত্তরাধিকারী হিসেবে কামালতে নবুওয়াতের পূর্ণ অংশ পেয়েছিলেন, তদ্রূপ এই তরিকার মুনতাহী বা শেষ পর্যায়ে উপনীত ব্যক্তিগণও অধীনস্থ হিসেবে উক্ত কামালতে নবুওয়াতের পূর্ণ অংশ প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। প্রারম্ভকারী ও মধ্যবর্তী অবস্থার ব্যক্তিগণ, যারা এ তরিকা দৃঢ়ভাবে ধারণ করেছেন এবং তরিকার কামেল মুনতাহীগণের সাথে প্রেম-ভালোবাসা রাখেন, তারাও আশা রাখতে পারেন। 'যে যাকে ভালোবাসে সে তারই সঙ্গে' হাদিসটি দূরবর্তীগণের জন্য সুসংবাদ। ক্ষতিগ্রস্ত ও দুর্ভাগ্যবান ওই ব্যক্তি, যে এ তরিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে তরিকার আদব ও সম্মান রক্ষা করে না এবং এই তরিকার মধ্যে নতুনত্ব সৃষ্টি করে, স্বীয় স্বপ্নাদির প্রতি নির্ভর করতঃ তরিকার বিপরীত কার্য করতে অগ্রসর হয়। এমতাবস্থায় তরিকার দোষ কী?

এখানে মীর সাহেবের কয়েকটি অলৌকিক ঘটনা ও কারামত উল্লেখ করা হলো। তাঁর জীবনে এ জাতীয় ঘটনা অসংখ্য ঘটেছে। এখানে প্রেক্ষাপট অনুযায়ী এবং পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি না হওয়ার প্রতি লক্ষ্য রেখে মাত্র দুটি কারামত উল্লেখ করা হলো।

কারামত ঃ একদিন দরবেশ ও মুরিদগণের এক দলের সঙ্গে তিনি তাঁর এক বিশেষ ভক্ত মুরিদের বাড়িতে উপস্থিত হলেন। দাওয়াত প্রদানকারীকে আহবান করে বললেন, খাবারে বাহুল্য কোরো না। সন্দেহযুক্ত খাদ্য সামনে এনো না। তিনি এভাবে যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করলেন। নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে অধিকসংখ্যক লোক ছিলো বলে অনেক ছাগল জবাই করতে হলো। ওই ছাগলগুলোর একটি ছিলো অসংখ্য পোকাযুক্ত, যার প্রভাব অল্প সময়ে গোশত থেকে হাড্ডি পর্যন্ত পৌঁছে গেলো। হজরতের কাছে সবকিছু জানানো হলো। এই নিয়ে শুরু হলো শোরগোল। তিনি বললেন, আমি এ জন্যই তো সাবধানতা অবলম্বন করতে বলেছিলাম। ওই ছাগলটি হালাল ছিলো না। তাই মহান আল্লাহ্ পোকাগুলোকে নিদর্শনস্বরূপ আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। আপনারা বিষয়টি যাচাই করুন। যখন বিষয়টি তদন্ত করা হলো, তখন দেখা গেলো নিমন্ত্রণকারীর এক বন্ধু ও তার কর্মচারী অন্যায়ভাবে ছাগলটি এনেছিলো এবং উপঢৌকনস্বরূপ দিয়েছিলো। নিমন্ত্রণকারী এ কথা জানতেন না।

কারামত ঃ হজরতের এক মুরিদ ছিলো বিবাহিতা, তার স্বামী [১] তার সাথে দুর্ব্যবহার করতো। তাকে খুবই কষ্ট দিতো। বিষয়টি মীর সাহেবকে জানানো হলো। তিনি মহিলার প্রতি করুণাপরবশ হলেন। বললেন, চিন্তা কোরো না। তোমার স্বামী খুব শীঘ্র মারা যাবে। দু'তিন দিন পর সে মারা গেলো। ওই মহিলা নির্যাতন থেকে মুক্তি পেলো।

মীর সাহেব ৯৭৭ হিজরীতে জন্মগ্রহণ [২] করেন। শব্দ 'শায়েখ হুনীদ' থেকে তাঁর জন্মতারিখ অবগত হওয়া যায়। সন্দেহাতীভাবে সত্য যে, তিনি সে যুগের জুনায়েদ র. অথবা শীবলী র. ছিলেন। এই গ্রন্থে হজরত মীর বলে তাঁকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। পুস্তকটি লেখার মূলেই তিনি। শায়েখ আবু সাঈদ হাবশী যার প্রসঙ্গে প্রথম খণ্ডে আলোচনা করা হয়েছে, তার সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটেছিলো। মীর সাহেবের মধ্যস্থতায় তাঁর অনুমতিক্রমে তাঁর সাথে সাক্ষাতের অনুমতি লাভ করেছিলো।

২. শায়েখ নূর মোহাম্মদ পাটনী কুদ্দিসা সিররুহু

তিনি পূর্ণিমার চন্দ্রসদৃশ বেলায়েতধারী ছিলেন। ছিলেন হজরত মোজাদ্দেদ র. এর প্রবীণ ও মর্যাদাসম্পন্ন খলিফা। মহান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে জাহেরী এলেম অর্জনের পর আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহ্‌র সন্ধানে লিপ্ত হন। হন সঠিক পীরের সন্ধানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। হিন্দুস্তানের বহু শহরে-প্রান্তরে তিনি ভ্রমণ করেছিলেন। বহু সাধকের দরবারে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু কোথাও তাঁর আশা পূর্ণ হয়নি। এমনকি আল্লাহ্‌র মহব্বতের আকর্ষণ এবং তাঁর ভাগ্য তাঁকে হজরত খাজা মোহাম্মদ বাকী বিল্লাহ কুদ্দিসা সিররুহুর দরবারে টেনে আনলো। সেখানে তিনি কলবী জিকিরের শিক্ষা পেয়ে ধন্য হলেন। অতঃপর খাজা সাহেব তাঁর প্রতিপালন হজরত মোজাদ্দেদ র. এর দায়িত্বে দিয়ে দেন। তিনি পূর্ণ আকর্ষণ-একাগ্রতা, বিনয়-আনুগত্য ও জযবার সাথে হজরত মোজাদ্দেদ র. এর দরবারে হাজির হলেন। পূর্ণ আত্মনিবেদিত হওয়ার কারণে হয়ে গেলেন হজরত মোজাদ্দেদ র.এর খাদেমদের অন্তর্ভুক্ত এবং তিনি হজরতের মিসওয়াক ও অন্যান্য খেদমতের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি অত্যন্ত উচ্চ হাল ও মাকামে উপনীত হয়েছিলেন। একবার হজরত মোজাদ্দেদ র. তাঁর হাল সম্পর্কে হজরত খাজা কুদ্দিসা

---

১. খাজা বাকী বিল্লাহ র. এর খলিফা খাজা হুছামুদ্দীন আহমদ (১০৪৩ হিজরী) এর স্ত্রীর ভাই ছিলো আবুল ফজল। সে তার ভগ্নিপতিকে কষ্ট দিতো। খাজা বাকী বিল্লাহ আবুল ফজল সম্পর্কে এরূপ বলেছিলেন, সে খুব শীঘ্রই মারা যাবে। ১০১১ হিজরীতে সে নিহত হয়েছিলো।
২. মীর সাহেবের ইন্তেকাল হয় ১৮ সফর ১০৫০ হিজরীতে। 'মীর আলাজাহ নো'মান মুত্তাকী' মৃত্যুসনের ভিত্তি। তাঁকে আকবরাবাদে দাফন করা হয়েছে (নুজহাতুল খাওয়াতির পঞ্চম খণ্ড ২৯৩ পৃষ্ঠা)।

সিররুহুর কাছে লিখলেন— শায়েখ নূর শেষ বিন্দু পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছেন। জযবার অবস্থায় পৌঁছে ওই মাকামের মধ্যবর্তী অবস্থায় উপনীত হয়ে মাকামে ফারাক (পৃথক করার মাকাম) এর শেষ পর্যন্ত পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছেন। প্রথমতঃ তিনি সিফাত বরং ওই নূর, যার উপর সিফাত প্রতিষ্ঠিত, নিজ থেকে পৃথক দেখেছিলেন। নিজেকে শায়েখ শূন্য পেয়েছিলেন। এরপর যাত থেকে সিফাত পৃথক দেখলেন। এই দর্শনে জযবার মাকামের আহাদিয়াত (একত্ব) পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। এখন তিনি নিজেকে এবং ধরনীকে এমনভাবে হারিয়ে ফেলেন যে, তিনি বেষ্টনীরও বক্তা ছিলেন না এবং সঙ্গতারও বক্তা ছিলেন না। সূক্ষ্ম যাত অর্থাৎ আহাদিয়াতে ছেরফা (নিছক একত্ব) এর প্রতি এমনভাবে নিবদ্ধ ছিলেন যে, আক্ষেপ ও অজ্ঞতা ছাড়া তাঁর কোনো অস্তিত্বই ছিলো না।

এই মকতুব লেখার সময় থেকে আট নয় বছর পর্যন্ত তিনি হজরত মোজাদ্দেদ র. এর মহান দরবারে আধ্যাত্মিক সাধনায় থাকেন। এমনকি মাকামাতে ফায়েকাহ (ঊর্ধ্ব মাকাম) এবং উচ্চতর ঘটনাবলী থেকে ফয়েজপ্রাপ্ত হয়ে উসুলের মরতবা এবং এরশাদ ও হেদায়েতের মাকামে পৌঁছেন। হজরত মোজাদ্দেদ র. কাওন ও মাকান (প্রকৃতি ও বিশ্ব) থেকে উদাসীন ব্যক্তিকে খেলাফত এবং তরিকতের প্রশিক্ষণের এজাযত দিয়ে বড় শহর পাটনাতে প্রেরণ করলেন। তিনি নির্দেশানুসারে পাটনায় পৌঁছলেন ঠিকই, কিন্তু স্বভাবগত উদাসীনতার কারণে জনসমক্ষে বসবাস করতে পারলেন না। তিনি জঙ্গলে-অলিতে-গলিতে বাস করতে লাগলেন। এই কথা যখন হজরত মোজাদ্দেদ র. এর কাছে পৌঁছলো তখন তিনি একটি চিঠি লিখলেন। চিঠিতে লোকজনের সাথে মেলামেশা করার প্রতি উৎসাহিত করলেন। কেনোনা এই সূক্ষ্ম তরিকা নকশবন্দিয়া সোহবতের উপরেই নির্ভরশীল। চিঠিতে লেখা ছিলো—

হে সরলচিত্ত ভ্রাতঃ! আল্লাহ্‌র হুকুম পালন এবং নিষেধাজ্ঞা বর্জন না করে যেরূপ কারো কোনো উপায় নেই, তদ্রূপ খলকুল্লাহ্‌র (সৃষ্টজীবগণের) হকের দিকে লক্ষ্য না রেখে এবং তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন না করারও কোনো অবকাশ নেই। আল্লাহ্‌তায়ালার আদেশসমূহের সম্মান রক্ষা এবং খলকুল্লাহ্‌র প্রতি অনুগ্রহ করা 'আততাজীমু লি আম্‌রিল্লাহ্‌ ওয়াশ্‌ শাফকাতু আলা খালকিল্লাহ্‌' আরেফগণের একটি উক্তি। এই বাক্য দু'টি হকের (অধিকারের) কথা বর্ণনা করছে— যেনো উভয় দিককেই বজায় রাখা হয়। শুধু একটি নিয়ে থাকা দ্বীনের (ধর্মের) জন্য ক্ষতিকর। আংশিকভাবে ধর্মপালন করলে কামালিয়ত বা পূর্ণতা লাভ হয় না। সুতরাং খলকুল্লাহ্‌র হক আদায় করার দায়িত্ব গ্রহণ না করে কোনো উপায় নেই। তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা অবশ্যকর্তব্য। কঠোর স্বভাব শোভনীয় নয় এবং বেপরওয়া থাকাও সঙ্গত নয়।

জগদ্বাসীর নাজনী ও সেই
প্রেমের ফাঁদে হয় শিকার
নাজনী নি তার রয়না বজায়
করতে হয় এ দুঃখ স্বীকার।

অনেক দিন সংসর্গে ছিলেন এবং অনেক কথাই শুনেছেন বলে বিস্তারিত কিছু লিখলাম না। সংক্ষেপ করেই ক্ষান্ত হলাম। আল্লাহ্‌পাক আমাদেরকে ও আপনাদেরকে হজরত রসুলুল্লাহ স. এর প্রশস্ত শরীয়তের উপর দণ্ডায়মান রাখুন। মকতুবাত শরীফ ৭০/১।

এরপর তিনি পাটনা শহরে গঙ্গা নদীর তীরে এক ঘরে অবস্থান গ্রহণ করলেন। সেখানে একটি মসজিদ বানালেন। পূর্ণ আস্থা ও অল্পতুষ্টির মাধ্যমে নিজের পরিবারের সঙ্গে জীবনযাপন শুরু করলেন। মুরিদগণের উন্নতির কাজে মনোনিবেশ করলেন। সেখানকার বাসিন্দারা তাঁর সুবিধা ও অসুবিধার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন। তাঁর তরিকা পছন্দ করতেন ও তাঁকে ভালোবাসতেন। বিলীনতা, নাস্তি, আমিত্বহীনতা, অস্তিত্বহীনতা, কল্যাণকামনা, অমুখাপেক্ষিতা তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিলো। পৃথিবী ও পৃথিবীবাসী তাঁর সাহসের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ শক্তিহীন এবং আস্থাহীন ছিলো। অভাব ও দারিদ্র্যকে বরণ করে নেওয়ার ব্যাপারে তিনি সে যুগে ছিলেন একজন সাহসী ব্যক্তিত্ব।

বলা হয়ে থাকে, প্রাথমিক যুগে তিনি, মাওলানা তাহের লাহোরী এবং তাঁদের বন্ধুরা হজরত মোজাদ্দেদ র. এর কাছে দিল্লীতে আওয়ারেফুল মাআরিফ (শায়েখ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী) পড়তেন। একদিন তাঁদের খেয়াল হলো, সবক প্রদানের সময় তো হজরত মোজাদ্দেদ র. কোনো মারেফাত এবং সূক্ষ্মতত্ত্ব বর্ণনা করেন না। তাহলে তা পড়ে কী লাভ। তিনি যা বলেন, তা তো আমরাও জানি। হজরত মোজাদ্দেদ র. তাঁদের ধারণার বিষয়ে অবগত হলেন। বললেন, ওই দু'জনকে আমার মজলিশ থেকে বের করে দাও। তাই করা হলো। তাঁরা দু'জন সারাদিন জঙ্গলে থাকতেন এবং কখনো এসে দাঁড়াতেন দূর্গের ফটকের সামনে। কোনো কোনো হজরত যেমন— খাজা হুছামুদ্দীন আহমদ সহ অন্যান্য ব্যক্তি সুপারিশ করলেন। হজরত মোজাদ্দেদ র. বললেন, তাদেরকে ত্যাগ করো। তাদের নফস অবাধ্য। ওই সকল হজরত বললেন, মসজিদ ফিরোজীর মাটির নিচের কুঠুরী নাপাকে [১] পরিপূর্ণ। যদি আদেশ করেন, তাহলে ওই দু'জনকে ওই নাপাক আবর্জনা পরিষ্কার করার হুকুম দেই। তাহলে তাদের নফসের প্রায়শ্চিত্ত হয়। হজরত মোজাদ্দেদ র. অনুমতি দিলেন। তাঁরা দু'জন স্বহস্তে সকল ময়লা

১. যুবদাতুল মাকামাত পুস্তকে মাটির নিচের কুঠুরী পরিষ্কার করার কথা রয়েছে। নাপাকীর কথা উল্লেখ নেই।

আবর্জনা পরিষ্কার করে দিলেন। এরপর হজরত মোজাদ্দেদ র. তাঁদের প্রতি কৃপা ও মহানুভবতা প্রদর্শন করলেন। এভাবে কয়েকবার তাঁকে তাঁদের অশোভনীয় ধারণা বিষয়ে অবগত করানো হয়েছিলো এবং তিনি তাঁদেরকে সতর্ক করেছিলেন। হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ কুদ্দিসা সিররুহুকে এক মকতুবে তিনি লিখেছিলেন, শায়েখ নূর এখনও এই মাকামে থেমে আছে। জযবার মাকামের ঊর্ধ্ববিন্দুতে পৌঁছাতে পারেনি। আচরণ ও কার্যাবলীর দ্বারা কষ্ট দিচ্ছে এবং এটাকে সে নিন্দনীয়ও মনে করছে না।[১]

মোটকথা জালালী এবং জামালী প্রশিক্ষণের পর শায়েখ নূরের কার্যাবলী এ পর্যন্ত পৌঁছালো যে, হজরত মোজাদ্দেদ র. তাঁর সম্পর্কে বললেন, শায়েখ নূর রিজালুল গায়েব (অদৃশ্যের খবরপ্রাপ্ত)দের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এ কথায় বর্ণনাকারীর কিছু সন্দেহ রয়েছে যে, তাঁকে নুকাবা'র অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, না বলেছিলেন, তিনি নুজাবা'র অন্তর্ভুক্ত।

এই শায়েখ এই লেখক ফকির (বদরুদ্দীন সেরহিন্দী) হজরত মোজাদ্দেদ র. এর খেদমতে হাজির হওয়ার পূর্বেই খেলাফত লাভ করে পাটনায় চলে গিয়েছিলেন এবং মখদুমজাদা খাজা মোহাম্মদ সাদেক র. ১০২৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করার পর সেরহিন্দে এসেছিলেন। তখন তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ হয়েছিলো। তাঁর ললাট থেকে বিস্ময়কর হতাশা, আমিত্বহীনতা, বিলীনতা, নাস্তি এবং চিন্তাযুক্ততার চিহ্ন পরিস্ফুট হতো এবং এমন অনুভব হতো যেনো তিনি আলিফ, বা-ও পড়তে জানেন না। আল্লাহ্প্রাপ্তির রাস্তায় তিনি যেনো কোনো সাধনাই করেননি।

এই নগণ্য ফকির এ সময় হজরত মোজাদ্দেদ র. এর জীবন-বৃত্তান্ত সম্পর্কিত গ্রন্থ 'সিয়ারে আহমদ'[২] লেখার কাজে ব্যস্ত ছিলো। কখনো কখনো তাঁর দরবারে বসতাম। তখন তিনি অত্যন্ত দয়াপরবশ হয়ে আনুগত্য ও ইবাদতের প্রতি উৎসাহ দিতে গিয়ে বলতেন, মাকাম সম্পর্কে আলোচনা এবং অলৌকিক ঘটনা লিপিবদ্ধ করা কোনো কাজে আসবে না। এগুলো সবই অতিরিক্ত। মাকামাত লিপিবদ্ধকরণ করা থেকে দু'রাকাত নামাজ পড়া অধিক উত্তম।

---

১. কিন্তু আসল মকতুব (প্রথম খণ্ড ১৪ নং) এর মধ্যে শুধুমাত্র এতোটুকু রয়েছে— শায়েখ নূরও ঊর্ধ্ববিন্দুর নিকটবর্তী। এখন পর্যন্ত সে সেখানে পৌঁছাতে পারেনি। হজরত মোজাদ্দেদ র. ছয়টি মকতুব তাঁর নামে লিখেছিলেন। প্রথম খণ্ড ১। দ্বিতীয় খণ্ড ২৭০, তৃতীয় খণ্ড ৩৪, ৮৫, ১১১, ১২১। 'যুবদাতুল মাকামাত' পুস্তকে নূর মোহাম্মদ তিহারীর আলোচনা অন্য খলিফাদের সাথে এসেছে। এর দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, নূর মোহাম্মদ তিহারী এবং নূর মোহাম্মদ পাটনী ভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন।

২. হজরত বদরুদ্দীন সিরহিন্দী র. এর লিখিত গ্রন্থ 'সিয়ারে আহমদ' সম্পর্কে আমার জানা নেই। হতে পারে ওই গ্রন্থ হাজ্‌রাতুল কুদুস গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। ওই পাণ্ডুলিপিটি হয়তো হারিয়ে গিয়েছিলো, যেমন হাজ্‌রাত নবম এর মধ্যে কারামত প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

৩. শায়েখ আবদুল হামীদ বাঙ্গালী কুদ্দিসা সিররুহু

তিনি হজরত মোজাদ্দেদ র. এর প্রবীণ খলিফাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর জন্মভূমি বাঙ্গাল প্রদেশের মঙ্গলকোটে। তিনি ছিলেন যাবতীয় আকলী এবং নকলী জ্ঞানের সমষ্টি। তাঁর মধ্যে পূর্ণ শরীয়াত, তাকওয়া, দৃঢ়তা, মনোনিবেশ, পরিত্যাজ্য বিষয় পরিত্যাগ করার চূড়ান্ত পর্যায়ের অবস্থান ছিলো। নকশবন্দিয়া সিলসিলার আদব এবং পূর্ণ অনুকরণ এবং এ উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন তরিকার সমন্বয়ের চূড়ান্ত পর্বে ছিলেন। তাঁর মধ্যে দারিদ্র, অল্পে তুষ্টি, তাওয়াক্কুল, দুনিয়াবিরাগ এবং উত্তম স্বভাবসমূহের দৃঢ়তা এমন ছিলো যা ভাষায় প্রকাশ করার নয়। তিনি মাত্র এক বছর হজরত মোজাদ্দেদ র. এর খেদমতে পূর্ণ বিনয়ী ও উৎসর্গকৃত অবস্থায় ছিলেন। সুলুকের অধ্যায়গুলো অতিক্রম করে মহান প্রভুর আকর্ষণে মিলিত হয়ে বেলায়েতের স্তর পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন এবং কামাল ও তকমিল অর্জন করেছিলেন। হজরত মোজাদ্দেদ র. তাঁকে খেলাফত দান করে তাঁর নিজ দেশে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। নিজ দেশে তিনি জাহের এবং বাতেন উভয় বিষয়ে শিক্ষা প্রদানে নিয়োজিত ছিলেন। জনসমাদৃত হয়েছিলেন। খ্যাতিমান হয়েছিলেন বিশেষ ও সর্বসাধারণের মধ্যে।

হজরত মোজাদ্দেদ র. এর উচ্চ মর্তবাধারী সিলসিলায় তাঁর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ঘটনাটি এরকম— তিনি স্বীয় মাতৃভূমি থেকে বাহ্যিক জ্ঞান অর্জনের জন্য লাহোর গিয়েছিলেন। শিক্ষা শেষে স্বীয় মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তনের পথে আগ্রা পৌঁছলেন। সেখানে লঙ্করশাহীর মুফতি আবদুর রহমানের সঙ্গে তাঁর পূর্ব পরিচয় থাকার সূত্রে আন্তরিকতা হেতু তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য কয়েকদিন তিনি সেখানে অবস্থান করেছিলেন। তিনি আধ্যাত্মবাদ পছন্দ করতেন না এবং বিশেষভাবে তিনি হজরত মোজাদ্দেদ র. কে অস্বীকার করতেন। বিশেষ করে তিনি ওয়াহদাতুল অজুদ দর্শনকে কঠোরভাবে অস্বীকার করতেন। ইত্যবসরে, ওই সময় হজরত মোজাদ্দেদ র. আগ্রা অবস্থান করছিলেন। ছিলেন মাওলানা আবদুর রহমানের নিকটবর্তী একটি বাড়িতে। তিনি হজরত র. এর মুরিদদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। শায়েখ আবদুল হামীদ হজরত মোজাদ্দেদ র. এর খবর শুনে বিব্রতবোধ করলেন। মাওলানা আবদুর রহমানকে বললেন, আমি এ স্থান ছেড়ে চলে যাচ্ছি। আপনার কাছে আমার যে সকল পুস্তক আছে সেগুলো দিয়ে দিন। মাওলানা সাহেব বললেন, তাঁর প্রতি আপনার এমতো অবজ্ঞা প্রকাশের হেতু কী? শায়েখ হামীদ হজরত মোজাদ্দেদ র. এর নাম ধরে বললেন, আমি তাঁর খুব নিকটবর্তী অবস্থানে আছি। আমি তাঁর সম্পর্কে জানি। যদি আমি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ না করি তাহলে অসুবিধা, আর যদি সাক্ষাৎ করি তাহলে আরো বেশি অসুবিধা। মাওলানা সাহেব বললেন, হজরত মোজাদ্দেদ র. একজন বুজর্গ ব্যক্তি এবং বড় আলেম। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অসুবিধা কোথায়? তিনি বললেন, তাঁর সাথে সাক্ষাতের প্রবৃত্তি আমার নেই। এতোটুকু বলেই তিনি চলে গেলেন। দু'তিন দিন পর তিনি তাঁর ফেলে

যাওয়া একটি বই নিতে পুনরাগমন করলেন। ঘটনাক্রমে হজরত মোজাদ্দেদ র. সে সময় মাওলানা সাহেবের বাড়িতে উপস্থিত হলেন। মাওলানা অত্যন্ত আদব সম্মান ও বিনয়ের সাথে হজরতকে তাঁর বাড়ির মধ্যে নিয়ে গেলেন। তাঁকে দেখে শায়েখ আবদুল হামীদের মুখের রঙ বিবর্ণ হয়ে গেলো। নিতান্তই লজ্জিত অবস্থায় ঘরের এক কোণে বসে রইলেন তিনি। হজরত মোজাদ্দেদ র মাওলানা সাহেবকে সম্বোধন করে বললেন, আমি একটি মাসআলা জানার জন্য আপনার এখানে আগমন করেছি। মাওলানা সাহেব বললেন, এমন কোনো মাসআলা আছে যা আপনার অজানা? হজরত মোজাদ্দেদ র. বললেন, যেহেতু আপনি মুফতি তাই আপনার কাছ থেকে জেনে নিয়ে সেই অনুযায়ী আমল করা সঠিক হবে বলে আমি মনে করি। মাসআলাটি জেনে নেওয়ার পর বললেন, এবার বিষয়টি স্পষ্ট হলো। এরপর শায়েখ আবদুল হামীদের প্রতি মুখ ফিরিয়ে বললেন, হে শায়েখ আবদুল হামীদ! আপনি এখানে? একথা বলে তাঁর দিকে দু'একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। মাওলানা খুবই অনুনয় করে বলতে লাগলেন, আপনার জন্য দস্তরখানা প্রস্তুত। কিন্তু আপনি তো কবুল করলেন না। মাওলানা প্রধান দরোজা পর্যন্ত হজরতকে বিদায় দেয়ার জন্য গেলেন। মাওলানা সাহেব বর্ণনা করেন, আমি দেখলাম শায়েখ আবদুল হামীদ হজরত মোজাদ্দেদ র. এর পিছনে পিছনে ক্রন্দনরত অবস্থায় পথ চলছেন। কিন্তু হজরত মোজাদ্দেদ র. তাঁর দিকে ভ্রুক্ষেপ করলেন না। ইতোমধ্যে তিনি তাঁর গন্তব্যে পৌঁছে গেলেন। শায়েখ তাঁর দরজায় অত্যন্ত চিন্তাক্লিষ্ট অবস্থায় অবনত মস্তকে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে রইলেন। বেশ কিছু সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর হজরত মোজাদ্দেদ র. শায়েখকে নির্জন কক্ষে ডাকলেন। তাঁকে একান্ত সন্নিধানে বসালেন। তওবা, তালিম এবং আধ্যাত্মিক সম্পর্কে আবদ্ধ করে নিলেন। শায়েখের আত্মিক হাল প্রবলতর ও গভীরতর হতে লাগলো। হালের হাতে পরাভূত হলেন তিনি। বন্ধুমহল ও হিতাকাঙ্ক্ষীদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। কিছুদিন পর হজরত মোজাদ্দেদ র. সেরহিন্দে প্রত্যাবর্তন করলেন। শায়েখও তাঁর অনুসরণ করলেন এবং অল্পদিনেই শায়েখ যে তওহীদে অজুদীকে অস্বীকার করতেন, সে তওহীদে অজুদীর মধ্যে নিমগ্ন হয়ে গেলেন। প্রত্যেক বস্তুর প্রতি তিনি অনুরাগ বোধ করতে লাগলেন। এমনকি পাখিদের উপস্থিতিও তাঁর উপর হালের প্রভাব বিস্তার করলো।

বলা হয়েছে, [১] একদিন তিনি রাস্তা দিয়ে চলার সময় এক মৃত পশু পড়ে থাকতে দেখলেন। তার দাঁত বের হয়েছিলো। শায়েখ এই অবস্থা দেখে বিস্মিত হলেন এবং তওহীদের প্রাবল্যহেতু অস্বাভাবিক হয়ে বলতে লাগলেন, হে প্রভু! এ কেমন আচরণ। এ পোশাকে আসা এবং নিজেকে এ আকৃতিতে বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর হেতু কী?

১. যুবদাতুল মাকামাত নামক গ্রন্থের শায়েখের সঙ্গে মীর মোহাম্মদ নোমানও ছিলেন বলে উল্লেখ রয়েছে।

কোনো কোনো হজরত থেকে এরকমও শোনা গিয়েছে যে, হজরত মোজাদ্দেদ র. এর আগ্রাগমন, অতঃপর মাওলানা আবদুর রহমান মুফতির বাড়িতে গমনের মূল উদ্দেশ্যই ছিলো শায়েখ আবদুল হামীদকে নিজের কাছে আনা। তিনি এ বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছিলেন। মাওলানা আবদুর রহমান বলতেন, শায়েখের প্রতি হজরত মোজাদ্দেদ র. এর এ ধরনের আচরণ দেখে হজরতের প্রতি আমার একাগ্রতা ও আস্থা আরো অধিক গুণে বৃদ্ধি পেলো। যখন কেউ মাওলানা সাহেবের কাছে হজরত মোজাদ্দেদ র. এর কারামত জিজ্ঞাসা করতেন, তখন অত্যন্ত আগ্রহ ও আকর্ষণের সংগে তিনি এই ঘটনাটি কখনো সংক্ষিপ্তভাবে বা কখনো বিস্ত ারিতভাবে বর্ণনা করতেন। এরপর শায়েখ জযবা ও সুলুকের পথ অতিক্রম করে বেলায়েতের স্তরে উপনীত হলেন। খেলাফত [১] লাভে ধন্য হলেন। মাশায়েখদের প্রথা অনুযায়ী খলিফাকে বিদায় প্রদানের প্রাক্কালে খেরকা ও খেলাফত দান করা হলে শায়েখ বরকত স্বরূপ হজরত মোজাদ্দেদ র. এর কাছে জুতা চেয়ে নিলেন। শায়েখ জুতা নিয়ে মুখে বুলালেন। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে অশ্রু বিসর্জন করতে করতে উল্টো পায়ে যাত্রা করলেন। লোকেরা তাঁকে বিদায় জানাতে এসে তাঁর সাথে সাথে গেলেন। তাঁরা বলতেন, যতদূর সেরহিন্দ শহর দৃষ্টিগোচর হলো ততদূর পর্যন্ত শায়েখ এভাবেই পথ চললেন। আর এই জুতাকে তিনি পাগড়ির সাথে বেঁধে নিলেন এবং মাথায় টুপি রাখার মতো রেখে নিজের মাতৃভূমিতে ফিরে গেলেন।

যদি ওই স্থানের কিছু মাটি আমি পাই
মুকুট থেকে অধিক মূল্য তার আমার কাছে ভাই।

যখন শায়েখ নিজ বাড়িতে পৌঁছলেন, তখন ওই জুতা রাখার জন্য পৃথক একটি ঘর নির্মাণ করলেন এবং বড়ই সম্মানের সাথে সেখানে জুতা সংরক্ষণ করলেন। আশেপাশের লোকেরা ওই তবারক সম্পর্কে জানতে পারলো। তারা নিজেদের ইচ্ছা পূরণের জন্য ও সমস্যা সমাধানের জন্য সেখানে হাজির হতে লাগলো। তারা রোগ পীড়া থেকে মুক্তি পাবার জন্য পাত্র ভর্তি পানি নিয়ে আসতো। শায়েখ ওই পানির পাত্রে জুতার একটি অংশ ডুবিয়ে দিতেন। লোকেরা এতেই আরোগ্য লাভ করতো। মরণাপন্ন কোনো রুগীর জন্য পানিপাত্র উপস্থিত করা হলে ওই পাত্রে জুতার অংশ ডুবানোর সাথে সাথে পানির পাত্র ফেটে যেতো। বিষয়টি অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানা গিয়েছে।

তাঁর পদচিহ্ন পড়তো যেখানে
কিছুক্ষণের জন্য হলেও চক্ষুষ্মানেরা সেখানেই হতো অবনত। [২]

---

১. যুবদাতুল মাকামাত পুস্তকে উল্লেখ করা হয়েছে, শায়েখ আনুমানিক দু'বছর পর্যন্ত উপস্থিত ছিলেন।

২. আল্লামা জামী র. এর লিখিত কবিতা এরূপ—
বাহ জমিনে কেহ নিশানে কাফে পায়ে তো বুয়াদ
ছালেহা লিজা ছাহেবে নজরান খাহেদে বুয়াদ

যতদিন পর্যন্ত শায়েখ জীবিত ছিলেন, ততোদিন এরকমই চলতে থাকলো। শায়েখের ইন্তেকালের পর তাঁর শিয়রে একটি তাক বানিয়ে ওই তাকে জুতা রাখা হলো। প্রয়োজনবোধকারীরা সেখানে উপস্থিত হতো এবং আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে তাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হতো।

লেখক [১] (বদরুদ্দীন সেরহিন্দী) শায়েখের খেলাফতপ্রাপ্তির এক বছর পর হজরত মোজাদ্দেদ র. এর গোলামগণের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। তাই শায়েখের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভের সুযোগ হয়নি। কিন্তু আমি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ও কামালতধারী ব্যক্তির কাছে একটি পত্র লিখেছিলাম এভাবে যে, এই নগণ্য হজরত মোজাদ্দেদ র. এবং তাঁর খলিফাবৃন্দের বৃত্তান্ত লিখছেন। নিবেদন এই যে, তাঁর জীবন-বৃত্তান্ত ও কারামত সম্পর্কে আপনার যা স্মরণ আছে, তা লিখে জানাবেন। নিজের অবস্থাদিরও বিবরণ লিখবেন। হজরত মোজাদ্দেদ র. যে খেলাফতনামা লিখে দিয়েছিলেন, তার একটি অনুলিপি প্রদান করে অনুগ্রহ করবেন। শায়েখ প্রতি উত্তরে যে চিঠি লিখেছিলেন, তা হুবহু নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

কুদসিয়্যাহ্‌ ঃ মহান আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তম চরিত্রের সমষ্টি। সকল মাশায়েখদের ঠিকানা, কামালতের ধারক, শায়েখ মিঞা বদরুদ্দীনকে সর্বদাই তাঁর রহমতের ছায়াতলে স্থান দান করুন এবং তাঁর রহমত ব্যতীত অন্য সকল কিছু থেকে দূরে রাখুন। আমিন। আপনার হৃদয়ের সজীবতা দিয়ে আমার কাছে যে অনুগ্রহলিপি প্রেরণ করেছিলেন, তা পেয়ে মূল বিষয় সম্পর্কে অবগত হয়েছি— আপনি অতি সুন্দর ইচ্ছা পোষণ করেছেন। আল্লাহ্‌ আপনার ইচ্ছা পূরণ করুন। আপনি এই নগণ্য ফকিরের কাছে মিঞাজী কুদ্দিসাসিররুহুর হালাত ও কারামত যা আমার স্মরণে আছে, তা জানতে ইচ্ছা পোষণ করেছেন। এভাবে নাকি অন্যান্য বন্ধুগণও লিখেছেন। তাঁর খাদেমবৃন্দের জানা আছে যে, হজরত মোজাদ্দেদ র. তাঁর হালাত ও মাকাম সম্পর্কে এমন কোনো বিষয় নেই, যা তাঁর মকতুবাতে উল্লেখ করেননি। এই বাস্তুহারা যা কিছু বর্ণনা করতে ইচ্ছা পোষণ করবে, হজরত র. তা মকতুবাতের মধ্যে আলোচনায় নিয়ে এসেছেন। এজন্য বলার কিছুই অবশিষ্ট নেই। শুধু ওই বিষয়টি অবশিষ্ট রয়েছে, যা এই নগণ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট। হজরত র. এর খেদমতে জীবনের যে অধ্যায়টুকু অতিবাহিত হয়েছে, সে সম্পর্কে লিখে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। মহান

১. বদরুদ্দী সেরহিন্দী নবম হাজ্‌রাতে লিখেছেন, তিনি হজরত মোজাদ্দেদ র.এর খেদমতে (শেষের দিকে) সতেরো বছর অবস্থান করেছিলেন। অর্থাৎ ১০১৭ হিজরীতে খেদমতে এসেছিলেন। আর ১০১৬ হিজরীতে শায়েখ আবদুল হামীদ খেলাফত প্রাপ্ত হন। তিনি আনুমানিক দু'বছর সেরহিন্দে ছিলেন। অর্থাৎ ১০১৪ হিজরীতে বায়াত গ্রহণ করেছিলেন। সম্ভবত ওই বছরই তিনি আগ্রায় হজরতের মহব্বতে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

হজরতের মাকামসমূহ এবং তাঁর পরমোৎকৃষ্ট হালসমূহের সাথেই সংরক্ষণ করা যেতে পারে। বিন্দু পরিমাণ বাধা সূর্য পর্যন্ত পৌঁছানোর অন্তরায়। অবশ্য খেলাফতনামা, যা আপনি চেয়েছেন, তা আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। ওয়াস্ সালাম আলা মানিত্তাবাআল হুদা। চিঠির উপরে লেখা ছিলো— মুখলিছ গায়েবানা সূফী হামীদ। খেলাফতনামার অনুলপি নিম্নরূপ ঃ

'আম্মাবা'দুল হামদু ওয়াস্সলাত, ফাইয়াকুলূল আবআদুল মুফাতাকাররা ইলা রহমাতিল্লাহিল মালাকুল অলিয়্যি আহমাদ বিনিশ শায়খ আবদুল আহাদিল ফারুকীন নাকশাবন্দীয়া রাহিমাহুমুল্লাহু সুবহানাহু রহমাতুও ওয়াসিআতুন আন্না আখুল আলিমু ওয়াসাদীকুস সালেহ্ জামিউ উলুমুশ শারীয়াতে ওয়া তরিকাতে ওয়ালহাকীকাতে আশ্ শায়েখ হামীদুল বানগালী অফ্ফাকহুল্লাহ্ সুবহানাহ্ লিমা ইউহিব্বুহু ওয়া ইয়ারদাহু লাম্মা কুতিয়া যানাযিলায সুলুক ওয়া উরুজা মাআরিজুল জমবাতি ওয়া ওয়াসালা ইলা দরজাতিল বেলায়াতা। বা'দা ইন হাসালা লাহু ইনদারাজান নিহায়াতে ফিল বিদায়াতে ইজাযাতহু লি তা'লিমি তরিকাতিল মাশায়েখে নকশবন্দীয়াতে কাদ্দাসাল্লাহু তায়ালা ইসরারহুম লিত্ ত্বলিবীনাল্ মুস্তারশিদীনা ওয়াল মুরিদিনাল মুখলিসীনা বা'দা ইসতিখারাতু ওয়াহুসুলিল ইযনি মিনাল্লাহি সুবহানাহু ওয়ালমাসউলু মিনাল্লাহে সুবহানাহু আই ইয়াসিমাহু আম্মা লা ইয়ালিকু ওয়াইয়াহফাজুহু আম্মা লা ইয়ামবাগী ওয়াল ইসতিকামাতু আলা মুতাবিআতু সাইয়্যেদিল মুরসালীনা আলাইহি ওয়া আলাইহিমুস সলাতু ওয়াত তাসলীমাত।

শেষে শায়েখ বিশেষ দ্রষ্টব্য পর্বে লিখেছেন, এই খেলাফতনামা হুবহু মূল অনুলিপি, যা হজরত মোজাদ্দেদ র. এর চিঠিতে রয়েছে।

কুদসিয়্যাহ্ ঃ শায়েখ আবদুল হামীদ দীর্ঘদিন পর দুই মখদুমজাদার কাছে বাঙ্গাল থেকে যে চিঠি পাঠিয়েছিলেন, তা হুবহু নিম্নে সংকলন করা হলো।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্র জন্য, যিনি আপনাদের দু'জনকে (খাজা মোহাম্মদ সাঈদ এবং খাজা মোহাম্মদ মাসুম) আমাদের মাওলানা, মুর্শিদিনা, কিবলাতিনা, কুতুবুল এরশাদ এবং বদরুজ্জিহাদ কুদ্দিসা সিররুহুর স্থলাভিষিক্ত করেছেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের জামানার পর তাঁর সমকক্ষ আর কেউ নেই। তিনি দুই মোহাম্মদের মধ্যবর্তী আহমদ (রসুলে আনওয়ার সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মোহাম্মদুল মাহদীর মধ্যবর্তী) এবং দু'জনের মধ্যে দ্বিতীয়। তাঁর ফয়েজপ্রাপ্তি পূর্বের ন্যায় হুবহু বর্তমান।

কিয়ামত পর্যন্ত খাজা মোহাম্মদ সাঈদ এবং খাজা মোহাম্মদ মাসুমকে আল্লাহ্ নিরাপদ ও শান্তিতে রাখুন। ওই সময় পর্যন্ত, যে সময় পর্যন্ত তাঁরা কামনা করেন। তাঁদের এবং তাঁদের সন্তানগণকে দীর্ঘজীবী করুন। আম্মা বাআদ।

নিবেদন এই যে, দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলো আপনাদের দু'জনের অবস্থা ও কুশলাদি বিষয়ে খবর পাইনি। কুশল জানিয়ে ধন্য করবেন। যারা সত্য পথ অবলম্বন করেছেন, তাঁদের প্রতি [১] সালাম।

শায়েখ আবদুল হামীদ ১০৫০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তারপর তাঁর সন্তান শায়েখ হাবীবুর রহমান, যিনি বিশেষ হাল ও মাকামধারী ছিলেন, দৃঢ়তায় পূর্ণ ও কারামতসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন, তিনি স্থলাভিষিক্ত হন। বর্তমানে তিনি মুরিদগণের তা'লীম প্রদানে সক্রিয়। তাঁর সোহবত খুবই প্রভাবশালী। মানুষের কাছে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা খুব বেশী।

৪. শায়েখ মোহাম্মদ তাহের লাহোরী কুদ্দিসা সিররুহু

মাওলানা শায়েখ মোহাম্মদ তাহের কুদ্দিসা সিররুহু হজরত মোজাদ্দেদ র. এর একজন উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন মুরিদ ও খলিফা ছিলেন। তিনি আকলী ও নকলী এলেমে পণ্ডিত ছিলেন। লাহোরের প্রসিদ্ধ বুজর্গ ছিলেন। কঠোর রেয়াজত, কঠিন সাধনা, কাশফ, ইলহামাত, কারামত ও জযবাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। সেখানকার বড় আলেম, নেককার এবং সাধারণ লোকের মধ্যে বড়ই গ্রহণযোগ্যতা ছিলো তাঁর।

মহান আল্লাহ্‌র অসীম অনুগ্রহে এই পথে তাঁর বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিলো। সে যুগের শ্রেষ্ঠ ও আকমাল আউলিয়াগণের মধ্য থেকে হজরত মোজাদ্দেদ র. ব্যতীত অন্য কেউ এমন শ্রেষ্ঠতা পাননি। এই নগণ্যের অসহায়ত্বই তাকে হজরতের মহান দরবারে পৌঁছে দিয়েছিলো। বছরকাল সেখানে নিজেকে উজাড় করে দিয়ে বিনয়ের সঙ্গে অবস্থান [২] করেছিলেন। হজরত মোজাদ্দেদ র. তাঁর উচ্চ মর্তবাধারী সন্তানদের তরবিয়তের দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত করেছিলেন। [৩] তিনি শিক্ষক হওয়া সত্ত্বেও হজরত মোজাদ্দেদকে খুব বেশী শ্রদ্ধা করতেন এবং তাঁকে এতো বেশী আদবসহ ভয় পেতেন যা বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

একদিন হজরত মোজাদ্দেদ র. তাঁকে ইমামতের নির্দেশ দিলেন। তখন তাঁর চেহারা হলুদ বর্ণ হয়ে গেলো। সারা শরীর কাঁপতে শুরু করলো। অথচ তিনি

---

১. শায়েখ আবদুল হামীদের নামে মকতুবাত শরীফে পাঁচটি মকতুব রয়েছে। প্রথম খণ্ডে ১৫৮, ২২০, ২৯২ এবং দ্বিতীয় খণ্ডে ৪৬, ৮৪।

২. যুবদাতুল মাকামাত পুস্তকে রয়েছে তিনি আনুগত্যশীল ও বিনয়ী আলেম ছিলেন। কখনো কখনো দরবেশগণকে বলতেন,ঝাড়ুদারদের বলে দাও, তারা যেনো ঝাড়ু না দেয়। শায়েখ তাহের নিজেই ঝাড়ু দিবে।

৩. যুবদাতুল মাকামাতে এরকমও রয়েছে যে, মখদুমজাদা বলতেন, হজরত শায়েখ তাহেরের ইহসান এতো বেশী যে, কোনোক্রমেই আমরা তাঁর শোকর আদায় করে শেষ করতে পারবো না।

কোরআনের হাফেজ এবং বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন। হজরত মোজাদ্দেদ র. এর ভয়ে ক্বেরাত থেমে থেমে যাচ্ছিলো। সুতরাং এমন সম্মান, শ্রদ্ধা, আদব ও শিষ্টাচারের বিনিময়ে হজরত মোজাদ্দেদ র. এর মূল্যবান দৃষ্টির বরকতে তিনি কামাল ও তাকমীলের মরতবায় পৌঁছেছিলেন এবং সুলুক পরিপূর্ণ করার পর উচ্চমর্তবাসম্পন্ন সিলসিলা নকশবন্দিয়ার প্রশিক্ষণদানের জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। তিনি কাদেরিয়া তরিকারও খেরকাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং চিশতিয়া তরিকার খেরকাও বরকত স্বরূপ পেয়েছিলেন। হজরত মোজাদ্দেদ র. তাঁকে লিখিত খেলাফতনামা দিয়েছিলেন এবং মুরিদগণের তরবিয়তের জন্য বড় শহর লাহোরে প্রেরণ করেছিলেন। এজাযতনামা [১] নিম্নরূপ ঃ

খেলাফতনামা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম।

বা'দুল হামদু ওয়াল মানাতা লি ওয়ালিয়্যিহি ওয়াস্সলাতু ওয়াত্তাহিয়্যাতু আলা নাবিয়্যিহি ওয়া আলা আলিহি ওয়াআসহাবিহিল কারামিদ দাআয়নি লিলহাক্বি ইলা দারিস সালাম। ইয়াকুলুল আবদুল ফকীরে ইলা রহমাতিল্লাহিল অলিয়্যিল গানিয়্যি আহামাদ বিন আবদুল আহাদিল ফারুকিউন নাকশবন্দী গাফারাল্লাহু সুবহানাহু যুনুবুহুমা ওয়া ছাতারা উয়ুবিহুমা আন্নাল আখুল আলিমিল আমিলিল ফাজিলিল কামিলুশ শায়খ মোহাম্মাদুত্ তাহেরু লাম্মা অফ্ফাকাহুল্লাহু সুবহানাহু ওয়াতাআলা বিসুলুকি তরীকাতি আউলিয়ায়িহী ওয়াদাখালা ফিত্ তরীকাতিল আলিয়্যাতিন নকশবন্দীয়াহ মাজমাউল হিম্মাতি ওয়াতামামুন নাহমাতি হাছালা লাহুল হুজুর ওয়াশশুহুদি ওয়াল কুরবাতি ওয়াল জামইয়্যাতি ওয়া তাইয়াস্সারা লাহুল বাদাইয়াতাল্লাতী আনদারজাত ফীহান নিহায়াতা ফাইযা মাজাত বুরহাতুম মিনায্যামানি ওয়া হুয়া আলা হাযিহিল আহওয়ালি জহারালী আন্নাহু ছাইউবতালী বিইযতিলায়ে আজীম হাত্তা ইয়াখরাজু মিনাস সিরাতিল মুস্তাকীম ইলা ছুবুলি মুতাফারিরকাতু ওয়া ইয়ামিলু মিনমাযহাবি আহলুল হাক্বি ইলা মাযাহিবি বাতিলাতুন ফাহিমনী যালিকা ওয়ালজানী ইলাত তাফাররুয়ে ওয়াল খুশুয়ি ইলাল্লাহি

---

১. এই এজাযতনামার মধ্যে শায়েখ মোহাম্মদ তাহেরের কিছু সীমাবদ্ধতার কথাও উল্লেখ ছিল। নূর মোহাম্মদ পাটনীর বর্ণনাধারাতেও এ সম্পর্কে কিছু আলোচনা এসেছে। যুবদাতুল মাকামাতেও এ কথার উল্লেখ রয়েছে। একবার হজরত মোজাদ্দেদ র. জিকিরের মজলিসে দেখলেন তাঁর ললাটে 'হতভাগা' লেখা আছে। হজরত মোজাদ্দেদ র. প্রথম খণ্ড ২১৭ নং মকতুবে তাকদীরে মুবরাম (অপরিবর্তনীয়) এবং তাকদীরে মুআল্লাক (পরিবর্তনীয়) এর আলোচনায় এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন। যুবদাতুল মাকামাতে রয়েছে, শায়েখ মোহাম্মদ তাহের একবার বললেন, হজরত মোজাদ্দেদ র. এমন হাল ছিনিয়ে নিতে পারেন না, যে কারণে আমি বিলীন বা শূন্য হয়ে যাবো। এ কথা শুনে হজরত র. তাঁর সকল হাল ছিনিয়ে নিলেন। তারপর মাফ করে দিলেন।

সুবহানাহু লিইয়াযহাবা আনহু হাযাল ইবতিলায়ে ওয়া ইয়ারফাউ আনহু যালিকাল বালাউ ছুমমা জহারালী বা'দাত তাজাররুয়িত তাম্মি আন্নাহু সাওফা ইয়ারফাউ আনহু যালিকাল ইবতিলায়ি ফাহামাদতুল্লাহ সুবহানাহু আল যালিকা ওয়াক্বদ জাহারা বা'দা মুদ্দাতিন ইয়াছিরাতুম মিনহু মা জাহারালী আওয়ালান হাত্তা খারাজা মিনাল ইসতিকামাতি ইলাল আ'অজাজু ওয়ামালা মিনাল হাক্কি ইলাল বাতিলি বিহায়ছু ইনকাতাআ রজাআনা মিন আই ইয়াউদু ইলাল হাক্কি ওয়া ইয়ারজিউ ইলাল ইসতিকামাতি হুয়া হুল্লামা দাখালা ফী সাবীলী মিনাস সুবুলিল মুতাফার্‌রিকাতি ওয়া আজহারাহুল্লাহু সুবহানাহু। আলাইয়্যা তাওয়াজ্‌জাহতু বি আউনিল্লাহি সুবহানাহু ওয়া তাওফিকাহু ইলা ইখরাজিহি মিন যালিকাল সাবীলি বিল কাসরিত তাম্মি ওয়া সা'য়াতু বা'দা যালিকা ফী আন আছ্‌ছাদা যালিকাস সাবীলি হাত্তা লা ইয়াকুনু লাহু উদু ইলা যালিকা ছানিয়ান ওয়া মাজতুশ শুহুরি বালিস্ সুনুনি আলা হাযিহিল হালাতি ছুম্মা জাহারা বি তা'য়িদিল্লাহু সুবহানাহু মা জাহারা ছানিয়ান ফাআদা ইলাল হাক্কি রজাআ ইলা সিরাতিল মুস্তাকিম ছুম্মা কাতাআ মা বাকীয়া লাহু মিন মানাজিলিল জাযবাতি ওয়া মাকামাতিস সুলুক ওয়াস্‌রা আহলান লি আন্‌না ইউর্‌খাসু লিতা'লিমি হাযিহিত্ তরিকাতি ওয়া তারবিয়াতিত্ তলাবাতি ফারখখাসতু লাহু বি যালিকা বা'দাল ইসতিখারাতি ওয়াত্ তাওয়াজ্জুহি ওয়াফ আল মাসউলু মিনাল্লাহি সুবহানাহু আল ইস্‌তিকামাতু ওয়াস্ সিবাতু আলা মুতাবিআতি সাইয়্যিদুল আউয়ালাইনি ওয়াল আখিরীনা আলাইহি ওয়া আলা আলিহিস্ সলাতু ওয়াত্ তাসলিমাতু আলাম্মা কানাশ্ শায়খুল মাশারা ইলাইহি মিন তরিকিস সিলসিলাতিল কাদরিয়াতি ওয়াল চিশতিয়াতি হাজ্‌জুন অফিরুন ওয়ানাসীবুন কামিলুন রুখসাতালাহু আয়জান আই ইউ'তা লিল মুরিদীনা খিরকাতাল্ ইরাদাতি ফিল্ কাদরিয়াতি ওয়া খিরকাতুত্ তাবারাকা ফিত্ তরিকিল চিশতিয়াতি ওয়াল মাসউলু মিনাল্লাহি সুবহানাহুল ইসমাতু ওয়াত্ তাওফিকু ওয়াল্ হামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন আওয়ালান ওয়া আখিরান ওয়াস্‌সলাতু ওয়াস্‌সালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালীনা দায়িমান সারমাদান ওয়া আলা আলিহিল ইজামা ওয়া আসহাবিহিল কারাম।

তিনি লাহোর শহরে ফয়েজ পৌঁছানোর কাজে নিয়োজিত হলেন। কিন্তু তাঁর পছন্দ ছিলো একাকীত্ব ও নির্জনতা। একাকী হুজরার মধ্যে বসে থাকতেন এবং দরজা শিকল দিয়ে আটকে দিতেন। মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ দান থেকে বিরত থাকতেন। বিশেষ করে আমীরগণ ও ধনাঢ্য ব্যক্তিগণকে কাছে আসতে দিতেন না। কেউ এলে তিনি সাথে সাথে দরজা বন্ধ করে দিতেন। কোনোক্রমেই তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন না। তাঁর জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম ছিলো তাফসীর, হাদিসের কিতাব লেখা যেমন তাফসীরে বায়হাকী এবং মেশকাত অতি সুন্দর বর্ণে লিখতেন এবং তার সাথে হাশিয়া (টিকা) লিপিবদ্ধ করে অলংকৃত করতেন।

বিভিন্ন পাণ্ডুলিপির সাথে মিলিয়ে দেখতেন এবং সুন্দর করে বাঁধাই করে বিক্রি করতেন। কিতাব ব্যবসার মাধ্যমে তাঁর জীবিকা নির্বাহ হতো।

তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি একাকী অতিবাহিত করেছেন। কিন্তু শেষ জীবনে রসুল স. এর সুন্নত আদায়ের জন্য বিবাহ করলেন। তিনি প্রতি বছরে একবার বা একাধিক বার কখনো দু'বছরে একবার হজরত মোজাদ্দেদ র. এর দরবারে এসে ফয়েজ ও বরকত হাসিল করতেন। এরপর হজরত র. এর অনুমতিক্রমে দেশে ফিরে যেতেন। মাঝে মাঝে নিজের হাল, মাকাম ও বিস্ময়কর ঘটনাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত লিখে চিঠি পাঠাতেন। ওই সকল চিঠির কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হলো। তাঁর চরিত্র অতি উত্তম ছিলো। আমিত্বহীনতা, দারিদ্র, বিলীনতা (ফানা) তাঁর উপরে খুব প্রবল ছিলো। কিন্তু বাক্যালাপের সময় খুবই হাস্যোজ্জ্বল থাকতেন। তিনি বলেন, একবার হজরত মোজাদ্দেদ র. অভিশপ্ত ইবলিসকে দেখলেন। জিজ্ঞেস করেলেন, আমার কোন কোন মুরিদের কাছে তোমার শক্তি কার্যকর হয় না? সে বললো, তাহের লাহোরীর প্রতি ওই সময় আমার শক্তি কাজ করে না, যখন সে ক্ষুধার্ত থাকে। শায়েখ কঠোর রেয়াজত ও সাধনা করতেন। কঠোর রেয়াজতের কারণে তাঁর শরীর কৃশ হয়ে গিয়েছিলো। চামড়া হাড়ের সাথে লেগে গিয়েছিলো। তিনি খুবই কাশফ ও কারামতধারী ব্যক্তি ছিলেন।

এখন আমি শায়েখের পবিত্র বাণীসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করছি।

আরিজাহ (নিবেদন) ১ ঃ নগণ্য মোহাম্মদ তাহের হজরতের দরবারে নিবেদন করে যে, যখন ওই মহান দরবার থেকে এদিকে রওয়ানা হলাম, তখন প্রতি কদমে নফস নিজে থেকেই নিজেকে বলতে লাগলো, হে মূর্খ! তোমার উদ্দেশ্যকে পিছনে রেখে তুমি কোথায় যাচ্ছো? আবার পিছন থেকে কে যেনো বলছে, চলো, সামনে চলো। এই দরবেশকে টেনে হিঁচড়ে এই শহরে আনা হয়েছে। জঙ্গলের একটি প্রান্তে চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে বসে গেলাম। হঠাৎ হজরত খাজা বুজর্গের রূহানিয়াত প্রকাশিত হলো। এর অর্থ হলো— হজরত মোজাদ্দেদ র. যে কাজের জন্য পাঠিয়েছেন তা শুরু করো। সুতরাং খাজা সাহেব র. এবং মোজাদ্দেদ র. এর নির্দেশ পালনার্থে কয়েকজনকে জিকিরে লিপ্ত করালাম। এমন সময় এক দীর্ঘদেহী যুবক উপস্থিত হলো। তাকে জিকিরের নিয়ম বললাম। সাথে সাথে তার দেহে জিকির জারী হয়ে গেলো। মাথা থেকে পা পর্যন্ত জিকির হতে লাগলো। অন্যান্য মুরিদগণেরও একাগ্রতা ও হুজুরী লাভ হলো। ঈর্ষাপরায়ণ কিছু ব্যক্তি হজরত মোজাদ্দেদ র. এর মাকামের সিলসিলার মধ্যে এবং বিশেষ করে হজরত আবু বকর সিদ্দীক রা. সম্পর্কে যা কিছু লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তার মধ্যে কিছু কথা নিজের দিকে টেনে নিয়ে বিষোদগারের রাস্তা উন্মুক্ত করেছিলো। মাওলানা আবদুল

হামীদ হুজুরের ওই মকতুব আল্লামাতুল আনাম মাওলানা আবদুস সালামের কাছে উপস্থাপন করলেন। মাওলানা অধ্যয়নপূর্বক বললেন, এর পরে আর কোনো সন্দেহ আরোপ করা চলে না। তিনি কিছু ইতিবাচক ধারণার অবতারণা করলেন। ফলে ঈর্ষাপরায়ণদের ঈর্ষা বন্ধ হলো।

আরিজাহ ২ ঃ সালাম নিবেদনপূর্বক জানাই হজরতের তিন তরিকা (নকশবন্দিয়া, কাদেরিয়া এবং চিশতিয়া) এর নেসবত চলমান। তরিকাসমূহের অসংখ্য মাশায়েখ আগমন করছেন। খুবই অনুকম্পা প্রদর্শন করছেন। বিশেষ করে খাজা বুজর্গ হজরত গউছুছ ছাকালাইন আবদুল কাদের জীলানী এবং হজরত শায়েখ ফরিদ শকরগঞ্জ কাদ্দাসাল্লাহু তায়ালা এর মতো গুপ্তরহস্য ধারকগণ এমনিভাবে জিকিরের মজলিসে, তারাবী নামাজে হজরত রসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, হাজারো সাহাবা কেরাম (রেজওয়ানুল্লাহি আলাইহিম) এবং মাশায়েখবৃন্দ (রহমাতুল্লাহি আলাইহিম) আগমন পূর্বক দীর্ঘ সময় অনুগ্রহ দান করেছেন। রমজানের শেষ দশকে এতেকাফের মধ্যে বিশেষ নির্জনতায়ও অফুরন্ত অনুগ্রহ পাচ্ছি। হজরত ফাতেমা (রাজিয়াআল্লাহু আনহা)ও বিশেষ অনুগ্রহ দান করেছেন। বাতেনী নেয়ামত দানে ধন্য করেছেন। এমনি শুভক্ষণে অনেক কিছু উরুজ ও নুযুলের ঘটনা ঘটেছে। তারপর অনেক মাকাম অতিক্রম করে আমি রসুলে আনওয়ার সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রওজা মোবারকে পেলাম।

এরপর রওজা মোবারকের নূর আমার ঘরে আগমন করলো। ওই নূর আমাকে পরিবেষ্টন করলো। এরপর আমার কাজে প্রতিবন্ধকতা দূর হলো। প্রকৃত মিলনের অবস্থা প্রকাশিত হলো। কথা-বার্তাও হলো। এরপর অজ্ঞতা অথবা জ্ঞানশূন্যতা প্রকাশিত হলো। এখন না মিলন, না বিচ্ছেদ, না আহবান, না প্রত্যাখ্যান— এই অবস্থায় আছি। কোনো নির্দেশের ব্যাপারে হাঁ বা না বলার অবকাশ পাচ্ছি না।

আরিজাহ ৩ ঃ সালামান্তে বলছি, হজরতের দেওয়া ইতোপূর্বে নকশবন্দিয়া, কাদেরিয়া, এবং চিশতিয়া তরিকার প্রত্যেকটির নেসবত বারংবার প্রকাশিত হচ্ছিলো এবং কখনো কখনো একত্র হয়ে পরস্পরে মিশে যাচ্ছিলো। কখনো পরাজয়ও হচ্ছিলো। একবার চিশতিয়া তরিকার নেসবত অধিক প্রবল হলো। এমন অবস্থা হলো যে, অন্য তরিকার নেসবত থেকে হতাশ হয়ে গেলাম। আজমীর শরীফ থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত বরং কাবুল পর্যন্ত চিশতিয়া তরিকার লোক ব্যতীত কোনো কিছুই দৃশ্যমান হতো না। চিশতিয়া তরিকার বুজর্গগণ পরিবেষ্টিত হয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানালো। “নাহনু উলু কুওয়াতিন ওয়া উলু যু বা’সিন শাদীদ” (আমরাই শক্তিধর এবং কঠোর প্রভাব বিস্তারকারী)। তারপর অন্য স্তরে নিজের থেকেই উত্তরে বললাম ‘ইন্নাল মুলুকা ইয়াদাখালু কারইয়াতান আফসাদুহা’ (নিঃসন্দেহে বাদশাহ্ যখন কোনো পল্লীতে প্রবেশ করে, তখন প্রথমেই তাকে

ধ্বংস করে দেয়)। ইত্যবসরে নকশবন্দিয়া তরিকার শ্রেষ্ঠ বুজর্গগণ প্রাধান্য বিস্তার করলেন এবং তাঁদের উচ্চ মর্তবাধারী নেসবত চিশতিয়ার নেসবতকে ম্লান করে দিলো। কিন্তু আমার স্বীয় হালের উপর এখনো চিশতিয়া তরিকার নেসবত বিদ্যমান এবং নকশবন্দিয়ার নেসবত প্রাধান্য বিস্তারকারী হয়ে এসেছে। এখন তিন নেসবতেরই সমন্বয় হচ্ছে। আবার কখনো কখনো একে অন্যের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেই চলেছে।

এখন মাশায়েখদের নেসবতের মধ্যে ভ্রমণ কম হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ঘটনাক্রমে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভ্রমণ হয়েও যায়। কিন্তু বর্তমানে সাহাবা কেরামের রা. নেসবতের মধ্যেও সায়ের ভ্রমণ হচ্ছে— শুধুমাত্র খোলাফায়ে রাশেদীন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) ব্যতীত অধিকাংশ সময় রসুলে আনওয়ার সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেসবতের মধ্যে ভ্রমণ হচ্ছে এবং সীমাহীন আস্বাদ অনুভূত হচ্ছে। রসুলে আনওয়ার সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেসবতের তুলনায় অন্য কোনো নেসবতের তুলনা চলে কি?

হজরত সালাম! এই নগণ্যের উদ্দেশ্য রসুলে আনওয়ার সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেসবত ব্যতীত অন্য কোনো নেসবত যেনো কাম্য না হয়। এই নেসবতই যেনো প্রবলতর হতে থাকে। আপনার দরবারে এটাই আমার নিবেদন। আশা রাখি এ দরবেশের এই নিবেদনটি মঞ্জুর করা হবে। হাল এবং মাকাম থেকে যেনো আর অন্য কোনো কিছু না হয়। হজরত পীর দস্তগীরের তরবিয়তে অনুকম্পা যেমন রয়েছে তেমনি কঠোরতাও রয়েছে। এভাবে প্রভাবাবলী দরবেশের প্রতি সম্পৃক্ত হয়ে যায়। অন্য কথা হচ্ছে, কখনো কখনো এমন বিষয় উপস্থিত হয়, যার প্রকাশ হওয়াতে লজ্জা বোধ করি। হালের প্রবলতার মধ্যে রসুলে আনওয়ার সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে তোমাকে দেখলো, তার জন্য দোজখের আগুন হারাম করে দেওয়া হলো। কখনো বলেন, যে তোমার হাতে বায়াত গ্রহণ করলো, তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হলো এবং কখনো যেমন গউছুছ্ ছাকালাইন কুদ্দিসা সিররুহুর ক্ষেত্রে বলেছেন, এ দরবেশের জন্যও তদ্রূপ।

হজরত সালাম! যদিও এই তিন নেসবত আগে পরে ভিন্নভাবে প্রকাশ হয়েই চলেছে, কিন্তু শিক্ষা-দীক্ষার কার্যক্রম চলছে মহান নকশবন্দিয়া তরিকা অনুযায়ী। এখান থেকে দরবেশগণ আপনার দরবারের জন্য এই কার্যক্রমে দোয়ায় লিপ্ত রয়েছে। একাগ্রতা বজায় রেখেছে। অনেকে এজাযতপ্রাপ্তির উপযোগী হয়েছে। তন্মধ্যে হাফেজ ইয়াকুব যিনি তুলনাহীন আলেম ও আমলওয়ালা— শরীয়ত বিষয়ে যথেষ্ট দৃঢ়তা রাখেন। তাওয়াক্কুলে পরিপূর্ণ এবং উচ্চ পর্যায়ের সাহসধারী, মনোযোগ এবং একনিষ্ঠতায় খুবই সুদৃঢ়। উরূজ ও নুযুলের অধ্যায় সবই অতিক্রম করেছেন। তাকে তরিকাত শিক্ষাদানের একপ্রকার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সে হজরতের বিশেষ অনুকম্পার প্রত্যাশী। আর একজন হাফেজ মাহমুদ জ্ঞানপিপাসু,

ক্বারী এবং আলেম। তাঁর লতিফাসমূহও উরুজ করতে সক্ষম হয়েছে, যা দীর্ঘকাল বিদ্যমান ছিলো। তার হাল এক প্রকারের চাঞ্চল্য বা ব্যস্ততার অন্তর্ভুক্ত। আমি অনেক তাওয়াজ্জোহ দিতাম, কিন্তু নুযুলের দিকে আনতে পারতাম না। সে-ও আপনার অনুকম্পাপ্রত্যাশী। কেউ কেউ এমনও রয়েছেন যে, তাদের লতিফাসমূহ উরুজ থেকে নুযুলের দিকে আনতে সক্ষম হয়েছি। কেউ কেউ নিজেই অনায়াসে নুযুলের দিকে এসে গিয়েছেন। কারো লতিফাসমূহ এই দরবেশের আয়ত্তেই উরুজের দিকে। আবার কারো কারো অবস্থা খুবই হতাশাব্যঞ্জক। এক ব্যক্তি [১] পেশোয়ার প্রদেশ থেকে এসেছিলেন। তাঁকে তরিকতের শিক্ষাপ্রদান করতেই তার চার লতিফা আপনা আপনি স্বস্থান থেকে বিকশিত হয়ে উরুজ করতে লাগলো। তার খেয়াল ছিলো দেশে ফিরে যাবে।

কিন্তু এ অবস্থায় তার দেশে ফিরে যাওয়া অসম্ভব ছিলো। তাই তাকে নুযুল অবস্থায় আনতে হলো। তিনি জ্ঞানপিপাসু, হাফেজ, ক্বারী এবং তাকওয়াতে পরিপূর্ণ। তাই তাকে তরিকতপ্রশিক্ষণের অনুমতি দিয়ে দেওয়া হলো। তিনি চৈতন্যময়তা এবং একনিষ্ঠতাও বজায় রাখেন।

বিশেষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি মাওলানা আবদুল হামীদ যিনি এই দরবেশের শিষ্য। এ সময় মিঞা ফররুখ হোসেন চলে যাওয়ার পর জঙ্গল থেকে লোকালয়ে এসে জিকিরে লিপ্ত হয়েছিলেন। খুবই প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই পূর্বের থেকে এখন অনেক প্রশান্তি পেয়েছি। প্রথম লতিফা থেকে বুকের লতিফা পর্যন্ত এসে গেলো। তিনি এই ফকিরের সাথে খুবই ঘনিষ্ঠ। যখন তিনি এই দরবেশের দরবারে বসতেন, নিমজ্জমানতার (ফানার) কারণে সম্পূর্ণ আত্মহারা হয়ে যেতেন। কিন্তু তার পরেও তাঁর আচরণে আড়ষ্টতা প্রমাণিত হতো। তিনি আগ বাড়িয়ে কোনো কাজ করতেন না। হজরতের তাওয়াজ্জোহের প্রত্যাশায় থাকতেন। তিনি খাওয়ান্দ মাহমুদ থেকে একটি সবক গ্রহন করেছিলেন, কিন্তু বেশ কিছুকাল অবস্থান করা সত্ত্বেও তার মধ্যে বিন্দুমাত্র প্রতিক্রিয়া হয়নি।সে খুব বেশী তাওয়াজ্জুহের প্রত্যাশী।

হজরত সালাম! এই দরবেশের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দৃষ্টিতে (বাসীরাত) লোকদের যোগ্যতা সম্পর্কে তদুপরি এ পথের সূক্ষ্মতা এবং অন্যান্য অতীব মূল্যবান সূক্ষ্মবিষয় ক্রমাগত আসছেই এবং অন্যান্য মাশায়েখদের নেসবতের মধ্যে ভ্রমণও সংঘটিত হচ্ছে। অবশেষে এ দরবেশ বিশুদ্ধ বন্দেগীর প্রত্যাশী।

---

১. ফারসী মূল কিতাবে পেশোয়ারের প্রাচীন নাম গুরছুরওয়ার লেখা হয়েছে। কথিত আছে, সম্রাট আকবরের শাসনামলে শাহদ্বীন উরফে শাহ ইবনে ইয়াশাহ বিন নামে এক বুজর্গ ছিলেন। এখনও তাঁর নামে রেলষ্টেশনের নিকটে এক প্রসিদ্ধ কবরস্থান রয়েছে। সেখানে তাঁর কবরও রয়েছে। সম্ভবত তিনি সেই বুজর্গই হবেন, যিনি শায়েখ মোহাম্মদ তাহেরের হাতে বায়াত গ্রহণ করেছিলেন।

আরিজাহ ৪

হজরত সালাম! উচ্চ মর্তবাধারী এক মাকাম প্রকাশিত হলো। বলা হলো, খুব কম লোককেই এই মাকাম দ্বারা ধন্য করা হয়েছে। এই মাকাম অধিক আস্বাদে পরিপূর্ণ এবং বহু নতুন তত্ত্বসমৃদ্ধ। হজরত খাজা বুজর্গ কুদ্দিসা সিররুহুর রূহানী তাওয়াজ্জোহ, হালের মধ্যে সাহায্যকারী পাচ্ছি। একবার রসুলে আনওয়ার সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসা এই নগণ্যের প্রতি খুবই প্রাধান্য বিস্তার করলো। চরম অস্থিরতা দেখা দিলো। আল্লাহ্‌র দরবারে খুবই বিনীত প্রার্থনা করলাম। এ পর্যায়ে নিজেই রসুলে আনওয়ার সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে গেলাম। এরশাদ হলো, তোমাকে রেসালাতের কামালিয়াতের তাজাল্লি থেকেও কিছু অংশ দেওয়া হয়েছে।

"আলহামদু লিল্লাহিল্লাজি হাদানা লিহাযা ওয়ামা কুন্না লি নাহতাদীয়া লাওলা আন হাদানাল্লাহু (আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা তিনি আমাকে হেদায়েত দিয়েছেন। তিনি যদি আমাদেরকে সরল পথ না দেখাতেন তাহলে কখনো আমরা হেদায়েত প্রাপ্ত হতাম না)। আমি জানি না যে, এটি গুপ্ত রহস্য বা মারেফাতের অংশ কিনা।

কখনো কখনো মাশায়েখদের নেসবতের মধ্যেও সায়ের (পরিভ্রমণ) হয়। অবশেষে এখন মখদুম পীর আলী [১] হাজকীরী (দাতা গঞ্জবখশ র.) এর নেসবতের মধ্যেও পরিভ্রমণ হলো। দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই মধুময় নেসবতের মধ্যে পরিভ্রমণ হতেই থাকলো। এমনি অবস্থায় তিনি অধিক মনোনিবেশ ও অনুগ্রহ করেছিলেন। তাঁর বদান্যতা দ্বারা ধন্য করেছিলেন। তাঁর নেসবত বড়ই সুমহান ও সূক্ষ্ম যার মধ্যে অধিক দাওয়াত (আহবান) এর প্রভাব বিদ্যমান।

যখন হজরত খাজা বুজর্গ কুদ্দিসা সিররুহুর নেসবতের মধ্যে সায়ের হতো, তখন হজরত র. তাঁর নিজের রাজকীয় ছত্র বারংবার এই ফকিরের মাথার উপর রাখতেন। আমি জানি না, এ ঘটনার উদ্দেশ্য কী?

লেখক বদরুদ্দীন সেরহিন্দীর ধারণা— ওই ঘটনা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, তিনি ওই অঞ্চলের কুতুব ছিলেন। মখদুমজাদা খাজা মোহাম্মদ সাঈদ সাল্লামাহুল্লাহু তায়ালা বর্ণনা করেন, এক রাতে এশা নামাজের পূর্বে শায়েখ তাহের হজরত মোজাদ্দেদ র. এর দরবারে উপস্থিত ছিলেন। তখন হজরত মোজাদ্দেদ র. বললেন, আপনাকে ওই অঞ্চলের কুতুব বানানো হয়েছে। এ কথার দ্বারা তাঁর মাতৃভূমি লাহোরের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

---

১. লাহোরের প্রসিদ্ধ বুজর্গ ছিলেন। 'নকশাফুল হুজুর' গ্রন্থের লেখক। তিনি ৪৬৯ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

শায়েখের বয়স তখন ৫৬ বছর। বৃহস্পতিবার চাশতের সময় ২০ মহররম ১০৪০ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। ‘গম’ শব্দ দ্বারা ১০৪০ হিজরী সন বুঝা যায়। লাহোরে মিয়ানীর দিকে তাঁকে দাফন করা হয়েছে। আহ! মারেফাতের প্রাণপুরুষ। তাঁর মৃত্যু সন [১] ১০৪০ হিজরী— এটাই সঠিক।

৫. খাজা মোহাম্মদ সিদ্দীক কাশমী আলাইহির রহমাহ্

বাস্তব সূক্ষ্ম রহস্যের ধারক খাজা মোহাম্মদ সিদ্দীক বদখশানী হজরত মোজাদ্দেদ কুদ্দিসা সিররুহুর খলিফা ও সহচরবৃন্দের অন্যতম ছিলেন। তিনি জাহেরী ও বাতেনী বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। ছিলেন কামালতসম্পন্ন। তরিকত ও হকিকত মাকাম দ্বারা সুসজ্জিত ছিলেন। যুবক জীবনের শুরুতেই স্বীয় মাতৃভূমি কাশম (বদখশান) থেকে হিন্দুস্তানে পৌঁছেছিলেন। দীর্ঘ সময়কাল ধরে মুহিব্বুল ফুকারা আবদুর রহীম খান খানানের সোহবতে অবস্থান করেছিলেন। কাব্য ও কবিত্বের সাথে বেশ সম্পর্ক ছিলো। পরোক্ষভাবে তা দিয়ে হেদায়েতের লক্ষ্যে কাজ করতেন। তাঁর মনোমুগ্ধকর কবিতাগুলো আল্লাহ্র প্রেমভালোবাসায় পরিপূর্ণ ও তাঁর স্বভাবের সাথে সম্পৃক্ত ছিলো। অন্তর সহমর্মিতায় পরিপূর্ণ ছিলো। সুরা-পাত্রের মতো ছিলো স্বচ্ছ। অপবিত্রতা থেকে মুক্ত হয়ে আন্দোলিত হতো। পরিচিত ও অপরিচিত ব্যক্তিদের চেতনায় বিস্ময়ের সৃষ্টি করতো। তাঁর গজল চিত্তাকর্ষক ও হৃদয়গ্রাহী হতো। তাঁর কবিতা রূপক অর্থে চীনা ঘটনা সদৃশ ছিলো। কিন্তু মারেফাতের গোপন তত্ত্ব ও এর প্রকৃতি সম্পর্কে তিনি মসনবীর জনক মৌলভী রুমী র. এর অনুকরণে মর্মস্পর্শী ছন্দে কবিতা রচনা করতেন।

তিনি প্রথমে কুতুবুল আকতাব খাজা বাকী বিল্লাহ কুদ্দিসা সিররুহুর কাছে বায়াত হয়েছিলেন। তাঁর দরবারে তওবা করে জিকিরের তরিকা শিক্ষা করেছিলেন। হজরত খাজা তাঁর প্রতি বিশেষভাবে দয়াপরবশ ছিলেন। অধিকাংশ সময় বলতেন, খাজা মোহাম্মদ সিদ্দীক উচ্চযোগ্যতাসম্পন্ন এবং বড়ই দক্ষ।

১. শায়েখ মোহাম্মদ তাহেরের নামে মকতুবাত শরীফ ১ম খণ্ডে ৩টি মকতুব রয়েছে। মকতুব নং ২২৫, ২২৭, ২৫৫। লাহোরে মিয়ানী কবরস্থানের চত্তবারজীর কাছে তাঁর নিজের নাম তাহের বন্দেগীর নামে প্রসিদ্ধ কবরখানা রয়েছে।

কুদসিয়্যাহ্ ঃ হজরত খাজা মোহাম্মদ সিদ্দীক বলতেন, যখন আমি দাক্ষিণাত্য সফর [১] শেষে প্রত্যাবর্তন করলাম তখন খাজা সাহেবের সাথে খুব ঘনিষ্ঠ রূহানী সহযোগ ছিল। বিষয়টি এ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলো যে, যার প্রতি দৃষ্টি দিতাম তার মধ্যে হজরত র. এরই সৌন্দর্য দেখতে পেতাম। এমনকি প্রাচীর, বৃক্ষলতা, পাথর যেখানেই দৃষ্টি পড়তো সেখানেই হজরতের সৌন্দর্য ব্যতীত অন্য কোনোকিছুই দৃষ্টিগোচর হতো না। বরং তিনি আমার মধ্যে এমনভাবে সম্পৃক্ত হলেন যে, আমি আমার অস্তিত্বের খেয়াল পর্যন্ত ভুলে গেলাম। আমি নিজেকেই হজরত খাজা মনে করতে লাগলাম। হজরত খাজা এক পর্যায়ে হজরত মোজাদ্দেদ র.কে সেরহিন্দ প্রত্যাবর্তনের জন্য অনুমতি দিলেন। সাধারণভাবে সকল মুরিদকে তাঁর দরবারে যাবার জন্য নির্দেশ দিলেন। শুধুমাত্র কয়েকজনকে হজরত খাজার কাছে থাকার অনুমতি দিলেন। ইত্যবসরে আমাকে ডেকে বললেন, সেরহিন্দ গমনের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছো কিনা? কিন্তু এ দরবেশের অবস্থা তো ওই রকমই ছিলো, যেমন বর্ণনা করা হয়েছে। তাই আমি অসম্মতি জানালাম। আমার অসম্মতি এবং হজরত খাজার 'জালাল' একই সঙ্গে প্রকাশিত হলো। আমি হুঁশ হারিয়ে ফেললাম। জ্ঞান ফিরলে হজরত খাজার এই বাণী স্মরণে এলো— 'তোমার মতো লেখককে হজরত মোজাদ্দেদ র. কী উপকার করবে?' তার থেকে তুমি ফয়েজপ্রাপ্ত হয়েছ কি না, তা তো তুমি বোঝনি। যে বিষয়ে তুমি মুগ্ধ হয়েছো, তা তাঁর ফয়েজের তুলনায় কিছু নয়। আমি আবার চেতনা হারিয়ে ফেললাম। জানি না কতোক্ষণ বেহুঁশ ছিলাম। যখন হুঁশ এলো, তখন বুঝলাম, খাজা সাহেব এখনও আমার প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন করছেন। চেতনা ফিরে পাবার পর আমার এতোটুকু স্মরণ ছিলো তিনি যেনো বলছেন, ভয় করো না (তোমার থেকে যে অস্বীকৃতি প্রকাশ পেয়েছে সে ব্যাপারে) ভালোবাসা হেতু একটি ফুল প্রস্ফুটিত হয়েছিলো। যদি তুমি

---

১. 'হায়াতে বাকীয়া' নামক গ্রন্থটির লেখকের নাম অজ্ঞাত। অবশ্য গ্রন্থভুক্ত এক কবিতার মধ্যে তাঁর ছদ্মনাম আছে। মনে হয় মোহাম্মদ সিদ্দীক কাশমীই হায়াতে বাকীয়া পুস্তকখানি রচনা করেছেন। পুস্তকে তাঁর ছদ্ম নাম ছিলো রুশদী। পরবর্তীতে 'হেদায়েত মুখাল্লাম', 'হায়াতে বাকিয়া' গ্রন্থের শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি ১লা সফর ১০০৯ হিজরীতে হজরত খাজা র. এর দরবারে হাজির হলেন। হজরত খাজার মালফুজাত লেখার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু হজরত খাজা সম্মত হলেন না। রমজান ১০০৯ হিজরীতে মিঞা শায়েখ আহমদ সেরহিন্দী বারংবার অনুরোধ করার পর অনুমতি দেওয়া হয়। শুক্রবার ২রা জমাদিয়াল উলা ১০১০ হিজরীতে লেখক দাক্ষিণাত্য সফরে যাবার অনুমতি পান। ১লা সফর ১০১২ হিজরী সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। তখন হজরত খাজা র. বলেছিলেন, আমার প্রতি শায়খের দায়িত্ব পরিত্যাগ করার হুকুম হয়েছে। তিনি তাঁর সকল মুরিদকে হজরত খাজা মোজাদ্দেদ র. এর তরবিয়তের অধীনে থাকার নির্দেশ দিলেন। হজরত মোজাদ্দেদ র. খাজা সাহেবের সাথে তৃতীয় বার সাক্ষাতের জন্য দিল্লী যাত্রা করেন। এখানে এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, যখন ১০১০ হিজরীতে 'হায়াতে বাকীয়া' গ্রন্থের লেখক দাক্ষিণাত্যে গিয়েছিলেন, তখন (যেমন এই কিতাব থেকে জানা যায়) শায়েখ আবদুল হক মোহাদ্দেসে দেহলভী র. হজরত খাজা র. এর দরবারেই ছিলেন।

সঠিক অবস্থা ও কথার সত্যতা রক্ষা করে থাকো তাহলে এবারের মতো তোমাকে ক্ষমা করে দেওয়া হলো। তুমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখো। বর্তমানে আসমানের নিচে মিঞা শায়েখ আহমদের মতো দ্বিতীয় কেউ নেই। এরকম কামেল ব্যক্তি এ পর্যন্ত ৩/৪ জন মাত্র হয়েছে। হজরত মোজাদ্দেদের কামালত, যা অর্জন করেছো তা যথেষ্ট নয়। আমি নিজেকেও তাঁর প্রতিপালনের অন্তর্ভুক্ত মনে করি। আমি যা কিছু বললাম, স্মরণ রেখো। কাজে আসবে। এখন দ্রুত পৌঁছে যাও। তিনি যদি তোমাকে সানন্দচিত্তে গ্রহণ করেন, তবে সুবহানাল্লাহ! হাঁ-না কিছুই যদি না বলেন, তাহলেও তুমি তাঁর সাথে সেরহিন্দে যেও। যদি দয়াপরবশ হয়ে ফিরিয়ে দেয় তাহলে কদম চুম্বন করে ফিরে এসো। মনে করবে এর মধ্যে হেকমত আছে।

যখন হজরত মোজাদ্দেদ র. দিল্লী শহরের শেষ প্রান্তে গেলেন। আমি তাঁর নিকটবর্তী হলাম। তিনি আমাকে ডেকে বললেন, এখন ফিরে যাও। তুমি হজরত খাজা র. এর খেদমতে যাও। সেরহিন্দ যাবার প্রয়োজন নেই। ওইটাই সেরহিন্দ । ওইটাই তোমার ঘর।

কুদসিয়্যাহ্ ঃ এই খোদাপ্রেমিক (মোহাম্মদ সিদ্দীক) বর্ণনা করেছেন— হজরত খাজা র. এর ইন্তেকালের সময় উপস্থিত ছিলাম। বিদায় রজনীতে আমি তাঁকে স্বপ্নে দেখলাম। আমার কাছে যে বিষয়গুলো সমস্যা মনে হচ্ছিলো তিনি তার সমাধান দিয়ে দিলেন এবং সুলুকের বাস্তবতা সম্পর্কে যেমন ইচ্ছা বর্ণনাপূর্বক কিছু নসিহত এবং দিকনির্দেশনা দিয়ে অনুগ্রহ করলেন। তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ উপদেশ ছিলো হজরত মোজাদ্দেদ র. এর দরবারে উপস্থিত হবে। তাঁর এই উচ্চমর্তবাধারী তরিকাকে অত্যাবশ্যক মনে করবে। আরো অনেক কথা ছিলো। সেগুলোর বিস্ত ারিত বিবরণ দিতে গেলে পৃথক পুস্তক রচনা করতে হবে।

হজরত খাজা র. এর ইন্তেকালের [১] পর খাজা মোহাম্মদ সিদ্দীক অসিয়ত পূরণের জন্য হজরত মোজাদ্দেদ র. এর আস্তানায় হাজির হলেন। যৌবনের চাহিদা ও কাব্য রচনা ত্যাগ করলেন এবং হজরত র. এর সাথে গভীর আত্মিক সংযোগ স্থাপনে সক্ষম হলেন।

তাঁর খেদমতে সর্বক্ষণ হাজির থাকাকে আবশ্যক করে নিলেন। হজরত মোজাদ্দেদ র. একদিন ফজরের মোরাকাবার পর মুরিদগণের সমাবেশে বললেন, আজ খাজা মোহাম্মদ সিদ্দীক বেলায়েতে খাস্‌সাহ্ মোহাম্মাদিয়া দ্বারা ধন্য হয়েছেন। লেখক ওই মজলিশে উপস্থিত ছিলেন। নিজেই হজরতের পবিত্র জবান থেকে এই বাণী শ্রবণ করলেন। হজরত মোজাদ্দেদ র. তাঁর এক ঘনিষ্ঠজনকে লিখে জানালেন—

১. 'হায়াতে বাকীয়া' গ্রন্থের লেখক লিখেছেন, হজরত খাজা র. এর ইন্তেকালের দশ পনেরো দিন পূর্বে বিশেষ প্রয়োজনে আমাকে সেনানিবাসে যেতে হয়েছিলো। এক প্রিয়জনের মাধ্যমে এজাযত লাভ করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, আমাদের বাজার জমজমাট (এই হিশেবে বলা যায় 'হায়াতে বাকীয়া' গ্রন্থের লেখক খাজা মোহাম্মদ সিদ্দীকই হবেন)।

খাজা মোহাম্মদ সিদ্দীক বর্তমানে মহান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে বেলায়েতে খাস্‌সাহ্‌ দ্বারা ধন্য হয়েছেন এবং এসমে জুমি (আংশিক এসেম) থেকে এসমে কুল্লি (পূর্ণ এসেম) এর সাথে সম্পৃক্ত হয়েছেন। এভাবে ফাওকের (ঊর্ধ্বস্তরের) প্রতি দৃষ্টি রাখছেন। এখন সেখান থেকে তাঁর প্রাপ্য নিয়ে প্রত্যাবর্তনের জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছেন।

'ওয়াল্লাহু ইয়াখতাস্‌সু বিরহমাতিহী মাইঁইয়াশা (মহান আল্লাহ্‌ যাকে চান তাঁর রহমতপরিবেষ্টিত করেন)।[১]

হজরত মোজাদ্দেদ র. এর কয়েকটি মকতুব খাজা মোহাম্মদ সিদ্দিকের[২] নামে রয়েছে। তিনিই 'মাবদা ওয়া মাআদ'[৩] পুস্তকখানি সংকলন করেছেন।

কুদসিয়্যাহ্‌ ঃ হজরত খাজা মোহাম্মদ সিদ্দীক বর্ণনা করেন, আমি মৃত্যুকেই জীবন মনে করি। প্রকৃত জীবন মৃত্যুর সাথেই সম্পৃক্ত। মৃত্যুই স্থায়ী জীবনের আসবাবপত্র। শুধু তাই নয়। মৃত্যুই হলো চিরস্থায়ী জীবন। মৃত্যুই বন্ধুত্বের পোশাক পরিধান করায়। মৃত্যুই অস্থায়ী আস্বাদকে নিঃশেষ করে দেয়। মৃত্যুই আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য সব কিছুর অস্তিত্বকে জ্বালিয়ে দেয়। মৃত্যুই দুশ্চিন্তার আবরণকে ভস্মীভূত করে। মৃত্যুই প্রকৃত সত্তার সাথে ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেয়। মৃত্যুই প্রকৃত সত্যের পথপ্রদর্শক। মৃত্যুই অদৃশ্যের সৌন্দর্যকে উন্মোচিত করে। মৃত্যুই সন্দেহমুক্ত দ্বীপ্তিকে দর্শন করায়। ওটাই প্রকৃত মৃত্যু, যার আগমনে আনন্দ লাভ হয়। মৃত্যুই সকল দুশ্চিন্তাকে একত্রিত করে দেয়। মৃত্যুই প্রেমিককে প্রেমাস্পদের সাথে মিলিয়ে দেয়। রসূলে আনওয়ার সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল মাউতু জাছারুন ইউসিলু হাবীবু ইলাল হাবীব' (মৃত্যু হচ্ছে এক সেতু বন্ধন, যা বন্ধুর সাথে বন্ধুর মিলন ঘটায়)। মহান আল্লাহ্‌ পূর্ণ অনুগ্রহ দিয়ে নিজের দিকে আহবান করেন এবং নিজের বন্দীশালায় আবদ্ধ করে নেন। এমনকি পৃথকভাবে তাঁর দর্শন দানেও ধন্য করেন এবং সালেককে তার আমিত্ব থেকে মুক্ত করে দেন।

যতক্ষণ সালেকের মধ্য হতে আমিত্ব দূর না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে নিজেরই আবেদ। সে নিজেরই আরাধনা করে। অথচ সে মনে করে, সে যেনো প্রকৃত মা'বুদেরই উপাসনা করছে। আরেফগণের মতে, এ ধরনের সালেক ও মূর্তিপূজারীর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আল্লাহ্‌পাক বলেছেন, "ইযা জাআ নাসরুল্লাহি ওয়ালফাত্‌হ" (যখন আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয় আসবে)। সালেকের হাল হক সুবহানুহুর সাহায্য না পেলে মানব স্বভাবের কুফরি শক্তির উপর বিজয়

১. মোল্লা মোহাম্মদ সালেহ র. এর নামে মকতুবাত শরীফ ১ম খণ্ডে ২৪১ নং মকতুব রয়েছে।
২. মকতুবাত শরীফ ১ম খণ্ডে ১৩৩, ১৩৪, ১৩৬, ১৬২, ১৭৬, ১৮৮, ২১২। ২য় খণ্ডে ২১, ৫১ এবং ৩য় খণ্ডে ৮ নং মকতুব।
৩. ১০১৯ সালে এ পাণ্ডুলিপি সংকলিত হয়েছিলো।

আসবে না। অনুতাপ! অধিকতর অনুতাপ! কোন্ জাগ্রত [১] দৃষ্টিচক্ষুর জন্য যে রয়েছে এই অমূল্য সম্পদ। এই বিজয় এবং পরাক্রম ওই সময় অর্জিত হবে, যখন তাজাল্লিয়াতে জালালীর সায়ের (পরিভ্রমণ) জামালের আয়নার মধ্যে আলমে সগীরের কেন্দ্রবিন্দুতে হামলা করে তার দূর্গের প্রাচীরকে চুর্ণ করে না দিবে। তাদের কাউকে স্বস্থানে থাকা বা পালিয়ে যাবারও যেনো সুযোগ না দেয়, তখন ওই সকল লোক দলে দলে মহান আল্লাহ্র দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রকৃত ইসলাম দ্বারা ধন্য হয়। তওবা ও ক্ষমাপ্রার্থনার মধ্যে লিপ্ত হয়। যেমন পবিত্র সুরা— 'ইযা জাআ নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাত্হ' এর দিকে ইঙ্গিত করে। এই বাস্তবতার বিকাশ আনুরূপ্যবিহীন অবস্থায় উপনীত হওয়ার সাথে সম্পর্কিত। সূরা আল ফাত্হ শব্দটি সে বিষয়েরই প্রকাশ্য ইঙ্গিত।

'নেয়ামতের মালিকের জন্য মোবারকবাদ।' ধন্যবাদই যেনো নেয়ামত হয়।

এ কেমন অনিষ্ট যা স্থায়ী কারণ হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে এটাই তো প্রকৃত জীবন যা মৃত্যুর পরে নতুন জন্মের সূচনা করে।

মৃত্যুর আগে মরো তুমি প্রত্যেক শ্বাস প্রশ্বাসে
তা না হলে আসবে মৃত্যু যে কোনো নিশ্বাসে।

এরূপ বেলায়েতধারী আরেফ ব্যক্তি বাস্তবতার মধ্যে সকল মানুষের রূহানী অবস্থা এবং বেলায়েতের মালিক, প্রতিটি স্থানেই তাঁর "সফর দর ওয়াতন" (আত্মভ্রমণ) এর সৌভাগ্য নসিব হয় এবং সকল বিষয়ের পূর্ণ অনুসরণ থেকেও মুক্ত করা হয়। আর বেলায়েতের মধ্য হতে প্রত্যেক হালসম্পন্ন বেলায়েতপ্রাপ্ত ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করতে সক্ষম হয়। তার পরেও তাদের দৃষ্টিতে এই মরতবাসমূহের কোনো সমাদর নেই।

কিন্তু আরেফের যে বেলায়েত আমিত্বের পরিচয়বাহী, সে এ ধরনের সামর্থ্য স্বপ্নেও লাভ করতে পারবে না। সে গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। যদি সে তার মরতবার মধ্যে সে কামেল ও মোকাম্মেলও হয় এবং সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিতভাবে সায়ের করে থাকে। এই মর্যাদা পর্বে তার শানে আজীম (বিশাল মর্যাদা)ও অর্জিত হয়ে গিয়েছে। তথাপিও সে স্বীয় বেলায়েতের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সে অন্যের বেলায়েত সম্পর্কে যা কিছু বলে, তা তার নিজের বেলায়েতেরই নমুনা। সে একত্রতা বা একনিষ্ঠতাকে মূল্যবান মনে করেছে। এ ধরনের বেলায়েতের মূল্য নেই। যদি সালেক আত্ম-বিচারে নিরূপণ করতে সক্ষম হয় যে, যা কিছু তার দর্শন হচ্ছে, তা বাস্তবে পরিণত হচ্ছে কি না। তা যথার্থই এক নিদর্শনের উপর হয়ে থাকে। এই

১. দিল গুজরাটি– যিনি হজরত মোজাদ্দেদ র. এর পীর মোর্শেদের পৌত্র আলী রেজা ইবনে ফররুখ শাহ্ ইবনে সাঈদ র. এর মুরিদ ছিলেন। 'দীদাহ বেদার' (জাগ্রত চক্ষু সম্পর্কে তিনি এই কবিতাটি পড়তেন—

ফুলের সিংহাসনের গম্য স্থান হলো শিশিরে
দেখ কতোইনা মর্যাদা জাগ্রত দুটি নয়নের।

নিদর্শনাবলীর মধ্য থেকে যা তার নুসখাহ্ জামেয়া (সংরক্ষিত লিপি), তার মধ্যে বস্তু এবং ব্যক্তিত্বকে গচ্ছিত রাখা হয়েছে। অথচ ওই বেলায়েত তার বেলায়েতের বেষ্টনী বহির্ভূত। যদি মহান আল্লাহ্পাক দয়াপরবশ হয়ে তাঁর অনুগ্রহ ও দয়ার মধ্যমে তার বেলায়েত থেকে বের করে নিয়ে এখন 'সফর দর ওয়াতন' (আত্মভ্রমণ) এর স্তর দান করেন, তাহলেই সে বুঝতে পারবে, প্রকৃত বিষয়টি কী। এর চেয়ে বেশী আর কী লেখা যেতে পারে। যদি এর থেকে বেশী কিছু বলা হয় এবং বর্ণনা করা হয়— যা হজরত মোজাদ্দেদ র. বর্ণনা করেছেন, যে কোনো সালীমুল ক্বলব (প্রশান্ত হৃদয়) যা সর্বাবস্থায় বিশ্বাসকে আনন্দচিত্তে মেনে নেয় এবং অস্বীকৃতির কোনো প্রশ্নই আসে না। এমনকি জিহ্বা পর্যন্ত সঞ্চালন করে না। স্বীকৃতিও দেয় না।

খাজা মোহাম্মদ সিদ্দীকের মাকাম এবং কামালত অসংখ্য। এখানে এ পর্যন্তই ইতি টানা হলো।

কুদসিয়্যাহ্ ঃ তিনি বলেন, একবার আমি হজ্ব পালনের দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করলাম। সফরের জন্য সকল ব্যবস্থা সুসম্পন্ন হলো। আমি হজরত মোজাদ্দেদ র. এর কাছে আমার দৃঢ় ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করলাম। তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, আমিতো তোমাকে হাজীদের মধ্যে দেখছি না। আমি তাঁর কথায় প্রভাবিত হলাম না। আমি হজ্বের জন্য রওয়ানা হয়ে গেলাম। পথিমধ্যে ডাকাতদল আক্রমণ করলো। আমাকে গুরুতর জখম করলো। মালামাল লুণ্ঠন করে নিয়ে গেলো। আমার আর হজ্বে যাওয়া হলো না। পরের বছর হজ্ব সম্পাদন করলাম।

কুদসিয়্যাহ্ ঃ তিনি বর্ণনা করেন, একবার আগ্রায় হজরত মোজাদ্দেদ র. এর খেদমতে হাজির হলাম। আমাকে দেখেই তিনি বললেন, আমি তোমার মধ্যে কিছু পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি। আমি বললাম, আমি তো কিছু উপলব্ধি করতে পারছি না। তিনি বললেন, আমি খারাপ দিকের পরিবর্তন দেখছি। আমি আগের কথারই পুনরাবৃত্তি করলাম। তিনি বললেন, তোমার খাজেগীর অবস্থা কী? (খাজেগী নামে আমার একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু রয়েছে। সে হজরতের ভক্ত ছিলো এবং ছিলো দ্বীনদার আমীর শ্রেণীভুক্ত)। আমি বললাম, এ নগণ্যের পরিবর্তনের কারণ এটাই যে, হেকিম আলী যিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে জগৎখ্যাত ছিলেন— সে সূত্রে তিনি তার চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়ে বলেছেন, সে খুব শীঘ্রই ইন্তেকাল করবে। হজরত র. বললেন, আমি হেকিমের বক্তব্য সম্পর্কে একটু চিন্তা-ভাবনা করে দেখি। পরের দিন তিনি বললেন, মহব্বত সুদৃঢ় করো। ইনশাল্লাহ এ রোগ থেকে খাজেগী অবশ্যই মুক্তি পাবে। ওই সময় আমার দাক্ষিণাত্যে সফর করার প্রয়োজন হয়ে পড়লো।

‘আর রফিক ছুম্মতি তরিক’ (পথ চলার পূর্বে সাথী তালাশ করো) এই উদ্দেশ্য নিয়ে আমি আমার বন্ধু খান খানানের কাছে রওয়ানা হলাম। আমাকে তাঁর অভিভাবক কাজী নসরুল্লাহর সাথী করে দিলেন। আমরা একই হাতির পিঠে যাত্রা করলাম। একদিন কাজী নসরুল্লাহ আক্ষেপ করে বললেন, খাজেগী খুবই ভালো বন্ধু ছিলেন। কিন্তু হেকিম আলী তার রোগ আরোগ্য হবে না বলে দিয়েছেন। আমি বললাম, আমাদের হজরত মোজাদ্দেদ র. বলেছেন, সে অবশ্যই সুস্থ হবে। হজরতের বাণীর প্রতি আমাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে। কাজী বললেন, খাজেগী সুস্থ হবে না— এ কথায় তো খুশী হওয়া যায় না। কিছুদিন পর সংবাদ পাওয়া গেলো, খাজেগী পরিপূর্ণভাবে আরোগ্য লাভ করেছেন।

এই কামালতসম্পন্ন ব্যক্তি মোহাম্মদ সিদ্দীক এর মৃত্যু শাওয়াল মাসে ১০৫০ হিজরীতে হয়েছিলো। তাঁর কবর দিল্লীতে হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ র. এর কবরখানায় অবস্থিত। তাঁর স্ত্রী খুবই নেককার ইবাদতকারিণী ছিলেন। তিনিও খাজা মোহাম্মদ সিদ্দীকের সাথে হজরত মোজাদ্দেদ র. এর খেদমতে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং তাঁর অনুগ্রহ ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি দ্বারা নিজেকে সুসজ্জিত করেছিলেন। হজরতের পূর্ণ মহব্বত অর্জন করে ধন্য হয়েছিলেন। মেয়েদের একটি বৃহৎ দল তাঁর দ্বারা তাসাউফের সৌন্দর্যপ্রাপ্ত হয়েছিলো। তাঁর সোহবত ছিলো মহৎ ও মায়াময়।

৬. শায়েখ বদীউদ্দীন ছাহারানপুরী কুদ্দিসা সিররুহু

তিনি হজরত মোজাদ্দেদ র. এর প্রসিদ্ধ খলিফাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর অঞ্চলের প্রসিদ্ধ বুজর্গ ছিলেন। আলেম, আমলকারী, মুত্তাকী, খোদাভীরু, বন্ধুবৎসল ও মিষ্টভাষী ছিলেন। আর ছিলেন কাশফধারী ও কারামতসম্পন্ন ব্যক্তি এবং মারেফাত দ্বারা সুসজ্জিত ও সুসংবাদপ্রাপ্ত। মুরিদ হওয়ার পূর্বে যৌবনকালে তিনি হজরত মোজাদ্দেদ র. এর কাছে ‘তালবিহ’ কিতাব অধ্যয়ন করেছিলেন। তখন দরবেশ প্রথায় তার কোনো আস্থা ছিলো না। বরং তিনি প্রসঙ্গটি অস্বীকার করতেন। এড়িয়ে চলতেন। ওই শায়েখ আমাকে (বদরুদ্দীন সেরহিন্দী) বলেছিলেন, এই দুই হজরত থেকে আমি জাহেরী বিদ্যা শিক্ষা করেছিলাম এবং সেরহিন্দের এক প্রসিদ্ধ দরবেশের খানকার একটি হুজরায় থাকতাম। হজরত মোজাদ্দেদ র. এ সময় হজরত খাজা র. থেকে বিদায় হয়ে সেরহিন্দে আগমন করেছিলেন। তখনও সেরহিন্দ হেদায়েত ও সত্যপথদর্শনের শহরে পরিণত হয়নি। কখনো কখনো হজরতের বিরুদ্ধে কিছু কিছু কথা ওই হজরতের সামনে বলে ফেলতাম। এতে তিনি খুবই অসন্তুষ্ট হতেন। আমাকে ভীতি প্রদর্শন করতেন। তিরস্কার করে বলতেন, আমার প্রতি স্পষ্ট হয়েছে যে, তিনি কুতুব হবেন। তুমি তার সম্পর্কে কী জানো? তাঁর দ্বারা তো অনেক কল্যাণ সাধিত হবে। কখনো তাঁর ব্যাপারে কোনো মন্তব্য কোরো না। এ সময় তিনি বড়ই মর্তবাপূর্ণ এক স্বপ্ন দেখলেন। পরিচিত এক বুজর্গের কাছে স্বপ্নের কথা জানালেন, ওই বুজর্গ

এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে বললেন, হজরত শ্রেষ্ঠতম আউলিয়াগণের অন্তর্ভুক্ত হবেন। বর্তমান জামানার কুতুব হবেন। লোকেরা তখনও তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে অবগত নয়। এক সময় তাঁর বিকাশ হবে। তুমি তাঁর কাছ থেকে ফয়েজপ্রাপ্ত হবে। শায়েখ বদীউদ্দীন তাঁর তওবা করার পূর্বের অবস্থা বর্ণনা করেছেন এভাবে— আমি চাকুরী করতাম। কখনো কখনো হজরতের খেদমতে হাজির হতাম। পরোক্ষ অনুরাগে নিমজ্জিত ছিলাম। আর আমলে সলিহার অনুশীলন এবং নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে ছিলাম স্বেচ্ছাচারী। হজরত র. বলতেন, হে অমুক! তুমি নামাজ কেনো পড়ো না? কেনো গুনাহ থেকে বিরত থাকো না? আমি বলতাম, এরকম উপদেশ আমি অনেকের কাছ থেকে শুনেছি। আপনি যদি এ বিষয়ে আমার প্রতি বিশেষ তাওয়াজ্জোহ দান করতেন, তাহলে আমার পক্ষে গুনাহ থেকে বেরিয়ে আসা সহজ হতো। আমার হেদায়েত নসিব হতো। শুধু উপদেশে তো কাজ হবে না। তিনি সামান্য সময়ের জন্য তাওয়াজ্জোহ দিলেন। বললেন, আগামীকাল তুমি শুভ নিয়তে স্বচ্ছতার সাথে আমার কাছে এসো। ঘটনাক্রমে পরবর্তীদিন আমার এক প্রিয়জন আমার মেহমান হওয়ায় আমি তাঁর সান্নিধ্যে যেতে পারলাম না। দু'তিন দিন পরে উপস্থিত হলাম। তিনি বললেন, তুমি তো অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছো। ভালো, এখন যদি সামনে অগ্রসর হও, তাহলে তো ভালো ও ফলপ্রসূ হবে। যাও। ওজু করে দুই রাকাত নামাজ পড়ো। তারপর আমার কাছে এসো। আমি নির্দেশ পালন করলাম। তিনি আমাকে নির্জনে নিয়ে গেলেন এবং ক্বলবী জিকিরের প্রশিক্ষণ দিলেন। তাওয়াজ্জোহ দিলেন। আমি আত্মহারা হয়ে গেলাম। হুঁশ ও অনুভূতি হারিয়ে ফেললাম। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে যাচ্ছিলাম। এমন অবস্থায় লোকেরা আমাকে ধরে নিয়ে আমার বাড়িতে পৌঁছে দিলো। একদিন একরাত পরে আমার চেতনা ফিরে এলো। কলবে খেয়াল করলাম। তখন আমার কলবকে পরোক্ষ অনুরাগশূন্য পেলাম, দুনিয়ার সকল সম্পর্ক থেকে শূন্য পেলাম। এরপর আমি নিয়মিত তাঁর দরবারে যেতে থাকলাম। হজরতের মহান তাওয়াজ্জোহের বরকতে সীমাহীন উন্নতি লাভ করতে থাকলাম। এরপর আমি প্রতিদিন আমার নিজের থেকে দূরে যেতে লাগলাম এবং প্রতি ঘন্টায় অদৃশ্য থেকে অদৃশ্যের প্রতি অগ্রসর হতে থাকলাম।

মোটকথা শায়েখ প্রায় কয়েক বছরকাল হজরত মোজাদ্দেদ র. এর দরবারে সময় কাটালেন। বিস্ময়কর ঘটনা, মাকামাত এবং কামাল ও তকমিলের স্তর লাভে ধন্য হলেন। নির্দেশানুসারে মাতৃভূমিতে ফিরে গেলেন। শুরু করলেন তরিকাশিক্ষাপ্রদানের কাজ। এই পুস্তকের লেখকের সাথে শায়েখের গভীর বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিলো। কখনো কখনো তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হতো। তিনি হজরত মোজাদ্দেদ র. এর বিস্ময়কর ঘটনাবলী ও কারামতসমূহ প্রাঞ্জলভাষায় অপূর্ব বাচনভঙ্গিতে বর্ণনা করতেন। তিনি নিজেই হজরত মোজাদ্দেদ র. এর কাশফ,

কারামত ও ভবিষ্যদ্ববাণীর এক গ্রন্থতুল্য ছিলেন। আমি তাঁর কাছ থেকে হজরত মোজাদ্দেদ র. এর যে সকল বিস্ময়কর ঘটনা শুনেছি, সেগুলো লিপিবদ্ধ করলে নিশ্চয় সেটি হবে অমূল্য একটি গ্রন্থ। অবকাশ না মেলার কারণে আমার এই শুভচিন্তাটি বাস্তবায়িত হয়নি। এখন তো স্মৃতিগ্রন্থের অনেক কিছুই ধুসর ও ম্লান।

কুদসিয়্যাহ্ ঃ তিনি বলেন, আমি হজরত মোজাদ্দেদ র. এর কাছে নিবেদন করলাম, চাকুরী ছেড়ে দিতে চাই। তিনি বললেন, তুমি সৈনিক দলের সাথে সফর ত্যাগ কোরো না। আমি আরো কিছু কথা বললাম। তিনি বললেন, এখন আল্লাহ্‌র ইচ্ছা নেই। তাঁর নিষেধের কারণে আমি বিদায় নিলাম। প্রথম দিন আকবরাবাদ থেকে বোরহানপুর যাত্রাকালে এক মনজিল পথ অতিক্রম করা পর্যন্ত হজরত মোজাদ্দেদ র.কে আমাদের সাথে দেখলাম। দেখলাম, সৈন্যদের মধ্য থেকে আমাকে হাত ধরে এক প্রান্তে নিয়ে গেলেন। তাওয়াজ্জোহ্ দিলেন। এরপর থেকে কোনো সময় তাঁর থেকে সম্পর্কছিন্ন হইনি।

কুদসিয়্যাহ্ ঃ তিনি বর্ণনা করেন, যখন আমি উজ্জয়িনি শহরে পৌঁছলাম, সেখানে আজিদরূপ [১] সন্ন্যাসিকে দেখতে পেলাম। সে ছিলো কাফেরদের পুরোহিত। সাধনাবলে সে অন্তর্দৃষ্টি এবং অন্তর্বিস্তৃতি লাভ করেছিলো। বাদশাহ্ এবং আমিরও তাকে সমীহ করতো। তার সাথে দেখা করতো। আমাকে দেখে সে বললো, হে অমুক! তুমি বর্তমানের শ্রেষ্ঠ বুজর্গকে ছেড়ে কোথায় যাচ্ছো? আমি বললাম, তুমি কেমন করে জানলে? সে বললো, অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে। তোমার পীরের মতো শ্রেষ্ঠ বর্তমান যুগে আর কেউ নেই। আমি বললাম, তুমি কেনো তার দরবারে যাও না? যে বললো, আমার ধর্মে আমি পরিপূর্ণ। তাঁর কাছে আমার যাবার প্রয়োজন নেই।

কুদসিয়্যাহ্ ঃ তিনি এরকমও বর্ণনা করেছেন যে, আমি জিকিরে মগ্ন অবস্থায় দেখলাম, রসুলে আনওয়ার সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হাজির হয়েছি। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রসূলাল্লহ! আপনি সুন্নতে যাওয়াল (পড়ন্ত বেলার সুন্নত নামাজ) আদায় করেন কি-না? রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিরব রইলেন। আমি বললাম ইয়া রসূলাল্লহ! হজরত শায়েখ আহমদ তো এই নামাজ আদায় করেন এবং আপনার যাত মোবারক থেকে যে আমল প্রকাশ পেয়েছে, তার প্রতি আমল করা তাঁর নিয়মিত অভ্যাস। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, মিঞা আহমদ যে সকল আমল করেন, তা সঠিক। হুবহু আমারই আমল। এই নামাজ আমি নিজেও আদায় করি।

---

১. তুঁযুকে জাহাঙ্গীরী পুস্তকে উল্লেখ করা হয়েছে, সম্রাট জাহাঙ্গীর ১০৬৮ সালে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। এর আগে সম্রাট আকবরও সাক্ষাৎ করেছেন— সে কথাও পুস্তকটিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

কুদসিয়্যাহ্ ঃ তিনি আরো বর্ণনা করেন, আমি যখনই হজরত মোজাদ্দেদ র. এর খেদমতে সেরহিন্দ হাজির হয়েছি, তখন তিনি নিজের থেকেই বলেছেন, এখন তোমার অবস্থা এরূপ এবং এখন এরূপই হবে। তিনি যেমনই বলতেন, তেমনই হতো। আমার প্রতি তিনি ছিলেন খুবই কৃপাপরবশ।

কুদসিয়্যাহ্ ঃ তিনি এ-ও বর্ণনা করেছেন যে, অদৃশ্যভাবে আমি হজরত মোজাদ্দেদ র. থেকে উপস্থিত থাকার মতো ফয়েজ হাসিল করতাম। তাঁকে (হজরত র. এর সত্তা) দেখতাম ও তাঁর রূহানী সান্নিধ্য অনুভব করতাম। ফয়েজের যোগাযোগ ছিলো সার্বক্ষণিক। দূরে থাকলে তাঁর ভালোবাসা ও আকর্ষণ অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পেতো।

কুদসিয়্যাহ্ ঃ তিনি বর্ণনা করেছেন, আমার এক বন্ধুর অনুরোধে আমি এক শায়েখের কবর জিয়ারতে গিয়েছিলাম। শরীয়তবিরোধী কোনো কোনো কথার কারণে হজরত মোজাদ্দেদ র. তার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। সেকারণে আমি ভয়ে ভয়ে ছিলাম। হঠাৎ শায়েখের কবরের পাশে একটি বাঘকে গর্জন করতে দেখলাম। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। দেখলাম, ওই বাঘের চক্ষু হজরতের চক্ষুর মতো। তার শরীরেও রয়েছে হজরতের চেহারার প্রভাব। আমি ভয়ে সেখান থেকে পালিয়ে এলাম। অনেক ইস্তেগফার পাঠ করলাম।

কুদসিয়্যাহ্ ঃ তিনি এই ঘটনাও বর্ণনা করেছেন যে, যখন আমি বোরহানপুরে ছিলাম, তখন কয়েকদিন পর্যন্ত শায়েখ ঈসা [১] সিন্ধীর (যিনি সেখানকার বড় বুজর্গ ছিলেন) দরবারে উপস্থিত হতে লাগলাম। তাঁর প্রতি আমার আস্থা ও আকর্ষণ সৃষ্টি হলো। আমি তাঁর কাছে বায়াত হতে ইচ্ছা পোষণ করলাম। ভাবলাম তাঁর কাছ থেকে জিকিরের পদ্ধতি শিখবো। ওই শায়েখও একবার ইচ্ছা করলেন। তিনি আমাকে নির্জনে ডেকে নিলেন। হঠাৎ দেখলাম, সেখানে হজরত মোজাদ্দেদ র. উপবিষ্ট রয়েছেন। তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে আমার মুখে এক থাপ্পড় মারলেন। মুখে দাগ পড়ে গেলো। শায়েখ নিজেও দৃশ্যটি দেখলেন এবং কেঁদে ফেললেন। বললেন, তোমার পীর এতো বড় একজন কামেল মোকাম্মেল ব্যক্তি। তিনি তো অতি সূক্ষ্ম মর্যাদা ও কারামতসম্পন্ন। আর তা প্রয়োগের ব্যাপারেও শক্তিধর। তারপরেও তুমি অন্য স্থানে বায়াত হওয়ার জন্য ইচ্ছা পোষণ করো কেনো? প্রস্থানোদ্যত হলেন। দাঁড়িয়ে বললেন, যাও! আপন পীরের তরিকা অনুযায়ী জিকির করো। আমাকে বিপদে ফেলো না।

এখানে কিছু নিবেদন, যেগুলো তিনি হজরত মোজাদ্দেদ র. এর কাছে চিঠির মাধ্যমে রেখেছিলেন, সেগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

মকতুব ঃ নগণ্য বান্দা বদীউদ্দীন ছাহারানপুরী মহান দরবারে বিনীতভাবে নিবেদন করছে যে, এই নগণ্য রসুলে আনওয়ার সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে বিশেষ সুসংবাদপ্রাপ্ত হচ্ছে। বড়ই অনুগ্রহ করছেন এবং উপদেশ দিচ্ছেন। একদিন তিনি বললেন, তুমি হিন্দুস্তানের বাতি। আরো বললেন, অধিক আনুগত্যশীল হও। অদৃশ্য জগত থেকে কুতুবিয়াতের সুসংবাদও আসছে। অধিকাংশ সময় আল্লাহ্র দরবার থেকে আগত ঘটনার সংবাদ, বাস্তবায়ন হওয়ার পূর্বেই, চাওয়ার পূর্বেই জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অদৃশ্য জগত থেকে এমন বিস্ময়কর শুভ সংবাদ আসছে, যা হজরতের গোচরীভূত করা একান্ত জরুরী।

কিছু সত্যপথান্বেষী মুরিদ সমবেত হয়ে জিকিরে মশগুল রয়েছে। তারা উচ্চতর হাল অতিক্রম করছে। স্বল্প সময়ে নকশবন্দিয়া তরিকার হুজুরীকে করায়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছে। হয়ে গিয়েছে নেসবতসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। কয়েকজন এমন যারা দৈহিক ফানা দ্বারা ধন্য হয়েছে। (মহান আল্লাহ্ই শেষ ও মধ্যবর্তী হাল সম্পর্কে অধিকজ্ঞাত) কিছুসংখ্যক এমনও আছে যারা জিকিরের স্বাদ আস্বাদনপূর্বক ঘরবাড়ি ত্যাগ করতে উদ্যত।

মকতুব ঃ হজরত সালাম! মহান আল্লাহ্ আপনার তাওয়াজ্জোহের বিনিময়ে আমাকে মোশাহাদার সৌভাগ্য দান করে ধন্য করেছেন। আমি আশা করি, একবার রসুলে আনওয়ার সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বরকতপূর্ণ দর্শন নসীব হোক। আমি ওই আস্তানায় জামার টাকা বায়না দেবো এবং আনওয়ারে কামালত (কামালতের নূর) এর প্রতিবিম্ব লাভ করবো। আল্লাহ্পাক তাঁর খাস কৃপা দ্বারা তাহাজ্জুদ নামাজের পর এই সম্পদ দান করুন। এমন অনুমিত হলো যে, এই মাকাম থেকে নূর কামেল আউলিয়াগণই অর্জন করতে পারেন, যাঁরা তাঁর স. এর পূর্ণ অনুসারী।

হজরত সালাম! এক দরবেশ যিনি কুদ্ওয়াতুল মোহাক্কেকীন হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ কুদ্দিসা সিররুহুর দরবার থেকে তরবিয়ত (প্রশিক্ষণ) প্রাপ্ত, তিনি বলেন, আমি তাঁর খেদমতে ছয়মাস অবস্থান করেছিলাম।

আমি আরওয়াহ পাকের সাথে নেসবত রাখতাম, বুজর্গগণের আরওয়াহ (আত্মাসমূহ) আমার দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হতো। তিনি এ-ও বলেছেন, হজরত শায়েখ ফরীদ শকরগঞ্জ কুদ্দিসা সিররুহু আমাকে বলেছেন, কিছুদিন পর্যন্ত বদীউদ্দীনের [১] সাথে অবস্থান করো। এই দরবেশের জিকিরের মধ্যে অধিক লিপ্ততা ছিলো। তার প্রতি অসাধারণ ও বিস্ময়কর অবস্থা প্রকাশিত হতো।

---

১. হজরত মোজাদ্দেদ র. এর দশটি মকতুব শায়েখ বদীউদ্দীন র. এর নামে রয়েছে— প্রথম খণ্ডে ১৭২, ১৯২, ২৪২, ২৫২, ২৫৬, ২৭৬, ২৮৬। দ্বিতীয় খণ্ডে ১৬, ৮৮ এবং তৃতীয় খণ্ডে ৬ নং মকতুব।

মকতুব ঃ এক স্বপ্নের মধ্যে আমি হজরত আবু বকর রা. এর কাছে তাঁর ওই মহব্বতের দাবী করলাম, যা রসুলে আনওয়ার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি তাঁর ছিলো। তিনি পূর্ণ অনুকম্পাবশত তা আমাকে দান করলেন। এরপর আমি রসুলে আনওয়ার সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ওই মহব্বতবিশিষ্ট নেসবত দাবী করলাম, যে মহব্বত আল্লাহ্‌র প্রতি তাঁর ছিলো। তিনি স. আমাকে তা দান করলেন। বললেন, এই তরিকা, এই মিলন খাস।

শায়েখ বদীউদ্দীন র. থেকে অসংখ্য কারামত, কাশফ প্রকাশিত হয়েছে। এখানে মাত্র কয়েকটি উল্লেখ করা হলো ঃ

কারামত ঃ এক বন্ধুর বিবরণ— যখন হজরত মোজাদ্দেদ র. শায়েখকে খেলাফত দান করে নিজ দেশে প্রেরণ করলেন, তখন আমি তাঁর সাথে শহরের বাহির পর্যন্ত গেলাম, আমার অন্তরে উদয় হলো, আমার পিতা মাত্র কয়েকদিন হলো ইন্তেকাল করেছেন। আমি শায়েখের নিকট তাঁর অবস্থা জিজ্ঞেস করবো। শায়েখ যখন চাশতের নামাজের জন্য প্রস্তুত হলেন. তখন আমি তাঁর কাছে বিষয়টি প্রকাশ করলাম। তিনি কিছু সময় মাথা নিচু করে মোরাকাবায় মগ্ন হলেন। অতঃপর বললেন, তাঁকে দেখলাম, উন্নতমানের শাদা কাপড় পরিহিত। তাঁর কাছে তাঁর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, ঠিক আছে। আমাকে উচ্চ মাকাম দান করা হয়েছে। আমি সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে চাইনি। কিন্তু আপনি ডেকেছেন, তাই দ্রুত এসে গেলাম। তিনি আমার পিতার চেহারা এবং দৈহিক গঠন যেমন বর্ণনা করলেন, তিনি ছিলেন সেরকমই।

কারামত ঃ হজরত মোজাদ্দেদ র. যখন তাঁকে খেলাফত দান করে নিজ মাতৃভূমি মালুফের দিকে বিদায় দিলেন, তখন তাঁর খেয়াল হলো, হজরত আমাকে তরিকার শিক্ষাপ্রদানের জন্য অনুমতি দিয়েছেন যখন, তখন মুরিদগণের মধ্যে আমি তা প্রয়োগও করতে চাই। পরীক্ষা করে দেখতে চাই, আমার তাওয়াজ্জোহ দানের শক্তি বা প্রতিক্রিয়া আছে না, নেই। সদ্য বিবাহিত এক কাফেরকন্যা পাল্কিতে চড়ে পথ অতিক্রম করছিলো, আমি তার প্রতি তাওয়াজ্জোহ্‌ প্রয়োগ করলাম। ওই নববধু লজ্জা-শরম ত্যাগ করে পাল্কি থেকে নেমে লাফাতে লাফাতে শায়েখের দিকে দৌড়ে এলো। তাঁর কদমে লুটিয়ে পড়লো। শায়েখের উদ্দেশ্য ছিলো তাওয়াজ্জোহের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করা। তা যখন স্পষ্ট হলো, তখন তিনি ফেত্‌নাকে দূরে সরানোর জন্য তাওয়াজ্জোহ্‌ উঠিয়ে নিলেন। মেয়েটি স্বাভাবিক হয়ে গেলো। লজ্জা পেয়ে তার পাল্কিতে গিয়ে বসলো।

কারামত ঃ কিছুসংখ্যক কুচক্রী লোকের কপটতায় পড়ে সম্রাট জাহাঙ্গীর হজরত মোজাদ্দেদ র. কে [১] আকবরাবাদ ডাকলেন। সম্রাটের নিকটবর্তী লোকদের একজনের সংগে শায়েখ বদীউদ্দিনের সখ্য ছিলো। কথিত আছে 'আলআক্বরিবু কাল আকারিবু' (বন্ধুত্বের উদাহরণ বিচ্ছুর মতো)। হজরতের সাথে তার বিশেষ শত্রুতা ছিল। তিনি ওই লোকের সঙ্গে দেখা করলেন। সে খুব হৃদ্যতা প্রদর্শনপূর্বক বললো, শায়েখকে কষ্ট দেয়ার জন্য সে কোনো চেষ্টা করবে না। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেলো, আরো বেশী শত্রুতা প্রদর্শন করলো । বললো, আমার দীর্ঘদিনের আশা পূর্ণ হলো। দেখো আমি কী করি। শায়েখ তার আচরণ দেখে ঘাবড়ে গেলেন। উত্তোজিতও হলেন। লোকটিকে বললেন, তুমিও দেখে নিয়ো কে কার জন্য কী করে। সেখান থেকে অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে নিজ অবস্থানে ফিরে এসে তিনি তাওয়াজ্জোহ দিলেন। ওই ব্যক্তি তাঁর কোনো ক্ষতি করার পূর্বেই দু'তিন দিনের মধ্যে সেখান থেকে বিদায় নিয়ে যেতে বাধ্য হলো। কথিত আছে, শায়েখের এক দুষ্ট আত্মীয় চিন্তা করলো, সে সম্রাটের নিকটে গিয়ে মোজাদ্দেদ র. বিরুদ্ধে কিছু বিষোদগার করবে। হঠাৎ তার পেটে ব্যথা শুরু হলো। সে আর ক্ষতি করার সুযোগ পেলো না। অল্পদিনের মধ্যে ওই ব্যথায় সে মারাও গেলো।

৭. শায়েখ মোহাম্মদ তাহের বদখশী কুদ্দিসা সিররুহু ।

শায়েখ মোহাম্মদ তাহের বদখশী কুদ্দিসা সিররুহু হজরত মোজাদ্দেদ র. এর প্রসিদ্ধ খলিফাবৃন্দের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। পূর্ণ আত্মহারা অবস্থা ছিলো তাঁর। তিনি ছিলেন পৃথিবীপ্রেমাসক্তমুক্ত এবং অনাড়ম্বর জীবনযাপনে অভ্যস্ত। ছিলেন জৈনপুরের সুপ্রসিদ্ধ মাশায়েখ। জন্মভূমি বদখশানে আর কখনো ফিরে যাননি। তিনি রুশটাকের বর্ধিত অংশে দূর্গের পাশে বসবাস করতেন। এই তরিকা গ্রহণের পূর্বাবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, আমি সৈনিক জীবনে এক আমীরের সঙ্গে মালকুছাহ এর দিকে যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে বিরতিস্থলে আমি নিদ্রাভিভূত হলাম। স্বপ্নে দেখলাম, এক লোক এসে আমাকে বলছেন, রসুলে আনওয়ার সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, হজরত আবু বকর সিদ্দীক রা. এবং অন্যান্য সাহাবা আগমন করেছেন। রসুলে আনওয়ার সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভারী বাজু বন্দ এবং কথা হলো এমন একটি ঢাল যা কোনো হাতী বহন করতে

১. সাধারণ ইতিহাসে এরূপ রয়েছে, সম্রাট হজরত মোজাদ্দেদ র. কে ডেকেছিলেন । কিন্তু মকতুবাত ২য় খণ্ডে ৯৬ নং মকতুব থেকে জানা যায় যে, তিনি নিজেই সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছা করেছিলেন একথা জানিয়ে যে, যখন তিনি রাষ্ট্রীয় সফরে আকবরাবাদে আসবেন, তখন আমি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবো। যুবদাতুল মাকামাত ২৪৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে, হজরত র. শায়েখকে আকবরাবাদে অবস্থানের জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি অনুমতি ব্যতীত নিজ দেশে গিয়েছিলেন। তারপর সৈন্যদের মধ্যে তিনি কঠোর প্রতিবন্ধকতার মধ্যে ধর্মপ্রচার করেছিলেন। তাই তারা (আকবরাবাদে) তাঁর বিপক্ষে চলে গেলো। শায়েখ ছাহারানপুরে ১০৪২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। 'নুজহাতুল খাওয়াতির' পঞ্চম খণ্ড ৯১ পৃষ্ঠা।

অক্ষম। আমাকে দেখেই তিনি বললেন, হে আবু বকর! এদিক থেকে বাজুবন্দটি ধরো যেনো আমি তা তাহের বদাখশীকে পরিয়ে দিতে পারি। একথা বলেই তিনি স. এবং হজরত আবু বকর রা. বাজুবন্দটিকে উঁচু করে আমার কাঁধে উঠিয়ে দিলেন। আমি তা পরিধান করলাম। তারপর আমাকে বললেন, এই দলের মধ্যে তোমার কী কাজ? দরবেশদের রাস্তায় এসো। কিন্তু প্রথমে এই দূর্গকে জয় করো। তারপর সৈনিক জীবন পরিত্যাগ করো। আমি নিদ্রা থেকে জাগ্রত হলাম। আমাকে তো যুদ্ধের ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি সওয়ার হলাম। যখন আমি মালকুছাহ দূর্গের কাছে সৈন্যদের সাথে মিলিত হলাম, তখন আমার মধ্যে এমন উত্তেজনা সৃষ্টি হলো যে, আমি অশ্বারোহী হয়ে সকলের আগে চলে গেলাম। পৌঁছলাম দূর্গের প্রধান ফটকে। প্রথম আক্রমণেই বিজয়ী হলাম। আমি দূর্গে প্রবেশ করলাম এবং কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করলাম। এরপর ঘোড়া থেকে নেমে অতিরিক্ত কাপড় খুলে ফেলে আমার কর্মচারীকে বললাম, আমার কাপড় এবং ঘোড়া ঘরে নিয়ে যাও। আমিও ইনশাল্লাহ্ পৌঁছে যাবো। আমি সেখান থেকে বেরিয়ে শায়েখ আবদুল জলিল বয়ানকীর দরবারে হাজির হলাম। তিনি আমাকে বললেন, খুব শীঘ্র তুমি কোনো বুজর্গের কাছে পৌঁছে যাবে। তিনি তোমাকে প্রস্তুত করে দিবেন। এরপর বললেন, তুমি এই রাস্তায় সফর করো। যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে। দিল্লীতে তুমি হজরত খাজা বাকী বিল্লাহকে পাবে। যখন আমি দিল্লী পৌঁছলাম, সংবাদ পেলাম, হজরত খাজা মাত্র কয়েকদিন আগে পরপারে পাড়ি দিয়েছেন।

কিন্তু তাঁর খলিফা হজরত মোজাদ্দেদ র. দিল্লীতেই আছেন। এই শায়েখ বর্ণনা করেন, দিল্লীতে হজরত মীর নোমান আমার উপর বড়ই মেহেরবানী করলেন। আমাকে হজরত মোজাদ্দেদ র. এর কাছে নিয়ে গেলেন। নামাজ শেষে আমি পরিশ্রান্ত থাকার কারণে দোয়া কামনাসহ বিদায়ের অনুমতি চাইলাম। হজরত র. বললেন, এখন তো রমজান মাস । পবিত্র কোরআন পড়া হচ্ছে। কেমন হয় যদি তুমি থেকে যাও এবং তারাবী সুন্নত নামাজ আদায় করো। আমি বললাম, আমিও কোরআন শিখবো। যদি আপনি আমার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে আমার উদ্দেশ্য পূরণে সহায় হন, তাহলে থেকে যাই। নচেৎ প্রস্থানের অনুমতি দিন। তিনি বললেন, কী আর বলবো। একথা বলে তিনি চলে যাচ্ছিলেন। আমি তাঁর কাছে বিদায় চাইলাম। তিনি কিছুক্ষণ মোরাকাবায় মগ্ন থেকে তাওয়াজ্জোহ দিলেন। তারপর বললেন, থেকে যাও। আমি তোমার জন্য আছি।

শায়েখ মোজাদ্দেদ র. এর দরবারে দু'মাস অবস্থান করলাম। হাল এমন হলো যে, ঘনঘন রসুলে আনওয়ার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীদার হতে লাগলো। এক মুহূর্তও দীদার বন্ধ হচ্ছিলো না। দু'তিন মাস এভাবে কাটলো। এরপর শরহে সদর (বক্ষসম্প্রসারণ) এবং উচ্চ মাকামের জযবা ও সুলুক লাভ

করে ধন্য হলাম এবং বেলায়েতপ্রাপ্তির সৌভাগ্য লাভ করলাম। সাধারণ ও বিশেষ গ্রহণযোগ্যতা অর্জিত হলো। পূর্ণ তাওয়াজ্জোহ্প্রাপ্তিতে ধন্য হলাম।

এই নগণ্য লেখক ১০১৭ হিজরীতে হজরত মোজাদ্দেদ র. এর দরবারে উপস্থিত হন। তার এক বছর পূর্বে তিনি নকশবন্দিয়া তরিকার অনুমতি ও খেলাফত লাভ করে জৌনপুরে চলে যান। বিদায়ের সময় হজরত র. বললেন, যাও। সেখানে এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটবে যিনি হবেন মহান আল্লাহ্র বন্ধু ও কবুলকৃত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।

হজরত মোজাদ্দেদ র. এর মহাপ্রস্থানের দশ বছর পর মখদুমজাদাদের কাছে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন যে, ওই সন্তান, যার জন্য মোজাদ্দেদ র. ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তার আবির্ভাব ঘটেছে। অর্থাৎ সেই সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে। সে জাহেরী ও বাতেনী এলেম শিক্ষা শুরু করেছে। বরং সাধনা ও নির্জনতায় আমাকে অতিক্রম করে নকশবন্দিয়া তরিকায় তাওয়াজ্জোহ গ্রহণ করেছে। সুবহানাল্লাহ! হজরত মোজাদ্দেদ র. এর ভবিষদ্বাণী ত্রিশ বছর পর প্রকাশ পেয়েছে। হজরত মোজাদ্দেদ র. এর ইন্তেকালের পর শায়েখ সেরহিন্দে এসেছিলেন এবং লেখক তাঁকে দেখেছিলেন। দীর্ঘদেহী শাক্তিশালী পুরুষ ছিলেন তিনি। 'আতকিয়াউ উম্মাতি বারাউন আনিত্তাকালুফি' (আমার উম্মতের মুত্তাকী ব্যক্তিগণ লৌকিকতামুক্ত হবে) এই হাদিস অনুযায়ী কালের বিবর্তন ও পৃথিবীর চাকচিক্য তার উপরে কোনো প্রভাব ফেলেনি। তাঁকে আবদাল বলা যায়। তাঁর নামে হজরত মোজাদ্দেদ র. এর মকতুব রয়েছে, খাতার সংকলনের [১] মধ্যে সংরক্ষিত আছে। তিনি সত্তর [২] বছর হায়াত পেয়েছিলেন।

৮. শায়েখ ইয়ার মোহাম্মদ (কাদীম) তলিকানি কুদ্দিসা সিররুহু।

তিনি হজরত মোজাদ্দেদ র. এর প্রবীণ মুরিদগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং তরিকত শিক্ষা প্রদানের অনুমতিপ্রাপ্তদেরও অন্যতম ছিলেন তিনি। তাঁকে 'কাদীম' (প্রাচীন) এজন্য বলা হতো যে, তার পরে একই নামধারী ইয়ার মোহাম্মদ ছিলেন।

---

১. প্রথম খণ্ড— মকতুব নং ১২২, ১২৩, ১২৪, ১৭১, ২১৭। দ্বিতীয় খণ্ড— ২০, ২৭, ৮৬। তৃতীয় খণ্ড— ৩৪, ৩৭, ৯১ ও অন্যান্য।

২. নুযহাতুল খাওয়াতির পঞ্চম খণ্ডে তাঁর মৃত্যু সন ১০৪৭ হিজরী বলে উল্লেখ রয়েছে। তিনি জৌনপুরে ইন্তেকাল করেন। 'যুবদাতুল মাকামাতে' শায়েখ তাহের সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি খুবই সরল স্বভাবের ছিলেন। কোনো কোনো সময় এমন হাল এবং কাশফ বর্ণনা করতেন যে, তা শুনে হজরত মোজাদ্দেদ র. কখনো কখনো মৃদু হাসতেন। কখনো এরূপ হতো যে, হজরত মোজাদ্দেদ র. তাঁর হাল এবং মারেফাত বর্ণনা করতেন। তিনি সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে বলতেন এবং মাথা নাড়াতে থাকতেন। হজরত মোজাদ্দেদ র. আনন্দচিত্তে বলতেন, আমার এমন মনে হচ্ছে যে, মারেফাতের গুপ্তরহস্য মাওলানা তাহেরের অনুসারী হচ্ছে এবং আমি তাকে প্রতিপালন করে যাচ্ছি। হজরত মোজাদ্দেদ র. ১৭১ নং মকতুব প্রথম খণ্ডে তাঁকে বিশেষ দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন শায়েখ আবদুল হামীদ বাঙ্গালীর সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করে চলতে।

যাকে বলা হতো 'জাদীদ' (নতুন)। ইয়ার মোহাম্মদ কাদীম নফল নামাজ, রোজায় বিশেষভাবে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি সর্বদাই হালের প্রাবল্যে নিমজ্জমান, বিনয়ী থাকতেন। নিমগ্নতা ও আত্মবিনাশ তিনি আন্তরিকভাবে পছন্দ করতেন। খুবই সুদর্শন [১] ছিলেন। কেউ তাঁকে দেখলে বলতেন 'সুবহানাল্লাহ্'! 'ইয়া রুউ যুকিরাল্লাহ্'। তাঁকে দেখলে আল্লাহ্র কথা স্মরণ হয়। আল্লাহ্র ওলিদের যে পরিচিতি হাদিস শরীফে বর্ণনা করা হয়েছে, তাঁর মধ্যে তা পাওয়া যেতো। স্থিরতা এবং দরিদ্রতা তাঁর বিশেষ গুণ ছিলো। ফকিরি, দরিদ্রতা, হালাল খাদ্যগ্রহণ তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিলো। অস্বচ্ছল অবস্থা সত্ত্বেও তিনি মক্কা-মদীনা সফর করেছিলেন। বায়তুলাহ শরীফ তাওয়াফ এবং রসুলে আনওয়ার সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র রওজা মোবারক জিয়ারতের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।

কুদসিয়্যাহ্ ঃ ওই মহা বরকতপূর্ণ সফর শেষে তিনি তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর [২] (মোহাম্মদ হাশেম কাশেমী) কাছে বলেছিলেন, আমি রুকনে ইয়ামিনির (কাবা ঘরের একটি কোণের) নিকটবর্তী ছোট একটি কুটিরে রসুলে আনওয়ার সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অত্যন্ত সুসজ্জিত অবস্থায় দেখেছি। ওই অবস্থার স্বাদে এবং আনন্দে আমি অভিভূত হয়েছিলাম। যখন চেতনা ফিরে পেলাম, তখন ঝিমুতে থাকলাম। মক্কা-মদীনা বিস্ময়কর অবস্থার মধ্যে ছিলো। আরবগণ বলেছিলেন, এ হচ্ছে অনারব পাগল। ১০৪৬ হিজরীতে তিনি হজরত মোজাদ্দেদ র. এর পবিত্র রওজায় উপস্থিত হলেন। এই লেখকের এই বুজর্গের সঙ্গে দীর্ঘদিনের মহব্বত ছিলো। একদিন আমি তাঁর কাছে নিবেদন করলাম, আমি হজরত মোজাদ্দেদ র. এবং তাঁর খলিফাবৃন্দের অবস্থা ও মাকাম সম্পর্কে লেখার কাজ শুরু করেছি। যদি আপনার পবিত্র জবানে কিছু জীবন-বৃত্তান্ত সম্পর্কে জানতে পারতাম, তাহলে তা কিতাবের অন্তর্ভুক্ত করতাম। তিনি অঙ্গীকার করেছিলেন যে, নিরিবিলি আমরা দু'জনে বসবো। যা কিছু আমার জানা আছে ইনশাআল্লাহ্ বর্ণনা করবো। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। তিনি আকবরাবাদে গেলেন এবং সেখানেই ইন্তেকাল করলেন।

কুদসিয়্যাহ্ ঃ হজরত মোজাদ্দেদ র. তাঁকে কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন। সেগুলো সকল মাশায়েখদের জন্য উপকারী। যেমন— 'যখন কোনো আল্লাহ্প্রেমিক তোমার কাছে মুরিদ হওয়ার জন্য আসবে, তখন তাকে বিশেষ যত্নের সঙ্গে তরিকত শিক্ষা দিতে হবে। এরূপ যেনো না হয় যে, এ ক্ষেত্রে তার বিষয়টি পরীক্ষা স্বরূপ হয়, যার পরিণতি খারাপ।

১. 'যুবদাতুল মাকামাত' পুস্তকে রয়েছে, একদা তিনি বর্ণনা করেছেন, আমি আমার দাড়ি লম্বা হওয়ার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি এ জন্য যে, যখন আমি বাজারে গমন করি, তখন লোকেরা আমাকে দেখে দরূদ পাঠ করে।

২. 'যুবদাতুল মাকামাতে' হাশেম কাশেমী র. লিখেছেন, আমাকে ইয়ার মোহাম্মদ কাদীম একান্তে এ কথা বলেছিলেন।

বিশেষভাবে কোনো মুরিদের আগমনে যদি কোনো খুশি বা আনন্দ বোধ হয়, তাহলে কর্তব্য— এ বিষয়ে একাধিকবার ইস্তেখারা করা। কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করবে, তার প্রতি যেনো দৃঢ় বিশ্বাস এসে যায়। পরবর্তীতে যেনো কোনো কুচিন্তা প্রশ্রয় না পায়। কেননা 'হক সুবহানাহুর' কোনো বান্দার জন্য সময় ব্যয় করা এবং তাদের পরিচর্যা করা আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত সমীচীন নয়। 'লিতুখরিজান নাসা মিনাজ্ জুলুমাতি ইলান নূর' (যেনো তিনি আল্লাহ্‌র অনুমতিতে মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে যান) এই পবিত্র আয়াত থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হয়। এক বুজর্গের ইন্তেকাল হলো। আল্লাহ্‌পাকের পক্ষ থেকে তাকে বলা হলো, তুমি কি সেই ব্যক্তি নও যে আমার বান্দাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পোশাক পরিধান করেছিলে? সে উত্তর দিবে, হ্যাঁ। এরশাদ হলো, তুমি কেনো আমার মাখলুককে আমার প্রতি ধাবিত হতে দাওনি। আর তোমার অন্তরকে কেনো আমার প্রতি নিবদ্ধ [১] করোনি'?

৯. শায়েখ আবদুল হাদী বদায়ুনি কুদ্দিসা সিররুহু

মাওলানা আবদুল হাদী কুদ্দিসা সিররুহু হজরত মোজাদ্দেদ র. এর প্রধান খলিফাদের একজন ছিলেন। ছিলেন বড় পণ্ডিত এবং নিজ অঞ্চলের প্রসিদ্ধ বুজর্গ। প্রথমে তিনি হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ কুদ্দিসা সিররুহুর হাতে বায়াত গ্রহণ করেছিলেন। তারপর হজরত তাঁর তরবিয়তের দায়িত্ব হজরত মোজাদ্দেদ র. এর উপর অর্পণ করেন। তিনি দিল্লী থেকে হজরত মোজাদ্দেদ র. এর দরবারে চলে যান। তিনি হজরত মোজাদ্দেদ র. এর দরবার থেকে প্রভূত ফয়েজ-বরকত হাসিল করেছিলেন। হজরত মোজাদ্দেদ র. তাঁর প্রাথমিক সুলুকের অবস্থা হজরত খাজা র. কে লিখে জানান এভাবে— মাওলানা আবদুল হাদী নুকতাহ ফাওক (ঊর্ধ্ববিন্দু) এর মধ্যে হুজুর (উপস্থিতি) ইস্তেগরাক (নিমজ্জমানতা) এর সাথে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি এ-ও লিখেছেন যে, হক তায়ালাকে বস্তুসমূহের মধ্যে পবিত্রতার গুণে গুণান্বিত দেখি এবং সকল ক্রিয়াসমূহ হক তায়ালা থেকে সংঘটিত [২] হয় দেখি।

এ হালে নিপতিত হওয়ার পর তিনি বেশ কিছুকাল পর্যন্ত হজরত মোজাদ্দেদ র. এর খেদমতে অবস্থান করেন। কামালত ও মাকামাতে দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি খেলাফতের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে ধন্য হয়েছিলেন। বলা হয়ে থাকে,

---

১. মকতুবাত প্রথম খণ্ড ২১১ নং মকতুবে তাঁর নামে এই খণ্ডের ১১৭ নম্বর মকতুবও রয়েছে। তাঁর মাশায়েখ মোজাদ্দেদ র. এর সোহবতের প্রতি আকর্ষণ ছিলো। তিনিও হজরত মোজাদ্দেদ র. এর বিশিষ্ট খলিফা ছিলেন। তাঁর ইন্তেকাল হয় ২৬শে রবিউল আখের ১০২৬ হিজরীতে।

২. তাঁর নামে মকতুবাত শরীফ ১ম খণ্ডে ১৪ এবং ২৬৫ নং মকতুব রয়েছে।

শায়েখ আবদুল হাদী [১] এবং মাওলানা ইয়ার মোহাম্মদ কাদীম হজরত মোজাদ্দেদ র. এর খানকাতে একই হুজরায় অবস্থান করতেন। মাওলানা ইয়ার মোহাম্মদ রাত ভোর হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নফল ইবাদতে মগ্ন থাকতেন। কিন্তু শায়েখ আবদুল হাদী কঠিন রোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণে শক্তি-সামর্থ্যের অভাবে রাত্রিজাগরণে অক্ষম ছিলেন। এ জন্য তিনি আক্ষেপ করতেন। একদিন হজরত মোজাদ্দেদ র. বললেন, সুবহানাল্লাহ্! শায়েখ আবদুল হাদীর আক্ষেপ ও অনুতাপ মাওলানা ইয়ার মোহাম্মদ কাদীমের ইবাদত থেকেও অগ্রগামী হয়েছে এবং তাঁর কাজকে মাওলানার কাজ থেকে অধিক লাভবান করে দিয়েছে। তাঁকে তৃণমূল থেকে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে দিয়েছে। নিঃসন্দেহে মহিমময় দাতা মহান আল্লাহ্র কাজ এরকমই হয়ে থাকে।

১০. খাজা মোহাম্মদ সাদেক কাবেলী কুদ্দিসা সিররুহু

তিনি হজরত মোজাদ্দেদ র. এর প্রবীণ মুরিদ ছিলেন। আর ছিলেন তাঁর মুখলিস ও বিশিষ্ট খলিফাদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর তওবা সংঘটিত হয়েছিলো এভাবে— তিনি সে যুগের সম্পদশালীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের কর্মচারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ঘটনাক্রমে তাঁর অন্তরে আল্লাহ্প্রেম উদ্বেল হয়ে উঠলো। সর্বস্ব ত্যাগ করে তিনি এলাহাবাদ থেকে হজরত খাজা কুদ্দিসা সিররুহুর খেদমতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। দিল্লী পৌঁছে শুনলেন, হজরত খাজার ইন্তেকাল হয়েছে। তিনি বলেন, তখন তাঁর বিশিষ্ট মুরিদ হুছামুদ্দীনের দরবারে পৌঁছলাম। তাঁর কাছে আল্লাহ্প্রাপ্তির বাসনা প্রকাশ করলাম। খাজা হুছামুদ্দীন বললেন, যদি তুমি মহান আল্লাহ্কে পেতে ইচ্ছা করো তাহলে দ্রুত হজরত মোজাদ্দেদের দরবারে পৌঁছে যাও। তাঁর আরোগ্যের দৃষ্টি অবশ্যই তোমাকে রোগমুক্ত করবে। আমি সময়ক্ষেপণ না করে হজরত মোজাদ্দেদ র. এর দরবারে পৌঁছে গেলাম। তিনি ছিলেন সত্যের সন্ধানী। তিনি হজরত মোজাদ্দেদ র. এর দরবারে গৃহীত হলেন। বিশেষ অনুকম্পা ও অনুগ্রহপ্রাপ্তিতে ধন্য হলেন। তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে উচ্চ মাকাম ও পছন্দনীয় হালে পৌঁছে গেলেন। হজরত মোজাদ্দেদ র. তাঁকে সন্তানতুল্য সমাদর করতেন। তিনিও ছিলেন অত্যন্ত বিবেচক, শিষ্টাচারী ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী। সফরে এবং গৃহে তিনি হজরত র. এর খাস খাদেম হিসেবে পরিগণিত হয়েছিলেন। খেদমত পরিচালনার দায়িত্ব তিনি তাঁর উপর ন্যস্ত করেছিলেন। বর্ণিত আছে, একবার ভ্রমণে হজরত মোজাদ্দেদ র. এর সাথে এমন এক জায়গায় অবস্থান করতে হলো, যেখানকার

১. মাওলানা মনজুর আহমদ নোমানী লিখিত 'তাজকেরাহ মোজাদ্দেদে আলফেসানী', আলফুরকান, লাখনৌ ১৯৬০ হিজরী ৩৪৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে, তাঁর ইন্তেকাল হয় ৯ই শাবান ১০৪১ হিজরী এবং বদায়ুনে খুররম শাহ্ এলাকায় তাঁর মাজার রয়েছে।

পানি ছিলো বিস্বাদপূর্ণ। তিনি হজরত খাজা মোহাম্মদ সাদেকের সাথে বিশেষ বন্ধুত্ব রাখতেন। তিনি তাঁকে নির্দেশ দিলেন, যমুনা নদীর পানি উটে বহন করে নিয়ে এসো। নির্দেশ পালন করা হলো। হজরত বললেন, মিঠা পানি এসে গিয়েছে। বলা হলো, হজরতের খাদেমদের জন্য যমুনা থেকে পানি আনা হয়েছে। এ পর্বে খেদমতের মাধ্যমে আর্শীবাদ আশা করা হয়েছিলো। হজরত মোজাদ্দেদ র. বললেন, যমুনা কাফেরদের দেবতা, সেখান থেকে পানি এনেছো— সে কথা আবার বার বার বলছোও। সম্মানপ্রদর্শন করতে হবে নাকি। কিন্তু আমি তা করবো না। ওই পানি দিয়ে আমি ওজুও করবো না। ওই পানি পানও করবো না। এরপর বললেন, পানি নষ্ট করা ঠিক নয়। তাই যার প্রয়োজন সে এস্তেঞ্জার জন্য ওই পানি ব্যবহার করতে পারবে। হজরত মোজাদ্দেদ র. ওই স্বাদহীন পানি ব্যবহার করলেন। এভাবেই স্থাপন করলেন তাকওয়ার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

কারামত ঃ কথিত আছে, খাজা মোহাম্মদ সাদেকের অন্তিম রোগ শুরু হলো এবং দেহের কোনো কোনো অংগ ফুলে গেলো। বন্ধুরা তাঁর সান্নিধ্য থেকে বিরত রইলো। একারণে তাঁর মন খারাপ হলো। সে জন্য তিনি ইচ্ছা করলেন, নীরবে কাউকে কিছু না বলে চলে যাবেন। তাঁর বন্ধুরা হজরত মোজাদ্দেদ র. কে তাঁর রোগমুক্তির কথা বললেন। তাঁর দয়া হলো। হজরত র. দৃঢ়ভাবে তাঁর তাওয়াজ্জোহ এবং সাহস রোগমুক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলেন। তাঁর বন্ধুদেরকে বললেন, তোমরা তাঁকে সঙ্গদান করো, আমি তাকে মনোক্ষুণ্ন দেখলাম। তার রোগ আমি আমার নিজের মধ্যে নিয়ে নিয়েছি। এরপর হজরত মোজাদ্দেদ র. এর বদন মোবারকে রোগের নিদর্শন ফুটে উঠলো। খাজা মোহাম্মদ সাদেক সুস্থ হয়ে গেলেন। হজরত র. এর ভক্তবৃন্দ অনুরোধ করলেন, হজরত! আপনি তাওয়াজ্জোহ্ দিন যেনো এই রোগ অন্যত্র দূর হয়ে যায়। তিনি তাদের আবেদন গ্রহণ করলেন। পুনরায় তাওয়াজ্জোহ্ দিলেন। রোগ দূরে চলে গেলো। যখন খাজা মোহাম্মদ সাদেক কামালতের স্তরে পৌঁছলেন এবং মাকাম বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করলেন, তখন হজরত মোজাদ্দেদ র. তাঁকে তরিকার তা'লীম প্রদানের জন্য অনুমতি দিলেন। তাঁর সোহবত ছিলো বড়ই প্রভাববিস্তারক। তিনি লাহোরে বসবাস করতেন এবং জনসমাদৃত হয়েছিলেন। তিনি ১০১৮ হিজরীতে ইন্তেকাল [১] করেন।

১১. হাজী খিযির খান আফগান কুদ্দিসা সিররুহু

তিনি হজরত মোজাদ্দেদ র. এর একনিষ্ঠ ও প্রবীণ মুরিদদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং অন্যতম খলিফা ছিলেন। তাঁর ঠিকানা ও দাফনের স্থান বাহলুলপুরে— সেরহিন্দের সন্নিকটে। তিনি হজরত মিঞাজী অর্থাৎ হজরত মোজাদ্দেদ র. এর

১. হজরত মোজাদ্দেদ র. এর দুইটি মকতুব রয়েছে খাজা মোহাম্মদ সাদেক কাবেলী র. এর নামে। প্রথম খণ্ডে ১৪৮ ও ১৪৯।

পিতার খেদমতেও অবস্থান করেছিলেন। তিনি অনেক সাধনা করেছিলেন। ফকির-দরবেশের খেদমতে অনেক সময় ব্যয় করেছিলেন। মক্কা-মদীনা সফর, আরব অঞ্চলসহ বায়তুল মাকদিস পর্যন্ত উপস্থিত হয়েছিলেন। প্রত্যেক স্থানে তাঁর সুমধুর জীবনের ঘটনাবলী শোনা যেতো, সেগুলো লিপিবদ্ধ করতে গেলে পুস্তক দীর্ঘ হয়ে যাবে। কোথাও তিনি স্বস্তি পাননি। স্বস্তি পেয়েছিলেন কেবল হজরত মোজাদ্দেদ র. এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে। সেখানেই বায়াত গ্রহণের সুযোগ লাভ করেন। অলৌকিক ঘটনাবলী ও উচ্চ মাকাম লাভে ধন্য হন। তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিলো যে, হজরত মোজাদ্দেদ র. একদিন শয়তানকে দেখে বলেছিলেন, আমার মুরিদগণের [১] মধ্যে কার উপর তোমার শক্তি প্রয়োগ অক্ষম হয়ে যায়? সে বললো, হাজী খিযির। আমি তাঁকে কুমন্ত্রণা দিয়ে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি।

লেখক বলেন, এটা কোনো বিস্ময়কর ব্যাপার নয়। কেননা মহান আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন — 'ইন্না ইবাদী লাইসা লাকা আলাইহিম সুলতান' (নিঃসন্দেহে আমার বান্দাদের উপর তোমার শক্তি ক্রিয়াশীল হবে না)

পবিত্র কুরআনে এরকমও বলা হয়েছে– 'ইল্লা ইবাদাকা মিনহুমুল মুখলিসীন' (শয়তান বললো, তোমার মুখলিস বান্দা ব্যতীত অর্থাৎ তাদের প্রতি কুমন্ত্রণা চলে না।)

হজরত মোজাদ্দেদ র. কখনো কখনো তাঁর প্রতি খুবই প্রফুল্ল মনোভাব প্রদর্শন করতেন। কৌতুক ছলে তাঁকে 'খাযরা' বলতেন। তিনি হজরত র.কে দর্শনের আশেক ছিলেন। হজরত র. এর প্রত্যেকটি অনুগ্রহ, কৃপা ও সূক্ষ্মতা তাঁর জীবনে এনে দিতো আনন্দের হিল্লোল। হাজী সাহেব উচ্চস্বর ও মধুর কণ্ঠে আজান দিতেন। তিনি যতোদিন পর্যন্ত হজরতের দরবারে ছিলেন, ততোদিন অন্য কেউ আজান দেননি। তাঁর আজান ছিলো হৃদয়স্পর্শী। তিনি জুমআর রাতে হজরত মোজাদ্দেদ র. এর মসজিদের হুজরার মধ্যে সুললিত কণ্ঠে দীর্ঘ সময় ধরে রসুলে আনওয়ার সালালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ পাঠ করতেন। গভীর রাতে সুমিষ্ট আওয়াজে নাতে রসুল পড়তেন এবং কাঁদতেন।

এই নগণ্য লেখক একবার রমজান মোবারকের শেষ দশকে হজরত মোজাদ্দেদ র. এর জীবদ্দশায় হাজী সাহেবের সাথে একই হুজরায় এতেকাফে বসেছিলেন। শেষ দশকের শেষ দু'দিন এর মধ্যে 'খুলাছাহ্ কীদানী শরহে মাবছুত' গ্রন্থের সম্পূর্ণ বর্ণনা সংকলন, যা মি'রাজুল মুমিনীন লেখার সৌভাগ্য— তা এই নগণ্যের অর্জিত হয়েছিলো। এখন আমি এই বিষয়টি বুঝতে পারছি না যে, হাজী সাহেবের জিকির ও তেলাওয়াত সম্পর্কে বলবো, না তাঁর নামাজ, মোরাকাবা

১. এ জাতীয় ঘটনা শায়েখ মোহাম্মদ তাহের লাহোরীর জীবনেও ঘটেছিলো।

এবং নিমজ্জিত হালের বিষয় আলোচনা করবো। অথবা তাঁর সহমর্মিতা বা ব্যথিত হৃদয়ের বিবরণ দিবো। অথবা তরিকতের ভাই ও একনিষ্ঠ মুরিদদের খেদমতের কথা বলবো। মোটকথা তাঁকে আমি এক মুহূর্তের জন্যও অকর্মণ্য অবস্থায় দেখিনি। বাহলুলপুরে, পাজুআরা ও অন্যান্য স্থানের অনেক আফগান তাঁর সঙ্গ লাভ ও তাঁরই তরবিয়তের কারণে সঠিক দিকনির্দেশনা পেয়েছিলেন এবং খুবই উচ্চ কামাল মরতবা পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। হাজী সাহেব থেকে তরিকত শিক্ষা করেছিলেন এ রকম হজরতবৃন্দের অন্যতম হলেন হজরত শায়েখ আদম বিন্ নূরী। তিনি প্রথমে হাজী সাহেবের কাছে তরিকতশিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন ও কামালত অর্জন করেছিলেন। অতঃপর তিনি হজরত মোজাদ্দেদ র. এর খেদমতে হাজির হয়েছিলেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা ইনশাআল্লাহ্ শায়েখ আদম বিন্ নূরী র. এর অধ্যায়ে আসবে।

হাজী সাহেব যখন বাজুআড়ায় ছিলেন, তখন হজরত মোজাদ্দেদ র. এর ইন্তে কালের (১০৩৪ হিজরী) খবর শুনতে পেলেন। তৎক্ষণাৎ বেহুঁশ হয়ে গেলেন। হুঁশ হওয়ার পরে তিনি বার বার টলে টলে পড়ছিলেন। অনেক রোদন ও হা-হুতাশ নিয়ে সেরহিন্দ পৌঁছলেন। নিজেকে মখদুমজাদাদের কদমে ফেলে দিলেন। অধিক ভালোবাসা ও অধিক আকর্ষণ হেতু তাঁর মধ্যে শক্তিহীনতা ও অতিমাত্রায় শোককাতরতা প্রকাশ পেয়েছিলো। তাঁর শোকার্ত অবস্থার কারণে হজরতের ইন্তে কালের পর দ্বিতীয় বার শোকের মাতম সৃষ্টি হয়েছিলো। এরপর তিনি এমন আবেগময় কণ্ঠে আজান দিলেন যে, চর্তুদিকে লোকজনের মধ্যে হজরত মোজাদ্দেদ র. এর যুগের কথা স্মরণ হয়ে গেলো। বিষয়টি এমনই হয়েছিলো যে, রসুলে আনওয়ার সালালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর হজরত ইমাম রা. কে সান্ত্বনা প্রদানের জন্য হজরত বেলাল রা. মদীনায় আগমন করেছিলেন। অতঃপর আজান দিয়েছিলেন। যে আজান শুনে মদীনাবাসীদের মধ্যে রসূলবিরহের শোকের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছিলো।

হাজী সাহেব অধিকাংশ সময় হজরত মোজাদ্দেদ র. কে হারানোর শোকে কাঁদতেন। এমন কি হজরত র. এর ইন্তেকালের কিছু দিন [১] পর তিনিও ইন্তে কাল করে হজরতের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। গাফারাল্লাহু লাহু ওয়া রহমাতুল্লাহ্ [২] রহমাতান অসিআতান।

১. 'যুবদাতুল মাকামাতে' বর্ণিত হয়েছে, হজরত মোজাদ্দেদ র. এর এক বছর পর ১০৩৫ হিজরীতে হাজী সাহেব ইন্তেকাল করেন।

২. তার নামে মকতুবাত শরীফে প্রথম খণ্ডে ১৩৭ নং মকতুব রয়েছে।

১২. শায়েখ আহমদ দীবানী (দেওবন্দী) কুদ্দিসা সিররুহু।

দীবন (দেওবন্দ) অঞ্চলের ছাহারানপুর বুড়িয়ার নিকটবর্তী স্থানে শায়েখ আহমদ দীবানী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় ভ্রমণ ও সাধনার মাধ্যমে কাটিয়ে দিয়েছেন। হজরত মোজাদ্দেদ র. এর প্রবীণ মুরিদগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তিনি। এই তরিকা গ্রহণের পূর্বে হজরত মোজাদ্দেদ র. এর কাছে তিনি জাহেরী বিদ্যা শিক্ষাগ্রহণ করেন। যখন হজরত মোজাদ্দেদ র. দেশের পূর্বাঞ্চলে সফরে গিয়েছিলেন তখন এই শায়েখ আহমদ তাঁর সঙ্গী ছিলেন। হজরত মোজাদ্দেদ র. এর প্রতি শায়েখের সুগভীর আস্থা ছিলো।

বিশেষ কারণে শায়েখ বোরহানপুর চলে এলেন। সেখানের প্রসিদ্ধ মাশায়েখ শায়েখ ফজলুল্লাহর [১] হাতে বায়াত গ্রহণ করলেন। তাঁর খেদমতে তিনি বহুকাল অতিবাহিত করেন। তাঁর নিকট থেকে খেলাফত এবং তরিকতের শিক্ষা প্রদানের অনুমতিও প্রাপ্ত হন।

অতঃপর নকশবন্দিয়া সিলসিলার স্বাদ আস্বাদনের জন্য হজরত মোজাদ্দেদ র. এর খেদমতে পৌঁছলেন এবং হজরতের পবিত্র সাহচর্য অবলম্বনপূর্বক জিকিরের তরিকা শিক্ষা গ্রহণে ধন্য হলেন। এখলাসের কারণে হজরত মোজাদ্দেদ র. এর অধিক মহানুভবতা ও কৃপা অর্জন করেছিলেন। ইত্যবসরে হজরত মীর মোহাম্মদ নোমান র. খেলাফত লাভ করে বোরহানপুর আগমন করলেন। তখন শায়েখের তরবিয়তের দায়িত্ব মীর মোহাম্মদ নোমানের উপরে অর্পণ করা হয়। মীর সাহেবের সোহবতে শায়েখ অনেক ফয়েজ প্রাপ্ত হলেন। এরপর অধিকাংশ লোক শায়েখের সোহবতে গমন করেন। তাঁর সোহবত অধিক ফলপ্রসূ বা ক্রিয়াশীল বলে প্রমাণিত হয়। পরে তিনি হজরত মোজাদ্দেদ র. এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁর অনুগ্রহ পেয়ে ধন্য হন এবং দীর্ঘকাল পর্যন্ত তাঁর আশ্রয়ে অবস্থান করেন। অনেক ফয়েজ-বরকত লাভ করেন। খেলাফত ও এজাযতও লাভ করেন। তারপর শায়েখের সাহচর্যে এমন প্রভাব সৃষ্টি হয় যে, কেউ তাঁর দরবারে এসে তাঁর প্রতি মনোনিবেশ করলে এমনভাবে জযবায় প্রভাবিত হন যে, মাটিতে লুটিয়ে পড়ার উপক্রম হন। কোনো কোনো লোক হুঁশ হারিয়ে ফেলেন। শায়েখের প্রতিপালনযোগ্যতা ও তাওয়াজ্জোহ্ ছিলো অত্যন্ত শক্তিশালী। তিনি দীর্ঘকাল আকবরাবাদে মাশায়েখের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এক বিশেষ ব্যক্তিত্ব তাঁর সোহবতে ফয়েজ বরকত লাভ করেন। শায়েখের শুভদৃষ্টিতে মরহুম কাশেম খান,

---

১. 'যুবদাতুল মাকামাত' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে, তিনি বোরহানপুরনিবাসী মোহাম্মদ বিন ফজলুল্লাহর (মৃত্যু ১০২৯ হিজরী) হাতে বায়াত গ্রহণ করেছিলেন। এই পুস্তকে এই তথ্যটিও রয়েছে— যখন শায়েখ আহমদ মীর মোহাম্মদ নোমানের বায়াত গ্রহণ করেছিলেন, তখন এক স্থানে মোহাম্মদ বিন ফজলুল্লাহ জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমি তোমাকে যে জিকির শিক্ষা দিয়েছি, তার উপর তুমি আমল করো কী না? উত্তরে তিনি বললেন, আমি এখন মীর মোহাম্মদ নোমানের কাছে বায়াত গ্রহণ করেছি। মোহাম্মদ বিন ফজলুললল্লাহ বললেন, ঠিক করেছো। উদ্দেশ্য তো উপকৃত হওয়া।

যিনি বাংলার শায়েখ ছিলেন, তিনি শাময়িয়াত থেকে তাসাননুনের দিকে আসেন এবং শায়েখের দিকে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি বায়াত হয়ে তরিকতের শিক্ষা গ্রহণ করলেন। শায়েখের সোহবতে থেকে আনুগত্যশীল ও যোগ্যতাধারী হয়ে অধিক নেকী অর্জনের সৌভাগ্য অর্জন করেন। তাঁর আমন্ত্রণ পেয়ে শায়েখ বাংলা প্রদেশ সফর করেন। সেখানে শায়েখের খুবই জনপ্রিয়তা অর্জিত হয়। অনেক আলেম, পুণ্যবান, ছোট-বড় তাঁর জিকিরের মজলিসের অন্তর্ভুক্ত হন। কেউ কেউ খেলাফত লাভ করেন। আর কেউ কেউ হন এজাযতপ্রাপ্ত। কথিত আছে— পীরত্ব লাভের পর শায়েখ হজরত মোজাদ্দেদ র. এর কাছে আবেদন করেছিলেন, আমি আমার মধ্যে কোনো রকম কামালত দেখতে পাচ্ছি না। দু'ব্যক্তিকে জিকিরের তরিকার শিক্ষা দিয়েছি এবং তাদের প্রতি এমন এমন অবস্থা বিরাজ করছে। হজরত মোজাদ্দেদ র. তাঁর কাছে লিখে পাঠালেন—

প্রকাশ থাকে যে, এই দুই ব্যক্তির হাল যা তাদের উপর প্রকাশিত হয়েছে, তা আপনার হালের প্রতিবিম্ব। আপনার হালই তাদের যোগ্যতার দর্পনে বিকশিত হয়েছে। ওই দু'জন আলেম। তাই তারা আপনার হালসমূহ অনুধাবনে সক্ষম হয়েছে। আপনাকেও এই গোপন রহস্যপূর্ণ এলেমের দিকনির্দেশনা দিয়েছে। যেমন দর্পণ এক ব্যক্তির গোপন কামালত অর্জন হওয়ার প্রতি প্রমাণ বহন করে। তার গুপ্তরহস্যকে প্রকাশ করে দেয়। উদ্দেশ্য, হালসমূহ অর্জন— এলেম অর্জন উদ্দেশ্য নয়। যদিও এলেম অর্জন একটা সম্পদ, যা কোনো কোনো ব্যক্তিকে দেওয়া হয়। সবাইকে দেওয়া হয় না। কিন্তু এই দু'ধরনের ব্যক্তিই বেলায়েতধারী হয়ে থাকেন। শায়েখ জিজ্ঞেস করেছিলেন, সার্বক্ষণিক অন্তর্দৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও উদাসীনতা সৃষ্টি হওয়ার কী কারণ হতে পারে? তখন হজরত মোজাদ্দেদ এই মকতুবের কয়েকটি ছত্রে এই কথাগুলো উলেখ করেছিলেন—

প্রকাশ থাকে যে, হক তায়ালার মধ্যে সার্বক্ষণিক অন্তর্দৃষ্টি যা বাতেনী হুজুরের (পরোক্ষ নৈকট্যের) সাথে সম্পর্ক। এলেমে হুজুরির সাথে সম্পর্ক দায়েমে লাযেমের (অবশ্যম্ভাবী সার্বক্ষণিক স্মরণের)। আপনি কি কখনো শুনেছেন যে, কোনো ব্যক্তি নিজের নফস থেকে উদাসীন হয়েছে অথবা স্বীয় সম্পর্ক বা নেসবতে উদাসীনতা বা ভুল সৃষ্টি হয়েছে? উদাসীনতা এবং ভুল এলমে হুসুলির মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়। কেনোনা এর মধ্যে বিরোধ বা বৈপরিত্য আছে। কিন্তু এলমে হুজুরীর মধ্যে সকল হুজুর, হুজুরই (নৈকট্য) হয়ে [১] থাকে।

শায়েখ সত্তর বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছিলেন। আকবরাবাদে তাকে দাফন করা হয়।

---

১. মকতুবাত শরীফ ৩য় খণ্ডে ১৬ নং মকতুব তাঁর নামে লেখা হয়েছে।

১৩. শায়েখ আহমদ বরকী কুদ্দিসা সিররুহ

শায়েখ আহমদ বরকী কুদ্দিসা সিররুহও হজরত মোজাদ্দেদ র. এর অন্যতম খলিফা ছিলেন। আলেম ও আমলধারী ব্যক্তি ছিলেন তিনি। কাবুল ও কান্দাহারের মধ্যবর্তী অদ নামক স্থান তাঁর মাতৃভূমি। কিন্তু তাঁর পিতা স্থান পরিবর্তন করে নাকবিত শহর যা বরক নামে পরিচিত, সেখানে বসবাস করতেন। সেখানেই তাঁর ঠিকানা। মকতুবাত শরীফের অংশবিশেষ (শায়েখের এক বন্ধুর মাধ্যম) সেখানে পৌঁছানো হলে শায়েখ হজরত মোজাদ্দেদ র. সম্পর্কে অবগত হন। তিনি প্রভাবিত হন। অতঃপর হজরত মোজাদ্দেদ র. এর প্রতি গভীর আস্থা স্থাপন করেন। অনতিবিলম্বে সেরহিন্দ অভিমুখে যাত্রা করেন। যথাসময়ে হজরত মোজাদ্দেদ র. এর দরবারে উপস্থিতি দিয়ে ধন্য হন। হজরতের তাওয়াজ্জোহের বরকতে এবং তাঁর সদিচ্ছার কারণে তিনি এক সপ্তাহের মধ্যে কামালতের স্তরে পৌঁছে যান। হজরত মোজাদ্দেদ র. তাঁকে খেলাফত দিয়ে বিদায় দেন।

তিনি তাঁর অঞ্চলের কুতুব ছিলেন। হজরত মোজাদ্দেদ র. এর মকতুবাত শরীফ প্রথম খণ্ডে ২৭৫ নং মকতুব থেকে এ কথা জানা যায়। মকতুবখানি তাঁরই উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছিলো। হজরত মোজাদ্দেদ লিখেছেন—

একদিন তাঁর হালের উপর তাওয়াজ্জোহ্ প্রদান করা হলো। দেখলাম, তাঁর এলাকার চতুষ্পার্শ্বের লোকেরা তাঁর দিকে দৌড়ে চলে এলো। সকলে তাঁর কাছে নিজ নিজ নিবেদন প্রকাশ করতে লাগলো। বোঝা গেলো, তাঁকে ওই এলাকার কুতুব বানানো হয়েছে। সেখানকার লোকগুলোকে তাঁর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। আল্লাহ্পাকের বড়ই দয়া ও অনুগ্রহ, এ বিষয়টিকে স্বপ্নে প্রাপ্ত কোনো ঘটনা মনে কোরো না। কেনোনা স্বপ্নের মধ্যে সন্দেহের অবকাশ থাকে। বরং এ বিষয়টিকে অনুভূতি ও দর্শনীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত মনে করতে হবে।

এই মকতুবে আরো কিছু কথার উল্লেখ রয়েছে। ২৭৪ নং মকতুবখানিও শায়েখ ইউসুফ বরকী র. এর নিকট লিখেছিলেন, যার বিবরণ এরকম— "সাধারণ লোকেরা মাওলানা আহমদ বরকীকে জাহেরী আলেম বলে মনে করেন। বলেন, তিনি মুরিদগণের হালের বিষয়ে অবগত নন। এর রহস্য হচ্ছে এই যে, তাঁর বাতেন শুহুদে তানযিহী (পবিত্রতার দর্শন) হওয়ার কারণে শুহুদে কাছরাত আমীয (অধিক আকর্ষণীয় দর্শন) এর দিকে তাঁর অভিনিবেশ নেই। তাঁর জাহের (বাহ্যিকতা) সুফীদের স্মরণযোগ্য কথার মতো হৃদয়গ্রাহী নয়। ওই অঞ্চলের লোকদের জন্য তাঁর অস্তিত্ব খুবই মূল্যমান। এই হাল, যা প্রাপ্তির সংবাদ তিনিই দিয়েছেন। এই হালের উপর মাওলানা সাহেব দীর্ঘকাল প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এ বিষয়ে তিনি জ্ঞাত থাকুন অথবা থাকুন অজ্ঞাত। এ নগণ্য ফকিরের ধারণা, ওই অঞ্চলের আত্মশুদ্ধির দায়িত্ব মাওলানা সাহেবের উপরই অর্পিত হয়েছে। বড়ই

আশ্চর্যের বিষয়, বিষয়টি সেখানকার কাশফধারী ব্যক্তিদের কাছেও গুপ্ত। এই নগণ্য ফকিরের জানা মতে মাওলানা সাহেবের বুজর্গী বাইরে ও অভ্যন্তরে সূর্যের মতো সমুজ্জ্বল।

মাওলানা সাহেবের ইন্তেকালের পর হজরত মোজাদ্দেদ র. তাঁর সন্তানদেরকে সান্ত্বনাপ্রদান প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, মাওলানা সাহেবের অস্তিত্ব এ যুগের লোকদের জন্য মহান আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর মধ্যে অন্যতম নিদর্শন। তাঁর রহমতের মধ্য হতে অন্যতম রহমত। হে আল্লাহ্! তাঁর ফয়েজ-বরকত থেকে তুমি আমাদেরকে বঞ্চিত কোরো না।" (মকতুবাত ২য় খণ্ড ৬১)।

তাঁর নামে আরেকটি মকতুব দ্বিতীয় খণ্ড ১৪ নং এ উল্লেখ রয়েছে এভাবে— প্রশ্ন হচ্ছে প্রত্যেক 'সাহেবে মানছাব' অর্থাৎ পদধারী ব্যক্তি এলেম (জ্ঞান) সম্পন্ন হন কি না। হে মান্যবর! যিনি কুতুবুল আকতাব বা কুতুবগণের কুতুব, তিনি অবশ্য এলেমধারী। কিন্তু বিভিন্ন শহরের কুতুবগণ উক্ত কুতুবুল আকতাবের অংশ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গস্বরূপ। তাঁদের মাদার (কেন্দ্র) হওয়ার জ্ঞান কারো আছে, আবার কারো নেই। আপনি লিখেছেন 'ফানাফিল্লাহ্' ও 'বাকাবিল্লাহ্' এ পর্যন্ত হস্তগত হলো না। কী করা যায়, আপনি অতি অল্পকাল সংসর্গে ছিলেন। এ পর্যন্তও অপেক্ষা করেননি যে, আপনাকে কোনো হালাত বা আত্মিক অবস্থাপ্রাপ্তির অবগতি প্রদান করা যায়। অবশ্য আমি হিন্দুস্তান থেকেই আপনার ফানা ও বাকা প্রত্যক্ষ করছি। উক্ত পূর্ণতাদ্বয় যা বলেছেন, তা আপনার মধ্যে অনুভূত হচ্ছে। কিন্তু আপনি তা অস্বীকার করছেন। অনেক দূরে আছেন, যে পর্যন্ত সাক্ষাৎ না হয়, সে পর্যন্ত গুপ্ত অবস্থাবলীর প্রতি অবগতি প্রদান সুকঠিন।

মাশায়েখগণ 'ফানা' ও 'বাকা' বিষয়ে অনেক কথাই বলে থাকেন। কিন্তু ওগুলো সবই ইশারা-ইঙ্গিত দ্বারা হয়ে থাকে। স্বীয় অবস্থা স্বয়ং কী আর উপলব্ধি করবে। মহান আল্লাহ্ সকলকে অবস্থার জ্ঞান প্রদান করেন না। বরং তাঁদের মধ্যে কোনো এক ব্যক্তিকে হালাতপ্রাপ্তির জ্ঞান দান করেন ও অন্য সকলের অগ্রগামী করতঃ অন্য সকলকে তাঁর সঙ্গে সংশিষ্ট করে তাঁকে পূর্ণতা লাভ ও পূর্ণতা প্রদান করার মর্তবায় উপনীত করেন।

সকলের মঙ্গলার্থে প্রভু নিরঞ্জন
বিশিষ্ট করে লয় কোনো একজন।

কুদসিয়্যাহ্ ঃ মাওলানা শায়েখ আহমদ বরকী হজরত মোজাদ্দেদ র. এর কাছে চিঠি লিখেছিলেন। এক মুরিদ লিখেছেন, রসুলে আনোয়ার সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি শায়েখ আহমদ বরকী ও তাঁর মুরিদদেরকে কবুল করেছি। আরেকজন নেককার ব্যক্তি স্বপ্নে দেখেছেন, রসুলে আনওয়ার স. বলছেন, দুই রঙের খরবুজা রান্না করা (প্রস্তুত করা) হচ্ছে।

অন্য এক দরবেশ স্বপ্ন দেখেছেন, “তিনটি ক্ষেত্র দু’টি পাকা ফসলে পরিপূর্ণ এবং একটি সবুজ (কাঁচা) যা ছিলো দু’টি ক্ষেতের মাঝখানে। তাঁকে বলা হলো একটি ক্ষেত রসুলে আনোয়ার স. এর। দ্বিতীয়টি বর্তমান যুগের কুতুবের এবং তৃতীয়টি যা ওই দুটি ক্ষেতের মধ্যবর্তী, হা হচ্ছে শায়েখ আহমদ বরকীর”।

কুদসিয়্যাহ্ ঃ মাওলানা শায়েখ আহমদ বরকী বলেছেন, বেলায়েতের মধ্যে অগ্রগমন ভিন্ন ভিন্নভাবে হয় — যার শ্রেণী পাঁচটি। যেমন—

১. যিনি কলবের বেলায়েত স্তরে পৌঁছেছেন তিনি সিফাতে ফে’লিয়াহ (কর্মগুণ) প্রত্যক্ষ করেন। তাঁর অন্তর্দৃষ্টিতে কর্মগুণ দৃশ্যমান হয়।

২. যিনি রূহের বেলায়েতের স্তরে পৌঁছেছেন, তিনি সিফাতে যাতিয়া (যাত পাকের গুণ) প্রত্যক্ষ করেন।

৩. যিনি বেলায়েতে সেরে উপনীত হয়েছেন, তিনি তাজাল্লিয়ে যাতিয়া (যাত পাকের তাজাল্লী) প্রত্যক্ষ করেন।

৪. যিনি খফীর বেলায়েতে উপনীত হয়েছেন, তাঁকে পাক ও পবিত্রতা দর্শন করানো হয়।

৫. যিনি বেলায়েতে আখফা স্তরে উপনীত হয়েছেন, তিনি আনুরূপ্যবিহীন মিলনের স্তর দর্শন করেন এবং লাভ করেন অসলে উরইয়ান (অন্তরায়হীন মিলন)।

কারামত ঃ ঘটনাটি ওই সময়ের যখন ‘আহদাদ’ [১] বের হলো। শায়েখের প্রতি তার অতীতকাল থেকে শত্রুতা ছিলো। সে শহরে সব সময় টহল দিয়ে বেড়াতো। ওই স্থানের লোকদের জন্য সে ছিলো এক ভয়ংকর আতঙ্ক। শায়েখ আহমদ বরকী তার ক্ষতি ও অত্যাচার থেকে মুক্ত থাকার জন্য হজরত মোজাদ্দেদ র. এর কাছে বিনীতভাবে একটি চিঠি লিখলেন। হজরত মোজাদ্দেদ র. প্রতিউত্তরে লিখলেন, ইনশাআল্লাহ্! তার অত্যাচার থেকে তোমার শহর অবশ্যই মুক্ত থাকবে। সুদৃঢ় মহব্বত রেখো। সেরকমই হলো। ওই শহরের আশেপাশের অঞ্চলগুলো তার হাতেই ধ্বংস হলো। কিন্তু শায়েখের শহরে সে কোনো ক্ষতি করতে পারলো না।

কারামত ঃ একবার হজরত মোজাদ্দেদ র. মাওলানা শায়েখ আহমদ বরকীকে লিখেছিলেন, যদি আপনি সফরে গমনের ইচ্ছা করেন, তাহলে শায়েখ হাসান বরকীকে আপনার প্রতিনিধি বানিয়ে দিয়ে যাবেন। এ চিঠিটি পৌঁছানোর কয়েকদিন পর ১০২৬ হিজরীতে মাওলানা শায়েখ আহমদ বরকী পরপারের সফরে পাড়ি দেন। তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর ভ্রাতা শায়েখ ওসমান আকবরাবাদ সফর শেষে হজরত মোজাদ্দেদ র. এর দরবারে পৌঁছলেন। হজরত মোজাদ্দেদ র.

১. ফারসি মূল লেখার মধ্যে ‘আহদাদ’ শব্দটি রয়েছে। উর্দূ পাণ্ডুলিপিতে রয়েছে ‘হাদ্দাদ’। কিন্তু অন্য কোনো ইতিহাসে তার নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না।

মাওলানা সাহেবের জন্য দোয়া করলেন। শায়েখ ওসমান দিশেহারা অবস্থায় কান্নাকাটি করতে লাগলেন। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে বেহুঁশ হয়ে গেলেন। তাঁকে সান্ত ্বনা দেওয়ার জন্য লোকেরা সমবেত হলো। হজরত মোজাদ্দেদ র. বললেন, তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আকাশ-পৃথিবী সকলেই মাওলানার শোকে অশ্রুসিক্ত। যদি ভাই কান্নাকাটি করে, তবে তোমরা তাকে বিরত রাখতে চাও কেনো? তাঁর এ কথায় কেউ কেউ বিস্ময় প্রকাশ করলেন। হজরত র. বললেন, মাওলানা শায়েখ আহমদ বরকী [১] আল্লাহ্র ওই সকল আউলিয়াগণের অন্তর্ভুক্ত, যাকে লোকেরা চিনতে পারেনি এবং মাওলানা নিজেও নিজেকে চিনতে পারেননি।

১৪. শায়েখ ইউসুফ বরকী কুদ্দিসা সিররুহু

তিনি হজরত মোজাদ্দেদ র. এর অন্যতম খলিফা ছিলেন এবং অজদ (মত্তপ্রেম), শওক (ভালোবাসা), না'রাহ (প্রেমরোদন), হা-হুতাশ এবং যাচঞাকারী ব্যক্তি ছিলেন তিনি। তিনি প্রথমে তাঁর নিজ এলাকায় মালুফের কোনো এক বুজর্গের হাতে বায়াত হন। তাঁর মাধ্যমে তাওহীদে সুরী (আকৃতিগত একত্ববাদ) এর মধ্যে 'ফানা' অর্জন করেন। স্বপ্ন দেখেন, সকল আউলিয়া কেরাম হজরত মোজাদ্দেদ র. এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তাঁরা তাঁকে হজরত মোজাদ্দেদ র. এর দরবারে উপস্থিত হতে উৎসাহিত করছেন। তিনি প্রথমে তাঁর হালের বর্ণনাসম্বলিত এক নিবেদনপত্র লিখলেন। প্রেরণ করলেন হজরত মোজাদ্দেদ র. এর দরবারে। হজরত মোজাদ্দেদ র. প্রতি উত্তরে লিখলেন, এ ধরনের অবস্থা এ পথের সূচনাপর্বেই হয়ে থাকে। এগুলোকে খুব বেশি গুরুত্ব না দিয়ে এড়িয়ে [২] যাওয়াই শ্রেয়ঃ। এই মকতুবখানি প্রাপ্তির পরপরই তাঁর মধ্যে হজরত মোজাদ্দেদ র. এর দর্শনের বাসনা প্রবল আকার ধারণ করলো।

তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে তাঁর মহান দরবারে উপস্থিত হয়ে নিজেকে ধন্য করলেন। সৌভাগ্যবান হওয়ার সুযোগ লাভ করলেন। অল্পদিনের মধ্যে তিনি কামালত অর্জন করেন। হজরত মোজাদ্দেদ র. তাঁকে এজাযত দিয়ে জলন্ধর অভিমুখে প্রেরণ করলেন। বিদায়ের প্রাক্কালে তিনি আর্তনাদ করতে লাগলেন। তাঁর আচরণ হয়ে উঠলো অস্বাভাবিক। তবু তিনি নির্দেশ পালন করলেন। কিন্তু তাঁর গভীর ভক্তি, ভালোবাসা ও অনুরাগের কারণে কিছুদিন পর পরই হজরত মোজাদ্দেদ র. এর দরবারে উপস্থিত হয়ে তিনি ফয়েজ লাভ করতেন। পুনরায় জলন্ধরে ফিরে যেতেন। কখনো কখনো তাঁর নিজের আত্মিক অবস্থার কথা হজরত

১. মকতুবাত প্রথম খণ্ডে মাওলানা শায়েখ আহমদ বরকীর নামে নিম্নলিখিত মকতুব রয়েছে। ২৩৯, ২৫০, ২৫৪, ২৭৪, ২৭৫। দ্বিতীয় খণ্ডে ১৪, ১৬,৭৭ নং এবং তৃতীয় খণ্ডে ১০৫ নং মকতুব।

২. মকতুবাত শরীফ ১ম খণ্ড ২৩০ নং ।

মোজাদ্দেদ র. কে লিখে জানাতেন। উত্তরও পেতেন। হজরত মোজাদ্দেদ র. তাঁর এক ভক্তকে চিঠিতে লিখেছিলেন, শায়েখ ইউসূফ আমার কাছে এসে বেশ কিছুকাল অবস্থান করেছিলো। সে অনেক ফয়েজপ্রাপ্ত হয়েছে এবং হকিকতে ফানা (প্রকৃত বিলীনতা) সম্পর্কে জানতে পেরেছে। পুনরায় আগমনের অঙ্গীকার করে নিজ গন্তব্যে চলে গিয়েছে। সে একজন খাঁটি যোগ্যতাধারী ব্যক্তিত্ব।

কুদসিয়্যাহ্ ঃ শায়েখ আবু ইউসূফ বর্ণনা করেন, সাধনার প্রারম্ভিক অবস্থায় আমার উপর ওয়াহদাতুল অজুদের হাল প্রবল হলো। এমতো প্রাবল্যের সময় আমি নিজেকে 'হক' মনে করতাম এবং নিজেই নিজেকে বলতাম, যদি বাস্ত বিকপক্ষে তুমি হক হও, তাহলে এমন এমন হয়ে যাও। তদ্রূপই হয়ে যেতো এবং বিস্ময়কর ও দুর্লভ বিষয়ের বহিঃপ্রকাশ ঘটতো। কোনো মুখাপেক্ষী ব্যক্তি তার প্রয়োজনে কথা বললে, আমি বলতাম যদি আমি হক হয়ে থাকি, তাহলে তোমার বাসনা পূর্ণ হবে। তাই হতো। কিন্তু যখন আমি এই অবস্থা থেকে নুযুল (অবতরণ) করতাম তখন আমি নিজেকে বান্দা হিসেবে পেতাম। তখন আমার মুখে মত্ততাপূর্ণ কথা প্রকাশ পেতো না।

শায়েখ ১০৩৪ হিজরীর নিকটবর্তী সময়ে ইন্তেকাল করেন। তাঁকে জলন্ধর শহরেই দাফন করা হয়।

(মকতুবাত শরীফে তাঁর নামে প্রথম খণ্ডে ৫৭, ২০০, ২৪০, ২৭৪ এবং দ্বিতীয় খণ্ডে ৭৯ নং মকতুব বিদ্যমান)।

১৫. শায়েখ করীমুদ্দীন উরফে আবদুল করীম কুদ্দিসা সিররুহু

শায়েখ করীমুদ্দীন কুদ্দিসা সিররুহু আটক পরগনার ওসমানপুরে কাথ্‌থার নামক স্থানে বসবাস করতেন। সেখান থেকেই কাশমীর গমনের পথ ভাগ হয়ে গিয়েছে। তিনি হজরত মোজাদ্দেদ র. এর একজন প্রসিদ্ধ মুরিদ ও অন্যতম খলিফা ছিলেন। ছিলেন খুবই কাশফ ও কারামতসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। ওই সময় তাঁর অঞ্চলে ব্যাপকভাবে তাসাউফ চর্চা হতো। তিনি সেখানকার দায়িত্বে ছিলেন।

হজরত মোজাদ্দেদ র. এর কাছে তাঁর বায়াত হওয়ার কারণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমি জাহেরী এলেম শিক্ষা করার জন্য যুবক বয়সে লাহোরে যাই এবং খুব মনোনিবেশের সঙ্গে জাহেরী এলেম শিখতে থাকি। এক সময় আমার অন্তরে এই বিষয়টির উদয় হলো যে, এ অবস্থায়ই যদি আমি মারা যাই তাহলে তো আমি আল্লাহ্‌কে না চেনা অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করবো। ব্যস! আমার অন্তরে এমন কথা উদয় হতেই আমি জাহেরী এলেম শিক্ষা ত্যাগ করলাম। নিজ দেশে ফিরে গিয়ে ইবাদত ও আনুগত্যের মধ্যে লিপ্ত হলাম। আমার অন্তরে মোর্শেদ-অন্বেষণের আকর্ষণ সৃষ্টি হলো। এক রাতে আমি এক বুজর্গকে স্বপ্নে দেখলাম। তাঁর চেহারায় হজরত ইউসূফ আ. এর সৌন্দর্যের নিদর্শন ছিলো। চেহারায় ছিলো অনন্যসাধারণ

মাহাত্ম্য ও গাম্ভীর্য। ঠিক করলাম, আমি এই বুজর্গের মুরিদ হবো। যখন জাগ্রত হলাম, তখন বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লাম এই ভেবে যে, এখন তাঁকে আমি কোথায় পাবো? আমার এ কথাও মনে হলো যে, স্বপ্নে যা দেখেছি, তা অবশ্যই বাস্তবে পরিণত হবে। দ্বিতীয় রাতে হুবহু ওই ব্যক্তির চেহারাই দৃশ্যমান হলো। তখন আমার জুলায়খার কথা মনে হলো। এভাবে কয়েকবার আমি তাঁকে স্বপ্নে দেখলাম। এরপর স্বপ্নাদেশ বন্ধ হয়ে গেলো। আমার অন্তরের অস্থিরতা আরো বেড়ে গেলো। এরপর আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে এই মর্মে সম্মত করিয়ে নিলাম যে, আজ তাহাজ্জুদের পরে সে আমাকে ডেকে দেবে। আমি পিতামাতা পরিবারবর্গ ছেড়ে কাউকে না বলেই আল্লাহ্‌র সন্ধানে বের হয়ে যাবো। কথা অনুযায়ী বন্ধুটি ওই সময় আমার ঘরে এলো। পরিবারের লোকেরা সকলেই নিদ্রিত ছিলো। আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম। পাগলপারা হয়ে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। হিন্দুস্তানের পথে রওয়ানা হয়ে সেরহিন্দের কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম। সেখানে শায়েখ জাওহারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি প্রসিদ্ধ আলেম ও তাকওয়াধারী ব্যক্তি ছিলেন। আমি তাঁর কাছে আমার সকল কথা ব্যক্ত করে এমন এক পীরের সন্ধান চাইলাম, যিনি শরীয়তের পূর্ণ অনুসারী। শায়েখ বললেন, চিন্তা কোরো না। এমন পীর তুমি অবশ্যই পেয়ে যাবে। আমি তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে আকবরাবাদ গমনের ইচ্ছা করলাম। ভাবলাম, সেখানে কোনো কামেল পীর পাওয়া যেতে পারে। ঘটনাক্রমে সেরহিন্দের বাজারে এক মুন্সী সুফী ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ হলো। তাঁর কাছে আমার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলাম। তিনিই আমাকে হজরত মোজাদ্দেদ র. এর ঠিকানা বলে দিলেন এবং হজরতের মসজিদ ও খানকা দেখিয়ে দিলেন। আমি সেখানে গিয়ে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার চেহারা ছিলো হতাশাগ্রস্ত। আমাকে দেখে এক দরবেশ ভিতরে গিয়ে হজরত মোজাদ্দেদ র.কে বললেন, বাইরে একজন বিধ্বস্ত ব্যক্তি এসেছেন। হজরত র. বললেন, তাকে ভিতরে নিয়ে এসো। আমি ভিতরে গেলাম। যখন আমি হজরত ফায়েজুল আনোয়ার র. এর চেহারা মোবারক দেখলাম, তখনই মনে পড়লো পবিত্র অবয়বধারীকে তো আমি কয়েকবার স্বপ্নে দেখেছি। আমার হৃদয় ভালোবাসা ও আবেগে উথলে উঠলো। ইচ্ছা হলো হজরতের কদমে লুটিয়ে পড়ি। কিন্তু হজরত র. আমাকে তাঁর বগলে নিয়ে নিলেন। কিছু সময় গভীর মমতায় জড়িয়ে রাখলেন। আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়লাম। দীর্ঘক্ষণ ধরে কাঁদলাম। হজরত মোজাদ্দেদ র. আমাকে উঠিয়ে নিয়ে ঘরের ভিতরে গেলেন। জিকিরের শিক্ষা দিলেন। আমি বললাম, আমার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছে। অথচ হজরত র. এর নিয়ম ছিলো এটাই যে, কাউকে মুরিদ করে প্রশিক্ষণ দেওয়ার পূর্বে বেশ কিছুকাল তাঁকে পর্যবেক্ষণে রাখতেন।

দরজাহ ঃ একবার হজরত মোজাদ্দেদ র. শায়েখ করীমুদ্দীন র. এর দেশে [১] সফরে গিয়েছিলেন। তখন তাঁর মুরিদগণ উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন, হজরত! আপনার রূহানী নেয়ামতের দস্তরখান থেকে আমাদেরকে কিছু দান করুন। হজরত মোজাদ্দেদ র. শায়েখকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি তাদেরকে তরিকত বিষয়ে কিছু শিক্ষা দিয়েছেন? তিনি বললেন, আমি হজরতের কাছ থেকে যা পেয়েছি তা তাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। হজরত মোজাদ্দেদ র. বললেন, শায়েখ করীমুদ্দীনের জবানই আমার জবান। যা কিছু তিনি বলেছেন, তা আমিই বলেছি। যাও নিজেদের কাজ করো। তারপর হজরত মোজাদ্দেদ র. গায়ের জামা খুলে শায়েখ করীমুদ্দীনকে দান করলেন।

কুদসিয়্যাহ্ ঃ শায়েখ বর্ণনা করেছেন, আমি একবার হজরত গউছুল আজম শায়েখ আবদুল কাদের জীলানী কুদ্দিসা সিররুহুকে স্বপ্নে দেখলাম। তিনি বলছেন, 'তুমি আমার কাছে চলে এসো'। আমার অন্তরে হজরত মোজাদ্দেদ র. এর ভয় এসে গেলো। ভাবলাম, আমি তো হজরত মোজাদ্দেদ র. এর কাছ থেকে নেয়ামতপ্রাপ্ত, তাঁরই পরিচর্যাধীন। এমতাবস্থায় তাঁর কাছে যাওয়া কি ঠিক হবে? আমি কোনো কথা বললাম না। স্বপ্নের মধ্যেই সতর্ক হয়ে গেলাম। এরপর এক বছর পর্যন্ত এই অবস্থা রয়ে গেলো যে, আমি যাকেই নকশবন্দিয়া তরিকার তালিম দেই, প্রকাশ্যভাবে জিকিরের মধ্যে তার কাদেরিয়া তরিকার নেসবত লাভ হয়ে যায়।

দরজাহ ঃ একবার এক কর্মচারী হজরত শায়েখের কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, এক মহিলা আপনার কাছে কিছু হাদিয়া পাঠিয়েছেন। শায়েখ মুরিদগণসহ মোরাকাবায় ছিলেন। তিনি মাথা ওঠালেন এবং তার দিকে দৃষ্টি দিলেন। কর্মচারীটির আকস্মিক পরিবর্তন দেখা দিলো। সে মত্ত অবস্থায় ওই মহিলার দিকে চলে গেলো। মহিলা ছিলো বুদ্ধিমতি। সে বুঝতে পারলো, তার উপর শায়েখের দৃষ্টি পতিত হয়েছে। কিন্তু কর্মচারীকে দেখে ওই মহিলার উপরও মত্ততার হাল প্রভাব বিস্তার করলো। সে বেপর্দা অবস্থায়ই শায়েখের কাছে দৌড়ে আসতে লাগলো। তার স্বামী তাকে বাধা দিলো। বললো, তুমি পর্দা অবস্থায় যাও। এই ঘটনার সংবাদ শায়েখের কাছে পৌঁছানো হলো। তিনি তাঁর খলিফা শায়েখ [২] জাওহারকে জিকির শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে মহিলার বাড়িতে প্রেরণ করলেন।

---

১. অন্য কোনো গ্রন্থে হজরত মোজাদ্দেদ র. এর সফরের কথা উল্লেখ নেই।

২. শায়েখ জাওহার ওই ব্যক্তি নন, যিনি সেরহিন্দে ছিলেন, যার সম্পর্কে শায়েখ করীমুদ্দীনের বিবরণীর শুরুতে আলোচনা করা হয়েছে।

তাসাররুফ ঃ আবদুন্ নবী [১] একজন বড় জ্ঞানী ও বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কোলাহল থেকে দূরে থাকতে ভালোবাসতেন। শায়েখের গ্রামেরই অধিবাসী ছিলেন তিনি। একদিন তিনি শায়েখকে দাওয়াত করলেন। আহারপর্ব সমাপনের পর নিবেদন করলেন, অনুগ্রহপূর্বক আমাকে জিকিরের শিক্ষা দিন। শায়েখ বললেন, ঘর থেকে বের হয়ে মসজিদে আসুন। সেখানে বায়াত হয়ে জিকিরের শিক্ষা গ্রহণ করুন। তিনি বললেন, আমাকে নির্জনে তরিকা শিক্ষা দিন। শায়েখ বুঝতে পারলেন, লোকজনের কারণে তিনি সংকোচ বোধ করছেন।

তিনি বললেন, নির্জনে তরিকত শিক্ষা দেওয়া হয় না। তিনি বললেন, যদি আমাকে নির্জনে একাকী তরিকত শিক্ষা না দেন, তাহলে আমি মানুষের কাছে গিয়ে অপপ্রচার করবো যে, আপনি একজন বেদাতী। শায়েখ বিব্রতবোধ করলেন। রাগান্বিতও হলেন। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, ঠিক আছে অপপ্রচার করুন। এতে আমার কোনো ক্ষতি হবে না। এই ঘটনার পর থেকে আবদুন্ নবী শায়েখের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে লিপ্ত হলো। কিছু দিন যেতে না যেতেই তার ঘর বাড়ি ধ্বংস হয়ে গেলো। সে এবং তার সন্তানও মারা গেলো। তার আবাসভূমি বিরানভূমিতে পরিণত হলো।

তাসাররুফ ঃ শায়েখ মূসা [২] সাহুনী ছিলেন তাঁর যুগের একজন উচ্চপদমর্যাদাসম্পন্ন বুজর্গ। তিনি একবার কার্যব্যাপদেশে শায়েখের গ্রামে এলেন। সেই সময় শায়েখের সংগে সাক্ষাৎ করলেন। শায়েখ জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কোন্ সিলসিলার মুরিদ? তিনি বললেন, আমি শায়েখ ঈসা [৩] লংগুতীর মুরিদ। তাঁর কাছ থেকে খেলাফতপ্রাপ্ত। শায়েখ বললেন, আপনি মোরাকাবায় বসুন,

---

১.উর্দু তরজমার মধ্যে তাঁর নাম এসেছে আবদুল গনী।

২. ফারসী মূল কিতাব ও অনুবাদের মধ্যে শায়েখ মূসা হাছবীন রয়েছে, যা সঠিক নয়। মকতুবাত শরীফ তৃতীয় খণ্ডে ৬৯, ৭০ নং মকতুবে তাঁর নাম রয়েছে শাওহীন। কিন্তু সঠিক শব্দ হচ্ছে সুহুন (সুহুনী)। সুহুন সিন্ধু প্রদেশের একটি প্রসিদ্ধ শহর। সেখানে হজরত শাহবাজ কলন্দর র. এর মাজার শরীফ রয়েছে। দক্ষিণ অঞ্চলের মুসলমানেরা যখন খায়বর উপত্যকা থেকে হিন্দুস্তানে প্রবেশ করেছিলো, তখন তারা এখানেও তাদের নদীর নাম ঠিক রেখেছিল। অর্থাৎ গঙ্গাকে বলতো জায়হুন এবং সিন্ধুকে সায়হুন।

এক কবি বলেছেন—

তাবেদায়াদ আতশে সিনানে সায়হুন
হাম বারানে আব নিসতে আবে কানুন

এখানে 'সায়হুন' শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য সিন্ধু। 'যাইয়েনুল আখবার' এবং 'মুয়াইদুল ফুজালা' পুস্তকে সায়হুন শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য সিন্ধু।

৩. ফারসী মূল কিতাব ও অনুবাদের মধ্যে শায়েখ ঈসা বালুতী রয়েছে, যা সঠিক নয়। লংগুতীই সঠিক, যার বিবরণ মোহাম্মদ আজম লিখিত 'তুহফাতুত্ তাহেরীন' এবং আলী শেরকানি লিখিত 'মাকালাতুশ্ শুআরা' গ্রন্থে পাওয়া যায়।

যেনো আমার থেকে কিছু পেতে পারেন। তিনি মাথা নত করে মোরাকাবায় মগ্ন হলেন। শায়েখ তাঁর উপর তাওয়াজ্জোহ্ দিলেন। মুখে কিছু বললেন না। শায়েখের নিয়ম ছিলো, তাওয়াজ্জোহ্ প্রয়োগের মাধ্যমে তিনি মুরিদের অন্তরে নকশবন্দিয়া তরিকা এলকা করতেন।

কিছুক্ষণ পর শায়েখ মূসা মাথা উঠিয়ে বললেন, শায়েখ ঈসার নেসবত আমার অন্তর থেকে দূরীভূত হয়েছে। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আপনার নেসবত। বাড়িতে ফিরে এসে তিনি সম্পূর্ণ ঘটনাটি তাঁর পুত্র শায়েখ ইসহাকের কাছে ব্যক্ত করলেন। তাঁকেও শায়েখের সোহবতে যেতে উৎসাহিত করলেন। এই সন্তান নিজে পীরজাদা ভাব নিয়ে শায়েখকে দেখতে গেলেন। তখন শায়েখ তাঁর হুজরাখানা নির্মাণের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর হাতে ও শরীরে কাঁদামাটি লেগে ছিলো। এমন অবস্থায় শায়েখজাদা ইসহাক শায়েখকে সালাম দিলেন। শায়েখ তার প্রতি তাকিয়ে বললেন, আমি হাত ধুয়ে এসে আপনার সাথে করমিলন করবো। তিনি বিনয়ের সাথে বললেন, হজরত! আপনি আমার প্রতি শুধুমাত্রএকবার দৃষ্টিপাত করেছেন, এতেই হজরত খাজা মোহাম্মদ বাকী বিল্লাহ্ কুদ্দিসা সিররুহুর খলিফা শায়েখ তাজ সম্বলী যার সাথে আমার সাত মাসের নেসবত সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে গেলো। প্রতিষ্ঠিত হলো আপনার নেসবত। তিনি ওই শায়েখজাদাকে হুজরার মধ্যে নিয়ে গেলেন। তাওয়াজ্জোহ্ দিয়ে নকশবন্দিয়া তরিকা এলকা করলেন। যথার্থ তাওয়াজ্জোহ্ পড়তেই শায়েখ ইসহাক মত্ততার জগতে পৌঁছে গেলেন। তিনি অস্বাভাবিক অবস্থায় হাত পা ছোঁড়াছুঁড়ি করতে লাগলেন। নিজেকে হুজরার প্রাচীর ও ছাদের সাথে আছড়াতে লাগলেন। উটের মতো তার মুখ থেকে ফেনা বের হতে লাগলো। শায়েখ উঠে বাইরে এলেন। হুজরার দরজার শিকল বাহির থেকে লাগিয়ে দিলেন। হুজরার ভিতরে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত অচেতন অবস্থায় রইলেন শায়েখজাদা ইসহাক। দুপুরের পরে শায়েখ হুজরার দরজা খুলে তার পাশে বসলেন। তাওয়াজ্জোহ্ দিলেন এবং পরে ইসহাক চেতনা ফিরে পেলেন। বললেন, দোয়াত কলম আনা হোক। এখানে হজরত মোজাদ্দেদ র. এসেছিলেন। তিনি যা কিছু বলেছিলেন তা লিখে রাখো যেনো ভুলে না যাও। তিনি বলেছিলেন—

মিন আহমাদিস সিহরিন্দী ইলা ইসহাকুস সানাদী।
ইয়া ইসহাক! আনতা ওয়ালাদী ওয়া খলিফাতি
ফী জামীয়ির রুমুযাতিল হাকীকী ওয়াদদাকীকী
ওয়া ইন্নী মাগফুরুন ওয়া আনতা মাগফুরুন ওয়ামান
তাওয়াসসালা বিকা আয়দান মাগফুরান ওয়াইকরায়িল
হাবীবী ওয়া খলীফাতি মাওলানা করীমুদ্দীন মিন্নীস সালাম। [১]

---

১. শায়েখ ইসহাক এ ঘটনা সহ আরেকটি নিবেদন হজরত মোজাদ্দেদ র. এর দরবারে উপস্থাপন করেছিলেন, যার উত্তর মকতুবাত শরীফ তৃতীয় খণ্ড ৭০ নং মকতুবে রয়েছে। ৬৯ নং মকতুব লেখা হয়েছে শায়েখ ঈসার পিতা শায়েখ মূসার নামে।

অর্থ ঃ আহমদ সেরহিন্দী (হজরত মোজাদ্দেদ) এর পক্ষ থেকে শায়েখ ইসহাক সনদীকে। প্রকাশ থাকে যে, ইসহাক তো আমার রূহানী সন্তান ও খলিফা। সকল এলমে মারেফাতের ইঙ্গিতসমূহের বাস্তবতায় ও সূক্ষ্মতত্ত্বের মধ্যে আমাকে ও তোমাকে ক্ষমা করা হয়েছে। যারা তোমাকে অসিলা হিসেবে গ্রহণ করবে, তারও ক্ষমাপ্রাপ্ত। আমার প্রিয়জন ও খলিফা মাওলানা করীমুদ্দীনের প্রতি সালাম।

শায়েখ তাঁকে বললেন, হজরত মোজাদ্দেদ র. এখনই আপনাকে খেলাফত দিয়েছেন। এটাই আপনার সনদ। অতঃপর তাঁকে বিদায় দিলেন। তিনি নিজ বাড়িতে ফিরে গেলেন এবং সেখানে বহুলোক তাঁর কাছে মুরিদ হয়ে গেলো। সর্বপ্রথম মুরিদ হলেন মীরাক মাসউদ বেগ বিন আহমদ বেগ খান কাবেলী। এই মীরাক আমীরগণের অন্যতম ছিলেন। তাঁর সাথে ছিলেন আলেম ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ। তারা ঈর্ষা ও বিরূপ ধারণা বশতঃ বলতে শুরু করলো, ইসহাক তো শায়েখ লংগুতীর মুরিদ। তিনি নিজেকে নকশবন্দী বলছেন— এটা ভুল। এ কথা শুনে মীরাক শায়েখ ইসহাকের কাছে মুরিদ হতে আপত্তি করলেন এবং দুই তিন দিন শায়েখ ইসহাকের কাছে গেলেন না। শায়েখ ইসহাক নিজেই মীরাকের বাড়িতে গেলেন। কিন্তু অপপ্রচারকারীদের অপপ্রচার তাকে পরিবেষ্টিত করেছিলো। তাই তিনি শায়েখ ইসহাকের প্রতি কোনো সম্মান প্রদর্শন করলেন না। শায়েখ বিব্রত হয়ে অপেক্ষা না করে ফিরে এলেন। ওই রাতেই মীরাক স্বপ্ন দেখলেন, হজরত খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দ কুদ্দিসা সিররুহু আগমন করেছেন। কখনো তাঁর আকৃতি জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত ধারণ করছিলো, আবার কখনো সূক্ষ্ম সূচের মতো চিকন হয়ে যাচ্ছিলো। তিনি মীরাককে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে মারদক! তুমি আল্লাহ্‌র প্রেমিক ব্যক্তিকে চিনতে পারলে না? মীরাক এ কথা শুনে ভয়ে আতংকে কাঁপতে শুরু করলেন। জাগ্রত হলেন। এরপর সময়ক্ষেপণ না করে অবিলম্বে শায়েখ ইসহাকের দরবারে হাজির হলেন। অনুনয়-বিনয়ের সাথে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাঁর কদমে লুটিয়ে পড়ে অপরাধ মার্জনার জন্য ক্ষমা চাইলেন। বললেন, ঈর্ষা প্রদর্শনের জন্য আপনি আমার প্রতি যে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন করুন। মানুষ আমার জীবন ও ইমান ধ্বংস করার চেষ্টা করেছিলো। শায়েখ ইসহাক বললেন, ওই লোকদেরকে দূরে সরিয়ে দিন। তিনি তাই করলেন।

দ্বিতীয়বার যখন শায়েখ ইসহাক, শায়েখ করীমুদ্দীন র. এর দরবারে উপস্থিত হলেন, তখন তিনি তাঁকে নফী ইসবাত জিকিরের শিক্ষা দিলেন। তাঁর বাতেনী অবস্থার মধ্যে জিকিরের প্রবাহ শুরু হয়ে গেলো এবং এতো পরিমাণ জালাল অবস্থার সৃষ্টি হলো যে, নদীর সমস্ত পানি পান করালেও তার জ্বালা নিভবে না। তাকে একটি মাটির বড় পাত্রের পানি পান করতে দেওয়া হতো। তিনি পান করতেন, কিন্তু পরিতৃপ্ত হতেন না। বারংবার বলতেন, জ্বলে গেলাম, পুড়ে

গেলাম। তারপর তিনি কয়েকদিন পর্যন্ত নীরব রইলেন। একদিন শায়েখ জিজ্ঞেস করলেন, আপনার অবস্থা কী? তিনি বললেন, আমি নিজেই জানি না যে, আমি কে? আমি নারী না পুরুষ, আমি জমিন না আসমান।

তাসররুফ ঃ শায়েখ করীমুদ্দীন র. বর্ণনা করেছেন, একবার আমি সপরিবারে হজরত মোজাদ্দেদ র. এর দরবারে পৌঁছলাম। যখন আমি বিদায় নিতে ইচ্ছা করলাম, তখন আমার স্ত্রী বললেন, ভালো হয়— আমিও যদি হজরত মোজাদ্দেদ র. এর তরিকার জিকির শিক্ষা করি। আমি বিষয়টি হজরত মোজাদ্দেদ র. এর কাছে ব্যক্ত করলাম। বললাম, সেতো আপনার কাছ থেকে জিকিরের শিক্ষা গ্রহণ করতে চায়। তিনি বললেন, ঠিক আছে। এরপর মোরাকাবায় মগ্ন হলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন, করীমুদ্দীন ! তার দায়িত্ব আমি তোমার উপর অর্পণ করলাম। সে তোমার কাছ থেকে জিকির শিক্ষা করবে। এরপর আমি তার উপর অনেকবার তাওয়াজ্জোহ্ দিয়েছি কিন্তু কার্যকর হয়নি। এক রাতে তাহাজ্জুদ নামাজের পর আমি কলেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র জিকির করছিলাম। আমার স্ত্রীও তাহাজ্জুদ শেষে আমার পিছনে বসে ছিলেন। আমার জবান থেকে যখন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বের হলো, তখন তাঁর হাল পরিবর্তিত হলো। জযবা প্রকাশিত হলো। জযবার প্রভাবে সে জবাইকৃত মোরগের মতো ছটফট করতে লাগলো।

সপরিবারে যখন করীমুদ্দীন হজরত মোজাদ্দেদ র. এর দরবারে গিয়েছিলেন, তখন তিনি নির্জনে [১] বাস করতেন। খুব কম লোকেরই তখন তাঁর সাথে সাক্ষাতের সুযোগ ছিলো। কিন্তু নির্দেশ ছিলো, করীমুদ্দীন ও তার লোকজনকে সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া হলো।

কারামত ঃ একবার শায়েখ করীমুদ্দীনের এক মুরিদ অসুস্থ হলেন। তিনি খবর পেয়ে সেখানে গেলেন। তার কাছাকাছি একটি বিছানায় রাত্রিযাপন করলেন, যেনো স্বপ্নে তার জীবন বা মৃত্যু অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। স্বপ্নে দেখলেন, এক সৈন্য কালো পোশাক পরিহিত একটি ঘোড়াসহ দ্রুত দৌড় দিলো। হঠাৎ ঘোড়া থেমে পড়ে গেলো। গুরুতর আহত হলো। ঘোড়াটি শত্রু দলের সাথে মিলিত হলো। শায়েখ জাগ্রত হলেন। ওই মুরিদের জীবনের আশা ছেড়ে দিলেন। তার বন্ধুদেরকে কাফন-দাফনের প্রস্তুতি নিতে বললেন। অনেকে তার কথা বিশ্বাস

---

১. হজরত মোজাদ্দেদ র. ১লা রজব জুমআর দিন ১০২৮ হিজরী সালে বন্দী হন এবং ১০২৯ হিজরীর ১১ই রজব মুক্ত হন। সম্রাট প্রথমে খেলাআত (পোশাক) এবং এক হাজার মুদ্রা হাদিয়া দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে দু'হাজার মুদ্রা দিয়েছিলেন। হজরত মোজাদ্দেদ র. কে এই মর্মে অনুমতি দেওয়া হয়েছিলো যে, আপনি বাড়ি যেতে পারেন, অথবা সৈন্যদের সাথে অবস্থান করতে পারেন। তিনি তাঁর জীবনের শেষ তিন বছর কাল সরকারী সৈন্যদের সাথে ছিলেন। ১০৩৩ হিজরীর শাবান মাসে নির্জনবাস অবলম্বন করেন এবং ১০৩৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। বিস্তারিত জানার জন্য ডাঃ সিরাজ আহমদ খান লিখিত গ্রন্থ 'মকতুবাতে ইমামে রব্বানী কী দ্বীনি আওর মাআশিরাতি আহাম্মিয়তি' দেখুন।

করতে পারলো না। কারণ তার অসুখ এমন গুরুতর ছিলো না, যাতে মৃত্যুর কথা ভাবা যায়। তারা বললো, হে শায়েখ! এমন কথা বলবেন না। এমন সময় রোগীর শ্বাস দীর্ঘ ও গভীর হয়ে গেলো। তরিকা পছন্দ করে না এরকম কিছু লোকও সেখানে উপস্থিত ছিলো। শায়েখ দোয়া করলেন, হে আমার আল্লাহ্! এ অবস্থায় যদি তার অন্তরে জিকির জারী না হয়, তাহলে তার জবানে অন্তত তোমার জিকির জারি করে দাও। দোয়া শেষ হওয়ার আগেই মুমুর্ষ ব্যক্তি আল্লাহ্ আল্লাহ্ জিকির শুরু করে দিলো। আওয়াজ ক্রমশঃ উচ্চ হতে লাগলো। শেষ নিঃশ্বাস 'আল্লাহ্' নামের উপর শেষ হলো। তরিকাবিরোধীরা তওবা করলো। তাঁর প্রতি আস্থা স্থাপন করলো।

কারামত ঃ শায়েখ বর্ণনা করেন, আমি রজব মাসের শেষ দিন সপরিবারে হজরত র. এর দরবারে উপস্থিত হলাম। তখন আমার স্ত্রী গর্ভবতী ছিলো। তাই আমি পদব্রজে তাঁর কাছে গমনের সিদ্ধান্ত নিলাম। আমার পায়ে ফোসকা পড়ে গেলো। আমি আমার বন্ধুর বাড়িতে তাকে রেখে গেলাম। একাকী হজরত র. এর দরবারে উপস্থিত হলাম। আমি উপস্থিত হতেই হজরত র. আমাকে বগলে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, মহান আল্লাহ্ আপনার উপর অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন। আপনার পরিবারের প্রতিও এবং তার পেটে যে বাচ্চা রয়েছে তার প্রতিও আল্লাহ্ রহমত বর্ষণ করুন। আমি বিস্মিত হলাম। ১০৫০ হিজরী মহররম মাসে শায়েখ ইন্তেকাল করেন এবং নিজ দেশে যেখানে তিনি বাস করতেন সেখানে তাঁর নিজের ঘরে তাঁকে দাফন করা হয়।

১৬. শায়েখ হাসান বরকী কুদ্দিসা সিররুহু

শায়েখ হাসান বরকী র. তাসাউফ জগতে এক দৃঢ়চেতা সাহসী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ছিলেন শরীয়ত ও হকিকতের সমষ্টি। উচ্চ মাকামধারী, সুন্নতের ধারক এবং এলমে লাদুন্নীসম্পন্ন। জাহেরী এলেমে পূর্ণতাপ্রাপ্ত। শায়েখ আহমদ বরকীর (মৃত্যু ১০২৬ হিজরী) শিষ্য ছিলেন।

শায়েখ হাসান হজরত মোজাদ্দেদ র. এর সুমহান আস্তানায় উপস্থিত হয়ে নকশবন্দিয়া তরিকা গ্রহণ করে ধন্য হয়েছিলেন। হজরত মোজাদ্দেদ র. এর বরকতপূর্ণ সোহবতে থেকে উচ্চ মাকাম ও হাল অর্জন করে নিজ দেশে ফিরে গিয়েছিলেন। সেখানে পেয়েছিলেন শায়েখ আহমদ বরকী র. এর সোহবত। মকতুবাত শরীফের প্রথম খণ্ডে ২৭৫ নং মকতুবে উলেখ করা হয়েছে—

"শায়েখ হাসান আপনার সম্পদসমূহের মধ্যে অমূল্য সম্পদ। আপনার অনুশীলন বিষয়ের দুষ্প্রাপ্য খনিজতুল্য। যদি আপনাকে কোথাও সফরে যেতে হয় তবে সে আপনার স্থলাভিষিক্ত হবে। তার প্রতি বিশেষ খেয়াল ও তাওয়াজ্জোহ দিবেন। তার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখুন যেনো সে দ্বীনের আবশ্যিক বিষয়ে জ্ঞান

অর্জন করতে পারে। হিন্দুস্তান সফর আপনার ও তার জন্য অতীব মূল্যবান। আল্লাহ্‌পাক আমাকে ও আপনাকে দৃঢ়তা দান করুন"।

এর কিছু দিন পর শায়েখ আহমদ বরকী পরপারে পাড়ি দেন। শোক সংবাদ পেয়ে হজরত মোজাদ্দেদ র. শায়েখ আহমদ বরকী র. এর সাথে সংশ্লিষ্ট লোকদের উদ্দেশ্যে লেখেন (মকতুবাত ২য় খণ্ড ৬১ নং মকতুব)—

জনাব! মরহুমের আচার-ব্যবহার রক্ষা করে চলবেন। তাঁর অবস্থাদির প্রতি লক্ষ্য রাখবেন। জিকিরের তরিকা ও হালকা এবং মনোনিবেশের মধ্যে যেনো ব্যতিক্রম না ঘটে। বন্ধুগণ একত্রিত হয়ে উপবেশন পূর্বক পরস্পর পরস্পরের মধ্যে ফানী বা বিলীন হবেন। তাহলে সংসর্গের উপকারিতা প্রকাশ পাবে। ইতোপূর্বে এই ফকির ঘটনাক্রমে লিখেছিলো, মাওলানা মরহুম যদি কোনো সফরে গমন করেন, তখন শায়েখ হাসানকে যেনো তাঁর স্থানে রেখে যান। তিনি তো এখন প্রত্যাবর্তনহীন সফর সম্পন্ন করেছেন। এখন আমি পুনঃপুনঃ লক্ষ্য করে বারে বারে শায়েখ হাসানকেই কাজের জন্য নির্দিষ্ট পাচ্ছি। একথা বন্ধুগণের কারো প্রতি যেনো অমনোপুত না হয়। যেহেতু বিষয়টি আমাদের বা তাদের ইচ্ছাধীন নয়। আনুগত্য একান্ত আবশ্যকীয়। শায়েখ হাসানের তরিকা মাওলানা মরহুমের তরিকার সাথে অধিকতর সম্পর্ক রাখে। মাওলানা শেষ সময় এখান থেকে যে নেসবত প্রাপ্ত হয়েছিলেন, শায়েখ হাসান তাতেও শরীক ছিলেন। অন্যান্য বন্ধুগণ তাঁর বিশেষ কিছু প্রাপ্ত হননি, যদিও তাঁরা কাশফ ও শুহুদ (আত্মিক বিকাশ) প্রাপ্ত হয়েছেন।

মোটকথা, হজরত মোজাদ্দেদ র. এর এজাযত ও খেলাফত দ্বারা অত্র অঞ্চলের আধ্যাত্মিক সম্পর্কের সাথে যুক্তকরণ ও ফয়েজ পৌঁছানো শায়েখ হাসানের জন্যই নির্ধারিত হলো। তাঁরা পরস্পরে গভীর মনোনিবেশসম্পৃক্ত হলেন। হজরত মোজাদ্দেদ র. এর গায়েবী তাওয়াজ্জোহের বদৌলতে অনেক উন্নতি সাধন করলেন। তাঁরা গ্রন্থও রচনা করেছিলেন, যার মধ্যে তাঁদের উচ্চ হাল ও মাকামের কথা বিবৃত হয়েছে। আল্লাহ্‌ যা ইচ্ছা করেন। তাঁরা হজরত মোজাদ্দেদ র. এর কাছে এভাবে একটি নিবেদন পাঠিয়েছিলেন—

"যে মারেফাতের ধনভাণ্ডার এই নগণ্যদের জন্য সান্ত্বনার কারণ, তা হচ্ছে মাআরেফে শরইয়াহ (শরীয়তভিত্তিক মারেফাত)। সুতরাং আহকামে শরীয়তের প্রত্যেকটি হুকুম বাতায়নস্বরূপ, যা উদ্দেশ্যের কেন্দ্রকে উন্মোচন করে। এটাই নমুনাবিহীন সম্রাটের ঠিকানা। আর এই কবিতাটি ফকিরের দৃষ্টির অংশ—

দেখার তো নেই কিছু চলেছি এমন সফরে—
যাকে চাই, সে তো রয়েছে অনেক অনেক অনেক দূরে। [১]

১. যুবদাতুল মাকামাতের নিবেদনে শায়েখ হাসান বরকী কোনো কোনো সূফীর পরিভাষাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, যা হজরত মোজাদ্দেদ র. এর পছন্দনীয় ছিলো না। দেখুন মকতুবাত ২য় খণ্ড ৭৭।

হজরত মোজাদ্দেদ র. উত্তরে বলেছিলেন, আপনাদের মারেফাত সঠিক, উচ্চমর্তবাসম্পন্ন ও আশাব্যঞ্জক। পাঠপূর্বক আনন্দিত হয়েছি। হক সুবহানাহু মনজিলে মকসুদে পৌঁছে দিন।

কুদসিয়্যাহ্ ঃ শায়েখ হাসান এক নিবেদনপত্রে লিখেছিলেন, দীর্ঘসময় ধরে খুব বেশি অস্বস্তি অনুভব করছিলাম, যা কোনো সূফীর সান্ত্বনাবাণীতে, কোনো বিজ্ঞ ব্যক্তির উপমায় এবং কোনো বাস্তব মারেফাতের মাধ্যমে দূর হয়নি। বরং বেড়েই চলেছে। বাধ্য হয়ে নিজের অসহায়ত্বকেই বরণ করে নিলাম এবং অসহায়ত্ব, অক্ষমতা ও ভারাক্রান্ত অবস্থায় সম্পূর্ণ জগতেই আমার অংশীদারিত্ব পেলাম। কিন্তু এমনি অবস্থায়ও আমি নিজেকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের উপর প্রতিষ্ঠিত পেতাম।

কুদসিয়্যাহ্ ঃ শায়েখ এক নিবেদনে লিখলেন, আমি তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ছিলাম। ইত্যবসরে আমার উপর 'নাহনু আকরাবু ইলাইহি মিন্ হাবলিল্ ওয়ারীদ (আমি তো তাদের শাহরগ থেকেও অধিক নিকটবর্তী) এর অর্থ প্রকাশিত হলো। দুশ্চিন্তার পর্দাকে উঠিয়ে দেওয়া হলো। আইনুল ইয়াকীন (দৃশ্যমান বিশ্বাস) দ্বারা ধন্য করা হলো। এই মাকামের হকিকত বা বাস্তবস্বরূপ বর্ণনা করতে কলম শক্তিহীন, শ্রোতাগণ শুনতে অক্ষম এবং বর্ণনাকারীগণ মুখ খুলতে পারেন না। আলমে মেছাল (উপমাজগত) এ এর স্বরূপের তুলনা এই-ই ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না— দেহের মধ্যে রূহ সম্পৃক্ত। দেহ রূহের পোশাক। আর রূহসমূহ সৃষ্টিকর্তার সাথে সম্পর্কযুক্ত। ব্যস এতটুকুই কথা। সুতরাং আবশ্যিকভাবে মহান আল্লাহ্ ঘাড়ের শিরা থেকে অধিক নিকটবর্তী এবং হক এর এমতো নৈকট্য বান্দার জন্য দূরবর্তীতা। এই নৈকট্য নিরাকার ও আনুরূপ্যবিহীন, যার সাথে জগতের খালেক ও মাখলুক (সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টজীব) 'সনে ওয়া মাসনু' (সৃজয়িতা ও সৃজন) ব্যতীত আর কোনো সম্পর্ক নেই। আলমে (জগত) দ্বারা এ মাটিকেই সম্পকির্ত করা হয়েছে।

কুদসিয়্যাহ্ ঃ শায়েখ এক নিবেদনে উল্লেখ করেছিলেন, আমি জানি না এটা বিচ্ছেদ, না মিলন। আমাকে মহান আল্লাহ্ তাঁর আনুরূপ্যহীন যাতের হকিকত এমনভাবে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন যে, আমি নিজেকে প্রত্যেকটি কাজে কর্মহীন পাচ্ছি। মহান আল্লাহ্র কোনো সম্পর্কের সাথে সম্পর্কিত পাচ্ছি না। পাচ্ছি কেবল মহান দরবারের অপার অনুগ্রহ এবং নিজের পক্ষ থেকে মুখাপেক্ষিতা। কোনো বস্তুকে তাঁর পক্ষ থেকে নিজের নিকটবর্তী দেখছি না। এমন কী দশ লতিফাও না।

এ বিষয়টি অবশ্যই সন্দেহমুক্ত যে, আল্লাহ্পাক থেকে দূরে থাকা কোনোক্রমেই উদ্দেশ্য নয়। আর উদাসিনতা নিরর্থক এবং তাওয়াজ্জোহ্ বিনাশপ্রাপ্ত। এ সবই রসুলে আনওয়ার স. এর পূর্ণ আনুগত্যের বরকতে এবং হজরত মোজাদ্দেদ র. এর তরবিয়তের কারণে। এ জন্য আশাবাদী। এ ছাড়াও দুটি চমকদার ঘটনা এ ফকিরের প্রতি প্রকাশ করা হয়েছে। যেমন—

১. হজরত মোজাদ্দেদ র. অত্যন্ত দয়াপরবশ হয়ে এরূপ বলেছেন যে, আল্লাহ্ বলেন, আমি তওফিক (যোগ্যতা)ও দান করি এবং ইমানে হাকিকী [১] (প্রকৃত ইমান)ও।

২. হজরত আমাকে বললেন— 'বেশ চলে এসো' এবং তিনি আমার হাত আঁকড়ে ধরলেন, তখন আমার মধ্যে আশ্চর্যজনক হাল সৃষ্টি হলো। তারপর হজরত মোজাদ্দেদ র. বন্ধু মহলে বললেন, হে লোক সকল! এই ব্যক্তির এমন অবস্থা হয়ে গিয়েছে যে, সে সর্বদাই বিজয়ী থাকবে।

কুদসিয়্যাহ্ ঃ শায়েখ তাঁর পরকালযাত্রার প্রাক্কালে বলে গিয়েছেন, আমাকে এই শুভসংবাদটি দেওয়া হয়েছে যে, তোমার সকল মুরিদ ক্ষমাপ্রাপ্ত। আমি আরেকটু বেশী প্রাপ্তির জন্য নিবেদন জানালাম। এলহাম হলো, তোমার প্রতি যারা আস্থাবান, তারা সকলে ক্ষমাপ্রাপ্ত। আমি আরো কিছু যাচঞা করলাম। আমাকে জানানো হলো, যে সকল ব্যক্তি কিয়ামত পর্যন্ত তোমার প্রতি ধারাবাহিকভাবে আস্থা পোষণ করবে, বিশ্বাস রাখবে, সে-ও ক্ষামাপ্রাপ্ত।

কুদসিয়্যাহ্ ঃ শায়েখ তাঁর সহচরবৃন্দ ও বন্ধুমহলে যে সকল অসিয়ত করেছিলেন, তার মধ্যে এ কথাও রয়েছে যে, আমি সমগ্র দুনিয়া তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি। কিন্তু হজরত মোজাদ্দেদ র. এর দুই সন্তান (খাজা মোহাম্মদ সাঈদ এবং খাজা মোহাম্মদ মাসুম) এর মতো অন্য কাউকে পাইনি। তোমাদের কারো মাঝে যদি আল্লাহ্প্রাপ্তির বাসনা থাকে, তাহলে তার উচিত তাঁদের দরবারে উপস্থিত হওয়া। তাঁদের কাছ থেকে ফয়েজ গ্রহণ পূর্বক নিজেকে সৌভাগ্যশালীদের অন্ত র্ভুক্ত করা।

শায়েখ হজরত মোজাদ্দেদ র. এর সন্তানগণের নামে পুস্তিকা লিখেছেন, যার মধ্যে মারেফাতের অনেক সূক্ষ্মতত্ত্ব বিদ্যমান। যা কিছু এই ফকির সংকলন করেছেন, তা তার তুলনায় বিন্দুতুল্য। হজরত মোজাদ্দেদ র. তাঁর কোনো কোনো নিবেদনের উত্তরও [২] দিয়েছিলেন।

---

১. উর্দু অনুবাদের মধ্যে 'রায়হান হাকীকী' রয়েছে।

২. শায়েখ হাসান বরকী র. এর নামে হজরত মোজাদ্দেদ র. এর ৪টি মকতুব রয়েছে। প্রথম খণ্ডে ২০, ৭৭, ২৭১, দ্বিতীয় খণ্ডে ১০৫ নং মকতুব। যুবদাতুল মাকামাতে খাজা হাশেম কাশমী র. উল্লেখ করেছেন, আজমীর সফরে এই নগণ্য হজরত মোজাদ্দেদ র. এর সঙ্গে ছিলেন। ওই সময় তাঁর কাছে শায়েখ হাসান বরকীর একটি নিবেদনপত্র পৌঁছলো, যার মধ্যে তাঁর উচ্চস্তরের কাশফ এবং হালের বিষয় উল্লেখ ছিলো। বেদাত উচ্ছেদের ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ ও সাহসের কথাও সেখানে ছিলো। নিবেদনপত্রটি হজরত মোজাদ্দেদ র. আমার কাছে দিয়ে বললেন, সুযোগ মতো উত্তর লিখে পাঠাবে। কিন্তু চিঠিটি আমার কাছ থেকে হারিয়ে গেলো। এরপর হজরত মোজাদ্দেদ র. কয়েক লাইন লিখেছিলেন, যা মকতুবাত ৩য় খণ্ডে ১০৫ নং মকতুবে রয়েছে।

কুদসিয়্যাহ্ ঃ শায়েখের ইন্তেকালের সময় তাঁর সত্যান্বেষী সুযোগ্য সন্তান আমার মোর্শেদ এবং বুজর্গ খাজা মোহাম্মদ সাঈদের দরবারে ছিলেন। শায়েখ তাঁকে স্মরণ করলেন। এরপর তাঁকে সুসংবাদ দেওয়া হলো। তিনি বললেন, এই সন্তানকে আমি ভালোবাসি। কারণ ওই মখদুমজাদা যিনি উচ্চ মর্তবাধারী, তাঁর কাছে অবস্থান করছেন এবং তরিকার প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যাপারে এজাযত পেয়েছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁকে রওয়ানা করিয়ে দিলেন। যথাশীঘ্র পৌঁছে যেতে বললেন। আরো বললেন, এখন থেকে আপনি আমার স্থলাভিষিক্ত হবেন। শায়েখ ইন্তেকাল করলেন। তাঁকে তাঁর মাতৃভূমি ওসমানপুরে দাফন করা [১] হলো।

১৭. শায়েখ আবদুল হাই সাল্লামাহু রব্বুহু

শায়েখ আবদুল হাই সাল্লামাহু রব্বুহু হজরত মোজাদ্দেদ র. এর বিশেষ পছন্দনীয় মুরিদগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি হিসানে সাদমানের অধিবাসী ছিলেন (যা ইস্পাহানের দক্ষিণ অঞ্চলে অবস্থিত)। হিন্দুস্তানে এসে তিনি পাটনা শহরে অবস্থান করেন। তাঁর সুযোগ হয়েছিলো এবং তাঁর সুন্দর ভাগ্যই তাঁকে হেদায়েত পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিলো। তিনি হজরত মোজাদ্দেদ র. এর দরবারে একনিষ্ঠচিত্তে পূর্ণ আস্থা রেখে সাধনার মানসে ঘর-সংসার ত্যাগ করে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং পূর্ণ গ্রহণযোগ্যতা ও সফলতা অর্জন করেছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি হজরত র. এর নৈকট্যভাজন ও বিশেষ সম্মানপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। তিনি হজরত র. এর খেদমতে সর্বাধিক সময় নিয়োজিত থাকতেন। লোক সমাবেশে ও নির্জনে সর্বক্ষণই হজরতের সন্নিধানে উপস্থিত থাকতেন। ইচ্ছা হলেই জিজ্ঞেস করে জেনে নিতেন। ইলমে মারেফাতের গুপ্ত রহস্যে তিনি বিশেষ যোগ্যতাধারী ছিলেন। মকতুবাত শরীফ দ্বিতীয় খণ্ড তিনিই সংকলন করেছেন। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তিনি হজরত মোজাদ্দেদ র. এর দরবারে অতিবাহিত করেছিলেন। তারপর হজরত র. তাঁকে খেলাফত দান করে পাটনা পাঠিয়ে দেন। হজরত মোজাদ্দেদ র. বলতেন, শায়েখ ওই স্থানের কুতুব। শায়েখ যখন নিজ দেশে পৌঁছলেন, তখন সাধারণ ও বিশেষ ব্যক্তিবর্গ সকলেই তাঁকে স্বাগতম জানালেন। তিনি সকলের কাছে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। তাঁর তরবিয়তে সত্যপথের পথিক অনেক মুরিদ, খলিফা ও অসংখ্য আল্লাহ্ওয়ালা লোক তৈরী হয়েছিলো। হজরত মোজাদ্দেদ র. পাটনার সুবাদার শায়েখ আবদুল হাই এবং শায়েখ নূর মোহাম্মদ (যার সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে) সম্পর্কে এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, দুই আল্লাহ্ওয়ালা ব্যক্তি শায়েখ আবদুল হাই

১. শায়েখ হাসানের পরলোকগমনের সন পাওয়া যায় না। অনুমান করা হয়, হজরত মোজাদ্দেদ র. এর ইন্তেকালের পর তিনি ইন্তেকাল করেছিলেন।

এবং শায়েখ নূর মোহাম্মদের এক শহরে একত্রিত হওয়া দুই সৌভাগ্যশুকতারা একত্রিত হওয়ার [১] মতো।

হজরত মোজাদ্দেদ র. শায়েখ নূর মোহাম্মদকে শায়েখ আবদুল হাই প্রসঙ্গে স্বীয় মকতুবে এরূপ উল্লেখ করেছেন— ভ্রাতঃ মিঞা শায়েখ আবদুল হাই আপনার স্বদেশী, এক নগরবাসী, পড়শী। তিনি এলমে মারেফাতের একটি অত্যাশ্চর্য তালিকা স্বরূপ। এ পথের বহু সামগ্রী তাঁর কাছে গচ্ছিত আছে। দূরবর্তী বন্ধুগণের জন্য তাঁর সাক্ষাৎ অতীব মূল্যবান। যেহেতু তিনি নবাগত এবং নব নব সংবাদবাহক। তাঁর নিকট ফানা-বাকার নিদর্শন ও জযবা-সুলুকের বর্ণনা আছে। সর্ববিদিত ফানা-বাকার ঊর্ধ্বের বিষয় ও নির্ধারিত সুলুকের পরের কথাও তাঁর জানা আছে। বরং বলা যাবে, ওই সকল স্তর তাঁর অতিক্রম করা আছে। মকতুবাতের অধিকাংশ মারেফাত তাঁর কর্ণগোচর হয়েছে। [২] তিনি যথাসাধ্য জটিল বিষয়গুলো জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়েছেন।

শায়েখ আবদুল হাইয়ের জীবনযাপনপদ্ধতি এরূপ ছিলো যে, তিনি সঞ্চিত সম্পদ ব্যয় করে ফেলতেন এবং তাঁর মুরিদগণের সাথে খাবার খেতেন (তাঁর সম্পদ তাদের পিছনে খরচ করতেন)। শাহী এবং ফকিরী দুটি ধারাই তাঁর স্বভাবসম্পৃক্ত ছিলো।

কুদসিয়্যাহ্ ঃ শায়েখ বর্ণনা করেন, আধ্যাত্মিক সাধনার প্রথম জীবনে আমি পাটনায় অবস্থান করছিলাম। তখনও হজরত মোজাদ্দেদ র. এর দরবারে উপস্থিত হইনি। একরাতে স্বপ্নে দেখলাম, একটি শূন্য দূর্গে আমি বিচরণ করছি। হঠাৎ একদল লোক উপস্থিত হলো। আমি লুকাতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু তারা আমাকে ধরে বেঁধে ফেললো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কারা? তারা উত্তর দিলো, রসুলে আনওয়ার স. এর সাহাবীগণসহ তারা এখানে আগমন করেছেন। তারা আমাকে বন্দী অবস্থায় দূর্গের বাইরে নিয়ে গেলো। এমন সময় হজরত আবু বকর সিদ্দীক রা. রসুল স. এর কাছে সুপারিশ করে আমাকে মুক্তি দিলেন। আমি ওই সাহাবীগণের সঙ্গে রসুলে আনওয়ার স. এর অনুগামী হলাম। তিনি স. অত্যন্ত মহানুভবতার সাথে আমাকে কাছে ডেকে বললেন, তুমি ওই কাজের জন্য সেখানে যাও। তুমি ব্যতীত কাজটি বাস্তবায়িত হবে না।

আমি এবং আমার সফরসঙ্গী উটের পিঠে চড়ে বাতাসে উড়ে যাত্রা শুরু করলাম।

১. মকতুবাত শরীফ দ্বিতীয় খণ্ডের ৫০নং মকতুবের শেষাংশ দ্রষ্টব্য।

২. মকতুবাত শরীফ দ্বিতীয় খণ্ডের ৮৫ নং মকতুব দ্রষ্টব্য।

কুদসিয়্যাহ্ ঃ তিনি বর্ণনা করেন, হজরত মোজাদ্দেদ র. আমাকে পাটনা পাঠানোর সময় বললেন, আমি শায়েখ আবদুল হামীদ বাঙ্গালীর প্রতি তৃপ্ত নই। তোমাকে অবশ্যই তাঁর কাছে যেতে হবে। আমি চিন্তিত হলাম। এতদূরের মঙ্গলকোটে আমি যাবো কীভাবে। এমন সময় এমন একটি প্রয়োজন দেখা দিলো যে, আমাকে সেখানে যেতেই হলো। শায়েখ আবদুল হামীদের শহরে গেলাম। ভাবলাম, তিনি বড় আলেম এবং এই অঞ্চলের প্রসিদ্ধ মাশায়েখ। এ অঞ্চলের সকলে তাঁর দরবারে আগমন করে। আমি তাকে কী-ই বা বলবো, যার দ্বারা তিনি উপকৃত হতে পারবেন। আবার ভাবলাম, হজরত মোজাদ্দেদ র. এর উক্তি তো হেকমতশূন্য নয়। আমি তাঁর দরবারে উপস্থিত হলাম। তিনি আমার প্রতি খুবই সম্মান প্রদর্শন করলেন। তিনি বললেন, হজরত মোজাদ্দেদ র. এবং অন্যান্য বুজর্গ লিখেছেন, এ পথে রসুলে আনওয়ার স. এর প্রতি গভীর মহব্বত একান্ত আবশ্যক। কিন্তু আমি বলি, যার অন্তরে আল্লাহ্র মহব্বত বিদ্যমান, তার অন্তরে অন্য কারো মহব্বত কী করে আসবে? আমি বললাম, রসুলে আনওয়ার স. এর প্রতি মহব্বতই আইনে হক (আল্লাহ্র) এর প্রতি মহব্বত। এক আয়াত রয়েছে— 'মাই ইউতিয়ির রসূলা ফাক্বদ আতাআল্লাহ্' (যে ব্যক্তি রসুলের আনুগত্য করলো সে আল্লাহ্রই আনুগত্য করলো।)। শায়েখ আবদুল হামীদ আমার উত্তর শুনে লজ্জিত হলেন। আমার পূর্ণ বিশ্বাস হলো, হজরত মোজাদ্দেদ র. যে বলেছিলেন, 'আমি শায়েখ আবদুল হামীদ বাঙ্গালীর প্রতি তৃপ্ত নই এবং তোমাকে তাঁর কাছে অবশ্যই একবার যেতে হবে'। পবিত্র নির্দেশের কারণ তাহলে এটাই। এভাবেই তিনি তাঁর সন্দেহ নিরসন করতে চেয়েছিলেন।

শায়েখ আবদুল হাই ১০৫৪ হিজরীতে হারামাইন শরীফ জিয়ারতের ইচ্ছা করলেন। পাটনা থেকে হজরত মোজাদ্দেদ র. এর মাজার শরীফ জিয়ারত ও মখদুমজাদাগণের সাথে সাক্ষাতের জন্য সেরহিন্দে এলেন। সেখান থেকে হারামাইন শরীফের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। আল্লাহ্র উপর পূর্ণ নির্ভর করে যথাসময়ে পুণ্যভূমিতে পৌঁছে গেলেন। অনেক জনসমাদরও পেলেন। শোনা যায়, হজ্ব পালন শেষে শায়েখ নিজ দেশে রওয়ানা হওয়ার উদ্দেশ্যে জাহাজে উঠলেন। এমন সময় একটি ঘটনা ঘটলো। কয়েক দিন পর্যন্ত চেষ্টা করেও জাহাজটিকে অগ্রসর করানো গেলো না। যাত্রীরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেন। শোরোগোল শুরু করে দিলেন। শায়েখ বললেন, আপনারা সকলে যাত্রা করুন। আমি নেমে যাচ্ছি। কথিত আছে, যখনই শায়েখ জাহাজ থেকে নামলেন তখনই জাহাজ চলতে শুরু করলো। বলা হয়েছে, পুনরায় হারামাইন শরীফের দিকে প্রত্যাবর্তনের জন্য এটি ছিলো রসুলে পাক স. এর ইঙ্গিত।

শায়েখের বয়স আনুমানিক ষাট বছর হয়েছিলো যখন তিনি মক্কা মুয়াজ্জামায় গমন করেছিলেন। আল্লাহ্পাক তাঁকে শান্তিতে রাখুন।[১] আমিন।

১৮. খাজা মোহাম্মদ হাশেম কাশমী বোরহানপুরী কুদ্দিসা সিররুহু

হজরত খাজা মোহাম্মদ হাশেম কাশমী কুদ্দিসা সিররুহু হজরত মোজাদ্দেদ র. এর অত্যন্ত প্রিয়ভাজন ছিলেন। তাঁর খাদেম ছিলেন। ছিলেন রহস্যভাণ্ডারের শিরোমনি বা সরবরাহকারী। আরো ছিলেন কাশম (বদখশান) এর বুজর্গজাদাদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর বুজর্গ পিতা খাজা মোহাম্মদ কাশেম বেলায়েতের এক শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ও প্রসিদ্ধ আলেম ছিলেন এবং বদখশানের বাদশাহ্ মীর্জা শাহরুখ খানের উস্তাদ ছিলেন। তিনি বলতেন, আমার পূর্বপুরুষ সিলসিলা কাবরাবিয়ার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। খাজা হাশেম কাশমী বলেন, শৈশবকাল থেকে আমি ওই সিলসিলার খলিফাবৃন্দের খেদমতে নিয়োজিত ছিলাম। যৌবনকাল থেকেই আমার স্বভাবগত আকর্ষণ ছিলো নকশবন্দিয়া খাজাগণের প্রতি। তবে আমি জনতাম না যে, এই অসংখ্য পদ্ধতির মধ্যে কোন্ পদ্ধতিটি আমাকে গন্তব্যে পৌঁছাতে সহযোগিতা করবে। এ মহান সিলসিলার কোন্ মূল্যবান নেয়ামত আমাকে কে দান করবে? বিষয়টি নিয়ে যখন আমি গভীরভাবে ভাবতাম তখন আমার বেশ কষ্টই হতো। এই হালের আধিক্যের কারণে আমার জবান থেকে অনায়াসে বের হয়ে যেতো, আচ্ছা তোমরা আমার ঘোড়ার জিন বেঁধে দাও। আমাকে হিন্দুস্তানে যেতে হবে। আমার এমতো অস্থির সময়ে এমন একটি ঘটনা ঘটলো, যে কারণে আমাকে বাধ্য হয়ে হিন্দুস্তানে আসতে হলো। এক বছর পর এক রাতে সেখানে পূর্ববর্তী যুগের মাশায়েখদের আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর আলোচনা ও ঘটনাবলী শুনলাম। খেয়াল হলো, পূর্ববর্তী যুগে যদি এ ধরনের মাশায়েখ থেকে থাকেন, তাহলে বর্তমানে কি থাকতে পারেন না? যদি থাকেন তাহলে তিনি বা তাঁরা আমার দৃষ্টির বাইরেই রয়েছেন।

এ সময় আমাকে স্বপ্নে এক আল্লাহ্ওয়ালা বুজর্গ এসে বললেন, ওঠো, ওমুক বুজর্গ ওমুক স্থানে আল্লাহ্ওয়ালা লোকদের সমাবেশে বসে আছেন এবং তোমাকে ডাকছেন। আমি ওই ঠিকানায় চলে গেলাম। সেখানে এমন এক বুজর্গকে দেখলাম যিনি আল্লাহ্ওয়ালাদের বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ। তিনি একটি উঁচু স্থানে মোরাকাবায় রত ছিলেন। তার মুরিদগণ ওই স্থান থেকে একটু নিচু স্থানে মোরাকাবায় রত। আমাকে ওই বুজর্গের নিকট নিয়ে যাওয়া হলো। ওই বুজর্গ মোরাকাবা শেষে তাঁর

১. শায়েখ আবদুল হাইয়ের নামে মকতুবাত শরীফে হজরত মোজাদ্দেদ র. এর বেশ কয়েকটি মকতুব রয়েছে। যেমন— প্রথম খণ্ডে ২৭৭, ২৯১, ৩০৪ এবং দ্বিতীয় খণ্ডে ৭ ও ৩৭। মাওলানা মোহাম্মদ মঞ্জুর নোমানী কর্তৃক লিখিত 'তাযকেরায়ে মোজাদ্দেদে সানি' পুস্তকে ১০৭০ হিজরীতে শায়েখের ইন্তেকালের কথা উল্লেখ রয়েছে।

হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমার হাত ধরে বললেন, পড়ো— ইযা জাআ নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাতহু ওয়ারাআইতান্নাসা ইয়াদ খুলূনা ফী দ্বীনিল্লাহি আফওয়াজা, ফাসাব্বিহ বিহামদি রব্বিকা ওয়াসতাগফিরহু ইন্নাহু কানা তাওওয়াবা'।

আমি পড়তে লাগলাম এবং আমার চক্ষু থেকে অশ্রু ঝরতে লাগলো। আমি জাগ্রত হলাম। তখন এ 'ফাতাহ' দ্বারা সম্পর্কিত বিষয় এবং এ সূরার শানে নুযুল থেকে নিজের উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত বুঝলাম। এই সূরার শেষে ইসতেগফারের (ক্ষমা প্রার্থনার) হুকুম রয়েছে, তাই আমি তওবা করাকে প্রধান কর্তব্য মনে করলাম। এর কয়েকদিন পর আমাকে সেই যুগের মোর্শেদ মীর মোহাম্মদ নোমানের খেদমতে যেতে হলো। তিনি ছিলেন এই মহান সিলসিলার অন্যতম খলিফা। এই বৃহৎ শহরে সত্যপথ প্রদর্শনের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি মুরিদগণের অন্তরকে জযবার পাত্র দ্বারা আত্মভোলা করে দিতেন। আমি তাঁর কাছ থেকে এই মহান সিলসিলার জিকির ও মোরাকাবা শিখলাম। কিছুকাল তাঁর খেদমতে রইলাম। ১০৩১ হিজরীতে এক সময় হজরত মোজাদ্দেদ র.[১] আমাকে সেরহিন্দে ডাকলেন। আমি মীর মোহাম্মদ নোমানের অনুমতিক্রমে হজরত মোজাদ্দেদ র. এর পাক দরবারে উপস্থিত হলাম। সফরে এবং অবস্থানে সার্বক্ষণিকভাবে প্রায় দু'বছর তাঁর আঁচল ধরে রইলাম।

অল্প কিছুকাল সঙ্গলাভ করে আমি হজরতের কাছ থেকে যে উপকার পেয়েছিলাম এবং যে নূরসমূহ সূর্যের মতো আমার ভগ্ন হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিলো তার যথাবিশ্লেষণ বর্ণনাবহির্ভূত।

বাস্তবিকপক্ষে এই স্বল্পসময়ের মধ্যে হজরত মোজাদ্দেদ র. এর তাওয়াজ্জোহ এবং তাঁর প্রতি প্রয়োগকৃত রূহানী শক্তির বরকতে তিনি বাতেনী হাল, মাকামসমূহের অবস্থা, বিস্ময়কর হালত, দুর্লভ কামালতসহ হজরতের রূহানী জগতের সূক্ষ্ম রহস্য ও অনুগ্রহ অর্জন করেছিলেন। যে কারণে তিনি মারেফাতের গোপন রাজ্যের বিশেষ ব্যক্তিবর্গের অন্যতম এবং বাতেনী রহস্যধারীদের মধ্যে পরিগণিত হয়েছিলেন। এরপর হজরত মোজাদ্দেদ র. কর্তৃক খেলাফতপ্রাপ্ত হয়ে তাঁর নির্দেশে বোরহানপুর অবস্থান গ্রহণ করলেন। মকতুবাত শরীফ তৃতীয় খণ্ডও তিনি সংকলন করেছেন। লোকেরা পঙ্গপালের মতো এবং প্রদীপের কাছে পতঙ্গের ন্যায় ধনী, গরীব, আমীর সকলে তাঁর সান্নিধ্যে সমবেত হতে লাগলো এবং তাঁর প্রতি গভীর আস্থা পোষণ করতে লাগলো। এ অঞ্চলের কুতুবের পদ তাঁর জন্যই নির্ধারিত ছিলো। বলাবাহুল্য, বিষয়টি হজরত মোজাদ্দেদ কুদ্দিসা সিররুহুর বিশেষ তাওয়াজ্জোহের ফল স্বরূপ অর্জিত হয়েছিলো। তাঁর এক নিবেদনের উত্তরে

১. মকতুবাত শরীফ তৃতীয় খণ্ড ১ নং মকতুব দ্রষ্টব্য। যুবদাতুল মাকামাতে রয়েছে, ১০৩২ হিজরীতে হজরত মোজাদ্দেদ র. আজমীর শরীফ আগমন করেছিলেন।

হজরত মোজাদ্দেদ র. লিখেছিলেন, তোমার চিঠি পড়ার সময় তোমার জ্যোতির্ময়তা ওই অঞ্চলে অধিক দৃশ্যমান হয়েছে, যা খুবই আশাব্যঞ্জক। এই নেয়ামতের জন্য মহান আল্লাহ্পাকের প্রতি সীমাহীন কৃতজ্ঞতা— এটি তাঁর মহাদান।

বর্ণিত আছে, হেদায়েত ও সত্য পথের সন্ধানপ্রদানের দায়িত্ব পালনকালে একদিন খাজা মোহাম্মদ হাশেম বোরহানপুরে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিলেন। অনেক আমীর ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা তাঁর সাথী ছিলেন। তিনি বিশাল জনসমাবেশ দেখে নিজের নিকৃষ্টতার দিকে লক্ষ্য করলেন। বললেন, আমি কী? সাধারণের জনপ্রিয়তার জন্য আমার মধ্যে এমন কী যোগ্যতা আছে? এ সব কিছুতো হজরত মোজাদ্দেদ র. এর পবিত্র বাণীর সফল বাস্তবায়ন, যা একদিন তিনি আমার সম্পর্কে বলেছিলেন। একদা লাহোরে হজরত মোজাদ্দেদ র. এর সাথে অসংখ্য বুজর্গ ছিলেন। সাথে আমিও সেখানে ছিলাম। হঠাৎ আমি ভিড়ের মধ্যে এক কর্দমাক্ত স্থানে পড়ে গেলাম। হজরত র. অত্যন্ত দয়াপরবশ হয়ে বললেন, হে খাজা! ওই সময় খুবই নিকটবর্তী, যখন তুমি বাহনের উপরে থাকবে এবং অসংখ্য আমীর ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা তোমার সঙ্গে চলবে (মকতুবাত তৃতীয় খণ্ড ৪২ নং মকতুব)।

হজরত মোজাদ্দেদ র. তাঁর সম্পর্কে যে সুসংবাদ দিয়েছিলেন তা মকতুবাত শরীফ তৃতীয় খণ্ডের এক মকতুবে সাহেবজাদাগণ (খাজা মোহাম্মদ সাঈদ এবং খাজা মোহাম্মদ মাসুম) এর নামে লিখিত চিঠিতে রয়েছে। এ দু'জন সাহেবজাদাকে কবুল করার জন্য মহান আল্লাহ্র দরবারে ফরিয়াদ করা হয়েছিলো। খাজা মোহাম্মদ হাশেম সম্পর্কে রয়েছে, এই তৃতীয় সঙ্গীর জন্য মনটা চিন্তিত, তাঁকে কবুল করানো গেলো না। আফসোস, যদি তাকে মহান আল্লাহ্ তাঁর চাকরদের চাকর হিসেবে কবুল করতেন। তারপর বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর হজরত মোজাদ্দেদ র. লিখলেন, ওই তৃতীয় সঙ্গীও দুই সাহেবজাদাগণের মতো ধন্য হয়েছেন এবং ওই বিশেষত্বের সাথে তাকেও কবুল [১] করে নিয়েছেন। এখানে তৃতীয় সঙ্গী দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে— খাজা মোহাম্মদ হাশেম।

মকতুবাত শরীফ তৃতীয় খণ্ডে ১০৬ নং মকতুব যা ওই দুই খাজেগানের নামে প্রেরণ করা হয়েছে, হজরত মোজাদ্দেদ র. রসুলে আনওয়ার স. এর জিয়ারত সম্পর্কে এমতো আলোচনা করেছেন যে, তিনি স. তাঁর (হজরত মোজাদ্দেদ র.) এর জন্য এজাযতনামা লিপিবদ্ধ করেছেন। হজরত মোজাদ্দেদ র. এ-ও লিখেছেন, আমার এক কাঙ্ক্ষিত সঙ্গীও এর অন্তর্ভুক্ত (এ বিষয়ের [২] অংশীদার)।

---

১. মকতুবাত শরীফ তৃতীয় খণ্ড ১০৬ নং মকতুব।

২. কাজী আলিমুদ্দীন সাহেব ১০৬ নং মকতুবের এরূপ অনুবাদ করেছেন— এ ফকিরের একনিষ্ঠ ভক্তদের মধ্য হতে একজন সঙ্গীও এ বিষয়ে সমপর্যায়ভুক্ত।

শোনা যায়, রসুলে আনওয়ার স. ও হজরত মোজাদ্দেদ র. এর মধ্যবর্তী অংশীদার হলেন এই খাজা মোহাম্মদ হাশেম।

দরজাহ ঃ খাজা মোহাম্মদ হাশেম বর্ণনা করেন, "ওয়া আম্মা বিনি'মাতি রব্বিকা ফাহাদ্দিছ'— এই আয়াতের অনুকূলধন্য একটি বিশেষ এজাযতনামা সম্পর্কে হজরত মোজাদ্দেদ র. বললেন, এর মধ্যে সামান্য অস্পষ্টতা রয়েছে এবং এর বিশেষ কারণও জানা গিয়েছে। যিনি ওই দরবারের উপস্থাপক, তিনি পুনরায় এজাযতনামাখানি রসুলে পাক স. এর দরবারে নিয়ে গেলেন এবং তিনি স. এজাযতনামার অপর পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় এজাযতনামা লিখলেন বা লেখালেন (এটি সন্দেহাতীতভাবে নিরূপণ করা যায়নি)। রসুলে আনওয়ার স. কর্মপ্রক্রিয়াটি সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তাই লেখার পর তিনি তাতে মহর (সীল) অংকিত করে দিলেন।

মহান আল্লাহ্‌র দান সম্পর্কে, যা তাঁর বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদার মধ্যে বিদ্যমান ছিলো বর্ণনা করেছিলেন— এ ফকির নিজেই নিজের প্রতি তাঁর (আল্লাহ্‌র) অনুগ্রহ ও অনুকম্পার উপর ভিত্তি করে তাঁর কাছে প্রশ্ন করেছিলেন যে, এই মিসকীন এ ক্ষেত্রে কোন্ খেদমতের দ্বারা ধন্য হবে এবং কোন্ বৈশিষ্ট্যের দ্বারা অন্যতম নির্বাচিত হবে? বললেন, তুমি আমার প্রেমসমাবেশের মধ্যমণি হয়ে গিয়েছো।

খাজা মোহাম্মদ হাশেম হজরত মোজাদ্দেদ র. এর দরবার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর নিজের হাল ও উচ্চ মাকাম সম্বন্ধে যে চিঠি লিখতেন, তা থেকে তাঁর উচ্চ মর্তবা, হাল ও কামালতের পরিচয় পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একটি চিঠি এখানে উল্লেখ করা হলো।

আরিজাহ্ ঃ পরিত্যক্ত গোলাম, বোরহানপুরের ভবঘুরে মোহাম্মদ হাশেম কাশমী আপনার মহান দরবারে অবগত করানোর চেষ্টা করছে যে, এই মহান দরবারের খাদেমগণের খাস তাওয়াজ্জোহতে সুস্থ শরীরে যথাযথভাবে নিজ গন্তব্যে পৌঁছে গিয়েছে। আমার নেতা ও মোর্শেদ মীর মোহাম্মদ নোমান সাল্লামাহুল্লাহ'র খেদমতে নিয়োজিত হয়েছি। হজরতের গোলামজাদা (অর্থাৎ আমার সন্তান)দেরেকে সুস্থ শরীরে পেয়েছি। কিন্তু হুজুরের দরবার থেকে বিচ্ছেদের কারণে যে কালো দাগ আমার হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে এবং আমার ভাগ্যে যে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তা কীভাবে কলমের ভাষায় বা মুখের ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব?

হে জাহানের মালিক! একটু তবে আয়না দিয়ে দেখো
মোর জীবন কেমন করে চলছে ফিরে দেখো।

কিন্তু আপনার তাওয়াজ্জোহের সুরভি হাওয়া ও সযত্ন প্রতিপালনে এ পথের ধূলাকে পুনরায় ওই মহান আস্তানায় পৌঁছে দিতে পারে। সুতরাং অনুযোগের

কোনো শেষ নেই এবং স্বেচ্ছাচারীর কোনো ঔষধ নেই। তাই বেদনা ও চিন্তা প্রকাশ করতে গিয়ে আমি হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছি। হজরতও বিদায়ের সময় এ নগণ্যকে এই নির্দেশটি দিয়েছিলেন যে, বিচ্ছিন্ন অবস্থায় তোমার উপর যে অবস্থা আপতিত হয়, আমাকে তা লিখে জানিও। সেই জন্য হুকুম পালনার্থে নিবেদন লেখার সাহস করছি। কেবলাগাহ! ওই হালসমূহ যা রসুলে আকদাসের দরবারে এই নগণ্য শুনেছিলেন— যার সংক্ষিপ্তসার পুনরায় নিবেদন করছি, যেনো এই হালের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয়ে দূরবর্তী অবস্থানকালে যা ঘটেছে, তা জেনে নিতে পারি। হজরতের তাওয়াজ্জোহতে রূহানী উন্নতির বিষয়টি ফানার এই স্তর পর্যন্ত পৌঁছেছিলো যে, অজুদ (অস্তিত্ব) ও তার অধীনস্থ নিজের মূল থেকে ওয়াছেল (মিলন) বা সংযুক্ত হয়ে গিয়েছিলো। আদমিয়াতের (নাস্তির) বিষয়টি আদম (নাস্তি) পর্যন্ত পৌঁছেছিলো। আইন (উৎস) এবং আছর (প্রভাব) দু'টোই পূর্ণরূপে বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছিলো। আমি আমার নিজেকেই পেতাম না। কিন্তু এক সুবুতের উপর স্বীয় নাস্তির কারখানা প্রতিষ্ঠিত ছিলো। নাস্তির মধ্যেই আমার অস্তিত্ব ছিলো। হজরতের কাছে যখন এ বিষয়ে নিবেদন করেছিলাম, তখন আপনি বলেছিলেন, এটি খাস বাকার নিদর্শন। এরপর কখনো আমি নিজেকে শুধুই নাস্তির মধ্যে পেয়েছি। আবার কখনো এর কামালতকে মূলের সাথে প্রতিষ্ঠিত দেখেছি। কখনো ওই নাস্তিকে নিজের হকিকত (বাস্তব অবস্থা) জেনেছি এবং এর কামালতসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত মনে করেছি। মোট কথা, আমি আইনে ফানা (যথার্থ ফানা) এর মধ্যে বাকী (অবশিষ্ট) ছিলাম এবং আইনে বাকা (যথার্থ স্থিতি) এর মধ্যে ফানী (বিলীন) ছিলাম। এমনকি একদিন আমাকে এ-ও বলা হলো যে, ওইটা সুবুত (প্রমাণ) নয়। বরং এটি মহান আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের নিদর্শন। আমি তাকেও আসল (মূল) এর দিকে ন্যস্ত করেছি এবং এখন

জিল্ল (প্রতিবিম্ব) এবং আসল (মূল) এর পার্থক্যও বিনাশ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু বিষয়টি এই বাস্তবতার বিপরীত যে, যে বস্তু বাস্তবে থাকে তা আয়নায় দর্শিত হয়। এখন সন্দেহাতীতভাবে মাস্তি ছেরফা (খাঁটি মত্ততা) ব্যতীত কিছুই প্রকাশ পাচ্ছে না। যখন এ বিষয়ে আমি হজরতের নিকটে নিবেদন করলাম, তখন উত্তরে তিনি বললেন, এখন দায়েরায়ে নফী (না-বোধক বৃত্ত) যার সম্পর্কের জাল ছিলো ইমকানের (সম্ভাব্যতার) সাথে, তা পূর্ণ হয়ে গেলো। এ জন্য মহান আল্লাহ্‌র প্রতি সীমাহীন কৃতজ্ঞতা।

এখন শুধুমাত্র থেকে গেলো ইসবাত (হাঁ-বোধক) বিষয়টি যা উজুব (অবশ্যম্ভাবীতা) এর সাথে সম্পর্কিত। এরকমও এরশাদ হয়েছে, এই দায়েরায়ে নফী সম্পন্ন হওয়াতে তোমার ভাগ্যলিপিতে যে বেলায়েতে ইব্রাহীমী (আলান্নাবিয়্যিনা ওয়াআলাইহিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম) এর সম্পর্ক ছিলো— তা

পূর্ণ হলো। কেনোনা নফী ইসবাত কারখানার সর্দার এবং এই বেলায়েতে ইব্রাহীমীর সর্দার হচ্ছেন খলিলুর রহমান (আলইহি ওয়া আলা নাবীয়্যিনাস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম)।

এমতো নিবেদনের পর এই বান্দা স্বপ্নে দেখলেন, হজরত মখদুমজাদা খাজা মোহাম্মদ সাঈদ সাল্লামাহুল্লাহ্কে এই ফকিরের সঙ্গে হজরত ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ্র কদমের উপরে ফেলে দিলেন। হজরত ইব্রাহীম আ. বড়ই আন্তরিকতা ও মহানুভবতার সাথে তাঁর ভালোবাসায় আবদ্ধ করলেন। এ বিষয়টিও হজরতের কাছে নিবেদন করেছিলাম।

ওই সময় আরো একটি ঘটনা নিবেদন করেছিলাম, সেটি হচ্ছে— হজরত বলেছিলেন, এখন তোমার কাজ নফী ইসবাত জিকির করা। যখন জিকির ইসবাত যথার্থভাবে আয়ত্তে এসে গেলো, তখন একথা শুনে তিনি নফী ইসবাত জিকির করতে নিষেধ করলেন এবং এসমে যাতের জিকির করার প্রতি তাওয়াজ্জোহ্ সহ নির্দেশ দিলেন। এরপর বললেন, নফী বিষয়ের মধ্যে এক সূক্ষ্ম রহস্য বিদ্যমান, তা-ও উন্মোচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। আর তা হচ্ছে, যেমন আদম (নাস্তি) কামালতের অস্তিত্বের প্রতিবিম্বের দর্পন এবং তুমি ওই প্রতিবিম্বকে এই ফানার মধ্যে তার উসুলের (মূলের) মধ্যে আসেল (মিলিত) করে দিয়েছো। এভাবে অস্তিত্বকে আকৃতি, কল্পনা, ধারণা এবং আহকামে আদমিয়া (নাস্তির শর্তসমূহ) এর দর্পন মনে করবে। কেননা মহান আল্লাহ স্বীয় যাত এবং কামালত ব্যতীত অন্য কিছু দেখেন না। কিন্তু আহকামে আদমিয়াকে ওই অস্তিত্বের দর্পনের মধ্যে পর্যবেক্ষণ বা নিরীক্ষণ করেন। এই সূক্ষ্ম বিন্দুকে অনুধাবনপূর্বক অর্জন করো এবং এই শর্তাবলীকে আদমে ছেরফা (খাঁটি নাস্তি)র দিকে ন্যস্ত করে অজুদের (অস্তিত্বের) দর্পন কে স্বচ্ছ জানবে।

তোমার যেমন হেদায়েতের পথনিদের্শক অলিকুল শিরোমনির বিশেষ অনুগ্রহে এই মহান সম্পদ অর্জিত হয়েছে, পরিপূর্ণ ফানার স্তরে পৌঁছে গিয়েছো, ফানা অনুযায়ী বাকাও দীপ্তিমান হয়ে গিয়েছে, হজরতের খাস তাওয়াজ্জোহে নাম অংশের মধ্যে যা মাবদায়ে অজুব (আবশ্যিক মর্যাদা) তার মধ্যে এই নগণ্যের মাবদা তাআইয়্যুনে বাকা অর্জিত হয়েছে, নিজেকে অস্তিত্বহীন এবং নাস্তি এই বিশ্বাসের উপর আবদ্ধ পেয়েছে এবং ওই এসেমের সাথে সম্পৃক্ত পেয়েছে এবং বিস্ময়কর বিষয় হচ্ছে এই উপার্জন থাকা সত্ত্বেও এই এসেমের আগমন আবশ্যক ছিলো না এবং তাঁর মাবদা তায়াইয়্যুনকে নিরূপণের সাথে সম্পৃক্ত পাইনি— শুধুমাত্র এটুকু ব্যতীত যে, এই এসেমের কাল্পনিক রূপের মধ্যে যা প্রকাশিত হয়েছে নিজেকেও একটি আকৃতিতে পেয়েছে। যেমন রুহুল আমীন (জিবরাইল আ.) হজরত দাহিয়া কালবী রা. এর আকৃতিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। 'ওয়ালিল্লাহিল মাছালুল আ'লা' (আল্লাহ্র জন্যই হচ্ছে সর্বোচ্চ উপমা)।

আল্লাহ পাক মহান নেই কো কোনো আকৃতি
প্রত্যেক ক্ষেত্রে বিদ্যমান সকলের মাঝে তাঁর স্মৃতি।

আপনি বর্তমান যুগের কুতুবের কাছে শায়েখ আত্তার র. এর কবিতার অর্থ জিজ্ঞেস করেছিলেন—

'পয়গম্বর স. ছিলেন সম্রাট সকল কিছুর প্রতি ছিলেন চিন্তাশীল
না পাইলেন গ্রন্থিতব কেনো এতো ব্যস্ত দীল্—

যখন কোনো চিন্তাই নেই, কিন্তু যখন নিদর্শন, সম্ভাব্যতা ও নাস্তি বিনাশ হয়ে যায়, তখন আবার সব কিছু নিয়ে চিন্তা কিসের? যখন এই বিষয়টি তুমি উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে, তখনই তোমার ফিকরে কুল (সকল বিষয় নিয়ে চিন্তা) মুক্ততা হাসিল হয়ে যাবে। এখন বিষয় হচ্ছে ফকিরগণের সর্দার এবং আম্বিয়াকুল শিরোমনি আলাইহিমুস্ সলাতু ওয়াত্ তসলিমের ফিকরে কুল (সকল বিষয় নিয়ে চিন্তা) মুক্ততা কেন অর্জিত হয়নি? আপনার মহান দরবারের ঝাড়ুদার আপনার মহান অনুগ্রহে এ বিষয়টির পূর্ণ উপলব্ধি পেয়ে ধন্য হয়েছে। আপনি আমার সমস্যা সমাধানকারী। অনুগ্রহ করে এ বিষয়ে আপনি আমাকে সমাধান দিন। তিনি এই কবিতার অর্থ প্রসঙ্গে বলেছিলেন— 'ফিকরে কুল' বাক্য দ্বারা শায়েখ আত্তীর র. এর বক্তব্যের উদ্দেশ্য এই যে, তায়াইয়ুনে অজুদী (অস্তিত্বের নির্ধারণ) এর পার্থক্যকরণবোধও অবশিষ্ট থাকবে না। অর্থাৎ তায়াইয়ুনে মোহাম্মদী স. নয়। কিন্তু আল্লাহ্‌র যাত পাকের জ্ঞানগত পার্থক্য (তায়াইয়ুনে মোহাম্মদী স.) শুধুমাত্র হজরত যাত পাকের জ্ঞানগত পার্থক্য। তাই রসুলে আনওয়ার স. মহান সাহসিক ব্যক্তিত্ব 'ফিকরে আতম্ম'ই কামনা করেছিলেন যেনো ওই পার্থক্য বা স্বাতন্ত্র্যবোধও উঠে যায়, যা অসম্ভব ও অসাধ্য ছিলো। এমন উচ্চমানসম্পন্ন গুপ্তরহস্য বিষয়ে আরেফগণই অধিক জ্ঞাত। সুতরাং শায়েখ আত্তার র. এর বক্তব্যের উদ্দেশ্য ছিলো এটাই।

এমন অবস্থার কিছুকাল পরে হজরত মোজাদ্দেদ র. এই গোলামকে বলেছিলেন, আমি তোমাকে তোমার মাবদা তায়াইয়ুন থেকে টেনে আমার মাবদা তায়াইয়ুনের মধ্যে নিয়ে এসেছি। আমি অনুধাবন করেছি যে, এ ক্ষেত্রে তোমার বাকা হাল সহজ হয়ে গিয়েছে। এরপর তিনি বরকতে খোল্লাত (বন্ধুত্বের কল্যাণ) অর্জনের সুসংবাদও শুনিয়েছিলেন। এই মিসকীন এই সকল সম্পদ অর্জনের যে উদ্দেশ্য মনে করতো, তা-ও হজরতের কাছে ব্যক্ত করলাম। আর ওই নেসবত, যা তিনি 'মালাহাত' শব্দ দ্বারা বিশ্লেষণ করেছিলেন, যা তাঁরই বিশেষ বেলায়েতের অধিভুক্ত ছিলো— তা-ও তিনি মহিমাযুক্ত আস্বাদের সাথে এই আশেকের ক্ষতবিক্ষত অন্তরে নিক্ষেপ করেছিলেন। এর উদ্দেশ্য যা কিছু আমার উপলব্ধিতে এসেছিলো তা-ও আমি হজরতের কাছে বললাম। তিনি বললেন, 'মাবদা

তায়াইয়্যুন' এর ফানা ও বাকা সম্পর্কে ইঙ্গিত এটাই যে, এই নেসবত, তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত।

তিনি প্রকৃত গোলামী বা দাসত্ব সম্পর্কে বলেছেন, যদিও আমার দরবারে অনেকে কষ্ট সহ্য করে বছরের পর বছর অবস্থান করেছিলেন, কিন্তু এই ব্যক্তি (মোহাম্মদ হাশেম কাশমী) আমার দরবারে খুব অল্প দিন অবস্থান করেও আমার খাস মহব্বতের কারণে আমার খাস নেসবতের অংশপ্রাপ্ত হয়েছে, এরপর বললেন, এখন তুমি নুযুলের (অবতরণের) দিকে মনোযোগ দাও। বিদায়ের পূর্বে বললেন, নুযুলও হয়ে গিয়েছে। হুসুলের (প্রাপ্তির) দিকেও উন্নতি হয়েছে। কিন্তু এখনও আমার অন্তর্দৃষ্টির মধ্যে কোনো বিশেষত্ব প্রকাশিত হয়নি।

হে কেবলা দোজাহানী! হে কাবা! আমার আশা-আকাঙ্ক্ষা ও নিরাপত্তার প্রতীক! আল্লাহ্‌পাক আপনাকে সর্বদাই মাখলুকের কল্যাণে নিয়োজিত রাখুন। আমার হৃদয়ের সঞ্চিত বাসনা এই 'জুঝি' (আংশিক) ও 'কুল্লি' (পূর্ণ) এর মধ্যে। বরং কুল্লির কেন্দ্রবিন্দুতে মিলিত হয়ে যায়, যাকে রাহুত (সাধকের সত্তা লয়প্রাপ্তির স্থান) বলা হয়েছে এবং ওই সম্পৃক্ততা নিজের সম্পৃক্ততার মধ্যে আপন বৈশিষ্ট্যে পৌঁছে দিয়ে মূলের মূলের সাথে সুসজ্জিত বা শোভামণ্ডিত করে দেয়। ইতোপূর্বে আজমীর [১] শরীফেও এ সম্পদপ্রাপ্তির সুসংবাদ দিয়েছিলেন এবং এর প্রাপ্তির বিষয়ে এই দরিদ্রকে নিতান্তই বিশেষ অনুগ্রহের উপর ন্যস্ত করেছিলেন। এর দৃষ্টান্তকেও এমনিভাবে আপনার দপ্তরের গণনার মধ্যেও রেখেছিলেন। যদিও এখন খোল্লাতের (বন্ধুত্বের) নেসবত যাকে 'সাবাহাত' বলা হয়, আপনার অনুদানে এই ফকির তার দ্বারাও শোভামণ্ডিত। কিন্তু আমার ব্যথিত হৃদয় 'মালাহাত' প্রার্থী। এই ছন্দগুলো [২] মালাহাতের সুরে মুখ থেকে বেরিয়ে আসে—

তোমার মাথার লম্বা কেশে হয়েছে মোর বিভ্রান্তি
আশেক নামে পাগল যারা উপদেশ রয়েছে তাদের জন্যে
হৃদয় আমার চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছে যে মালাহাতে
কে সে জনা সাক্ষাৎ করেছে যে তার সাথে।

দ্বিতীয় মারেফাত যা আপনি ওই সময় দান করেছিলেন, যদি অন্য কোনো সময় স্মরণে আসে, তাহলে আপনার খেদমতে উপস্থাপন করবো। কখনো এমন মনে হয় সায়ের বাহির অভিমুখী কর্ম। আর 'আলম' এর দিকে তার মনোযোগ নেই। অথচ হজরত যখন মুরিদগণের জিকিরের প্রশিক্ষণ এবং ফয়েজ রেছানীর হুকুম দিয়েছিলেন কিন্তু আলমের (জগতের) দিকে মনোযোগ না থাকার কারণে

১. এর দ্বারা বুঝা যায় যে, এতো বড় দীর্ঘ চিঠি মোহাম্মদ হাশেম কাশমী র. ১০৩২ হিজরীতে আজমীর সফর শেষে লিখেছিলেন।
২. ফারসী মূল কিতাবে পূর্ণ কবিতা রয়েছে। যার আংশিক অনুবাদ এখানে দেওয়া হয়েছে।

এই খেদমতের মধ্যে সংশ্লিষ্টতা পাইনি। এখন বিদ্যমান নেসবতের মধ্যে এই হাদিসের এক গুপ্ত ভেদ রয়েছে— 'মহান আল্লাহ্-ই ছিলেন, তাঁর সাথে আর কেউ ছিলো না এবং তিনি পূর্বে যেমন ছিলেন এখনও তেমন রয়েছেন। তিনি আইনে বাকার মধ্যে ফানী (বিলীন) রয়েছেন এবং আইনে ফানার মধ্যে বাকা (স্থিত) রয়েছেন। এ বিষয়টি হজরত খাজা মোহাম্মদ পারসা কুদ্দিসা সিররুহু কর্তৃক লিখিত 'কুদসিয়্যাহ্' শেষ পরিচ্ছেদের মধ্যে রয়েছে, যা হজরত গউছুল আরেফিন খাজা বাহাউদ্দিনের পবিত্র বাণী থেকে সংগৃহীত। পূর্ণ বাক্যটি এরকম—

'যখন আরেফের কার্যাবলী এ পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, আইনে ফানার মধ্যে বাকা হয় এবং আইনে বাকার মধ্যে ফানা হয়, তাহলে যখন সে আইনে বাকার মধ্যে ফানা হয়, তখন সে ফানা হয় ফানায়ে এলমী (জ্ঞানগত) ফানা ।'

কিন্তু এ অবস্থায় যে 'আইনে ফানা' এর মধ্যে বাকা হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে হজরত একথা বলেননি যে, এটি বাকা এলমী। অথবা এর হকিকত আরো কিছু আছে। আমি বুঝেছিলাম হজরত এ বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়তো নিজেই ত্যাগ করেছেন। অবশেষে এটাই স্পষ্ট হলো যে, যখন সালেক আইনে বাকার মধ্যে ফানা হয়ে যায়, তখন এলেমের মধ্যে ফানা হওয়ার অবকাশ ছিল। কেনোনা বিষয়টির ভিত্তিই ছিলো বাকার উপর। আর বাকার মধ্যে এলেম থাকে। কিন্তু যখন আইনে ফানার বাকা হয় তখন তো আর বাকার এলেম হতে পারে না। কেনোনা এ পর্যায়ে এলেম হারিয়ে যায়। এর ভিত্তি হয় ফানার উপর। আর এ বিষয়টিও স্পষ্ট হয়েছে যে, এলেম ফানা এর বিষয়টি অনুভব করে। অর্থাৎ যে এলেমের মধ্যে আরেফ ফানার নেসবত দ্বারা জ্ঞাত হয়, তা হচ্ছে ওই নূরের এক প্রতিবিম্ব। যে এলেম বাকা'র কামালতের সাথে সংশ্লিষ্ট তা যেনো 'মা ইয়াজরী আলা লিসানিকাল ইসতিহ্লাক', এর গুপ্তচরবৃত্তির জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এ রকম নয় যে, ওই এলেম সালেক থেকে মিলিত বা সন্নিবেশিত পায়। বরং তা নিজেরই মর্তবার অন্তর্ভুক্ত। কেনোনা ওই এলেম হচ্ছে ওয়াজিবে তায়ালা (আল্লাহ্)। ওই মর্তবা থেকে এ বিষয়ের উপর দৃষ্টি রাখে বা পর্যবেক্ষণ করে, যেমন সূর্যের কিরণ ছিদ্রের মধ্যে পতিত হয় এবং তার হালসমূহ অবগত হয়। ওই সূর্যের জ্যোতি তুল্য নূর নিজের মর্তবার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এ জন্য আর বেশী কী-ই বা বিশ্লেষণ করতে পারি? যতটুকু করতে পারি তা শুধুমাত্র হজরত মোজাদ্দেদ র. এর বাতেনী ফয়েজের এলেমের বরকতে করতে পারি। হে আল্লাহ! তুমি আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও।

বর্তমানে দু'ভাবে নেসবতের বহিঃপ্রকাশ ঘটছে। প্রথমতঃ কখনো জিকির, ফিকির, তাওয়াজ্জোহ্, নাগরানী (পর্যবেক্ষণ) ও আনুগত্যের মাধ্যমে। মাধ্যমগুলি দ্বারা তার জন্য রাস্তা প্রশস্ত হয়ে যায়। আবার কখনো মাধ্যম ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনেক মহান তরিকা থেকে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে। আমি এর মধ্যে পরিপূর্ণভাবে

বিলীন হয়ে যাই। এর নেসবতের মধ্যে এবং তার মূলের মধ্যে হই মশগুল। দ্বিতীয় প্রকার প্রথম প্রকার থেকে অধিক সূক্ষ্ম, এটাকে সায়েরে মুরাদী ও মাহবুবী এবং সায়েরে মা'শুকী বলে বিশ্লেষণ করা হয়।

আমি এক রাতে বোরহানপুর শহরের এক বাগানে রাতে একাকী অবস্থান করলাম। রাতে কথোপকথনের দৃশ্য থেকে এমন নেসবতের ফয়েজ প্রাপ্ত হলাম, যা আমি হজরতের খেদমতে সরাসরি ব্যক্ত করবো। এ সকল খায়ের-বরকতপ্রাপ্তি হজরতের স্নেহশীল দৃষ্টির কারণেই সম্ভব হয়েছে। তা নাহলে আমার মতো অযোগ্য ও অদক্ষ ব্যক্তির সাথে এ সকল বিষয়ের কী-ই বা সম্পর্ক?

এখন আপনার কাছে এই বিষয়টি ভিক্ষা চাই যে, এই গোলামকে আপনার ইচ্ছামতো অনুসারী বানিয়ে দিন। এই ছাগলের আস্তানাকে পুনরায় আপনার পবিত্র আস্তানায় ডেকে নিন।

খাজা মোহাম্মদ হাশেম র. বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন এবং পদ্ধতিগত বিদ্যায় সকল দিকে পূর্ণ দক্ষতা রাখতেন। মিষ্টভাষী, নম্র, উত্তমচরিত্রবিশিষ্ট ও বিনয়ী ছিলেন। হৃদয়গ্রাহী ঘটনাবলী অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ভাষায় বর্ণনা করতে পারতেন। তাঁর আলোচনা ও লেখনীর বৈশিষ্ট্য ছিলো হৃদয়োত্তাপ ও কোমলতায় পরিপূর্ণ। তাঁর বর্ণনা ছিলো তাঁর হাল ও জওক (আস্বাদন) নির্ভর। প্রথাগত বক্তব্য ছিলো না। তাঁর চেহারায় আত্মহারা ও মত্ততার ছাপ বিদ্যমান ছিলো। অতীত ইতিহাস স্মরণে ও রচনাশৈলীতে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁর মেধা ছিলো অত্যন্ত প্রখর। তাঁর হৃদয়গ্রাহী কবিতা, জীবনের স্পন্দন বৃদ্ধিকারী ছন্দ, চিত্তাকর্ষক শ্লোক, জীবনছোঁয়া বাক্য এবং সূক্ষ্ম দর্শনপূর্ণ রচনাবলী বিশেষভাবে খ্যাতিলাভ করেছিলো।

কুদসিয়্যাহ্ ঃ তিনি বর্ণনা করেন, হজরত মোজাদ্দেদ র. আমাকে রাবেতায়ে শায়েখ ও আকৃতির স্মৃতিচারণের নির্দেশ দিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁর প্রতি আমার আকর্ষণ সৃষ্টি হলো। একদিন তাঁকে চার লাইন কবিতা রচনা করে শোনালাম।

হজরত মোজাদ্দেদ র. বললেন, কারো প্রশংসা এমনভাবে কোরো না যে, অন্য কোনো বুজর্গের নিন্দা করতে হয়। ফেরেশতাগণ যথার্থই পুত ও পবিত্র। ফেরেশতাগণকে মাগছে কুনাদ (মিষ্টির উপর মাছিতুল্য) বলা শোভনীয় নয়। তাঁর এ বাণীর সূত্র ধরে আমার মধ্যে মাওলানা রুমী র. এর একটি কবিতা স্মরণ হলো।

তিনি বললেন, কখনো যেনো এমন না হয় যে, তুমি মাওলানা রুমীর কবিতার উপর নির্ভর করো। 'খাছানে হক' শব্দটি, যা কবিতায় উল্লেখ রয়েছে, তার দ্বারা মাওলানা রুমীর উদ্দেশ্য হবে আম্বিয়া আলাইহিস্ সলাতু ওয়াস্ সালাম। তারপর তিনি তো কবিতার মধ্যে 'গার মালাক বাশাদ' বলেছেন। অর্থাৎ যদি আমরা

আবশ্যক মনে করে বলি যে, 'যদি ফেরেশতাও হয়' হতে পারে, মাওলানা রুমী র. সম্ভবত মত্ততাবশতঃ এমন কথা বলেছেন।

কারামত ঃ তিনি বর্ণনা করেন, একদিন আমি সূরা বনী ইসরাইলের এই আয়াত তেলাওয়াত করলাম— 'ফাতাহাজ্জাদ বিহী নাফি লাতাল লাকা 'আসা আইঁইয়াব 'আসাকা রব্বুকা মাক্বমাম মাহমূদা' (তাহাজ্জুদ আদায় করো, এটা তোমার জন্য অতিরিক্ত। খুব শীঘ্র তোমাকে তোমার রব এমন স্থানে দাঁড় করাবেন, যেখানে সকলে তোমার প্রশংসা করবে)। আমার খেয়াল হলো সম্ভবতঃ মাকামে মাহমুদ যা শাফায়াতের স্থান— তার বরকত লাভ করতে তাহাজ্জুদ নামাজ বিশেষ ভূমিকা রাখে। বিষয়টি হজরতের কাছে জানার জন্য গেলাম। দেখলাম, তিনি ওজু করছেন। ওজু শেষে আমার দিকে ফিরে বললেন, তুমি কি তাহাজ্জুদ পড়ো? আমি বললাম, অধিকাংশ সময় পড়ার চেষ্টা করি। তিনি বললেন, যদি মাকামে মাহমুদের (শাফাআতের মাকামের) বরকত লাভ করতে চাও, তাহলে নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করবে। তিনি ওই আয়াত তেলাওয়াত করে শোনালেন। বললাম, আমি এই বিষয়টি জানার জন্যই হজরতের কাছে এসেছিলাম। আলহামদু লিল্লাহ! হজরতের কারামত। বলার আগেই উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে গেলো।

কারামত ঃ তিনি এরকমও বলেছেন যে, হজরত র. সাধারণত প্রত্যেক মুরিদের কাছে চিঠি লিখতেন। এই ফকিরেরও এরূপ খেয়াল হলো যে, তার নামেও অন্তত একটি চিঠি আসবে এবং তা প্রথম খণ্ডের শেষ মকতুব হবে। কেনোনা আমি তাঁর শেষভাগের নিম্নমানের মুরিদ। হজরত মোজাদ্দেদ র. আমার এমতো বাসনা তাঁর বাতেনী শক্তির মাধ্যমে অবগত হয়ে আমার কাছে চিঠি (৩১৩ তম) লিখলেন। শেষে লিখেছিলেন, যার উপর খাজা মোহাম্মদ হাশেমের নাম রয়েছে সেই চিঠিটি বদর যুদ্ধে রসূল স. এবং সাহাবা রা. গণের সংখ্যা অনুযায়ী ৩১৩ তম নম্বর। এই মকতুবটির মাধ্যমে প্রথম খণ্ড যেনো সমাপ্ত করা হয়। এভাবে হজরত মোজাদ্দেদ র. এর কারামতের মাধ্যমে আমার উদ্দেশ্য পূর্ণ হলো।

কারামত ঃ খাজা মোহাম্মদ হাশেম র. এর এক মুরিদ বর্ণনা করেন, একবার আমি ঠিক করলাম, যদি আমার ঘোড়া বিক্রি হয়ে যায়, তাহলে আমি কিছু অর্থ খাজা র. কে দিবো। যথাসময়ে ঘোড়া বিক্রি হয়ে গেলো। কিন্তু অর্থপ্রদানে দুই তিন দিন বিলম্ব করলাম। একদিন আমি হজরতের দরবারে উপস্থিত হলাম, আমার থলের মধ্যে মুদ্রাও ছিলো। খাজা সাহেব বললেন, তোমার মুদ্রার থলের মধ্যে আমার কিছু অংশ আছে, দিয়ে দিচ্ছো না কেনো? একথা শুনতেই আমার অন্তর আলোড়িত হলো। হঠাৎ আমি থলে থেকে মুদ্রা বের করে দিলাম। বুঝতে পারলাম না, কখন দিলাম।

কারামত ঃ হজরত খাজা মোহাম্মদ হাশেমের এক মুরিদ বর্ণনা করেন— সৈনিক জীবনে কোনো এক যুদ্ধে আমরা পরাজিত হলাম। আমার দলের লোকেরা জান বাঁচানোর জন্য পালিয়ে যাচ্ছিলো। আমি হজরত খাজা র.কে স্মরণ করতে করতে ঘোড়া চালাচ্ছিলাম। হঠাৎ জিন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘোড়ার পশ্চাদ্দেশের দিকে চলে গেলাম। এমন সময় হজরত খাজা র. আগমন করলেন এবং শক্তিপ্রয়োগ করে আমাকে ধরে জিনের উপর বসিয়ে দিয়ে বললেন, ঠিক হয়ে বসো। আমি ঠিক হয়ে বসলাম। তিনি বললেন, যাও। ইনশাআল্লাহ্ নিরাপদে পৌঁছে যাবে। তাঁর তাওয়াজ্জোহের বরকতে আমি নিরাপদে পৌঁছে গেলাম। আমার সাথীরা অনেকেই নিহত হলো।

তাঁর জীবনের অলৌকিক ঘটনা ও কারামত অসংখ্য, যা বিস্ময়কর ও দুর্লভ বলে শ্রুত। কিন্তু সে যুগের লোকেরা এ বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ করতো না। বুঝতোও না। তাই কলম বিরতি করা হয়েছিল। তিনি বোরহানপুরে ইন্তেকাল [১] করেন।

এ থেকে বুঝা যায় যে, তিনি পুস্তকটি সংকলনের পরে ইন্তেকাল করেছিলেন। বোরহানপুরে তাঁর মাজারের ফলকে মৃত্যু সন ১০৪৫ হিজরী লেখা রয়েছে। সম্ভবতঃ এখানে কিছু পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে হবে ১০৫৪ হিজরী। তাঁর লেখা কবিতা লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত রয়েছে, যার নম্বর ২৮৯৮। এর মধ্যে বিভিন্ন ভাষার সমাবেশ রয়েছে। সমসাময়িক বহু বিষয় সম্পর্কে অনেক তথ্য রয়েছে। হজরত মোজাদ্দে র. এর ইন্তেকালের তারিখের উপর ৬৩ বাক্য লিখেছিলেন। এ সম্পর্কে 'হাজ্‌রাতুল কুদুস' দশম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে মীর মোহাম্মদ নোমানের উল্লেখযোগ্য বাক্যাবলীও লিপিবদ্ধ রয়েছে। খাজা মোহাম্মদ হাশেম হজরত মোজাদ্দেদ র. এর ইন্তেকালের উপর অনেক কবিতা লিখেছেন। অনেক হৃদয়গ্রাহী শোকগাঁথা রচনা করেছেন। আরবি ভাষায়ও তাঁর অনেক ঐতিহাসিক তথ্যসম্বলিত গ্রন্থ রয়েছে। এই গ্রন্থের শেষেও অনেক ছন্দ রয়েছে। লেখার মাঝে মাঝে বিভিন্ন স্থানে তাঁর কবিতাও রয়েছে।

হাজ্‌রাতুল কুদুস গ্রন্থে রয়েছে, মীর মোহাম্মদ নোমানের শিশুকন্যা হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ কুদ্দিসা সিরুহুর কোলে বসেছিলো, যে তাঁর দাড়ির একটি চুল ছিঁড়ে নিয়েছিলো। ওই চুল মীর মোহাম্মদ নোমানের ঘরে সংরক্ষিত ছিলো। ওই শিশু কন্যা হয়েছিলেন খাজা মোহাম্মদ হাশেম কাশমীর স্ত্রী। যুবদাতুল মাকামাত দ্রষ্টব্য।

---

১. এ গ্রন্থের মধ্যে খাজা সাহেবের ইন্তেকালের সন উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু খাজা মোহাম্মদ হাশেম 'মুকাশাফাতে আয়নিয়া' ১০৫৩ হিজরী সনে বিভিন্ন গ্রন্থের সাহায্য নিয়ে সুবিন্যস্ত করেছিলেন।

মকতুবাত শরীফে তাঁর নামে এ সকল মকতুব রয়েছে—

প্রথম খণ্ড— ২৯০, ৩১০, ৩১৩ নং

দ্বিতীয় খণ্ড— ৭৪, ৯৩, ৯৭ নং

তৃতীয় খণ্ড— ৪২, ৫২, ৬৮, ৭৫, ৯০, ৯২, ৯৬ নং

বোরহানপুরে হজরত হাশেম কাশমীর র. এর মাজার ঈদগাহের নিকটবর্তী পান্তারোল নদীর কুলে ছিলো। ১২৭২ হিজরীতে সেখানে প্লাবন হয়েছিলো। তখন তিনি স্বপ্নযোগে বিভিন্ন মসজিদের ইমামদেরকে বলেছিলেন, আমার কবর ওখান থেকে সরিয়ে নাও (বর্তমানে তাঁর কবর হাইস্কুলের প্রশস্ত ময়দানে অবস্থিত)। যখন কবর উন্মুক্ত করা হলো, তখন দেখা গেলো তাঁর দেহ সম্পূর্ণ অক্ষত, নিরাপদ ও সুগন্ধিযুক্ত। ঘটনাস্থলে বিভিন্ন মতাবলম্বী লোকেরাও উপস্থিত ছিলো। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে উৎসবেরও আয়োজন করা হয়েছিলো এবং বিভিন্ন বই পুস্তকেও ঘটনাটির বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিলো।

১৯. শায়েখ আদম বিন্ নূরী কুদ্দিসা সিররুহু

শায়েখ আদম বিন নূরী কুদ্দিসা সিররুহু হজরত মোজাদ্দেদ র. এর প্রসিদ্ধ খলিফাদের অন্যতম ছিলেন। ছিলেন মর্যাদাশীল সহচরবৃন্দের অন্তর্ভুক্ত। তিনি স্বল্প সময়ের সোহবতে অধিক সুফল প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাঁর হাল ও মহান মাকামসমূহ ছিলো উচ্চ মর্তবা ও সীমাহীন মর্যাদাসম্বলিত। দক্ষতা ও আত্মশুদ্ধি সব কিছুই হজরত মোজাদ্দেদ র. এর বিশেষ তাওয়াজ্জোহে অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলো। তিনি খেলাফতলাভের সৌভাগ্যেও সৌভাগ্যমণ্ডিত হয়েছিলেন। তিনি সুন্নতের অনুসরণ ও বেদাত উচ্ছেদের ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এবং শরীয়ত ও তরিকতে পূর্ণ দৃঢ়তাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। দানশীলতা, উদারতা তাঁর প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিলো। ধনী-গরীব-আমীর-খাদেম, মখদুম-সন্তান-দরবেশ— সকলেই তাঁর দৃষ্টিতে সমান ছিলো। কারো মাঝে পার্থক্য করতেন না। একজন নেককার দরবেশ পরিপূর্ণ পবিত্রতার সাথে দরবারের খাদ্য রান্না করতেন এবং সকলের মাঝে সমানভাবে বণ্টন করে দিতেন। তাঁর মজলিসে রিয়া ও লোক দেখানো কোনো কারবার ছিলো না। তাঁর দরবারে গরীবের উপর ধনীর কোনো প্রাধান্য ছিলো না। সৎকাজের আদেশ এবং অন্যায়ের প্রতিরোধ ছিলো তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি কখনো কখনো দুনিয়াদার লোকদের প্রতি এমন কঠোর ও কর্কশ ব্যবহার করতেন, যা অন্য কেউ এতো কঠিন ও কঠোর হওয়া সত্ত্বেও পারতো না। তাঁর কথা খুবই প্রভাব বিস্তার করতো। তিনি যাকে যা নির্দেশ দিতেন, তা-ই পালিত হতো। লোকেরা তাঁর কাছে তওবা করে সঠিক পথে ফিরে আসতো। তিনি অধিকাংশ সময় সৎকাজের আদেশ বিষয়ে

বক্তব্য রাখতেন। কখনো হকিকত ও মারেফাত বিষয়ে আলোচনা করতেন। প্রথাগত কথা তাঁর কাছ থেকে খুব কমই শোনা যেতো। এরূপ হয়ে গেলেও তার মধ্যে থাকতো উপদেশ ও হেকমত। তাঁর সোহবত সকল প্রকার খারাপ কথা, অসৎচরিত্র এবং পৃথিবীপ্রসক্তি থেকে মুক্ত করে দিতো। তিনি তাঁর যুগের একজন শ্রেষ্ঠ আউলিয়া ছিলেন। তাঁর প্রায় একশত খলিফা ও লক্ষাধিক মুরিদ ছিলো। মানুষের কাছে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা এতো বেশী ছিলো যে, পৃথিবীর সকল প্রান্ত থেকে দলে দলে লোকেরা তাঁর দরবারে চলে আসতো। সাক্ষাৎ লাভের পর তওবা করতো। অধিকংশ সময় তাঁর সাথে খাঁটি ফকির দরবেশের একটি দল থাকতো।

তাঁর প্রকৃত জন্মভূমি ছিলো রাদাহ। পিতৃকুলের দিক দিয়ে তিনি সাইয়্যেদ বংশীয় ছিলেন। কিন্তু তাঁর দাদী ছিলেন আফগান বংশোদ্ভূতা। কোনো কারণে তিনি সেরহিন্দের বিন্নূর নামক স্থানে বসবাস শুরু করেন।

কুদসিয়্যাহ্ ঃ শায়েখ এই নগণ্যকে বলেছিলেন, একবার আমার পিতা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখলেন। তিনি আমার পিতার বুকের উপর হাত বুলিয়ে সেখান থেকে কিছু বের করে আমার পিতাকে দিয়ে বললেন, খাও। আমার পিতা খেয়ে নিলেন। এরপর আমি আমার মায়ের গর্ভে এলাম। আমাকে বলা হয়েছে, আমার অস্তিত্ব রসূলে আনওয়ার স. এর দান মোবারক থেকে।

কুদসিয়্যাহ্ ঃ শায়েখ এই ফকিরকে এ-ও বললেন, আমার মাতা স্বপ্ন দেখলেন, হেকমতের প্রদীপ জ্যোতির্ময় হয়ে গিয়েছে। প্রদীপখানি ঘরের ছাদের সাথে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমার মাতা এই স্বপ্নের কথা আমার পিতাকে জানালেন। তিনি বললেন, তোমার এক নূরানী (জ্যোতির্ময়) পুত্র জন্মগ্রহণ করবে।

কুদসিয়্যাহ্ ঃ শায়েখ এ কথাও এক ফকিরকে বলেছেন, আমি সর্বপ্রথম হজরত মোজাদ্দেদ র. এর খলিফা হজরত খাজা খিজির র. (যাঁর সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে) এর দরবারে হাজির হয়ে তরিকার জিকির শিখেছিলাম। উচ্চতর হালও অর্জন করেছিলাম। হাজী সাহেবের কাছে নিজের অলৌকিক ঘটনাবলী উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, এর থেকে বেশি কিছু আমার কাছে নেই। এখন তুমি হজরত মোজাদ্দেদ র. এর দরবারে যাও। আমি হাজী সাহেবের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে হজরত মোজাদ্দেদ র. এর কাছে উপস্থিত হলাম। সকল ঘটনা খুলে বললাম। তিনি বললেন, এ-তো প্রাথমিক অবস্থা। এখনও কামালত (পূর্ণতা) আসেনি। একথা শুনে আমি বুঝলাম, হজরত মোজাদ্দেদ র. আমার আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য এরূপ কথা বললেন। তা না হলে এর থেকে বেশি কামালতের আর কী থাকতে পারে? কিন্তু হজরতের প্রতি আমার গভীর আস্থা ছিলো। তাই তাঁর দরবারেই রয়ে গেলাম। কিছু কাল পর আমার এমন হাল হলো যে, তার

তুলনায় পূর্বের হালকে প্রাথমিক অবস্থার হালও বলা যায় না। হজরত আমাকে একান্তে ডেকে নিয়ে এজাযত ও খেলাফত দান করে বিন্নূরে পাঠিয়ে দিলেন। নির্দেশ পালনার্থে সেখানকার লোকদেরকে জিকিরের শিক্ষা দিতে লাগলাম। কিন্তু আমার মনে কখনো শায়েখের আসনে আসীন হওয়ার বাসনা ছিলো না। কিছুদিন পর আমি হজরতের দরবারে উপস্থিত হলাম। তিনি কাশফের মাধ্যমে অবগত হলেন যে, দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে আমার তেমন কোনো মাথাব্যাথা নেই। বললেন, মহান আল্লাহ্ তোমার কাছে জিজ্ঞেস করবেন যে, হেদায়েতের পথপ্রদর্শনের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তুমি নিজে কেনো তোমার নিজেকে হেদায়েত করা থেকে বঞ্চিত রেখেছো? হজরত বারংবার এ কাজের জন্য আমাকে তাগিদ দিলেন। আমি বাধ্য হয়ে জোরে শোরে এ কাজে লিপ্ত হলাম।

১০৫৩ হিজরীতে এক ঘনিষ্ঠজনের অনুরোধ ও তার অঙ্গীকার রক্ষার্থে তিনি প্রসিদ্ধ শহর লাহোরে আগমন করলেন। সে সময়ের সম্রাট শাহজাহান সংবাদ পেলেন। শায়েখের সঙ্গে আফগানিস্তানসহ অন্যান্য স্থানের লোকদের এক বিশাল কাফেলা তাঁর সঙ্গে থাকায় কিছু লোক সম্রাটের কাছে তাঁর আগমনসংবাদকে খারাপ দৃষ্টিভঙ্গিতে পৌঁছে দিলো। তাদের এমতো আচরণ সম্রাটের [১] পছন্দ হলো না। শায়েখের দীর্ঘদিনের বাসনা ছিলো জিয়ারতে বায়তুল্লাহ এবং রসূলুল্লাহ স. এর রওজা মোবারক দর্শন। তিনি দেশে ফিরে এসে হারামাইন শরীফের দিকে রওয়ানা হলেন। পবিত্র হজ্বব্রত পালন শেষে তিনি মদীনা মুনওয়ারায় উপস্থিত হলেন। চল্লিশ দিন পর্যন্ত সেখানে থাকার অনুমতি পেয়েছিলেন। সেখানেও তিনি খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। তারপর যখন তিনি সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা করলেন, তখন রসুলেপাক স. থেকে এই মর্মে সুসংবাদপ্রাপ্ত হলেন, হে আমার সন্তান! তুমি আমার প্রতিবেশি হয়ে যাও। তিনি সেখানেই রয়ে গেলেন। ১০৫৪ [২] হিজরী শাওয়াল মাসে ইন্তেকাল করেন। হজরত আমীরুল মুমিনীন ওসমান রা. এর রওজার একটু দূরে তাঁকে দাফন করা হয়।

---

১. উর্দূ অনুবাদের মধ্যে এই বাক্যের পরে এ কথাটিও রয়েছে— সম্রাট তাঁকে মক্কা মুয়াজ্জামায় চলে যেতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

২. উর্দূ অনুবাদে এখানে ১০৫৩ হিজরী লেখা আছে। ফারসী মূল কিতাবে এ স্থানটি শূন্য রয়েছে। কিন্তু ১০৫৩ হিজরী সঠিক হতে পারে না। কেনোনা ওই বছর শায়েখ লাহোরে ছিলেন। যদি তিনি হজ্বে যেয়ে থাকেন, তাহলে ওই বছর জিলহজ্ব মাসে হজ্ব করেছেন। তারপর মদীনা মুনাওয়ারায় উপস্থিত হয়েছেন। এরপর তো আর ১০৫৩ হিজরীতে শাওয়াল মাস আসার কথা নয়। ১০৫৪ হিজরীতে 'রওজাতুল কাইয়্যুমিয়া' গ্রন্থের ২১৪, ২১৫ পৃষ্ঠায়, 'নুজহাতুল খাওয়াতির' গ্রন্থের ৫ম খণ্ডে এবং অন্যান্য গ্রন্থেও শায়েখের জীবনচরিত বর্ণিত হয়েছে, যার মূল বক্তব্য হচ্ছে— তিনি ছিলেন উম্মী (অক্ষরজ্ঞানহীন), কিন্তু রূহানী ফয়েজের মাধ্যমে তিনি পবিত্র কোরআন মুখস্থ করেছিলেন এবং জাহেরী এলেমও অর্জন করেছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি সেনাদপ্তরের কর্মচারী ছিলেন। এক যুদ্ধে মন্দিরের মধ্যে এক পূজারীকে নিমগ্ন দেখে তাকে

২০. হাজ্‌রাতুল কুদুস গ্রন্থের লেখক শায়েখ বদরুদ্দীন

এই মিসকিন বদরুদ্দীন (গ্রন্থপ্রণেতা) আল্লাহ্ তাকে মাফ করুন, তার এ রকম কোনো যোগ্যতা নেই যে, নিজেকে হজরত মোজাদ্দেদ র. এর মুরিদগণের দলমধ্যে গণ্য করে। কিন্তু যেহেতু হজরতের পবিত্র ইলহামী জবান থেকে অনেক মূল্যবান কথা আমি শুনেছি, তাঁর অনেক অলৌকিক ঘটনা দেখেছি, তাঁর হাল এবং ঘটনাসমূহের বিষয়ে আমি অবগত, তাই আমি এ গ্রন্থ রচনার উদ্যোগ নিতে সাহস করেছি। তাই আমার মতো এ নগণ্যের নামটিও এই মহামূল্যবান দলের অন্তর্ভুক্ত হতে চলেছে।

এ ফকিরের বয়স যখন পনেরো বছর, তখন হজরত মোজাদ্দেদ র. আমাকে তাঁর মুরিদগণের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি যখন আমাকে এসমে যাতের জিকির বলে দিলেন, তখন খুবই মনোনিবেশের সঙ্গে জিকির ও মোরাকাবায় লিপ্ত হলাম। আমি তখন হাবছে দম (শ্বাসরুদ্ধ করে জিকির) করতাম। তিনি কাশফের মাধ্যমে বিষয়টি অবগত হয়ে বললেন, হাবছে দম ছাড়াই জিকির করো। এসমে যাতের জিকিরে হাবছে দম নেই। তাঁর নির্দেশ মতো আমি জিকির করতে থাকলাম। ওই মজলিসেই আমার অন্তরে জিকির জারি হয়ে গেলো। তিনি বললেন, কিছুদিনের জন্য তুমি তোমার কিতাব অধ্যয়ন বন্ধ রাখো, যেনো তোমার অন্তরে জিকির দৃঢ়মূল হয় এবং খেয়াল অন্যদিকে না যায়। তারপর বললেন, তুমি জিকিরের শোগল (সার্বক্ষণিক লিপ্ততা) ছাড়বে না। আমি হজরত মোজাদ্দেদ র. এর নির্দেশ অনুযায়ী সাময়িকভাবে কিতাব অধ্যয়ন বন্ধ করলাম। তখন হজরত র. থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াও বন্ধ হয়ে গেলো। জিকির আমার অন্তরের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করলো। অবস্থা এমনই হলো যে, আমি জিকির না করতে চাইলেও জিকির বন্ধ হতো না। আমি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে গেলাম। এরপর ওই জিকির বক্ষের ডান পাশে 'রূহ' নামক লতিফায় স্থানান্তরিত হলো। তারপর বাম পাশে কলবের উপরে 'সির' মাকামে স্থানান্তরিত হলো। এরপর জিকির চলে গেলো রূহ মাকামের সোজা উপরে মাকামে 'খফীতে'। অতঃপর বক্ষের মধ্যস্থানে মাকামে আখফায়। একটা দীর্ঘ সময় এই অবস্থায়ই চললো। অতঃপর সমস্ত শরীরে এই জিকির প্রবাহিত

হত্যার পর তিনি ভাবাতুর হয়ে পড়েন। অতঃপর তাসাউফের মধ্যে প্রবেশ করেন। স্বীয় গ্রন্থ 'নাকাতুল আসরার' এর মধ্যে হজরত মোজাদ্দেদ র. থেকে ফয়েজপ্রাপ্তির বিবরণ উল্লেখ করেছেন। আজমীর শরীফে হকিকতে মোহাম্মদী ও হকিকতে কোরআনের সুসংবাদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। হজরত মোজাদ্দেদ র. এর ইন্তেকালের পর দু'বছর তিনি সেরহিন্দে অবস্থান করেছিলেন। হজরত মোজাদ্দেদ র. এর মকতুবাতের মধ্যে তাঁর নামে কোনো মকতুব নেই। অবশ্য মকতুবাতে মাসুমিয়া ৩য় খণ্ড ৭০ নম্বর মকতুবে মীর্জা আমানুল্লাহ বোরহানপুরীর হালাত বর্ণনার মধ্যে রয়েছে, তিনি মক্কা মোয়াজ্জামায় অবস্থিত মীর মনসুরের কবরের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি লজ্জিত অবস্থায় ছিলেন এ কারণে যে, তিনি হজরত মোজাদ্দেদ র. এর মজলিস ত্যাগ করে কেনো শায়েখ আদমকে অবলম্বন করেছিলেন। অনুরূপভাবে শায়েখ তাজ সাম্বলীও নিজ কবরে লজ্জিত ছিলেন। যুবদাতুল মাকামাত গ্রন্থে সাধারণ খলিফাদের বিবরণীতে শায়েখ আদম বিন্ নূরীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

হলো এবং প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জিকির করতে থাকলো। এমনি অবস্থায় একদিন আমি চাশতের নামাজের জন্য ওজু করছিলাম। তখন এক বৃদ্ধা আমার সামনে দিয়ে চলে গেলো। তখনই আমি দেখলাম, যাতে ইলাহীর তাজাল্লীর প্রতিবিম্ব এবং মহান আল্লাহ্ আবির্ভূত হচ্ছেন। এরপর আমার চোখে যা কিছু দৃশ্যমান হতো, তখন এরূপ মনে হতো যে, মহান আল্লাহ্ ওই পরিচ্ছদে দীপ্তিমান। এরপর আমি নিজেকেও অনুরূপ পেলাম। যেরূপ আমি অন্যদেরকে দেখছিলাম। যেনো এই নগণ্যের সকল বাতেনকে বের করে নেওয়া হলো এবং অধিকাংশ জাহেরও তার সাথে চলে গেলো। যদি কেউ আমার সাথে কথা বলতো, অথবা আমি যদি কারো সাথে কথা বলতাম, তাহলে সে কি বলছে এবং আমি কি বললাম— কিছুই বুঝতে পারতাম না। আর যদি আমি আমার বাতেন পুনরায় ফিরে পেতাম তাহলে দেখতাম যে, কোনো রকম প্রতিক্রিয়া বা চিহ্ন নেই দুনিয়ার, অথবা দ্বীনের। এর কিছুই অবশিষ্ট পেতাম না। ওই বাতেন আয়না থেকেও স্বচ্ছ। কিন্তু আমি জানি না, আমাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এরপর হজরতের তাওয়াজ্জোহ্ থেকে তানকিয়াহ এবং তাকদীস (পুত-পবিত্রতা) এর প্রতিবিম্ব পতিত হলো এবং তাশবীহ (সন্দেহ) ও তওহীদ বিদায় নিলো। হক তায়ালাকে গায়বুল গায়েব (অদৃশ্য থেকে অদৃশ্যতর) পেলাম এবং তাঁর সিফাতকেও তাঁর যাতের মতো গায়বুল গায়েব পেলাম। ওই অবস্থাকে আমার ভাষাগত সীমাবদ্ধতার জন্য গায়বুল গায়েব বলেছি। নচেৎ সে ক্ষেত্রে এ শব্দ প্রয়োগের কোনো অবকাশ নেই। এই যাতকে দুনিয়ার কোনো অবস্থার মধ্যে অথবা কোনোরকম সম্পর্কের মধ্যে বিদ্যমান পেতাম না। তাঁর সিফাতকেও পেতাম না। বরং স্বাভাবিকভাবেই সকল মানুষকে ওই যাত পাক থেকে সম্পর্কহীন পেতাম এবং তাঁর মারেফাত উপলব্ধিতে অক্ষম এবং সে পর্যন্ত পৌঁছাতেও নিজেকে পরিশ্রান্ত পেতাম। বিস্বাদ, উদাসীনতা, নিজের পূর্ণতা সব কিছুকেই হতাশার সঙ্গে সম্পৃক্ত পেতাম। কখনো হালের প্রাবল্য এমনই বৃদ্ধি পেতো যে, মনে হতো বস্ত্র ছিন্ন ভিন্ন করে অরণ্যে গমন করি। কখনো নিজেকে ধ্বংস করে দিতে ইচ্ছা হতো, যেনো এই পাওয়া ও না পাওয়ার বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি পাই। এই অবস্থায় অধিকাংশ সময় হা-হুতাশ ও বুকে করাঘাত করতাম। কিন্তু হজরত মোজাদ্দেদ র. কে সার্বক্ষণিক চোখের সামনে দেখতাম। তিনি আমাকে সান্ত্বনা দিতেন। কিছুদিন পর পর অবস্থার পরিবর্তন হতো। এরপর তিনি পুনরায় সান্ত্বনা দিতেন। মহান আল্লাহ্‌কে এ জগত থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অমুখাপেক্ষী দেখতে পেতাম এবং আমার নিজেকে দূরে অনেক দূরে দেখতাম। তখন ইমান হারানোর আশংকায় ও পরকালের শাস্তির ভয়ে আতংকিত থাকতাম। গায়বুল গায়েবের প্রাপ্তির বাসনা অন্তরালের পর্দার মধ্যে থেকে যেতো। অতঃপর যখন অন্ধকারের পর্দা উন্মোচিত হতে শুরু করলো এবং তাকে উপেক্ষা করে সায়ের যখন অগ্রগামী হলো, তখন আরো কিছু দৃশ্যমান হলো এবং সেগুলোও

অতিক্রম করানো হলো। কিন্তু এ বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানানো হলো না। ইতোপূর্বে যে সায়ের হয়েছিলো তার স্বরূপ ভিন্ন ছিল। সকল অবস্থায় সকল অন্ত রায়ের পর মহান আল্লাহ্‌র নৈকট্য নির্ধারিত হয়ে যেতো। যখন আমি সেখানে উপনীত হতাম তখন হকতায়ালাকে ওই পর্দা থেকে আরো উপরে পেতাম। কিন্তু এ অবস্থায় কোনো স্থানে তার নির্দিষ্টতা হতো না। আরো চার, পাঁচ বা দশ, বিশ পর্দা দৃশ্যমান হতো। তার উপরে তাঁকে পেতাম বরং পেতামই না। আক্ষেপ এবং অজ্ঞতা বৃদ্ধিই পেতে থাকতো। নির্ধারণ ও নিরূপণের কোনো বিষয়ই ছিলো না। সেটা ছিলো এক বিস্ময়কর ও দুর্লভ ব্যাপার। আশা-নিরাশার মাঝে এক উভয় সংকটপূর্ণ অবস্থা। আমি আমার এই হালের কথা নির্জনে হজরত মোজাদ্দেদ র. এর কাছে ব্যক্ত করছিলাম। এমন সময় তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র খাজা মোহাম্মদ সাদেক (ইন্তেকাল ১০২৫ হিজরী) আগমন করলেন। হজরত মোজাদ্দেদ র. তাঁকে বললেন, তুমি কি শুনেছো বদরুদ্দীন অকেজো বা পরিত্যক্ত হয়ে গিয়েছে। তিনি মৃদু হাসলেন। বললেন, কোনো ভয় নেই। এ ধরনের হাল এসালাতে মাল (মূল লক্ষ্যে উপনীত হওয়া) স্বরূপ, যা সালেকগণের প্রতি উপর্যুপরি ঘটতে থাকে। কিন্তু শোকর করো যে, এটি পবিত্র জগতের অন্তর্ভুক্ত, সন্দেহভাজন জগতের অন্তর্ভুক্ত নয়, যা পদস্খলনের কারণ— যেখানে ভ্রষ্টতা এবং অন্ধকার এসে যায়। অধিকাংশ লোক এই সন্দেহের পথেই চলেছে। পুতপবিত্রতার পথ অবলম্বন করেনি। আম্বিয়া আলাইহিস্ সলাতু ওয়াস্‌সালামগণ শুধুমাত্র এ তানযিয়াহ বা পবিত্রতার শিক্ষাই দিয়েছিলেন।

একবার হজরত মোজাদ্দেদ র. এর দরবারে তিনি একটি নিবেদনপত্র লিখেছিলেন, যা এখানে হুবহু উল্লেখ করা হলো।

নিবেদন— হৃদয়ের কেবলা! উন্নতির সোপান, তাকদিস ও তানকিয়াহ এর ধারাবাহিকতায় প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন রহস্যের আবির্ভাব হচ্ছে এবং বিস্ময়কর ও দুর্লভ অবস্থা অতি উত্তম প্রক্রিয়ায় প্রকাশ হয়েই চলেছে। কিন্তু একটি হাল অতিক্রম করার পর তা খুব কমই মনে থাকে। বরং সম্পূর্ণ বিস্মৃতি এসে যায়। কখনো এমনও মনে হয় যে, আমার এরূপ কোনো হালই ছিলো না। এরপর আরো দুটি বাধা রয়েছে। একটি হচ্ছে আমার বিশ্বাস, মুরিদগণের হালের উপরে কাশফ হয়ে যায়— তার বর্তমান অবস্থা কোন পর্যায়ে তা বোঝা যায়। বিশেষ করে এই নগণ্যের হাল বিষয়ে, কেনোনা আমার বাতেনী অবস্থা হজরতের বাতেনী অবস্থার পরিপন্থী পাচ্ছি। আত্মিক প্রেমের মধ্যে এবং সংক্ষিপ্তভাবে তরিকার ক্ষেত্রেও। যেমন আয়নার মধ্যে একটি আকৃতি অন্য আকৃতির প্রতিবিম্ব হয়।

দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, আমি হজরতের কিতাবে পড়েছি— হাল এবং অজদ গণনার মধ্যে আসবে না। বেশী গুরুত্ব দেবে না। বরং সাহসিকতার সাথে উদ্দেশ্য সাধনে কোমর বাঁধা উচিত যেনো যিনি হাল বানানোর মালিক তাঁর কাছে পৌঁছে

যেতে পারো। এই নগণ্য হালসমূহের ব্যাপারে খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করো না। বরং আপ্রাণ সাধনা করো, যেনো হালের মালিকের কিছু সুগন্ধ পাওয়া যায়। এখন আমার নিবেদনের মূল উদ্দেশ্য হলো, এক মাসের কিছু কম বা বেশী হলো এই জগতকে এবং ওই বস্তুসমূহ যা ইতোপূর্বে বিদ্যমান ও প্রতিষ্ঠিত ছিলো স্বীয় বাতেনী দৃষ্টিতে দূরবর্তী নিশ্চিহ্ন মনে হচ্ছে। এ থেকে বিস্মৃতি সৃষ্টি হয়েছে। আসতাগ্ফিরুল্লাহ! বিস্মৃতি এমনই ছিলো যে, বিস্মৃত ব্যক্তিই অস্তিত্বে নেই। কিন্তু তিনি (হক সুবহানাহু) বিদ্যমান। এমন পবিত্রতার সাথে বিদ্যমান, যা লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশ করা একেবারেই অসম্ভব। হ্যাঁ, এতোটুকু বলা যেতে পারে যে, সেখানে (তানকিয়ার মধ্যে) আক্ষেপ এবং অজ্ঞতা ব্যতীত আর কিছু নেই এবং সেখানে আহকামের স্বীকৃতি, অবস্থা এবং গুণসমূহের স্থিতি ও অস্থিতি বাস্তবিক পক্ষে অবিশ্বাস স্বরূপ। এমনি অবস্থায় এলকার মাধ্যমে এটাই প্রকাশিত হয়েছে যে, এই ফানা, দায়রায়ে উরুজে কলব (অন্তর ঊর্ধ্বরোহণের বৃত্ত) পূর্ণ হওয়ার পরবর্তী স্তর। এ অবস্থার পরিপক্কতা ও অপরিপক্কতা সম্পর্কে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। এই মাকামে নিজেকে গুনাহমুক্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত দেখেছি। তা হলে এ বিষয়টি কী?

হজরত মোজাদ্দেদ র. এই নিবেদনের উত্তরে লিখলেন, এটাই হচ্ছে ফানা ও বাকা (লয় ও স্থিতি) যার বেলায়েত প্রতিষ্ঠিত হয়।

মখদুমজাদা হজরত খাজা মোহাম্মদ সাদেক আমার এই লেখার প্রেক্ষিতে উল্লেখ করেছেন— যা কিছু কামালত হজরতের অন্তর্জগতে পতিত হচ্ছে, তা এই নগণ্যের বাতেনের উপরেও বিকশিত হয়। বিস্মিত হওয়ার কী আছে? আরো বললেন, খুবই চমৎকার। হজরত মোজাদ্দেদ র. বলেছেন, আশ্চর্যের বিষয় হবে কেনো, তিনি তো নিজ দক্ষতা অনুযায়ী ফয়েজপ্রাপ্ত হয়েছেন। এরপর এই কবিতাটি পড়লেন—

সংখ্যায় যতো বেশী হবে দর্পন
ততোই করিবে সৌন্দর্য দর্শন।

এরপর আমি দ্বিতীয় নিবেদনপত্র হজরতের দরবারে উপস্থাপন করলাম। লিখলাম—

হজরত সালাম! এখন আত্মহারা ও মত্ততা স্তিমিত হয়ে গিয়েছে। জগত দৃশ্যমান হচ্ছে। কিন্তু কল্পনা ও ধারণা পূর্বের মতো নেই। আমার জগতকে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এলেম এবং হাল প্রবল ছিলো। এখন হালের প্রাবল্যের কারণে তা প্রতিষ্ঠিত ও বিদ্যমান থাকার কোনো এলেম নেই। বরং এখন তো হাল অনুযায়ী এলমে ইয়াকীন সুদৃঢ় রয়েছে।

হজরত মোজাদ্দেদ র. এই হাল বিষয়ে অবগত হয়ে বললেন, হালই আসল। আমাদের খাজা মোহাম্মদ বাকী বিল্লাহ কুদ্দিসাসিররুহু এটাকে বলতেন, ‘ফরক বা’দাল জমা (মিলনের পর বিচ্ছেদ)।

একবার এই ফকির হজরত মোজাদ্দেদ র. এর কাছে চিঠি লিখলেন এভাবে— হক সুবহানাহু ওয়ারাউল ওয়ারা (বিজয়ী বা প্রভাবমুক্ত) তাঁর নাম ও গুণসমূহ থেকে এবং শান (অবস্থা) ও ই'তিবার (ধারণা) থেকে বরং তাঁর অস্তিত্ব থেকে তাঁকে প্রভাবমুক্ত পাচ্ছি। হজরত মোজাদ্দেদ র. বললেন, এটাই প্রকৃত হাল এবং পূর্ববর্তী মাশায়েখদের প্রতিও এ জাতীয় হালের অবতারণা হয়েছিলো। শায়েখ আলাউদৌলা সামনানী র. বর্ণনা করেন, আলমে অজুদের ঊর্ধ্বে আলামিল মালাকুল ওয়ারূদ রয়েছে।

আর এক নিবেদনে উল্লেখ করেছিলাম— হজরত সালাম! এই ফকির যখন কোনো কবরের পাশ দিয়ে যায়, তখন ওই কবরবাসীর শান্তি-শাস্তি-পুরস্কার-কষ্ট সবই জানতে সক্ষম হয়। কখনো কবরের চলমান শাস্তিকে দেখতে পাই। আবার কখনো কবরের শান্তিময় অবস্থাও দর্শন করি। কখনো কবর অন্ধকার কখনো জ্যোতির্ময়। কখনো কোনো বুজর্গের কবরের কাছে গেলে জান্নাতের মধ্যে কোন্ নেয়ামত বা কোন্ মাকামে আছে তাও অবলোকন করি। ওই বুজর্গের মারেফাতের সূক্ষ্ম রহস্য ও দানসমূহ আমার নিজের মধ্যে প্রত্যক্ষ করি। কখনো তাঁদের বিমুখতা ও মনোনিবেশহীন অবস্থাও দৃশ্যমান হয়। জিজ্ঞেস করার পর অতি কষ্টে ওই মনোনিবেশহীনতার কারণও জানতে পারি।

একবার আমার পিতা-মাতার কবর জিয়ারতের জন্য গেলাম। ওজু করে দু'রাকাত নামাজ আদায় করলাম। দোয়া করলাম, হে আল্লাহ্ পাক! এর সওয়াবটুকু আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সকল আম্বিয়া আলাইহিস্ সলাতু ওয়াস্‌সালাম এবং তাঁর সহচরবৃন্দ এবং সকল আউলিয়া কেরাম ও তাঁদের অনুসারীদের উপর এবং আমার পিতা-মাতার রূহের উপর পৌঁছে দাও। আমার দোয়া শেষ হতে না হতেই কবরস্থানের সকল মৃতব্যক্তিগণ পঙ্গপালের মতো আমার সামনে উপস্থিত হলো। বললো, আমাদেরকেও ওই সওয়াবের অন্তর্ভুক্ত করুন। আমি তাঁদের কয়েকজনকে বললাম, আমি আমার পিতা-মাতার আত্মার প্রতি অধিক সওয়াব পৌঁছাতে ইচ্ছুক। কিন্তু কোনো কাজ হলো না। তাঁরা কাকুতি-মিনতি করতে লাগলো। তখন আমি পালিয়ে শায়েখ আব্বু বোখারীর কবরের কাছে চলে গেলাম। দেখলাম, শায়েখের চতুস্পার্শ্ব তারা পরিবেষ্টিত করে আছে। হতাশ হয়ে ফিরে আসার ইচ্ছা করলাম। আমি তাদের কাছে অঙ্গীকার করলাম, ফিরে যাবার সময় তোমাদের সকলের জন্য পৃথকভাবে দোয়া করবো। তাঁরা খুশি হলেন। অতঃপর আমি শায়েখ বুজর্গের মাজারবেষ্টনীর মধ্যে প্রবেশ করলাম। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে আমার প্রতি সম্মানপ্রদর্শন করলেন। বিনয় ও সৌজন্য প্রদর্শন করলেন। বললেন, শহরের মধ্যে যে মহামারী ছড়িয়ে আছে তা থেকে নিরাপদ থাকবেন। (১০২৫ হিজরী সেরহিন্দে মহামারী ছড়িয়ে পড়েছিলো। নিবেদনপত্র ওই সময়েরই ছিলো)

হজরত মোজাদ্দেদ র. বললেন, আমাদের হজরতবৃন্দ কাদ্দাসাল্লাহু আসরারাহুম কাশফে কুবুরকে খুব বেশী গুরুত্ব দেননি। তাঁদের মাজার জিয়ারতের পদ্ধতি হচ্ছে— তাঁরা মাজারের সামনে নিজেকে সকল নেসবতমুক্ত করে খুবই মনোযোগিতার সাথে কবরের সামনে বসবে। তারপর বাতেনীভাবে যে ফয়েজপ্রাপ্তি হয়, তার দ্বারাই কবরবাসীর হাল অনুধাবন করবে। সাধারণ মানুষের সোহবতে তাদের প্রক্রিয়া এটাই। কিন্তু এ বিষয়ের প্রতি খুব গুরুত্ব দেবে না। তা না হলে আকৃষ্টি সৃষ্টি হবে। আর অনেককিছুর আকৃষ্টি এই রাস্তায় চলার গতিকে রুদ্ধ করে দেয়।

একবার সুযোগ পেয়ে হজরতের কাছে চিঠি লিখেছিলাম এভাবে— হজরত সালাম! যেমনভাবে আল্লাহ্‌র দরবারে অজ্ঞতা ও আক্ষেপ নিবদ্ধ ছিলো, এখন এলেমও তার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে। যেনো দুই দুর্বলতা সমবেত হয়েছে। পূর্ববর্তী তানযিয়ার মধ্যে অধিক পর্যবেক্ষণমুক্ততা ছিলো। অজ্ঞতা প্রতিষ্ঠিত ছিলো। এখনো তদ্রূপই আছে। যাতের জন্য সিফাতের স্বীকৃতি এবং যাত সম্পর্কিত জ্ঞান, সুন্নত জামাতের মতাদর্শ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত ছিলো। কিন্তু এমন ছিলো না যে, দুটি অবস্থা এককের মধ্যে সমন্বিত পাওয়া যেতো। এখন তো এলেম এবং অধিক স্বীকৃতিই বিদ্যমান। কিন্তু যদি দেখি যে, পূর্ববর্তী তানযিয়া এখন বাতেনের মধ্যে কল্পনায় আছে বা নেই, তখন এলেমের উৎসও বাতেনের মধ্যে পাই, যেনো তা তানযিয়া ছেরফা (খাঁটি পবিত্রতা)। এসময় এলেমও তার সাথে একত্রিত হয়ে যায়।

অন্য আর এক সময় আমি এক চিঠিতে লিখেছিলাম— হজরত সালাম! যখন আমার মধ্যে অজ্ঞতা এবং আক্ষেপ বিরাজ করতো তখন আমি তরিকতের পথে সুলুক হওয়ার বিষয়ে হতাশ হয়ে গিয়েছিলাম। আমার যোগ্যতার পাত্রকে খুবই সংকীর্ণ পেতাম। ওর চেয়ে বড় পাত্র পাওয়ারও কোনো সুযোগ দেখতাম না। তখন স্বয়ংসম্পূর্ণ মহান আল্লাহ্‌র দরবারে খুবই অনুনয়-বিনয় করতাম। এরপর আল্লাহ্‌পাক হজরতের খাস বাতেনী তাওয়াজ্জোহের বরকতে আমার অন্তর্জগতকে প্রশস্ত করে দিয়েছেন। আমাকে এলকার মাধ্যমে বলা হয়েছে, বাতেনী ময়দানের এই প্রশস্ততা প্রকৃতপক্ষে মূল রূহের ময়দানেরই প্রশস্ততা। আমি আশা করি হজরত অবস্থার চিকিৎসা করবেন। রোগীকে ব্যবস্থাপত্র দিয়ে ধন্য করবেন।

হজরত মোজাদ্দেদ র. বর্ণনা করেছিলেন, জহল (অজ্ঞতা) এবং হায়রত (আক্ষেপ) এলেম ও মারেফাত থেকে উত্তম। আমীরুল মুমিনীন হজরত আবুবকর সিদ্দীক রা. বর্ণনা করেছেন, প্রাপ্তি-অনুভূতি থেকে অক্ষমতায় এসে যাওয়াই প্রাপ্তি। কিছুদিন পর্যন্ত বিষয়টি খাঁটি অজ্ঞতার সাথে নিবদ্ধ থাকে এবং তানযিয়াহ মূলত এই বিষয়ের সাথেই সম্পর্কিত এবং উসূল (উপনীত হওয়া) থেকে অধিক নিকটবর্তী। সাধনা করো যেনো জহল (অজ্ঞতা) থেকে এই হাল, এলেমের মধ্যে

অবতরণ না করে। জাহের ও বাতেন এ ক্ষেত্রে একত্রিত হয়ে যায়। তবে হ্যাঁ, নুযূলের (অবতরণের) পরে এলেম, জহুল (অজ্ঞতা) থেকে উত্তম হয়ে থাকে। উরুজের (ঊর্ধ্বারোহণের) ক্ষেত্রে এর বিপরীত। তোমার বর্ণিত হাল উরুজের, নুযূলের নয়।

একবার এক চিঠিতে লিখলাম, হজরত সালাম! বিভিন্ন পদ্ধতিতে গায়েবী বিষয়াবলী প্রকাশিত হয়েই চলেছে। কখনো গায়েব থেকে কানে আওয়াজ আসে— হে উমুক! ঘটনা এরূপ। কখনো আরবিতে, ফারসিতে কখনো বা হিন্দিতে আবার কখনো অপ্রচলিত ভাবধারায়, যার ভাষা বুঝতে পারি না এবং হক তায়ালাকে অনুরূপ গায়েবুল গায়েব পেতাম। কথোপকথোনকারীদের বাক্যের মতো পেতাম না। বরং কখনো আমি প্রকাশ্যে বুঝতাম যে, এ কথার সম্পর্ক মহান আল্লাহ্র সঙ্গে। কিন্তু সম্পর্কের প্রকৃতি আমার বোধগম্য হতো না। এর বহিঃপ্রকাশের দিকও আমি উপলব্ধি করতে পারতাম না। কখনো এরূপ হয় যে, আমি কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করে তার উত্তরের অপেক্ষায় থাকতাম। হঠাৎ তার বাস্ত বতা দেখতে পেতাম। যেমন এই আবেগময় বান্দা ও ফকির যখন এসমে কারীম (আল্লাহ্র নাম) এর মাধ্যমে কোনো বিষয় জানার ফরিয়াদ করতাম, তখন এসমে কারীম তার উত্তর দিতেন। ফকির বিষয়টিকে পর্যবেক্ষণ করতো এবং এই এসেমের উত্তরে পূর্ণ বিশ্বাস অর্জিত হতো। কখনো এমন হতো যে, কোনো কাজ করবো কি করবো না— এ বিষয়ে জানতে চাইতাম। তখন অন্তরের স্বস্তি ও গতির দিকে লক্ষ্য করে সেই অনুযায়ী নির্দেশ দিতাম। কখনো দৃশ্যমান হতো— কোন কাজটি হবে এবং কোন কাজটি হবে না। যেমন কখনো কোনো সুস্থ ব্যক্তিকে রোগগ্রস্ত দেখতাম। আবার কাউকে মৃত ব্যক্তির আকৃতিতে দেখতাম। অথবা কোনো ব্যক্তি সফরে আছে তার হায়াত ও মউত সম্পর্কে জানতে ইচ্ছা করলে তার দিকে মনোনিবেশ করতাম। যদি তার স্বরূপ দেহবিশিষ্ট লোকদের মতো দেখতাম তাহলে বুঝে নিতাম সে জীবিত আছে। আর তার অবস্থা আত্মা বেশে দেখতে পেলে বুঝতাম সে মৃত। আবার কখনো আলম (জগত) কে যেমন সে বহিরাংশে রয়েছে তা নিজের বাতেনে অনুভব করতাম। অর্থাৎ জমিন ও আসমানের সকল পথ এবং বাজার— সাধারণ ও অসাধারণের কোলাহল আমার বাতেনে অনুভব করতাম। এভাবে কারো হায়াত ও মউতের সময় অবগত হওয়াও সহজ হয়ে গিয়েছে। এমনকি যদি মনে করতাম, কোনো মানুষের অন্তরের খবর জানবো, তাহলেও জানতে পারতাম। এমন স্বচ্ছতা অর্জিত হয়েছিলো যে, অজ্ঞাত বিষয়ও জানা হয়ে যেতো। হজরতের হালকা জিকিরের মধ্যে তাঁকে দেখি। কেমন যেনো তিনি এই জ্ঞানহীনের বক্ষে জ্যোতি ঢেলে দিচ্ছেন। পরোক্ষে ও অচেতনতায়ও হজরতের গতিবিধি ও তাঁর ইচ্ছার বিষয়ও অবগত হয়ে যেতাম। এই অবগতি কখনো ভুলে পর্যবসিত হতো না।

ঘটনা— আমি দেখলাম, মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছে রসুলে আনওয়ার স. এর রওজা মোবারকের কাছে উপস্থিত হলাম। দেখলাম, খুবই উচ্চ কারুকার্যখচিত একটি গম্বুজ। অনেক লোক যাতায়াত করছে। রওজা মোবারক ফেরেশতাগণের সমাবেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত। আমিও হাজির হলাম। আমি রসুলেপাক স. এর রওজা আতহার দেখলাম এবং চুম্বন করলাম। উটের কুহান (পিঠের উঁচু হাড় বা কুঁজ) সদৃশ এবং মাটি থেকে এক হাত উঁচু। আমার খেয়াল হলো, রসুলুল্লাহ স. এর কবরের গম্ভুজের মধ্যে তো হজরত আবু বকর সিদ্দীক রা. এর কবরও রয়েছে। কিন্তু কোনো কবর তো দেখা যাচ্ছে না। ভাবলাম, মাটির নিচে থাকতে পারে। আমি কোদাল এনে মাটি সরিয়ে দেবো কি না চিন্তা করলাম, যেনো কবর দৃশ্যমান হয়। আমি তাঁর স. রওজা বরাবর খনন করতে শুরু করলাম। কিন্তু কোনো কবর দেখা গেলো না। আমি মনে মনে ভাবলাম, আদব রক্ষার খাতিরে ওই কবর হয়তো একটু নিচে খনন করতে হবে। আমি তখন আনুমানিক আরো এক হাত নিচে থেকে খনন শুরু করলাম। কবর বের হলো। আমি তা সমান করলাম। ডান-বামের মাটি সরালাম। তখন কবর যেমন হয়ে থাকে তেমনই বের হলো। আমি তা ঠিক করে দিলাম। এর পর খেয়াল হলো, হজরত ওমর রা. এর কবরও তো এখানে— হজরত আবু বকর রা. এর কবরের পাশে। আমি সেখানেও কিছু মাটি খনন করলাম। কিন্তু কোনো কবর দেখলাম না। ধারণা করলাম, হয়তো বা হজরত আবু বকর রা. এর প্রতি আদবপ্রদর্শন স্বরূপ এ কবর আরো কিছু নিচে বানানো হয়েছে। আমি আনুমানিক আরো দু'হাত নিচে থেকে কবর খনন শুরু করলাম এবং মাথার দিক থেকে মাটি সরিয়ে ফেললাম। তখন কবর দেখা গেলো। এমন সময় মুয়াজ্জিন ফজরের আজান দিলেন। আমি নামাজে চলে গেলাম। ভাবলাম, নামাজের পরে সম্পূর্ণ কবর উন্মোচন করবো। কিন্তু ইতোমধ্যে জেগে উঠলাম।

ঘটনা— দেখলাম, রসুলুল্লাহ স. এই ফকিরের মসজিদে উপস্থিত হয়ে কেবলার দিকে পিঠ ফিরিয়ে দুই হাঁটুতে হাত রেখে বসে আছেন। আমি বাহির থেকে মসজিদের ভিতরে অত্যন্ত আবেগপ্রবণ অবস্থায় তাঁর স. এর কদমে পতিত হলাম। তারপর উঠলাম এবং দোয়া করার মতো দুই হাত উত্তোলন করে বিনয়ের সাথে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি আমাকে কিছু শুভসমাচার দান করুন। তিনি স. এই আয়াত পড়লেন 'সুবহানাল্লাযী আসরা বি আবদিহী লাইলাম্ ...... শেষ পর্যন্ত। তারপর বললেন, তোমার ঘরে পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করবে। এই ঘটনার দশমাস পর আমার একটি পুত্রসন্তান হলো। আমি তার নাম রাখলাম মোহাম্মদ আরিফ। তারপর প্রতি বারই পুত্রসন্তান হয়েছে। রসুলুল্লাহ স. এর সুসংবাদের কারণে আল্লাহ্‌পাক আমাকে সাতটি পুত্রসন্তান দান করেছেন।

ঘটনা— আমি দেখলাম, রসুলে আনওয়ার স. হিন্দুস্তান জয় করার জন্য সেনাবাহিনীসহ আগমন করেছেন এবং মুলতানের পথে আগমন করে সেরহিন্দ অঞ্চল পর্যন্ত কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। আরো সামনে অগ্রসর হওয়ার ইচ্ছা করলেন। হজরত স. দুই মখদুমজাদাকে অর্থাৎ খাজা মোহাম্মদ সাঈদ ও খাজা মোহাম্মদ মাসুমকে সেনানায়ক বানালেন। এ সকল বিষয়ের চিন্তা-ভাবনা ও সিদ্ধান্ত এই দু'জনের উপরেই ছেড়ে দিলেন। আর এই নগণ্যকে সেনামোতায়নের দায়িত্ব প্রদান করা হলো। সেনাবাহিনী যেনো যথাযথভাবে পরিচালিত হয়। অগ্রাভিযানে যেনো শৈথিল্য না আসে। হজরত মোজাদ্দেদ র. সেরহিন্দ থেকে বাইরে আগমন করলেন। শহর থেকে দুই তিন ক্রোশ দূরে আকবরাবাদের দিকে অগ্রসর হলেন। থামলেন। ভোর হলো। হজরত মোজাদ্দেদ র. ঘোড়ার উপরে আরোহণ করে রওয়ানা হলেন। নিক্ষিপ্ত তীরের দূরত্ব পরিমাণ বা তার থেকে কম পথ অগ্রসর হয়ে দু'পুত্রের অপেক্ষায় থেমে গেলেন। আমিও অত্যন্ত চিন্তা-ভাবনার মধ্যে ছিলাম। ভাবলাম, যেনো সাহেবজাদাগণ দ্রুত সওয়ার হয়ে যান, কেনোনা হজরত তাঁদের জন্য অপেক্ষমাণ। আমি অন্যান্য সেনাদেরকেও সমবেত করার চেষ্টা করছিলাম। সাহেবজাদাগণকে বলছিলাম, রসুলে আনওয়ার স. বাহনারোহী হয়ে আগমন করেছেন। তা হলে আপনারা কি কিছু দূর পর্যন্ত তাঁর স. এর সাথে পদব্রজে চলবেন? যদি তা আপনাদের পক্ষে সম্ভব না হয়, তাহলে আপনারা আমাকে অনুমতি দিন। তাহলে আমি তাঁর স. এর সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারবো। এমন সময় এক লোক বললো, কূপের কাছে ভবনের দরজা থেকে রসুলুল্লাহ স. এর ভুবনমোহিনী সৌন্দর্য দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে। দ্রুত সওয়ার হও। তাঁর স. দরবারে উপস্থিত হতে হবে। আমি ওই দরজার নিকটবর্তী হলাম। তাঁর স. অনুপম দীদার নসীব হলো। এই সৌন্দর্যের সামনে সূর্যও লজ্জিত হয়। নিষ্প্রভ ও বিবর্ণ হয়ে যায়। আর হজরত মোজাদ্দেদ র. এর শাদা রঙ, কালোচুল এবং জ্যোতির্ময় চেহারাবিশিষ্ট উন্মুক্ত ময়দানে একটি আসনে উপবিষ্ট রয়েছেন। মূলার মতো ফল নিজ হাতে পরিষ্কার করে টুকরো টুকরো করে খাচ্ছেন। সৈনিকরা তাঁর সামনে সারিবদ্ধভাবে মাটিতে বসে আছে। তাঁর পবিত্র সৌন্দর্য দেখে আনন্দিত ও বিমোহিত হলাম। অকস্মাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠলাম। দীর্ঘসময় পর্যন্ত আমার অন্তরে অভূতপূর্ব ঘটনাবলীর স্বাদ প্রবহমান রইলো।

ঘটনা— আমি দেখলাম, সরোয়ারে কায়েনাত সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নগণ্যের ঘরে আগমন করে মহানুভবতা প্রদর্শন করলেন। দেখলাম, তিনি স. সুদৃশ্য আসনে উপবিষ্ট। আমি একটি খেজুরের পাটিতে বসলাম। তখন বাহির থেকে দেয়াল ভেদ করে প্রবেশ করলেন হজরত গউছুছ্ ছাকালাইন। ভিতরে তিনি

অত্যন্ত বিনীতভাবে রসুলে আকদাস স. এর হাঁটুর সম্মুখে শ্রদ্ধাবনত হলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি তো শুনেছেন, এই যুবক কী বলছে (আমার দিকে ইশারা করলেন)। এ কথাটি ছিলো মনোরঞ্জনমূলক ও উপদেশের। রাগ বা অভিযোগের নয়। ভয় ও ভক্তির মধ্য দিয়ে আমার নিদ্রাভঙ্গ হলো। আমি তওবা ও ক্ষমাপ্রার্থনা করলাম। তাঁর অনুযোগের কারণ আমি জানতে পারিনি। অবশ্য এতোটুকু বুঝতে পেরেছি যে, ওই রাতে দুটি ঘটনা ঘটেছিলো। একটি হচ্ছে— আমি মখদুমজাদা খাজা মোহাম্মদ সাঈদকে বলেছিলাম, সকল ক্ষেত্রে রসুলে পাক স. এর অনুসরণ হয়তো সম্ভব, কিন্তু সকলের ক্ষেত্রে নৈকট্য লাভ কী সহজ? নৈকট্যের বিষয়টি কীভাবে জানা যাবে? দ্বিতীয়তঃ এক ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলো কবর এমনভাবে খনন করা হয়, যেনো বসতে না পারে। অথচ রসুলুল্লাহ স. বলেছেন, মৃত ব্যক্তিকে কবরে বসানো হবে। আমি ওই ব্যক্তিকে বলেছিলাম, বসানোটা হবে রূপক অর্থে, দৈহিক পদ্ধতিতে নয়। আমি দু'টি বিষয় থেকে তওবা করলাম।

ঘটনা— দেখলাম, একটি গভীর প্রবহমান ঝর্ণা। চারপাশে সুসজ্জিত ফুলবাগান। সেখানে এক বিশাল সৌন্দর্যময় অট্টালিকা। আফজালুল আম্বিয়া মোহাম্মদুর রসূলুল্লাহ স. আগমন করলেন। এ নগণ্য সেখানে উপবিষ্ট ছিলো। সেখানে বালতি থেকে পানি পড়ছিলো। এক ব্যক্তি আমার সামনে হাদিস পড়ছিলো। আমি একটি দুর্বোধ্য শব্দের অর্থ অনুধাবনে অক্ষম হয়েছিলাম। এমন সময় রসুলেপাক স. ওই অট্টালিকা থেকে বাগানে বের হয়ে এলেন এবং দুর্বোধ্য শব্দটির অর্থ বুঝিয়ে দিলেন। এরপর তিনি বাগানের প্রধান প্রবেশদ্বারের দিকে গেলেন। এই নগণ্যও তাঁর অনুগামী হলো। তিনি স. হাদিসটি সম্পূর্ণ বললেন। আমি তা মুখস্থ করে নিলাম। পরে লিখতে গিয়ে ভুলে গিয়েছি।

ঘটনা— দূরদূরান্ত সফর শেষে ফিরছিলাম। ছিলাম অশ্বারোহী। আমার পিতাও আমার সাথে ছিলেন। আমার সালেকবৃন্দ, যারা মাজযুব প্রকৃতির তাদের একদলও আমার সাথী ছিলো। তাদের নাম আমার স্মরণে আছে। তারপর আমি নামাজ আদায়ের লক্ষ্যে ঘোড়া থেকে অবতরণ করে এক বহমান হ্রদের পাশে গিয়ে ওজু করলাম। পানি পান করলাম। যখন সেখান থেকে ফিরলাম, তখন আমার অভ্যন্তরে আওয়াজ হলো। সেই আওয়াজের কথা আমার বন্ধুদেরকেও হুবহু শুনিয়ে দিলাম। মহান আল্লাহ্ আমাকে বলেছেন, আমি তোমাদের সকলকে মাফ করে দিলাম।

ঘটনা— এক রাতে আমি স্বপ্নযোগে দেখলাম, এই চাকচিক্যময় শহরের মধ্যে এক বিশাল প্রাসাদ, যার মধ্যে উঁচু প্রাঙ্গণ রয়েছে। হজরত মোজাদ্দেদ র. এলেন। আমি তাঁর খেদমতে উপস্থিত হলাম। এক দরবেশ বাইরে থেকে এসে বললেন,

হজরত খিজির আ. দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। আপনাকে ডাকছেন। আমি হজরত মোজাদ্দেদ র. এর অনুমতি নিয়ে বাইরে গেলাম। দেখলাম, হজরত খিজির আ. যুবকের আকৃতিতে দণ্ডায়মান। মিষ্টভাষী, সুদর্শন, শাদা রঙ, জ্যোতির্ময় চেহারা। সালাম দিলাম। আমাকে দেখে তিনি রওয়ানা হলেন। আমি তাঁর পিছনে পিছনে চললাম। তিনি শহরের অলিতে গলিতে ঘুরলেন। আমি নিবেদন করলাম, আপনি আপনার নেসবত থেকে আমাকে সুসজ্জিত করুন। তিনি বললেন, তুমি এমন এক মহান ব্যক্তিত্বের নেসবত পেয়েছো, যা তোমার এবং গোটা বিশ্বাবাসীর জন্য সরল পথনির্দেশের সনদপ্রাপ্ত। খিজির আ. পথ চলতে চলতে হজরত মোজাদ্দেদ র. এর দরজার দিকে ফিরে এলেন। এমন সময় অনিচ্ছাকৃতভাবে হজরত মোজাদ্দেদ র. নিজ ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। আমি নিবেদন করলাম, আমার হজরতের সাথে সাক্ষাৎ করুন। হজরত খিজির আ. সম্মুখে অগ্রসর হলেন। কিছু দূর এগিয়ে হজরত মোজাদ্দেদ র. এর সাথে করমর্দনপূর্বক কোলাকুলি করলেন। বললেন, আপনি কুতুব। অতঃপর দু'জনই দু'জনের কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

ঘটনা— হজরত মোজাদ্দেদ র. এর ইন্তেকালের পর আমি স্বপ্নে দেখলাম, তিনি এক অতি উচ্চ ও প্রশস্ত প্রাসাদে অবস্থান করছেন, যার দৈর্ঘ্য প্রায় এক ক্রোশ। প্রাসাদটি জান্নাত সদৃশ। এই নগণ্য ওই প্রাসাদের একটি ছোট্ট কুঠুরির মধ্যে ছিলো। প্রাসাদ থেকে অনেক দূরে আরেকটি ভবন ছিলো। তার মধ্যে আরো অনেক কক্ষ ছিলো। বলা হলো, এগুলো দোজখ। আমার খেয়াল হলো অল্প সময়ের জন্য ওই ঘরগুলো দেখে আসি। দেখি কোন শ্রেণীর লোকেরা দোজখের মধ্যে আছে। আমি দু' তিনটি কক্ষ অতিক্রম করে ওই কক্ষের মধ্যে পৌঁছলাম, যে কক্ষটির দরজা বন্ধ এবং তার সামনে এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান। আমি তাকে বললাম, দোজখবাসীদেরকে একটু দেখতে চাই। ওই ব্যক্তি বললো, যে দিন হজরত মোজাদ্দেদ র. ইন্তেকাল করেছেন এবং জান্নাতের সুমহান স্তরে প্রবেশ করেছেন, আল্লাহ্‌র নির্দেশে সে দিন থেকে দোজখের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। দোজখকে ঠাণ্ডা করে দেওয়া হয়েছে। এখন হজরতের জিম্মাদারীর মধ্য থেকে কোনো লোক দোজখে প্রবেশ করে না। আমি ফিরে এলাম। হজরতের খেদমতে এসে বিষয়টি খুলে বললাম। তিনি বললেন, দোজখের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা ঠিকই বলেছে। মহান আল্লাহ্‌র বড়ই দয়া যে, তিনি আমাদেরকে হজরতের মুরিদ বানিয়েছেন।

দরজাহ ঃ হজরত মোজাদ্দেদ র. দীর্ঘকাল ধরে পশমী কাপড়ের একটি মুসল্লার উপরে নামাজ আদায় করতেন। হজরত ইমাম মালেকের মাযহাবে পশমী বস্ত্রের উপর নামাজ পড়া বা সেজদা করা মাকরুহ। হজরত মোজাদ্দেদ র. এর তরিকা ছিলো সকল মাযহাবের সমন্বয়। তাই তিনি সেজদার স্থানে এক টুকরা চট বিছিয়ে নিয়েছিলেন। তিনি ওই টুকরার উপরে সেজদা করতেন। যখন টুকরাটি ময়লা হয়ে

গেলো, তখন খাদেম ওই টুকরাটি সরিয়ে দিয়ে পৃথক একটি টুকরা সেখানে বিছিয়ে দিলেন। আমি ওই সরিয়ে রাখা বরকতপূর্ণ টুকরাটি নিজের পাগড়ীর মধ্যে রেখে দিলাম। ভাবলাম, বাড়িতে গিয়ে একটি সুন্দর স্থানে সযত্নে সংরক্ষণ করবো। রাত হয়ে গেলো। এই নগণ্য এশা নামাজ পড়ে শুয়ে পড়লো। ওই টুকরাটি রয়ে গেলো পাগড়ীর মধ্যেই। হজরতের কারামত ও বুজর্গীর অবদানে ওই রাতে আমি রসুলে পাক স. কে বারো বার অথবা তার থেকে বেশী বার স্বপ্নে দেখলাম। প্রত্যেক বারই আমি জেগে উঠতাম। তারপর আবার শুয়ে পড়তাম।

দরজাহ ঃ এই গ্রন্থ 'হাজ্রাতুল কুদুস' রচনার সময়কাল জমাদিউল আউয়াল মাসের নবম তারিখে স্বপ্নে দেখলাম, একটি সুসজ্জিত বাগান যার তোরণ খুবই উঁচু। আমি হজরতকে ওই বাগানের মধ্যে শাহী আসনে উপবিষ্ট দেখলাম। আরো দু'তিন জনকে তাঁর পাশে একই বিছানায় উপবিষ্ট দেখলাম। তোরণের সামনে দু'দিকে যতদূর দৃষ্টি যায়, আউলিয়া কেরাম অত্যন্ত আদবের সঙ্গে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। সকলেই নাভির উপরে হাত বাঁধা। মস্তক অবনত। তাঁদের দণ্ডায়মানতার আদব এমন ছিলো যে, মনে হচ্ছিলো, যেনো তাদের দেহ প্রাণশূন্য। এ ফকির হজরতের দরবারে উপস্থিত ছিলো। কখনো ভিতরে যাচ্ছিলাম, কখনো বাইরে আসছিলাম। লোকেরা যে হাদিয়া ও উপঢৌকন নিয়ে আসছিল, তা হজরতের সামনে উপস্থিত করে ব্যবহারের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাছে দিয়ে দিচ্ছিলাম। ওই মজলিসে হজরত আমাকে ঊনিশটি রুপিয়া (মুদ্রা) উপঢৌকন দিলেন।

দরজাহ ঃ দেখলাম, হজরত মোজাদ্দেদ কুতুবিয়াতের আসনে উপবিষ্ট। তাঁর মোবারক হাতে কাগজের টুকরা রয়েছে। সেখানে তিনি লিখেছেন, ওমুক ব্যক্তিকে কবুল করা হয়েছে। এর উপর সীল লাগিয়েও দিচ্ছিলেন। তারপর এ নগণ্যকে বললেন, কাগজের টুকরায় যার নামে রয়েছে, তাকে পৌঁছে দাও। সর্বপ্রথম টুকরাটি বিশেষভাবে লিখে স্বাক্ষর করলেন। লেখা ছিলো 'বদরুদ্দীনকে কবুল করা হয়েছে'। অতঃপর তাতে সীল লাগিয়ে নিতান্তই অনুগ্রহ ও মেহেরবানী করে আমার কাছে দিলেন। আমি বিনয়াবনত হয়ে তাঁর পবিত্র হাত থেকে কাগজটি নিয়ে পাগড়ীর মধ্যে রাখলাম। এরপর আরেকটি কাগজে সীল লাগিয়ে আমাকে দিলেন। সেখানে লেখা ছিলো 'আমানউল্লাহকে কবুল করা হয়েছে'। তাঁর কাছে এটি পৌঁছে দাও। তিনি বড় আলেম ছিলেন এবং আমার প্রবীণ সহপাঠিও ছিলেন। ছিলেন হজরতের বিশিষ্ট মুরিদ। এভাবে কাগজের উপর নাম লিখে সীল লাগিয়ে আমার কাছে একটি একটি করে দিচ্ছিলেন। কাগজগুলোতে লেখা ছিলো— ওমুককে কবুল করা হয়েছে। আমি ওই কাগজের টুকরা প্রত্যেকের

কাছে পৌঁছে দিচ্ছিলাম। ‘ইল্লা মাশাআল্লাহ্’। ওই সময় আমার এমন মনে হয়েছিলো যে, ওই সময়ের গোটা বিশ্বের প্রত্যেকটি মানুষকে কবুল হওয়া বা না হওয়া সম্পূর্ণরূপেই হজরতের ইচ্ছার উপরেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিলো। আর এই নগণ্য ছিলেন তাঁর পেশকার বা উপস্থাপক।

দরজাহ ঃ একরাতে আমাকে স্বপ্নে দেখানো হলো, হজরত মোজাদ্দেদ র. তাঁর পবিত্র রওজার সামনে উপবিষ্ট। তাঁর সামনে তাঁর মুরিদগণ ও ভক্তবৃন্দ রয়েছেন। অল্পকিছু পরে দেখলাম, সরওয়ারে কায়েনাত স. আর সাহাবা কেরাম রা. এবং আম্বিয়া আ.গণ তাঁর সামনে উপবিষ্ট। এমন সময় দেখলাম, হজরত জিব্রাইল আ. আসমান থেকে নিচে অবতরণ করে রসুলে আনওয়ার স. কে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সালাম দিলেন। একটু দূরে গিয়ে দুই হাঁটু উঁচু করে বসে পড়লেন। আমার নিকটবর্তী সাহাবীগণকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, জিব্রাইলের অবতরণ তো বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তিনি কী জন্য এলেন। তাঁরা বললেন, তোমার কী জানা নেই, জিব্রাইল তো সর্বদাই তাঁর স. এর কাছে খোরদাহ খাদ্য গ্রহণের জন্য আসেন।

কুদসিয়্যাহ্ ঃ হজরত মোজাদ্দেদ র. এর চিরাচরিত অভ্যাস ছিলো, প্রতি রমজান মাসে তিনি তিন খতম কোরআন পাক শুনতেন। যদিও বার্ধক্যজনিত কারণে তাঁর শরীর যথেষ্ট দুর্বল ছিলো। সাধারণ লোকদের খুবই কষ্ট হয়ে যেতো। অনেকের তন্দ্রা এসে যেতো। কিন্তু পাক কোরআন শ্রবণের সময় কখনই তাঁর তন্দ্রা আসতো না। এই নগণ্য নিবেদন করলো, হজরত সালাম! লোকেরা তো তারাবীর সময় তন্দ্রামগ্ন হয়ে যায়। আপনার মধ্যে তো কখনো এরূপ অবস্থা দেখিনি। এটা তো আপনার কারামত। তিনি বললেন, সমুদ্রে ভাসমান অবস্থায় উদাসীনতার কোনো প্রশ্নই আসে না। সে তো টেনে হিঁচড়ে তার দিকেই নিয়ে যায়।

কুদসিয়্যাহ্ ঃ একদিন হজরত মোজাদ্দেদ র. তাঁর বড় বড় খলিফাদের কাছে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের সিলসিলার বুজর্গদের মুখে ‘নেসবত’ শব্দটি অধিক ব্যবহৃত হয়। কারণ কী? আমরা বললাম, হজরত বিষয়টি যদি আমাদেরকে বুঝিয়ে দিতেন। তিনি কিছুক্ষণ মৌনতা অবলম্বন করলেন। তারপর বললেন, ‘নেসবত’ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে সম্পর্ক। যে সম্পর্ক সালেক এবং হক সুবহানুহুর মধ্যে হয়ে থাকে।

একবার হজরতের এক বিশেষ মুরিদ আমার উপস্থিতিতে জিজ্ঞেস করলেন, এর কারণ কী যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর জিকির নাভিমূল থেকে শুরু করা হয় এবং এর মাদ্দ (দীর্ঘটান) কে সের লতিফা পর্যন্ত নিয়ে যেতে হয়। তারপর সোজা কাঁধ পর্যন্ত নিয়ে কলবের উপরে আঘাত করা হয়। তিনি কিছুক্ষণ মৌন থেকে বললেন, এ অবস্থায় ‘লা’ এর নকশা প্রস্তুত হয়ে যায়। তারপর তিনি যা বুঝালেন তাই বুঝলাম।

কুদসিয়্যাহ্ ঃ একবার এই ফকির হজরত মোজাদ্দেদ র. কে জিজ্ঞেস করলেন, হাদিসে এসেছে, রসুলুল্লাহ স. নামাজকে পরিপূর্ণভাবে এবং ব্যস্ততার সাথে আদায় করতেন। নামাজ আদায়ের মধ্যে কোনো আদব বাদ পড়তো না। এটা কী করে সম্ভব? তিনি বললেন, লোকেরা নামাজের মধ্যে অধিক অপ্রয়োজনীয় বিলম্ব করে। যদি নামাজের আরকান ও আদবের মধ্যে আপাদমস্তক নিয়োজিত থাকে এবং অহেতুক মন্থরগতিসম্পন্ন না হয়, তাহলে তার নামাজ দ্রুত হবে। পরিপূর্ণভাবে আদায় হয়ে যাবে।

কুদসিয়্যাহ্ ঃ একবার আমি হজরত মোজাদ্দেদ র. এর পবিত্র মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। তিনি বললেন, শরীয়তের পরিভাষায় নামাজের মধ্যে হুজুরে কলব আবশ্যিক বলা হয়নি। রসুলে আনওয়ার স. খুশু, খুজু বিষয়ে যা বলেছেন, তা হলো— কিয়ামের সময় দৃষ্টি সেজদার স্থানে নিবদ্ধ রাখা, রুকুতে পায়ের পাতার উপর, সেজদার মধ্যে নাসিকার অগ্রভাগে এবং বৈঠকে বক্ষের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা— এর রহস্য হচ্ছে এই যে, অন্তরের একাগ্রতার জন্য দৃষ্টি বন্ধ রাখা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। যার চক্ষু বিক্ষিপ্ত না হয়, তার অন্তরও বিক্ষিপ্ত হয় না।

যেদিন এই ফকিরকে জিকিরের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, সে দিন বলা হয়েছিলো জিকিরের সময় চক্ষু বন্ধ রাখার বিশেষ প্রভাব রয়েছে। হজরত নকশবন্দিয়া কাদ্দাসাল্লাহু আসরারাহুম এ প্রসঙ্গে একটি হাদিসও উল্লেখ করেছিলেন। হাদিসটি তিনি পাঠও করেছিলেন। এক কবি অধিক আগ্রহে বলেছেন—

যদিও আছে আঁখি, তোমার পাহারাদার হলো দীল
পাহারাদারকে যেনো না নিয়ে যায়, সতর্ক রাখো খেয়াল।

কুদসিয়্যাহ্ ঃ একদিন হজরত মোজাদ্দেদ র. বললেন, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন, বিড়ালের সাথে বন্ধুত্ব ইমানের অন্তর্ভুক্ত। এই হাদিসটি লোকদেরকে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে দেয়। তারা বুঝতে পারে না, বিড়ালের সাথে ইমানের সম্পর্ক কী? তিনি স. তো তার সাথে বন্ধুত্বকেই ইমান বলে উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে পূর্ণ তাওয়াজ্জোহে লিপ্ত হয়ে জানা গেলো, লোকেরা বিড়ালের রোদনের আওয়াজকে অশুভ লক্ষণ বলে মনে করে এবং তাকে হতাশার কারণও মনে করে। তাই বিড়ালের সঙ্গে দুশমনী করে। তিনি স. বলেছেন, বিড়ালকে ভালোবাসা ইমানের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ যখন সে তাকে ভালোবাসবে, তখন তার রোদনের শব্দকে অশুভ মনে করবে না। তাকে নিরাশা বা হতাশাগ্রস্ত ভাববে না। এ ধরনের ফালনামা বের করা কুফরি। আর এটাকে ত্যাগ করাই ইমান।

কুদসিয়্যাহ্ ঃ একদা হজরত মোজাদ্দেদ র. উপদেশ প্রদানের উদ্দেশ্যে বললেন, এক খাদেমকে নাম না নিয়ে তার বন্ধু বৈঠকে বলেছিলেন, কলবের সাথে

মুকাল্লাবের (হকতায়ালার) এক বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। অন্য কোনো কিছুর সাথে সে ধরনের সম্পর্ক নেই। সে কলব কাফেরের হলেও। তাই কারো অন্তরে ব্যথা দিলে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্তায়ালাকেই কষ্ট দেওয়া হয়। কেনোনা এক প্রতিবেশিকে কষ্ট দিলে অন্য প্রতিবেশি পর্যন্ত পৌঁছায়।

কুদসিয়্যাহ্ ঃ হজরত মোজাদ্দেদ র. বলেছেন, নামাজের মধ্যে সুন্নত, মোস্ত াহাব ও আদবের অনুসরণও হুজুরী কলবের অন্তর্ভূত। কেনোনা এ সকল কিছু জিকিরের অন্তর্ভুক্ত। স্মরণ করা তাঁরই (হক তায়ালার) হুকুম। আর তাঁর প্রতি পূর্ণ মনোনিবেশ করাও তাঁর নির্দেশ।

কারামত ঃ এ নগণ্যের এলমে ক্বেরাত বিষয়ের এক পাণ্ডুলিপি হস্তগত হলো। চিন্তা করলাম, হজরতের এলমে ক্বেরাতের প্রতি অধিক আগ্রহ রয়েছে। ভাবলাম পাণ্ডুলিপিটি আমি তাঁর কাছে উপস্থাপন করবো। এ উদ্দেশ্যে আমি পাণ্ডুলিপিটি বুকে চেপে ধরে হজরতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। তিনি আমাকে দেখে বললেন, হাতে কী? বললাম, এলমে ক্বেরাত বিষয়ক একটি বই। আমি তাঁর নিকটবর্তী হলাম। তিনি আমার হাত থেকে বইটি নিয়ে পড়তে শুরু করলেন। জটিল বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করলেন। এরপর আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন, জাযাকাল্লাহু খায়রান (আল্লাহ্ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন)। তুমি উত্তম পুস্তক এনেছো।

আমি বললাম, হজরত সালাম! এ নগণ্য আপনার জন্যই এনেছে। তিনি আর কিছু বলার পূর্বেই পুস্তকটি গ্রহণ করলেন এবং তা তাঁর নিজ কক্ষের তাকের উপর রেখে দিলেন।

ফেরার সময় আমার মনে হলো এ পাণ্ডুলিপিটি সুন্দর, দুর্লভ ও উচ্চমানের। হজরত অধ্যয়নের সময় কোনো কোনো স্থানে দাগ দিয়ে চিহ্নিত করেছেন। যদি পাণ্ডুলিপিটি আমার কাছে থাকতো, অথবা যদি তার একটি অনুলিপি করে নিতে পারতাম, তাহলে খুবই উত্তম হতো। পরের দিন জোহরের নামাজের জন্য যখন হজরত হুজরার দরজা খুললেন, তখন এই নগণ্য তাঁর দরবারে উপস্থিত হলো। তিনি ওজু করছিলেন। আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আজ আমি কায়লুলা করার সময় দেখলাম, তুমি ওই পাণ্ডুলিপিটি আমার কাছ থেকে চাও। তাকের উপরে রয়েছে, নিয়ে যাও। আমার মধ্যে ভীতির সঞ্চার হলো। আমি বিব্রতকণ্ঠে বললাম, হজরত সালাম! ঘটনাটির ব্যাখ্যা এরকমও হতে পারে যে, এই অধম আপনার কাছ থেকে এলমে ক্বেরাত শিখতে চায়। তিনি বললেন, এরকম নয়। বিষয়টি ভিন্ন। তুমি তোমার অন্তরের দিকে তাকাও।

কারামত ঃ এ নগণ্য ফকির যখনই হজরত মোজাদ্দেদ র. এর জিকিরের মজলিসে বসতো তখন তাঁর চেহারা মনের পর্দায় ভেসে উঠতো। এভাবেই

জিকিরের মজলিস শেষ হয়ে যেতো। যখন দেখতাম হজরতের চেহারা আমার অন্তর থেকে অদৃশ্য হয়েছে, তখন চক্ষু খুলতাম। দেখতাম, হজরত উঠে গিয়েছেন, অথবা উঠতে উদ্যত হয়েছেন। ব্যাপারটির মধ্যে কোনো পার্থক্য বুঝতাম না। তিনি কখনোই বিচ্ছিন্ন হতেন না। সুবহানাল্লাহ!

কারামত ঃ এক রাতে স্বপ্ন দেখলাম, দুই ব্যক্তি আমার বুকের উপরে বসেছে। তাদের থেকে মুক্তি পাবার জন্য খুবই চেষ্টা করলাম। পারলাম না। এমন শক্তিও ছিলো না যে 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' পড়ি। অবশেষে খুব শক্তি প্রয়োগ করে তাদের হাত থেকে মুক্তি পেলাম। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় রাতেও এরূপ হলো। অবশেষে ভারাক্রান্ত মনে হজরত মোজাদ্দেদ র. এর পবিত্র মাজারের কাছে উপস্থিত হয়ে নিজের কষ্টের কথা স্মরণ করে ক্রন্দন করলাম। ফানার হাল প্রবল হলো। দেখলাম তিনি বলছেন, তোমার বাসভবনের ছাদের উপর দু'টি জিন বাস করে। যখন তুমি ঘুমাবে, তখন আমার দোহাই দিয়ে ঘুমিয়ে যেয়ো। রাতে শয্যাগ্রহণের সময় বললাম, হে জিনেরা! আমি তোমাদেরকে হজরত মোজাদ্দেদ র. এর দোহাই দিচ্ছি। নিদ্রায় বা জাগরণে তোমরা কখনো আমার কাছে এসো না। আমি ঘুমানোর পূর্বে নিয়মিত এই আমল করে আরামের সঙ্গে নিদ্রা যেতাম। আমার কাছে কোনো জিন আসতো না। এক রাতে অধিক নিদ্রামগ্নতার কারণে দোহাই দিতে ভুলে গেলাম। তন্দ্রা ও নিদ্রার মধ্যবর্তী অবস্থায় ছিলাম। এমন সময় দেখলাম, দু'জন লোক এসে আমার গলা চেপে ধরেছে। আমি ভয়ে জেগে উঠলাম এবং দোহাই দিলাম। তারপর থেকে আর কোনো জিন আমার কাছে আসেনি।

কারামত ঃ আমার পুত্র শায়েখ মোহাম্মদ আফজাল শিশুকালে অসুস্থ হয়ে গিয়েছিলো। দেহে প্রচণ্ড তাপ ছিলো। এর মধ্যে তার উপর দুষ্ট জ্বিনের আছর হলো। সে প্রলাপ বকতে শুরু করলো। এমন সময় আমি সেখানে পৌঁছে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কে? সে বললো, আমি পুরনামনাহ এর জ্বিন। তোমার ঘরের অমুক চুঙ্গির মধ্যে থাকি। আমি বললাম, তুমি কি আমাকে চেনো না, আমার পুত্রকে কষ্ট দিচ্ছো কেনো? আমরা তো হজরত মোজাদ্দেদ র. এর মুরিদ। সে বললো, আমি একটু আগে হজরত মোজাদ্দেদ র. এর রওজা আকদাস থেকে এসেছি। বললাম, তুমি চলে যাও, না হলে ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি পুনরায় হজরতের রওজায় গিয়ে পূর্ণ বৃত্তান্ত জানিয়ে দিলাম। মাজারে আকদাস থেকে আওয়াজ এলো, তুমি বাড়ি ফিরে যাও। তোমার পুত্র সুস্থ হয়ে গিয়েছে। সে পালিয়ে গিয়েছে। আমি খুশি মনে ঘরে ফিরে এসে দেখলাম, আমার স্নেহাস্পদ সন্তান সম্পূর্ণ সুস্থ।

কারামত ঃ মকতুবাত শরীফ তৃতীয় খণ্ড সংকলন সুসম্পন্ন হলো। এর পরেও হজরত কারো কারো কাছে দু' একটি চিঠি লিখতেন, তখন আমার মতো স্বল্প জ্ঞানের অধিকারীর মনে জাগ্রত হলো— যেমন প্রথম খণ্ড মাওলানা মোহাম্মদ

জাদীদ সংকলন করেছেন, দ্বিতীয় খণ্ড মাওলানা আবদুল হাই এবং তৃতীয় খণ্ড মোহাম্মদ হাশেম কাশমী র. তদ্রূপ আমি চতুর্থ খণ্ড সংকলন করবো। একদিন একাকী আমার ইচ্ছার কথা হজরতের কাছে ব্যক্ত করলাম। তিনি কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন, সময় কই, অবসরই বা কোথায়? প্রথমে তো এটাই বিশ্বাস করতে হবে যে জীবনের সময় এতটুকু বাকী আছে। জীবনের সময়কাল তো বছর থেকে দিনের মধ্যে এসে গিয়েছে। তোমার নিয়তের জন্য তুমি সওয়াব পেয়ে গিয়েছো।

এ কথা বলার কিছুদিন পরেই এই জগতসূর্য মাটির পর্দার মধ্যে নিজের মুখ লুকিয়ে নিলেন।

কারামত ঃ অনেক দিন আগের কথা। আমার পায়ে কুষ্ঠরোগের শাদা চিহ্ন দেখা দিলো। আমি বিশেষভাবে চিন্তিত হলাম। কখনো ধারণা হতে লাগলো যে, আমি দেশ ছেড়ে চলে যাই। আর কখনো ফিরে আসবো না। কখনো নিজের জীবন শেষ করে দিতেও ইচ্ছা হলো। একদিন ফজরের নামাজ শেষে হালকা থেকে অবসর হয়ে হজরত ভিতরে প্রবেশের উদ্দেশ্যে দরজার কাছে পৌঁছালেন। তখন আমি তাঁর কাছে গিয়ে আমার দুশ্চিন্তার কথা ব্যক্ত করলাম। ওই শাদা দাগও আমি হজরতকে দেখালাম। তিনি বললেন, এটা কোনো ব্যাপার নয়, তুমি চিন্তা কোরো না। ইনশাআল্লাহ্ ওই দাগ দূর হয়ে যাবে। হজরত আরো বললেন, তোমার মনের দুশ্চিন্তাও দূর হয়ে যাবে। হজরতের দেওয়া এই সুসংবাদের প্রেক্ষিতে আমার মনের দুশ্চিন্তাও দূর হয়ে গেলো। ওই দিন রাত পর্যন্ত ওই দাগ দেখা গেলো। কিন্তু সকালে ওই দাগের আর কোনো চিহ্ন পাওয়া গেলো না। আল্লাহ্পাকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম।

কারামত ঃ একবার হজরত মোজাদ্দেদ স্বীয় সম্মেলনকক্ষে আগমন করলেন। তাঁর সাথে মখদুমজাদা খাজা মোহাম্মদ সাঈদ এবং খাজা মোহাম্মদ মাসুমও উপস্থিত ছিলেন। তিনি ভিতর থেকে দরজায় শিকল লাগিয়ে তার উপর হাত রাখলেন যেনো ভিতরে কেউ প্রবেশ করতে না পারে এবং তিনি মখদুমজাদা আজম খাজা মোহাম্মদ সাদেক কুদ্দিসা সিররুহুর গম্বুজ মোবারকের মধ্যে কেবলার দিকে ফিরে বসে মারেফাত সম্পর্কে বর্ণনা করতে লাগলেন। এই নগণ্য এই গম্বুজের ভিন্ন প্রান্তে উপবিষ্ট ছিলো। হজরত আমাকে দেখেননি। আমি অত্যন্ত মনোযোগী হয়ে মারেফাতের বর্ণনা শুনছিলাম। খেয়াল হলো, কতোই না উত্তম হতো যদি হজরত আমাকে ভিতরে ডেকে নিয়ে যেতেন। তাঁর আলোচনা যখন এ পর্যন্ত পৌঁছালো যে, ফানাপ্রাপ্ত ব্যক্তির অন্তরে অন্য কোনো খেয়াল আসবে না, যদিও তার হায়াত নবী নূহের মতো দীর্ঘ করে দেওয়া হয়। অবশ্য ওই সময় আমার মনের অবস্থা এমন ছিলো যে, অন্তর থেকে অন্যসব কিছুর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু এ বিষয়ে আমি হজরতকে কিছু বলিনি। এমন সময়

হজরত এই মিসকীনের নাম ধরে ডাকলেন। বললাম, হাজির আছি। সঙ্গে সঙ্গে ওই খাস দরবারে উপস্থিত হলাম। তিনি বললেন, বসে পড়ো। তুমি আমার অন্তরঙ্গদের মধ্যে অন্যতম ও আমার পরিবারভুক্ত। একান্ত পরিবেশের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হও, যেনো এলেমের ফযীলত দ্বারা হালের মধ্যে এর সুফলপ্রাপ্তি সহজ হয়। আর তোমার মধ্যে তো এই হাল বিরাজমান। তোমার অন্তর তো কোনো বিপত্তি সৃষ্টি করে না। এবার বলো, পানাহার উঠা বসার খেয়ালের উৎস কোথায়? আমি উত্তরে বললাম, ছয় লতিফার মধ্যবর্তী যে দূরত্ব রয়েছে এ সকল খেয়াল সেখান থেকেই উৎপত্তি হয়। তিনি এ ফকিরের এ ধরনের উত্তরে খুবই সন্তুষ্ট হলেন। তারপর বললেন, আমার প্রতি যা কিছু প্রকাশ করা হয়েছে, তা হলো, এ সকল খেয়ালের উৎসস্থল হচ্ছে নফস। যার সম্পর্ক দেমাগ বা মস্তিষ্কের সংগে, অন্তরের সঙ্গে নয়।

কারামত ঃ প্লেগ মহামারী চলার সময়ে একরাতে আমার স্ত্রীর গলা ফুলে উঠে প্লেগের চিহ্ন দেখা দিলো। তাঁর শরীর প্রচণ্ড উত্তপ্ত ছিলো। আমি বিশেষভাবে চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে পড়লাম। কেনোনা আমার সন্তানেরা সকলেই ছোট। আমি ওই সময় অত্যন্ত বিনীতভাবে আহাজারী করে বাতেনী দিক দিয়ে হজরতের প্রতি বিশেষভাবে মনোনিবেশ করলাম। হজরত আগমন করে বললেন, উমুক স্থানে যে রুটি রয়েছে, তা সদকা করে দাও। ইনশাআল্লাহ্ তোমার স্ত্রী সুস্থ হয়ে যাবে। ইতোমধ্যে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমি আমার স্ত্রীর কাছে জিজ্ঞেস করলাম, ঘরে কি কোনো রুটি আছে? সে বললো, উমুক ঘরের উমুক স্থানে রুটি আছে। হজরত যেখানে ওই রুটির কথা বলেছিলেন, আমি সেখানেই ওই রুটি পেয়ে গেলাম। আমি ওই রাতেই রুটি নিয়ে বাহিরে বের হলাম। এক ভিক্ষুককে ঘুম থেকে জাগিয়ে রুটি দান করলাম। ভোর না হতেই আমার স্ত্রীর শরীরের প্রচণ্ড তাপ কমে গেলো। তার গলা ফুলাও আর রইলো না।

কারামত ঃ একবার এই ফকিরকে কিছু মুহরিম মহিলা এবং আমার বৃদ্ধ চাচা শায়েখ মোহাম্মদ, যিনি বার্ধক্যের কারণে হজরতের দরবারে যেতে অক্ষম ছিলেন, তাঁরা আমাকে হজরতের পদ্ধতিতে জিকির শিক্ষাদানের অনুরোধ করলেন। আমি বললাম, অনুমতি নেই। আমি হজরতের দরবারে অনুমতিপ্রাপ্তির নিবেদন করবো। যখন আমি হজরতের দরবারে বিষয়টি উপস্থাপন করলাম, তখন মহিলাদের কথাই শুধু বললাম, চাচার কথা ভুলে গেলাম। তিনি বললেন, ওই মহিলাদেরকে জিকিরের পদ্ধতি বলে দিয়ো। তোমার চাচাকেও। এ বিষয়ে তিনিই অধিক উদগ্রীব। তিনি আরো এক বৃদ্ধের কথা বললেন, যার সন্তান তাঁর পিতার বিষয়েও অনুরোধ করেছিলো। তুমি তার বাড়িতে গিয়ে তাঁকেও জিকিরের তরিকা শিক্ষা দিয়ো। এই ফকিরের অন্তরে এ বিষয়টির উদয় হলো যে, এই এজাযত শুধু এই কয়জনের জন্য, না সকলের জন্য। তিনি বললেন, তোমাকে সকলের জন্য এজাযত দেওয়া হলো, তুমি তো আমার পরিবারভুক্ত।

এরপর আমি ওই সকল মহিলা, আমার চাচা ও ওই বৃদ্ধকে জিকিরের তরিকা শিক্ষা দিলাম। পরে একদিন আমি হজরতের দরবারে যখন উপস্থিত হলাম, তখন তিনি আমাকে সকল বিষয় জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম, আমি তাদের সকলকে জিকির শিক্ষা দিয়েছি। তাঁদের প্রতি হজরতের তাওয়াজ্জোহ্ বিশেষভাবে কার্যকরী হয়েছে। তিনি বললেন, আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামিন। এছাড়াও আরো কিছু লোককেও আমি জিকিরের শিক্ষা দিয়েছি। তাঁদের একাগ্রতা ও গভীর মনোনিবেশ ও নিমগ্নতার কথাও হজরতকে বললাম। তিনি অত্যন্ত খুশি হলেন। বললেন, আমি তো এটাই চাই যে, তুমি মনোনিবেশপূর্বক আল্লাহ্র মখলুকের হেদায়েত করবে। কিন্তু তোমার পরিবারে সদস্যসংখ্যার আধিক্য তোমাকে ছাড়ে না।

ঘটনা— যে সময় আমি মহান আল্লাহ্র ইচ্ছায় আকবরাবাদ সফরে যাচ্ছিলাম, পথিমধ্যে পানিপথের বরকতপল্লীর এক সরাইখানায় অবস্থান গ্রহণ করলাম। জোহর নামাজ শেষে সরাইখানার পূর্ব প্রান্তের দরজা দিয়ে হজরত শায়েখ শরফুল হক ওয়ালেদাইন আবু আলী কলন্দর কুদ্দিসা সিররুহুর পবিত্র মাজার জিয়ারতের জন্য বের হলাম। আমার বন্ধুগণ আমার সাথে ছিলেন। সকলের মধ্যে জিয়ারতের বাসনা ছিলো। যখন মাজার মোবারকের দরজার দিকে কয়েক কদম অগ্রসর হলাম, তখন পিছন থেকে কোনো এক বুজর্গ আমার প্রতি ইঙ্গিত করলেন, আমার কাছে এসো। আমাকে জিয়ারত করো। এই স্থানের বেলায়েতের মালিক আমি। আমি আমার সঙ্গীদেরকে বিষয়টি জানালাম। সকলে আশ্চর্য হলো যে, শায়েখ আবু আলী কলন্দর র. এর উপস্থিতিতে বেলায়েতধারী আর কে হতে পারে? যা হোক আমরা পিছন ফিরে ওই ইঙ্গিত অনুসরণ করলাম। ডান পাশের দরজার নিকটবর্তী একটি মসজিদ দেখলাম। আমার মনে হলো, ইঙ্গিত এদিক থেকেই করা হয়েছে। আমরা ওই মসজিদের বেষ্টনীর মধ্যে প্রবেশ করলাম। মসজিদের সামনের প্রাঙ্গণে অনেকগুলো কবর রয়েছে। মসজিদের মধ্যে যে সকল লোক ছিলো তাদের কাছে জিজ্ঞেস করলাম, এ কবরসমূহের মধ্যে কি কোনো বুজর্গের কবর আছে? তাঁরা বললেন, হাঁ। খাজা শামসুদ্দীন তুরক র. যিনি এ অঞ্চলের বেলায়েতধারী ছিলেন, যিনি হজরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী কুদ্দিসা সিররুহুর সিলসিলার অন্যতম খলিফা ছিলেন। যখন খাজা সাহেব আল্লাহ্র হুকুমে ভারতবর্ষের মধ্যে আউলিয়াগণের দায়িত্ব বণ্টন করেছিলেন, তখন পানিপথের দায়িত্ব হজরত খাজা শামসুদ্দীন তুরক র. এর প্রতি ন্যস্ত করেছিলেন। তিনিই এখানে শায়িত আছেন। হজরত খাজা শামসুদ্দীন র. স্বীয় পীর-দস্তগীরের (মখদুম সাবের কালিয়ারী কুদ্দিসা সিররুহুর) নির্দেশে এখানে আগমন করেছিলেন। একথা শোনার পর কাশফের বিষয়টি সন্দেহাতীতভাবে সত্য বলে প্রমাণিত হলো। আমি হজরত খাজা শামসুদ্দীন র. এর মাজারের হুজরার মধ্যে প্রবেশ করলাম। সেখানে উপস্থিত হতেই ওই বুজর্গের

নূর বিকশিত হলো এবং আমার সমস্ত দেহে তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়লো। তাঁর নূরের প্লাবনে এই মিসকীনের জাহের-বাতেন সবই নূরান্বিত হয়ে গেলো। আনন্দধারায় অবগাহন করলাম। আমি কবর মোবারক চুম্বন করলাম এবং বিনায়বনতভাবে নতজানু হয়ে তাঁর কবরের সামনে বসে পড়লাম এবং জিকিরে লিপ্ত হলাম। প্রেমসমুদ্র থেকে সীমাহীন অনুগ্রহ প্রদর্শিত হলো। তিনি তাঁর বিশেষ অদৃশ্য নেসবত দিয়ে এই অধমকে ধন্য করলেন।

পরের দিন সেখান থেকে সামনে অগ্রসর হলাম। এমনকি আমরা জৌলুসপূর্ণ শহর দিল্লীতে পৌঁছে গেলাম। বাসনা ছিলো হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ কুদ্দিসা সিররুহুর দরবারে উপস্থিত হয়ে নিজেকে ধন্য করবো। বন্ধুদের কাছে শুনেছিলাম হজরত খাজার মাজার দিল্লী শহরে প্রবেশ করতেই সামনে পড়ে। এর পূর্বে কখনো সেখানে উপস্থিত হবার সুযোগ হয়নি। তাই তার সঠিক ঠিকানা জানা ছিলো না। আমার সাথীদেরও জানা ছিলো না। গাড়ীচালক ভুল করে গাড়ী ভিন্ন রাস্তার দিকে চালিয়ে দিলো। বললো, দিল্লী থেকে দু'মাইল দূরে আমার বাড়ী। রাতে সেখানে থেকে সকালে আমরা অন্যত্র গমন করবো। মনটা বিস্বাদ হয়ে গেলো। গাড়ীচালকের সাথে আমাদের ঝগড়া শুরু হলো। এমন সময় একটি রাস্তা দেখা গেলো যার দুধারে ছিলো বাগান। এ নগণ্যের প্রতি কাশফ হলো, হজরত বাকী বিল্লাহ কুদ্দিসা সিররুহুর মাজার এই রাস্তার ডান পাশের বাগিচার মধ্যে। বারংবার এলহামের মাধ্যমে তাগিদ হতে লাগলো। ভোরের আলো দেখা গেলো। আমি নির্ভিক চিত্তে আত্মহারা অবস্থায় গাড়ী থেকে লাফ দিয়ে নামলাম। বাগিচার দিকে রওয়ানা হলাম। সেখানে গিয়ে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, এই বাগিচার মধ্যেই তিনি শায়িত। এরপর তো আমার বাসনা-আবেগ হাজার গুণে বেড়ে গেলো। আমি দৌড়ে গিয়ে উচুঁ প্রাঙ্গণে পৌঁছে গেলাম। না জানা সত্ত্বেও কবরস্থানের কবরসমূহের মধ্যে হজরত খাজার কবরটি চিনে ফেললাম। এরপর খাদেমের কাছে জিজ্ঞেস করে আরো অধিক নিশ্চিত হলাম।

সুবহানাল্লাহ! ওই মাজার এমনই, যার থেকে আল্লাহ্প্রেমের বিরহ ও বিনয় প্রকাশিত হচ্ছে। আমি হজরত খাজার কদমের কাছে আদবের সঙ্গে বসে পড়লাম। আমার মধ্যে মত্ততার হাল জারি হলো। মত্ততা এমন প্রবল আকার ধারণ করলো যে, হাজারো হুঁশওয়ালা লোকের হুঁশ এর তুলনায় বিন্দুও নয়। আমার বিলাপ ও ক্রন্দনধ্বনি এমনভাবে প্রকাশিত হলো, যা হাজারো লোকের আনন্দের তুলনায় পরিমাপযোগ্যও নয়। এক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আমি আত্মহারা হয়ে রইলাম। এমন দুর্বিষহ অবস্থায় হজরত খাজা র. এর সাথে সাক্ষাৎ হলো। আমি তাঁর পদচুম্বন করলাম। তিনি আমার প্রতি পিতৃতুল্য স্নেহ, দয়া, মহানুভবতা প্রদর্শন করলেন। আমাকে তাঁর সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত করলেন। তাঁর নেসবতে খাস্সাহ (বিশেষ নেসবত) দ্বারা ধন্য করলেন। বললেন, আমার নেসবতে খাস্সাহ

হচ্ছে মায়িয়্যাতে হুব্বী (আমার ভালবাসার সঙ্গ)। এই নেসবত তোমার পীর খাজা মোহাম্মদ সাঈদ অদৃশ্যভাবে তাঁর গভীর মহব্বত ও আস্থার শক্তির দ্বারা আমার নিকট থেকে অর্জন করেছে। আমি আমার মধ্যে বিস্ময়কর আকর্ষণ অনুভব করলাম। আকারাতীত সত্তা থেকে আনুরূপ্যবিহীন ভালোবাসা আমার মধ্যে দেখতে পেলাম। এরপর আমি আমার পীরজাদাকে এ বিষয়ে বিস্তারিত লিখে জানালাম। তিনি প্রতিউত্তরে লিখলেন, সাধনা করো, যেনো মাহবুবে হাকিকী ব্যতীত অন্য কারো নাম নিশানাও বাসীরাতের সম্মুখে না থাকে। আমি চিন্তিত ছিলাম এজন্য যে, অন্যের প্রতি তো আমার দৃষ্টি ছিলো। আর স্বচ্ছ প্রেমের দাবী হচ্ছে এটা যে, কাঙ্ক্ষিতজন ব্যতীত অন্য সবকিছুকে ভুলে যেতে হবে। এ বিষয়ে চিন্তাক্লিষ্ট থাকাকালে এলহাম হলো, বিস্মৃতি বেলায়েতেরই অংশ। আর এ মায়িয়্যাতে হুব্বী তো ভিন্ন জিনিস। এতো নবুওয়াতের অংশ থেকে সংগৃহীত এবং 'ইউহিব্বুহুম ওয়া ইউহিব্বুনাহু' প্রেমের এই ঝর্ণাধারা নবুওয়াতের অংশের সাথেই সংশ্লিষ্ট এবং 'আল্লাহু মাআনা' এই মাকামেরই আহবান। বিস্মৃতির মাকাম, বেশ কিছুকাল অতীত হয়েছে যা আপনি আপনার শায়েখ থেকে অর্জন করেছিলেন। কিন্তু আপনি তা দূরে ফেলে দিয়েছেন। বাস্তব ঘটনাও ছিলো তাই। এরপর আমি হজরত খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী র. এর পবিত্র মাজারে গেলাম। তাঁর কবরের সামনে দাঁড়ালাম। আমার আপাদমস্তক ভেঙে আসছিলো। আবেগপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি হলো। আমি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে তা বরণ করে নিলাম। তাঁর মাজারের সামনে বসে মোরাকাবায় লিপ্ত হলাম। হজরত খাজা কুতুবুদ্দীন র. একটি আরবী ঘোড়ায় আরোহণ করে কবর থেকে বের হলেন এমন অবস্থায় যে, ঘোড়ার পিছনের অংশ কবরের মধ্যে ছিল এবং অগ্রভাগ ছিলো বাইরে। ঘোড়া খুব দ্রুত বেগে চালালেন। বললেন, যে নেসবতে হুব্বী খাজা বাকী বিল্লাহ র. তোমাকে দান করেছেন, তা আমার কাছ থেকেই নিয়ে দিয়েছেন। এই নেসবত আমারই নেসবত। তুমি অধিক যত্নসহকারে একে সংরক্ষণ করবে। তোমার নিজেকে আমারই মনে করবে এবং অন্যকে বলবে। এখন ফিরে যাও। নির্জন স্থানে গিয়ে বসো। লোকজনের আনাগোনা বন্ধ করো। তুমি এই সফরে যা অন্বেষণ করছো তা অবশ্যই পেয়ে যাবে। আমি বললাম, আমি যখন এসে পড়েছি, তখন একবার আকবরাবাদে যাবো। সেখান থেকে ফিরে এসে আপনি যে উপদেশ দিয়েছেন ইনশাল্লাহ্ তার উপর আমল করবো। তিনি বললেন, যাও। দ্রুত ফিরে এসো। এ কথা বলে আমাকে বিদায় দিলেন।

আমি বুঝতে পারলাম না, তার ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে বেরিয়ে আসা এবং ঘোড়া চালিয়ে এ পর্যন্ত আগমন করার কারণ কী! এরপর আমি হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ কুদ্দিসা সিররুহুর হুজরাখানাও দর্শন করলাম, যা হজরত খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী কুদ্দিসা সিররুহুর পবিত্র মাজারের খুবই নিকটবর্তী স্থানে, যেখানে

তিনি একাকী রাত্রি যাপন করতেন। অর্ধেক রাত পর্যন্ত হজরত খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী র. এর মাজারের পাশে অতিবাহিত করতেন। কিন্তু হজরত খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকীর কথায় আমার মধ্যে একটা চিন্তা ও বিস্ময় কাজ করছিলো— সম্ভবত ওই নেসবত যা তাঁর কাছ থেকে হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ লাভ করেছিলেন, তা চিশতিয়া সিলসিলার নেসবত। যদি তা-ই হয়, তা হলে তিনি কেনো বললেন না যে, এটা চিশতীয়া সিলসিলার নেসবত, নকশবন্দিয়া তরিকার নেসবত নয়। অন্তরের মধ্যে এ বিষয়টি সব সময়ই তোলপাড় করতে থাকলো।

এরপর আমি আকবরাবাদ পৌঁছলাম। যে কাজ ছিলো, তা সম্পাদন করলাম। ঘটনাক্রমে ওই সময় সম্রাট শাহজাহান শাবান মাসের শেষে হজরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী আজমীরীর মাজার জিয়ারতের জন্য গমন করলেন। এই ফকিরেরও সেখানে যাবার বাসনা প্রবল হলো। সুতরাং আমি সম্রাটের নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সেখানে রওয়ানা হলাম। মাজারে পৌঁছে জিয়ারতের জন্য গেলাম। ওই দরবার ছিলো যথার্থই শাহী দরবার। মাহাত্ম্যেও শাহী শান-শওকাতে পূর্ণ।

সম্রাটের আগমনীসংকেতের বাদ্য বাজানো হচ্ছে। নিরাপত্তাবাহিনীর আধিক্য এবং দর্শনার্থীদের ভিড়ের (যার মধ্যে আমীরগণসহ সম্রাটও ছিলেন) কারণে জিয়ারত করা কোনোক্রমেই সম্ভবপর ছিলো না। আমি ফিরে এসে এক ঘরে অবস্থান করলাম। ওই ঘরে একজন আমীরও অবস্থান করছিলেন, যিনি আমার বিশেষ ভক্ত ছিলেন। আমি তাঁকে মাজার জিয়ারতে উৎসাহিত করলাম। তিনি হজরত খাজা কুদ্দিসা সিররুহুর মাজারের খরচ বাবদ একশত মুদ্রা নিলেন যাতে জিয়ারত সহজতর হয়। আমি নিজেও তাঁর সাথে গেলাম। ওই আমীর সেখানে মুদ্রা বিতরণ শুরু করলেন। কিন্তু একশত মুদ্রা খুবই সামান্য। হাজার হাজার মুদ্রা দান করলেও সেখানে উপস্থিত হওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার। বিশাল জনজটলা। সকলেই মাজারের কাছে যেতে উদগ্রীব। কেউ ভিতরে আসে আবার কেউ বাইরে যায়। এভাবে জনতার বিপরীতমুখী স্রোতে সকলেই অতিষ্ঠ। ভিড়ের মধ্যে পড়ে কিছুসংখ্যক লোকের জীবনাশংকা দেখা দিলো। খাজা আজমীরী র. এর প্রতি গভীর আবেগ ও প্রবল ভালোবাসায় মানুষ এখানে হয়ে যায় প্রায়োন্মাদ।

'শুনেছি শুধু তব গুণগান দেখিবো কখন'?

আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করে মাজার মোবারকের গম্বুজের মধ্যে প্রবেশ করলাম এবং তাঁর মাজার স্পর্শ করার সুযোগ হলো। এমন সময় অন্তরে প্রশ্ন উত্থিত হলো, হে হজরত! আপনি এতো কোলাহলকে কেনো পছন্দ করলেন। আমার বিশ্বাস, আপনি পছন্দ না করলে কখনোই এতো ভিড় হতো না। তিনি বললেন, আমার ইজ্জত মানেই ইসলামের ইজ্জত।

এরপর আরেকবার জিয়ারতের সুযোগ হয়েছিলো। সম্পূর্ণ রাত মর্মর পাথরের তৈরী মসজিদ যা তাঁর মাজারের সামনে সেখানে অবস্থানের সুযোগ হয়েছিলো। শেষ রাতে একাকী তাঁর মাজার জিয়ারতের সুযোগ হয়েছিলো। সেখানে দীর্ঘ সময় অবস্থান করেছিলাম। তখন আমার অন্তরের মধ্যে আগের কথাটি মনে হলো। বরং মুখেই এসে গেলো। বললাম, জনাব খাজা সাহেব! এতো ভিড় আপনার নেসবতের মধ্যে প্রতিবন্ধকতার কারণ হয় কি-না? তিনি বললেন, আমাকে ভারতবর্ষের কুতুব বানানো হয়েছে। সৃষ্টির প্রয়োজন এবং তাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়া আমার সাথেই সংশ্লিষ্ট। এজন্য লোকেরা আমার দিকে ধাবিত হয়। এই বাস্তবতাকে মেনে নেওয়া ব্যতীত অন্য কোনো বিকল্প নেই। আল জমা বাইনাল আমরাইনি (দুয়ের মধ্যে সমন্বয়) আমার জন্য সহজ। এরপর বললেন, ওই নেসবত (মাইয়িয়্যাতে হুব্বী), যা খাজা কুতুবুদ্দীন খাজা মোহাম্মদ বাকীকে দিয়েছিলেন এবং যা তিনি তোমাকে দিয়েছেন, ওই নেসবত তিনি (খাজা কুতুবুদ্দীন) আমার কাছ থেকে লাভ করেছিলেন। এই নেসবত আমারই। তুমি খুবই স্মরণ রাখবে, তুমি কিন্তু আমারই। আমি বললাম, আয় খাজা হজরত! আমি তো ওই নেসবতকে খাজেগানে নকশবন্দিয়া নেসবত মনে করতাম। কিন্তু আপনার এবং খাজা কুতুবুদ্দীনের বক্তব্য থেকে মনে হচ্ছে, এই নেসবত চিশতীয়া সিলসিলার নেসবত। তিনি বললেন, এ নেসবত খাজেগানে নকশবন্দিয়াগণেরই, যা খাজা ইউসুফ হামাদানী আমাকে দান করেছিলেন।

এরপর আরেকবার ওই দরবারে উপস্থিত হবার সুযোগ হয়েছিলো। তখন তিনি বলেছিলেন, তুমি নিজ দেশে ফিরে যাও। সেখানে অবস্থান করো। লোকজনের আনাগোনা বা মেলামেশা বন্ধ করো। এ ক্ষেত্রের সকল কষ্টকে ধৈর্য্যের সাথে বরণ করে নিয়ো। আমি সেখান থেকে দিল্লী আগমন করলাম এবং হজরত সুলতানুল মাশায়েখ নিজামুদ্দীন কুদ্দিসা সিররুহুর জিয়ারতের জন্য উপস্থিত হলাম। সেখানে দেখলাম, এক সুদর্শন মাহবুব যিনি অত্যন্ত বিলাসবহুল বিছানায় বিশ্রামরত। তিনি বললেন, 'মাইয়িয়্যাতে হুব্বী' যা আমার নেসবত— এর অর্থ উভয় দিকের ভালোবাসা সমান হবে। কিন্তু আমার উপর মাহবুবী হালের প্রাধান্য রয়েছে। এ-ও বললেন, মাশায়েখদের উপদেশ অনুযায়ী নির্জনতা অবলম্বন করো। এ ক্ষেত্রে ধৈর্য বিশেষ সহায়ক এবং সহনশীলতা অতি উত্তম। সুফলপ্রাপ্তিতে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

দিল্লী থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় রসুলে আনওয়ার স. এর কদম মোবারক দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করলাম। খাদেমবৃন্দ যে পানি কদম মোবারকে ঢেলে দিচ্ছিলেন, আমি তা মুখ লাগিয়ে পান করলাম। অন্তরে বেদনাবিধুর বিলাপ শুরু হয়ে গেলো। ওখানেই আমার ক্ষমাপ্রাপ্তির সুসংবাদ লাভ করলাম। সেখান থেকে বাইরে এলাম। পুনরায় হজরত খাজা বাকী বিল্লাহর জিয়ারতের বাসনা প্রবল

হলো। কিছুটা পথ এগিয়ে যেতেই ওই বাগিচা দৃশ্যমান হলো, যেখানে হজরত খাজার মাজার শরীফ রয়েছে। আমি সেখানে পৌছে কদমের কাছে চুম্বন করলাম। আমার হালে মত্ততা প্রবল হলো। সেখানে অনেক অনুগ্রহই দৃশ্যমান হলো। এরপর পুনরায় পানিপথ পৌঁছলাম এবং খাজা শামসুদ্দীন তুরক র. এর মাজার শরীফে উপস্থিত হলাম। তাঁর দরবার থেকে এলমে মারেফাতের সীমাহীন সূক্ষ্মদর্শন ও অনুগ্রহ দৃষ্টিগোচর হলো। এরপর শায়েখ শরফুদ্দীন আবু আলী কলন্দর র. এর মাজার শরীফে গেলাম। তিনি অত্যন্ত দয়া ও অনুগ্রহ করার পর বললেন, এখন তো আর কোনো কষ্ট নেই এবং ধৈর্য্য ধারণেরও কোনো ব্যাপার নেই। নিঃসন্দেহে তাঁর কথা অনুযায়ী কিছুদিন এমনভাবেই চলেছিলো। তারপর পুনরায় কষ্ট, ধৈর্য্য ও সহনশীলতায় অন্তরায় সৃষ্টি হলো।

ঘটনা— এক রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম, সমগ্র জগত পানিতে পরিপূর্ণ। আমি এক রাস্তা দিয়ে চলছিলাম। যতদূর অগ্রসর হলাম, ততদূর পর্যন্ত পানিতে ডুবে গেলো। ফিরে এসে অন্য রাস্তা অনুসরণ করলাম। তখন সামনে কাবাঘর দেখতে পেলাম। দেখলাম, সকল পানি তার পাদদেশে ঢেলে দেওয়া হয়েছে। কালো আবরণ দ্বারা আবৃত করা হয়েছে। এটা ছিলো কাবা শরীফের পিছন দিক, যে দিক পানিতে পরিপূর্ণ ছিলো। কিন্তু কাবাঘরের সামনে হারামের মধ্যে একটি দরজা ছিলো। আমি ওই দিকের পথ দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলাম। তখন কাবা সম্পূর্ণ আমার সামনে এসে গেলো। তার দরজা ছিলো প্রাসাদতুল্য প্রশস্ত। আর কালো পোশাক দরজার সম্মুখভাগ থেকে একটু সামনে টানানো ছিলো। আমি তা উপরের দিকে উত্তোলন করলাম। তখন মধ্যভাগের দেয়ালে 'তাওরাত' গ্রন্থ লেখা ছিল। আমি তা পড়লাম। অতঃপর পর্দা ছেড়ে দিলে সূর্যের মতো হয়ে গেলো। এরপর আমি উঁচু স্থানে গেলাম। যেখানে কোনো পানি বা বৃক্ষ ছিলো না। সেখানে আমার বন্ধু সৃষ্টি হলো। তিনি আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন। এরপর আমি জাগ্রত হয়ে গেলাম। এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা আমার মধ্যে এরকমই প্রতিভাত হলো যে, এই দরবেশের বেলায়েতে মোহাম্মদী এবং বেলায়েতে মূসাবী অর্জিত হয়েছে। আমি এই স্বপ্ন ও তার ব্যাখ্যা মখদুমজাদা হজরত খাজা মোহাম্মদ সাঈদকে জানালাম। তিনি বললেন, আমারও এরকম মনে হয়।

ওয়াস্ সালাম আউওয়ালান ওয়া আখিরান আলা সাইয়্যিদিল অউয়ালিনা মুহাম্মাদিঁও ওয়া আ'লিহী ওয়া আসহাবিহী আজমাইন।

মহান আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহে এ পুস্তকখানি গ্রন্থনার কাজ সুসম্পন্ন হলো, যার নাম— 'হাজ্‌রাতুল কুদুস ফী মাকামাতিল আকাবিরিন নকশবন্দীয়া ওয়া দরজাতুল আ'ইয়ানিল আহ্‌মাদিয়াহ।'

হাজ্‌রাতুল কুদুস গ্রন্থের শেষ পর্বে হজরত মোজাদ্দেদ র. এর যে সকল খলিফাবৃন্দ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে তাদের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

১. মীর মোহাম্মদ নোমান
২. শায়েখ নূর মোহাম্মদ পাটনী
৩. শায়েখ আবদুল হামীদ বাঙ্গালী
৪. শায়েখ মোহাম্মদ তাহের লাহোরী
৫. খাজা মোহাম্মদ সিদ্দীক কাশমী
৬. শায়েখ বদীউদ্দীন ছাহারানপুরী
৭. শায়েখ তাহের বদখশী
৮. শায়েখ ইয়ার মোহাম্মদ তালেকানী
৯. মাওলানা আবদুল হাদী বদায়ুনী
১০. খাজা মোহাম্মদ সাদেক কাবেলী
১১. হাজী খিজির খান আফগান
১২. শায়েখ আহমদ দীবানী (দেওবন্দী)
১৩. শায়েখ আহমদ বরকী
১৪. শায়েখ ইউসূফ বরকী
১৫. শায়েখ আবদুল করীম (করীমুদ্দীন)
১৬. শায়েখ হাসান বরকী
১৭. শায়েখ আবদুল হাই শাদমানী
১৮. খাজা মোহাম্মদ হাশেম কাশমী
১৯. শায়েখ আদম বিন্ নূরী
২০. শায়েখ বদরুদ্দীন সেরহিন্দী (লেখক)

(রহমাতুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন)

এ সকল হজরতগণ স্বীয় হাল বিষয়ে ‘ওয়া আম্মা বিনি’মাতি রব্বিকা ফাহাদ্দিছ’ (আর আপনি আপনার রবের নেয়ামতের কথা প্রকাশ্যে ব্যক্ত করুন)— এ আয়াতের সূত্র ধরে শুধুমাত্র দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ গ্রন্থের মধ্যে হজরত মোজাদ্দেদ র. এর হাল ও ফয়েজপ্রাপ্তি বিষয়ে অধিক আলোচনা করা হয়েছে।

কিন্তু খাজা মোহাম্মদ হাশেম কাশমী র. ‘যুবদাতুল মাকামাত’ নামক গ্রন্থে এ সকল খলিফাবৃন্দের বৃত্তান্ত পৃথক পৃথক অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন।

১. মীর মোহাম্মদ নোমান
২. শায়েখ তাহের লাহোরী
৩. শায়েখ বদীউদ্দীন

৪. শায়েখ নুর মোহাম্মদ পাটনী (যিনি নূর মোহাম্মদ তিহারী থেকে ভিন্ন ছিলেন পৃঃ ৩৭৭)
৫. শায়েখ আবদুল হামীদ বাঙ্গালী
৬. শায়েখ মোজাম্মেল
৭. শায়েখ তাহেরী বদাখশী
৮. মাওলানা ইউসূফ সমরখন্দী
৯. মাওলানা আহমদ বরকী
১০. মাওলানা মোহাম্মদ সালেহ কাওলাবী
১১. মাওলানা মোহাম্মদ সিদ্দীক কাশমী
১২. শায়েখ আবদুল হাই
১৩. মাওলানা ইয়ার মোহাম্মদ কাদীম তালেকানী
১৪. মাওলানা কাশেম আলী
১৫. শায়েখ হাসান বরকী
১৬. শায়েখ আবদুল হাদী বদায়ুনী
১৭. শায়েখ ইউসুফ বরকী
১৮. সাইয়্যেদ মোহেব্বুল্লাহ মানিকপুরী
১৯. হাজী খিজির খান
২০. শায়েখ আহমদ দিবানী
২১. শায়েখ কারীমুদ্দীন
২২. মাওলানা আমানুল্লাহ লাহোরী

(রহমাতুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন)

এ সকল খলিফাবৃন্দের মধ্যে খাজা মোহাম্মদ হাশেম কাশমী র. নিজের নাম অন্তর্ভুক্ত করেননি। কিন্তু যুবদাতুল মাকামাত গ্রন্থ অধ্যয়নে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়— তিনিও খলিফাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বিশেষ করে নবম অধ্যায়ে এ সকল খলিফা ব্যতীত খাজা মোহাম্মদ হাশেম র. যুবদাতুল মাকামাত গ্রন্থের ৩৭৭ , ৩৭৮ পৃষ্ঠায় অন্যান্য খলিফাদেরকে এক সঙ্গেই উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ —

১. শায়েখ হাররী
২. শায়েখ দাউদ সালেকী
৩. শায়েখ ছালীম বিন নূরী
৪. শায়েখ নূর মোহাম্মদ তিহারী
৫. শায়েখ হামীদ বাহারী
৬. সূফী কোরবান কাদীম
৭. মাওলানা সাদেক কাবেলী

৮ . মাওলানা মোহাম্মদ হাশেম খাদেম
৯. মাওলানা গাজী নওগুজরাটি
১০. সূফী কোরবান জাদীদ
১১. সাইয়্যেদ বাকের সারেন্তাপুরী
১২. মাওলানা ফররুখ হুসাইন
১৩. মাওলানা জাফর আহমদ
১৪. মাওলানা বদরুদ্দীন সেরহিন্দী
১৫. মাওলানা আবদুল হামীদ আহমদী
১৬. হাজী হুসাইন
১৭. শায়েখ আবদুর রহীম বরকী
১৮. খাজা মোহাম্মদ আশরাফ কাবেলী
১৯. মাওলানা হাজী মোহাম্মদ ফরকতী
২০. মাওলানা আবদুল গফুর সমরখন্দী
২১. হাফেজ মাহমুদ গুজরাটি
২২. সলীম খান সহ অন্যান্য

(রহমাতুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন)

সূচীপত্রের নিম্নভাগে শায়েখ আদম বিন নূরী এবং মাওলানা বদরুদ্দীন সেরহিন্দী সহ অন্যান্যদের নাম রয়েছে। যাদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি হওয়ার আশংকায় পরিহার করা হয়েছে।

সমাপ্ত

আমি মৃত্যুকেই জীবন মনে করি। প্রকৃত জীবন মৃত্যুর সাথেই সম্পৃক্ত। মৃত্যুই হচ্ছে জীবন। মৃত্যুই বন্ধুত্বের পোশাক পরিধান করায়। নিঃশেষ করে দেয় অস্থায়ী আস্বাদকে। মৃত্যুই আল্লাহ্ ছাড়া সবকিছুর অস্তিত্বকে জ্বালিয়ে দেয়, অদৃশ্য ও স্থায়ী সৌন্দর্যকে উন্মোচিত করে। প্রেমিককে প্রেমাষ্পদের সাথে মিলিয়ে দেয়। ওটাই প্রকৃত মৃত্যু, যার আগমন আনন্দ দান করে।

- খাজা মোহাম্মদ সিদ্দীক কাশমী রহ.

HAZRATUL QUDUS

Written by Allama Badruddin Serhindi R.
Published by Hakimabad Khanka-e-Mozaddedia
www.hakimabad.com
Exchange Taka.300/- only. US $ 20

ISBN : 984-70240-0066-8